বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষা-চিন্তা

(১৮৫৭-১৯৪৭)

এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ

গবেষক
রোকসানা আক্তার
রেজিঃ নং ২০৭/২০১৫-২০১৬
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-২০১৬
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষা-চিন্তা (১৮৫৭-১৯৪৭) [The Educational Thought of Muslim Middle class of Bengal (1857-1947)] শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার একক ও নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, এ শিরোনামে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম.ফিল ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রির অথবা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

জুন, ২০২২

(রোকসানা আক্তার)
এম.ফিল গবেষক
(প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
বিভাগ, মিরপুর কলেজ, ঢাকা)
রেজিস্টেশন নং ২০৭/২০১৫-২০১৬
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-২০১৬
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬৩৩০

Department of Islamic History & Culture
University of Dhaka
Dhaka 1000
Phone : 9661900-73/6330
E-mail : ihc@du.ac.bd

নং :.....................................

তারিখ : ....

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব রোকসানা আক্তার কর্তৃক **'বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষা-চিন্তা (১৮৫৭-১৯৪৭)' [The Educational Thought of Muslim Middle class of Bengal (1857-1947)]** শীর্ষক এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছেন। এটি আমার নির্দেশনায় পরিচালিত গবেষকের একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। গবেষকের বক্তব্য স্পষ্ট ও ভাষা প্রাঞ্জল। এতে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তসমূহ নির্ভরযোগ্য। আমার জানা মতে, এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার জন্য অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপন করা হয়নি।

অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রী প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপন করার সুপারিশ করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

(ড. আবদুল বাছির)
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এম.ফিল অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষা-চিন্তা (১৮৫৭-১৯৪৭)'। এই অভিসন্দর্ভে বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষা-চিন্তার উপর মৌলিক যুক্তি প্রয়োগ করে এর স্বরূপ উদঘাটন ও অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এর সময়সীমা হলো ১৮৫৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। এ সময়ে পরিক্রমায় পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল ক্রিয়ার সমন্বয় ঘটিয়ে স্বরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে আলোচ্য অভিসন্দর্ভে। ভারতীয় উপমহাদেশ শাসনের সময় মুসলিম শাসকগণ শিক্ষার প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন। ইংরেজ আমলে সরকার ধীরে ধীরে আধুনিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব অনুধাবন করেছিল। একারণে তারা ফারসি ভাষার গন্ডি থেকে বের হয়ে আধুনিক তথা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি এদেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন। ইংরেজি ভাষা শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ভিত্তিতে তৎসময়ে বাংলার সমাজ ব্যবস্থাতে এক অবিস্মরনীয় পরিবর্তন সেই সাথে পরিবর্ধন শুরু হয়। পরিবর্তনের এই সুরকে প্রতিপক্ষ হিন্দুগণ আশির্বাদের মতো করে নিলেও মুসলিমগণ তা বরণ করেছিল অবহেলিতভাবে। তাদের এই চিন্তার অসারতা তাদেরকে শূণ্য অবস্থান হতে সর্বোচ্চ অবস্থান পর্যন্ত নিয়ে যেতে নিদারুন কষ্ট পোহাতে বাধ্য করেছে। বিশেষ করে বাঙালি মুসসলমানদের অবস্থা ছিল শোচনীয় পর্যায়ে। তবুও বাংলার মুসলিমগণ প্রস্তুত হতে থাকে। শিক্ষার আবহকে অন্তরে ধারন করতে থাকে। সামাজিক জীবন-যাপনে তাদের এই অবস্থান তৈরির অনুসন্ধানই আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (বর্তমানে ডিন, কলা অনুষদ) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির স্যারের তত্ত্বাবধানে আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। অভিসন্দর্ভটির সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও নির্দেশনা আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছে। এছাড়া তিনি আমাকে আন্তরিক অনুপ্রেরণা ও উপদেশ দিয়ে আমার কাজকে সর্বদা গতিশীল রেখেছেন। এজন্য আমি তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণাকর্ম সম্পাদনে আমি যাঁর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তিনি হলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া (বর্তমানে কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য)। গবেষণাকালে নানা পর্যায়ে তিনি আমাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও তথ্যাদি দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাঁর দিক-নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণাদানের জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) ড. তৌহিদ হোসেন চৌধুরী ও সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন খালেদ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এস. এম. মফিজুর রহমান, অধ্যাপক ড. মো. আবদুল রহিম, অধ্যাপক ড. এটিএম সামছুজ্জোহা, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. জসিমউদ্দিন ও তাঁর সহধর্মিনী হালিমা আক্তার (প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা সরকারী কলেজ) এবং শেখ বোরহান উদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক এস. এম. জাওয়াদুন নাহীন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তাসলিমা ইসলাম, মিরপুর কলেজের সহকারী অধ্যাপক শবনাম জাহান। তাদের সকলের পরামর্শ ও অন্যান্য সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

গবেষণাকর্মটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে গিয়ে আমি যে সকল প্রাজ্ঞ লেখক ও গবেষকের গবেষণা গ্রন্থাদি ও জার্নালসমূহ ব্যবহার করেছি তাঁদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

গবেষণাকর্মটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে গিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইট লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, বিশেষভাবে ব্যবহার করেছি। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ ও বাংলা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল লাইব্রেরি এবং বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস লাইব্রেরিতে আমি কাজ করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বরত ব্যক্তিবর্গ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে জানাই আন্তারিক ধন্যবাদ।

অনেক অসুবিধা ও সমস্যার মধ্যে থেকেও আমার পরিবারের সদস্যরা আমাকে সমর্থন জ্ঞাপন করে আমার লিখার কাজকে করেছে সহজতর। বিশেষ করে আমার বাবা-মার আর্শিবাদ আমার অনুপ্রেরণার উৎস। আমার বাবা আমার কাজের প্রতি সর্বদা যে শুভকামনা জ্ঞাপন করেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমার স্বামী আরিফুর রহমান মজুমদারের প্রতি আমার অনেক ঋণ। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে হয়তো এই অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সম্পন্ন হতো না। গবেষণা কাজকর্ম করতে গিয়ে নানাবিধ বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রমে আমাকে তাঁর সাহায্যদান অবিস্মরনীয়। আমার গবেষণালবদ্ধ মনকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে তাঁর সরব উপস্থিতি এবং আমার অনুসন্ধানময় জগতে বিশেষ অবস্থান তৈরি পূর্বক আমাকে অভিসন্দর্ভখানি রচনায় যতটুকু সাহায্য করেছেন তার জন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমার কন্যা পারিজাত মজুমদার আমাকে সর্বদা লিখায় ব্যস্ত থাকতে দেখতো। অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে আমার ব্যস্ততা মেনে নিয়ে প্রফুল্ল চিত্তে সে আমার পাশে থেকেছে যা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তার প্রফুল্লচিত্ত ও প্রীতিপূর্ণ সহযোগিতা আমাকে দিয়েছে সতেজতা।

পরিশেষে আমার সকল অনুপ্রেরণাদানকারী ও শুভাকাঙ্খীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

রোকসানা আক্তার
এম.ফিল গবেষক
(প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, মিরপুর কলেজ, ঢাকা)
রেজি: ২০৭/২০১৫-২০১৬
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন-২০২২ ইং

সারসংক্ষেপ/Abstract

শিরোনাম

বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষা-চিন্তা (১৮৫৭-১৯৪৭)

"The Educational Thought of Muslim Middle Class of Bengal (1857-1947)"

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ প্রশাসন নানাবিধ প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করে। এগুলির মধ্যে ইংরেজী ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে প্রচলন, ভূমি সংস্কার, রেলপথ স্থাপন এবং শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। নতুন ধারার এই পদক্ষেপগুলি এদেশের সমাজে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে এবং যার ফলশ্রুতিতে সমাজে নতুন শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। নতুন যুগে নতুন শ্রেণিকরণ বিষয়টি অতি বাস্তব সত্য হলেও সব সমাজে তার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। তাই বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় আধুনিক যুগের শুরুর সাথে সাথে নতুন শ্রেণি বিন্যাসকরণ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় যে মধ্যবিত্তশ্রেণির অস্তিত্ব পাওয়া যায় তা হলো মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি। কোম্পানি প্রশাসনে কর্মচারীদের মাধ্যমে এই শ্রেণিটি মধ্যবিত্তশ্রেণি। কোম্পানি প্রশাসনে কর্মচারীদের মাধ্যমে এই শ্রেণিটি আত্মপ্রকাশ করে। মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গন্ডির সীমায় তখন অবস্থান করছিল হিন্দুগণ। ১৭৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ থেকে পাস করা ছাত্রদেরকে কোম্পানি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশাসনে নিয়োগ দেয়। যেখানে মুসলিম সমাজ-এর অবস্থান ছিল শূণ্য। পরবর্তী দশকগুলিতে বিশেষ করে ১৮৮০ সালের পর হতে পাটের উৎপাদন ও চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়; সেই সাথে চাঙ্গা হতে থাকে বাংলার অর্থনীতি, পরিবর্তিত হতে থাকে মুসলিমদের জীবনধারা। মুসলিম সমাজ গঠন করে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণি, যার আর্থিক বুনিয়াদ ছিল পাটচাষ ও পাট শিল্পের বিকাশ। ১৮৭০ সালে পাঞ্জাব ও এলাহবাদ দুটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসিলম মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। তবে পূর্ব ও কিছুটা পশ্চিম বাংলায় তখনও কোন মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত বলে এখানে তাদের প্রতিপত্তি ছিল দূর্বল। মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ দশক ছিল ১৯১১ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত। ১৯১২ সালে বিশেষভাবে একটি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় মুসলিম সমাজে, কেননা তখন তারা বিশেষভাবে অধিকার সচেতন হয়ে উঠে। ১৯২১ সালে গিয়ে পূর্ববাংলার চেহারা পাল্টাতে শুরু করে। একটি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববাংলাকে এনে দেয় সীমাহীন পূর্ণতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাই পূর্ববাংলার জন্য গৌরবের বিষয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় পেশাভিত্তিক শিক্ষার হার যেমন বাড়ায় তেমন বাড়ায় ঢাকার মর্যাদা। দেখা গেল এই পূর্ববাংলায় দিনের পর দিন চাকুরীর হার বর্ধিত হতে গিয়ে বাড়িয়ে দেয় জীবন যাত্রার মান। সমাজে স্ব-স্ব অবস্থান তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে মুসলমানগণ। সমকালে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য সংগ্রম করে তারা অতীত গৌরবে অভিযান করার চিন্তায় নতুনত্ব অবিষ্কার করে কাঙ্খিত কল্পলোক তৈরির ভিত্তিতে নবজাগরণ রচনা করে । বাঙালির অভ্যাস, আচার-প্রথা, রীতি-নীতি, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানসমূহে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। কেবল একটি ক্ষেত্রে বাঙালিরা ছিল বাহিকে প্রভাবমুক্ত। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাঙালিরা ছিল স্বাধীন। এশিয়ার বাণিজ্যজগতে বাংলার স্থান ছিল সর্বোচ্চ। ১৮০০ শতকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানি চূড়ান্ত পতন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায়। ১৮২০-১৮৫৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে কোম্পানি তার ব্যবসায়িক স্বার্থ হারানোর ফলে রাজনীতিই হয়ে উঠে বাংলায় কোম্পানির একমাত্র নীতি ও উদ্দেশ্য। বাংলার সামাজিক অবস্থা তখন নতুন দিকে মোড় নেয়। অধিকার সচেতন বাঙালিরা

Dhaka University Institutional Repository

গড়ে তুলতে থাকে বিচ্ছিন্নভাবে নানা সংগঠন ও বিপ্লবী তৎপরতা। বাস্তব বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একটি বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলিম মানস জগৎ তৈরি করতে থাকে। এরা আবার নিজস্ব চিন্তা- চেতনার প্রকাশ করার রাস্তা বের করে। অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের নেশায় চিন্তা-চেতনাকে কাজে লাগাতে উদগ্রীব হয় উক্ত মুসলিমগণ। ১৮৫৭-১৯০০ সাল পর্যন্ত বাংলাভাষায় প্রকাশিত সংবাদ সাময়িক পত্রের মোট ৯০৫টি সংখ্যার ঘর দেখলেই তা সহজেই অনুমেয় হয়। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ২৪০টি। কোলকাতা কেন্দ্রিক পত্র-পত্রিকা বেশি হলেও অন্যান্য মফস্বল শহরগুলি থেকেও সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হওয়া শুরু করে। এগুলির মধ্যে যশোর থেকে প্রকাশিত 'অমৃত বাজার' পত্রিকা এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ঢাকা প্রকাশ' উল্লেখযোগ্য। তাবে বাংলাভাষায় প্রকাশিত সংবাদ সাময়িকপত্রের প্রকাশক ও গ্রাহক প্রায় অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি। ১৯২০-এর দশকের পূর্বে শিক্ষাপ্রাপ্ত নবজাত মধ্যবিত্তশ্রেণির ভূমিকা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় তেমনটি নয়। বস্তুত ১৯২০ সালে 'নবনূর' পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী কিংবা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র সম্পাদক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর ন্যায় দু'চারজন ব্যতিত কৃচিৎ তেমন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের সাক্ষাত পাওয়া যায় না। প্রতিবন্ধকতা ছিল অর্থের অভাব, কেননা উদ্যোক্তারা ছিলেন অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত। নিজেদের সামান্য সংগতি, সাধারণের নিকট হতে দান সংগ্রহ আর পত্রিকার বিক্রয়মূল্যের উপর নির্ভর করে তারা দু:সাধ্য প্রয়াসে ব্রতী ছিলেন, যা প্রশংসানীয়। তৎকালীন অধিকাংশ পত্রিকা প্রকাশিত হয় কোলকাতা থেকে। এরকম বিখ্যাত অনেক পত্রিকাদির মধ্যে ইসলাম প্রচারক, 'আল এখলাস', 'ছোলতান', 'ধূমকেতু' ইত্যাদি। অর্থের অভাব চলমান থাকলেও নতুন চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের বিজয় ঘটলে সমাজ সত্তায় নুতন গতিধারার সংযোজন সম্ভব, এই বিশ্বাসেই তখন পিছিয়ে পড়া মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি এগিয়ে যেতে থাকে। মূলত বিশ শতকের গোড়ায় লর্ড কার্জনের শাসনকালে লোহা ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ফলে বাঙালি সমাজে যে নতুন ধনিকশ্রেণি ও মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ হয় তাদের চরিত্র কতগুলি নির্দিষ্ট উপাদানে গঠিত। ইংরেজ শাসক ও বণিকদের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ তারা নানাদিক থেকে পেয়েছিলেন। এই সান্নিধ্য বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে নানা উপায়ে অর্থোপার্জনের পথ খুলে দিয়েছিল। তবে মুসলমানগণ এক্ষেত্রে সঠিকভাবে সুবিধাগ্রহণে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভবই মূলত বাংলার আর্থ-সামাজিক বিবতর্নের ফল, একথা স্বীকার্য।

বিত্তের মাপকাঠিতে গড়ে উঠা মধ্যবিত্তশ্রেণি তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে জীবিকা উপার্জন করে থাকে যেমন সরকারি ও আধাসরকারি বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা, সাধারণ ব্যবসায়ী, আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক এই শ্রেণিভুক্ত। আর অর্থোপাজনের এইসব ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপস্থিতি অতি সীমিত আকারে পরিলক্ষিত হয়। তাহলে মুসলিম সম্প্রদায়-এর উপায় ? বিশ শতকে এসে গোটা বাংলা অঞ্চলে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির অবস্থান বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠে। তারা সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য অন্বেষণ সহ বহুমাত্রিক ধারায় অগ্রসর হতে থাকে। বিশেষত মুসলিম সমাজ হতে কুসংস্কার দূরীকরণ, সাহিত্য সাধনা, হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস পুনরুদ্ধারে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি বিশেষ স্থান দখলের চেষ্টায় ব্রত হয়। কৃষি বুনিয়াদ হয়ে উঠে তখন বাঙালি মুসলিমগণের প্রধান লক্ষ্য। ১৮৯০-১৯১২ সালের দত্ত কমিটির মূল সংক্রান্ত বিস্তৃত অনুসন্ধ্যানে দেখা যায় যে, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় কৃষিভিত্তিক আয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল মন্থর। যেখানে ১৯০৯-১৩ সালে ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি স্পষ্ট হয়। পাট শিল্পের পাশাপাশি বাঙালি মুসলিমগণ মনোযোগ দেয় চা, চাউল, তাঁত ও লবন শিল্পের প্রতি। উন্নতি আসতে থাকে দ্রুতগতিতে তবে ভাগ্যখুলেনি কৃষক সমাজের। ক্রমশই তারা পতিত হতে থাকে দূর্বীপাকের ভিতরে। যার প্রভাব পড়তে থাকে আবার পরবর্তীতে উন্নতির সোপান কৃষির সাথে জড়িত শিল্প পক্রিয়ায়। ১৯৩০-৪০ এর দশককে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

যুগ, বলে চিহ্নিত একটি অধ্যায় রচিত হয়। আর মুসলমানদের এই প্রভাব বৃদ্ধির কারণ হলো একশ্রেণির মুসলমান কৃষকের সম্পদ বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র হলেও মধ্যবিত্তের সরব উপস্থিতি ও বিকাশ। ইংরেজী শিক্ষা চালু করার ফলে বাংলার সমাজ ব্যবস্থার ভিতর ও বাহিরে এক নান্দনিক পরিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। ইংরেজ সরকার ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচলন এবং ইংরেজী শিক্ষার জন্য পৃথক কলেজ স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই এই পরিবর্তন। বিশেষ করে ১৮২৮ সালের ১১ই অক্টোবর কোলকাতা মাদ্রাসায় মুসলিম ছাত্রদের জন্য ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন ছিল বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। ১৮৬১ সালে হুগলি কলেজ থেকে দেলওয়ার হোসেন নামক প্রথম মুসলমান ব্যক্তি বি.এ. পাস করেন। ১৮৭৪-এ গিয়ে বাংলা সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে, যার মধ্যদিয়ে শিক্ষানুরাগী ব্রিটিশদের উদারতা প্রকাশ পায়। লর্ড কার্জনের দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা ও তীক্ষ্ণতা মুসলিম শিক্ষার ক্ষেত্রটিকে আরও প্রসারিত করে। মূলত কার্জন শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির অধিকারটিই বেশি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। একটি মুষ্টিমেয় শ্রেণির মধ্যে আধুনিক শিক্ষার আলোকে আবদ্ধ না করে বরং এই শিক্ষাকে তিনি করেছেন সর্বশ্রেণির সর্বজনের জন্য উন্মুক্ত। ১৮৭০ সালে ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে একটি জিহাদ ঘোষণা করা হয়। মূলত তখন হতেই সমাজ হতে নানা কুসংস্কার ও কু-প্রথার অবসানের চিন্তা তৈরি হতে থাকে। এই চিন্তা অবশেষে সমাজ সংস্কারে গিয়ে নিমজ্জিত হয়। এমনই একজন বিখ্যাত সংস্কারক হলেন হাজী শরিয়তউল্লাহ, মুন্সী মেহেরুল্লাহ। জমিদারদের মধ্যে রয়েছে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী, নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। শিক্ষা সচেতন সংস্কারকগণের মধ্যে রয়েছে নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী। যাদের মধ্যে নওয়াব আবদুল লতিফ হলেন রক্ষণশীল মনের এবং আমীর আলী ছিলেন আধুনিক মনের অধিকারী। বিশেষ করে সৈয়দ আমীর আলী পুস্তকসমূহ সমাজ সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, মীর মশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহের হোসেন চৌধুরী যারা মুক্তবুদ্ধির চিন্তাকে মর্যাদাদান পূর্বক সমাজ সংস্কার ও পরিবর্তন সাধনে ছিলেন বিশেষ আগ্রহী। আধুনিক বাংলার জনক রাজা রামমোহন রায় হলেও বাঙালি মুসলমান ও বাংলাকে আধুনিক ধারায় অব্যহত রাখতে তৎপরবর্তী সময়ে শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির কয়েকজন ব্যক্তিমানস বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা কখনও নীচুতা, কখনও শঠতার মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলেছিল ঠিক বিশ শতকের ৪০-এর দশক পর্যন্ত। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির মনোজগৎকে ইংরেজদের ক্রীয়ানক হতে মুক্ত রাখার জন্য সু-পরিবর্তনকামী বাঙালি মুসলমানগণ প্রতিভূ হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকেন। আবার কখন উন্নত ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে সমাজে এনে দেয় আলো। বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি এক সংঘাতময় অবস্থান তৈরীতে যথেষ্ট। যেমন, বিশ-উনিশ শতকের ও সত্তর-এর দশক পর্যন্ত প্রসিদ্ধ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর চিন্তা-চেতনায় তা বোঝা সম্ভব। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১), যিনি বাঙালি মুসলমান সাহিত্য স্রষ্টাদের মধ্যে অগ্রগামী। রচনার আধিক্যে ও প্রতিভার গৌরবে তিনি বাংলার সকল শ্রেণির পাঠকের কাছে সুপরিচিত। তিনি তাঁর লিখায় একটি আদর্শ মেনে চলতেন, তা হলো সমাজে অত্যাচারের স্বীকার মানুষের বেদনাবোধের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর চিন্তা মূলে কিংবা চিত্ত গোহরে যে বিষয়টি দৃঢ়তার রূপ নিত; কুসংস্কার, অন্যায় হলো একটি বিশেষ সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফল। চল্লিশ বৎসরের সাহিত্য সাধনার জগত থেকে বিচার করলে তিনি যে সম্পূর্ণ সম্প্রদায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী তা স্পষ্ট হয় । মূলত তিনি ছিলেন সাহিত্য পদবাচ্য ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী একজন লেখক। মুক্তবুদ্ধির কণ্ঠস্বর কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) যাঁর আজীবন সাধনা ছিল সম্মোহিত মুসলামনের জাগরণ। তিনি বিশ্বাস করতেন জ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজন মুক্তবুদ্ধির অথবা তারও চাইতে বেশি প্রয়োজন সমাজ জীবনে বৈচিত্রের।

Dhaka University Institutional Repository

অথচ তৎসময়ের মুসলিম সমাজ ইসলাম ধর্মের সঠিক অর্থ ভালভাবে বোধগম্য না করে নিজের খেয়াল-খুশি মতো কোরআন-সুন্নাহ-এর মধ্যে জ্ঞানের অপার বিষমতা খুঁজতে গিয়ে পৃথিবীর বৈচিত্রতা ভূলে চিত্তকে নানা কুসংস্কারে দূর্বল করে ফেলেছিল, যা নিতান্ত দুঃখজনক। মানুষের চিত্ত যার আঘাতে জেগে উঠবে সেই বৈচিত্রতাও তৎসময়ের সমাজে ছিল দূর্বল। তাই কাজী আবদুল ওদুদের উদার ধর্ম নিরপেক্ষবাদ দৃষ্টিভঙ্গি বাংলার মুসলিম সমাজে বির্তকের সৃষ্টি করে। প্রকৃত জ্ঞান চর্চার অভাবেই মূলত তাঁর উদার ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বুঝার ক্ষমতা তৎসময়ের মধ্যবিত্তশ্রেণির ছিল না।

আবুল হোসেন (১৮৯৬-১৯৩৮) তিনি ছিলেন মূলত উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন, ধর্মনিরপেক্ষ লেখক। ইসলাম ধর্মের শরীয়তের সত্য বিষয়গুলির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল, তৎসময়ে মুসলিম সমাজে একধরণের রোগ বাসা বাঁধে, আর তা হলো 'বৈরাগ্যবাদ'। অথচ ইসলামে বৈরাগ্যের স্থান নেই। এই কারণেই তৎসময়ে মধ্যবিত্তশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত মুসলিম লেখকদের সাথে দ্বন্দ্ব বাঁধে সমাজে বসবাসকারী বাকী মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির। আলোচ্য দুই জন বুদ্ধিদীপ্ত লেখকদের ছাড়া আরও অনেকে রয়েছেন যারা উনিশ শতকের শেষার্ধ ও বিশ শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত তাদের উদার মনোভাবাপন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে স্ব-ধর্মের মানুষের নিকটই হয়েছেন আলোচিত ও সমালোচিত। বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি শ্রেণিগত স্বার্থে অতি দ্রুত সংঘাতে যেমন জড়িয়ে পড়ে তেমনি আবার তারাই সমাজকে করে শংকামুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত।

রোকসানা আক্তার
এম.ফিল গবেষক
(প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,
মিরপুর কলেজ, ঢাকা)
রেজি: ২০৭/২০১৫-২০১৬
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন-২০২২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষা-চিন্তা

(১৮৫৭-১৯৪৭)

সূচিপত্র

ঘোষণা পত্র i

প্রত্যয়নপত্র ii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার .... iii-iv

সার-সংক্ষেপ/Abstract .... v-viii

ভূমিকা: প্রস্তাবনা ১-৭

প্রথম অধ্যায়: বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ ৮-৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ ৩৪-৭৮

তৃতীয় অধ্যায়: বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ৭৯-১২৭

চতুর্থ অধ্যায়: আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা এবং বাঙালি মুসলমান ১২৮-১৮৭

পঞ্চম অধ্যায়: সমাজ সংস্কার আন্দোলন এবং কতিপয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব ১৮৮-২৪৯

ষষ্ঠ অধ্যায়: আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মধ্যবিত্তশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি ২৫০-৩০০

উপসংহার ৩০১-৩১২

পরিশিষ্ট ৩১৩-৩১৮

গ্রন্থপঞ্জি ৩১৯-৩২৯

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

প্রস্তাবনা

ব্রিটিশ বাংলায় আধুনিক মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ ইংরেজ শাসন আমলে সম্পন্ন হয়। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দরুন বাংলার সংস্কৃতি ছিল মূলত গ্রামীণ ধাচের। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন এবং বংশধরদের জন্য সঞ্চয় করার প্রবণতা না থাকায় মানুষজন শহরমুখী হয়নি বা চেষ্টা করেনি। নগররাষ্ট্র যেখানে সচেতন, নাগরিকগণ সেখানে সচেতন, আর এই সচেতন নাগরিকদের উৎস মেলে শিল্পে, যার ফলশ্রুতিতে গঠিত হয় সচেতন মধ্যবিত্তশ্রেণি। এই মধ্যবিত্তশ্রেণি পরমুখাপেক্ষী মধ্যবিত্তশ্রেণি হিসেবেও পরিচিত। এই শ্রেণি কর্মচঞ্চল ও গতিশীল। নবজাগরণ সংগঠনের পূর্বশর্ত আবার এই গতিশীলতা। তাইতো মধ্যবিত্তশ্রেণির চিন্তাশক্তির বলয়ই তৈরি করে নবদিগন্তের সূচনা। শহরকেন্দ্রিক শক্তিশালী মধ্যবিত্তশ্রেণি বৃটিশ শাসনের ফল।[১] উনিশ শতকের সত্তর দশক থেকে বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহ ও সুযোগ পরিলক্ষিত হয় এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে নানা সমস্যার মধ্যদিয়েও সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় উল্লেখ্যযোগ্য প্রসার লাভ করে। বাঙালি মুসলমান পরিবর্তন করতে থাকে স্ব-স্ব ক্ষেত্রকে। আধুনিক ভাষা শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, পত্র-পত্রিকার প্রকাশ, সভা-সমিতির গঠন, বাংলা গদ্যের বিকাশ ও তার মাধ্যমে আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি, কলকারখানা স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, নগর সৃষ্টি এবং নগরে মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব, শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ সংস্কার আন্দোলন এবং তার মধ্য দিয়ে মুক্তবুদ্ধির ও মানবতাবোধের বিকাশ বিশেষভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ম-নীতির ফলে বাঙালি মুসলমানদের জন্য যেসব প্রেক্ষাপট ও ঘটনাবলী তাদের শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তা হলো– ১৮৭১ সালে ভারত সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত ঘোষণা, ১৮৭২ সালের জনশুমারী, ১৮৭৩ সালে বাংলা সরকারের শিক্ষা রেজুলেশন, হান্টার কমিশনের (১৮৮২) সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৮৮৫ সালে লর্ড ডাফরিনের ঘোষণা, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার (১৯১৪), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৯২১), ১৯৩৭ সালে মুসলিমলীগের সহযোগিতায় বাংলায় সরকার গঠন, ১৯৪৬ সালে দিল্লীতে মুসলিম লেজিসলেটরস কনভেনশন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২]

বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস অনুধাবনের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত গবেষণা ‘বাংলার মুসলিশ মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষা-চিন্তা (১৮৫৭-১৯৪৭)’ শীর্ষক গবেষণাকর্মের কেন্দ্রবিন্দু ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রনাধীন ঔপনিবেশিক বাংলা। আমাদের গবেষণার ভৌগোলিক পরিসীমা হলো অবিভক্ত বাংলা তথা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ। বৃটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ হলো বাংলা ভাষাভাষী এই অঞ্চল। ১৮৫৫-৫৬ সালে তদানীন্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের অধীনে বাংলার আয়তন ছিল সর্বমোট ২,৫০,০০০ বর্গমাইল। এই বিশাল বাংলা প্রদেশ তখন সাতটি অংশে (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, সীমান্ত রাজ্য, আসাম ও আরাকান) বিভক্ত ছিল।[৩] ১৮৭৪ সালে আসামকে বাংলা থেকে বিভক্ত করা হয়।[৪] ১৯০৫ সালে বৃটিশ সরকার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে পূর্ববাংলার সাথে পুনরায়

আসামকে যুক্ত করে।[৫] ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর পশ্চিমবাংলাকে ভাগ করে বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর নিয়ে পৃথক প্রদেশ গঠন করা হয় এবং পূর্ববাংলা থেকেও আসামকে পুনরায় বিযুক্ত করে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সমন্বয়করণের মাধ্যমে মূল বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬] এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।[৭]

প্রস্তাবিত গবেষণার ব্যাপ্তি ১৮৫৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। ১৮৫৭ সাল ভারতের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রার সংযোজন করে। এই মাত্রা ছিল মুসলমানদের শিক্ষা-চিন্তার কাঠামো তৈরীর সোপান। যদিও তারা ব্রিটিশদের চোখে ত্রাসরূপে গণ্য হতো। মূলত এরই ধারাবাহিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে ১৮৬০-এর দশক হতেই শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির গঠন কাঠামো শুরু হয়। অবশেষে ১৮৭০-এর দশকে গিয়ে শিক্ষা-চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে নবজাগরণের সূচনা করে।[৮] আধুনিক ইংরেজী শিক্ষাই এক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচ্য। ১৯৪৭ সাল ভারত-এর স্বাধীনতা ও বাঙলা ভাগের পূর্ব পর্যন্ত বিশেষ করে ১৯৪১-এর পর হতে ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা বিষয়ক কোন বিবরণী প্রকাশিত না হলেও ১৯৪৭ সালকে অবিভক্ত বাংলা ভাঙ্গনের শেষ সীমা নির্ধারণ তাৎপর্যের দাবী রাখে। এযাবৎকাল বাংলার আর্থ-সামাজিক-ইতিহাস অনুধাবনের উদ্দেশ্যে সে সমস্ত গ্রন্থ ও গবেষণা অভিসন্দর্ভ বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ের উপর রচিত হয়েছে সেখানে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষা-চিন্তা ও এর বহিঃপ্রকাশ নিয়ে তেমন কোন গ্রন্থ ও গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। ফলে আমাদের এই গবেষণা কর্মটি গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটাবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে মোট 'ছয়টি অধ্যায়ে' ভাগ করে মূল উপপাদ্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ'। আলোচ্য এই শ্রেণিটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য আমরা বাংলার সমাজ ব্যবস্থার নানামুখী কর্মকাণ্ডকে ব্যবহার করে সর্বজনীন মধ্যবিত্তশ্রেণির সাথে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে; তাছাড়াও গুরুত্ববহ এই শ্রেণিটির পরিধি, বিস্তার, বিকাশ, অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে শ্রেণিটির উদ্ভব এর যুক্তিসঙ্গত অনুসন্ধান খুঁজে বের করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ'। এই অধ্যায়টি ১৮৫৭-১৯০৫, ১৯০৬-১৯২১, ১৯২১-১৯৪৭ গুরুত্বপূর্ণ সময়সীমার আলোকে বিন্যস্ত। ক্ষমতাহীন বাঙালি মুসলমানগণ কী করে নব্য মধ্যবিত্তশ্রেণি গঠনের প্রয়াস হাতে নিল, বিশেষ করে তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে বাঙালি মুসলিম সংকট আবহ আলোচিত হয়েছে। ইতিহাসের প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িত উৎসের আলোকে যাচাই বাছাই পূর্বক তথ্য সন্নিবেশনের মাধ্যমে অধ্যায়টিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য হলো 'বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের আর্থ-সামাজিক অবস্থা'। পাট শিল্পকে ব্যবহার করে বাংলার মুসলিম সমাজ কী করে নিজেদের আর্থিক উন্নতি সাধন করে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হয়– সেই বিষয়ের বিশেষ বিবরণ এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রাথমিক উৎসসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে। বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য তাদের জীবন-যাপনে বস্ত্র, চাউল, চা, তুলা, ধান শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থানটিকে যাচাইকৃত ডাটা, তত্ত্ব ব্যবহার করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হলো 'আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা ও বাঙালি মুসলমান'। ইংরেজী বিদ্যার অভাবহেতু চাকুরিহীন অসহায় বাঙালি মুসলিম, অপরদিকে যে মক্তব-মাদ্রাসা, খানকাগুলিতে সুফি-দরবেশগণ ধর্মীয় জ্ঞান দান করে জীবিকা নির্বাহ করত বৃটিশ সরকারের প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি, তদুপরী গ্রামে হিন্দু জমিদার ও শহুরে নব্য হিন্দু বাবুশ্রেণির বৃদ্ধির সংকট দাঁড়ায় ভয়াবহতায়। পরবর্তীতে বিখ্যাত ইভানজেলিস্ট আন্দোলন[৯] ও ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, আসাম ও বিহারের মুসলিম সম্প্রদায়ের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি সদিচ্ছার (১৯০৭-১৯০৮) ফলে বাংলার মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতি হয় দ্রুতগতিতে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার মুসলিম শিক্ষা ও আধুনিকতার গতি প্রাপ্তির দিকটিকে যাচাইকৃত তত্ত্ব-উপাত্তের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্বল করার লক্ষে পূর্ববাংলার অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয়-এর আওতাধীন করে যেভাবে শিক্ষার্থী বাড়ানো হল, সে অর্থে শিক্ষক সংখ্যা না বাড়িয়ে অথচ শিক্ষক সংকট ঘটানো হয়েছিল তার অর্থবহুল চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়টির শিরোনাম 'সমাজ-সংস্কার আন্দোলন এবং কতিপয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব'। বাংলার মুসলিমগণ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সেদিন থেকে অনুভব করে যেদিন ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের শাসনের অবসান হয়। সমাজ ও রাষ্ট্র সচেতন মধ্যবিত্তশ্রেণি সমাজ সংস্কারের পুরোধা। তারা মূলত বিপ্লবী চেতনার মানুষ, যারা আন্দোলন ও প্রতিবাদী পরিবেশ তৈরির মধ্যদিয়ে জাগরণ তৈরি করে থাকে। সংস্কারবাদীরা সংঘাতকে উপেক্ষা করে সমাজকে পরিবর্তনের, উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। শিক্ষক, মাওলানা, লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কৃষক, শ্রমিক এবং কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অপরপক্ষে জমিদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ কীভাবে বাংলার মুসলমানদের কুসংস্কার আচ্ছন্ন জীবনধারাকে পাল্টে দিতে পেরেছিল তার সামগ্রিক আলোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। একটি নব-উত্থিত সমাজের অন্ত:প্রকৃতিও বহিঃপ্রকৃতিতে যেমন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল, সমাজের নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের শিক্ষা-চিন্তারও তেমনি সীমাবদ্ধতা ছিল। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়-সীমাবদ্ধতার মধ্যদিয়েই উন্মোচিত হয়েছে নবচেতনার দ্বার। আলোচ্য অধ্যায়ে এসব বিষয়ের স্বরূপ উদঘাটনের প্রয়াস চালানো হয়েছে। সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতির আলোকে বাঙালি মুসলিম সংস্কারক ও তাদের আন্দোলনকে জাতির সামনে তুলে ধরার সামগ্রিক এই ধরনের যুক্তিসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ পূর্বে হয়েছে বলে আমাদের অজানা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি'-এর স্বরূপ নিরূপন করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমাজের প্রচলন সনাতন ধারাকে বদলে দেয়। পশ্চিমা আদলে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি নিজেদেরকে পাল্টাতে শুরু করে, গড়ে তুলে পেশাভিত্তিক সভা-সমিতি ও সংগঠন। বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে নবজাগরণের অগ্রপথিকদের আধুনিক চিন্তা, সমাবেশ হতে থাকে মুক্তবুদ্ধির ধারা। রাজা রামমোহন রায়[১০] তার জ্ঞানান্বেষনের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রয়োগ করে পুঁথিগত ও শাস্ত্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বিলুপ্তির নিমিত্তে সর্বদা নিজের যুক্তিতে অটল থেকেছেন। আমূল সংস্কারবাদী চিন্তাধারার প্রতিভূ হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) তার একাডেমিক এসোসিয়েশনের মাধ্যমে একটি দল তৈরি করতে সক্ষম হন।[১১] যার নাম 'ইয়ংবেঙ্গল', তারা ধর্মকে উপেক্ষা করে চলত। ডিরোজিও তিনটি মন্ত্র মেনে চলতেন– পাপের

প্রতি ঘৃণা, যুক্তিবোধ, সত্যনিষ্ঠা। আধুনিক শিক্ষার প্রভাব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-কে (১৮২০-১৮৯১) করে তুলে প্রগতিবাদী। ১৮৪৮ সালের পর হতে নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) তাঁর রক্ষণশীল অথচ পাশ্চাত্য উদারনৈতিক শিক্ষার্জনে সমাজে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি (১৮৬৩)। শিক্ষিত হিন্দু, মুসলিম ও ইংরেজদের মধ্যে পাস্পারিক সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তোলায় বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৮৭০ সালে মুসলিম সম্প্রদায়ের পুনজার্গরণের বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হন সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৮২৮)। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রগতিশীল পদক্ষেপ নেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এ উদ্দেশ্যকে সফল করতে কোলকাতায় গড়ে তুলেন Central National Mohameddan Association। এই দুই ব্যক্তিত্ব একটি নতুন এলিট সোসাইটি সংগঠিত করার মধ্যদিয়ে যুক্তিবাদের যুগ তৈরী করতে সমর্থ হন। ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব’। জড়তা থেকে বুদ্ধির মুক্তির, বিচারবাদের, মানবিকত্বের প্রবক্তা, সাম্প্রদায়িকতার বিরোধীতা, যা ছিল মুক্তবুদ্ধির কণ্ঠস্বর কাজী আবদুল ওদুদ ও ওদুদ মানসদের। কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)। বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনকালে ১৯২৬-এ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম সাহিত্য সমাজ, তিনি ছিলেন সংগঠনটির প্রতিভূ।[১২] সংগঠনটির বার্ষিক মুখপত্র ছিল শিখা।[১৩] বিবেচনা যখন গুনাহতুল্য-সেই পরিবেশে কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, বেগম রোকেয়া, কাজী মোতাহের হোসেন, আবুল হুসেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তৈরী করতে পেরেছিলেন ‘বিদ্রোহী চেতনার যুগ’।[১৪]

বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষা-চিন্তা (১৮৫৭-১৯৪৭) বিষয়ের উপর গবেষণাকর্ম অপ্রতুল। এ বিষয়ে যে যৎসামান্য আলোচনা হয়েছে তা উনিশ শতকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কয়েকজন পণ্ডিত এই সময়ে বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন। বিশেষ করে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ তাদের আলোচনায় প্রাধান্য পেলেও বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষা-চিন্তা বিষয়টি তেমনভাবে সেসব গবেষণাকর্মে উঠে আসেনি। উক্ত সময়সীমার মধ্যে যেসব গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে তার মধ্যে ওয়াকিল আহমদ কর্তৃক রচিত (১৯৮৩) *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা (১৮৫৭-১৯০৫)* গ্রন্থটি এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নিঃসন্দেহে। তবে গ্রন্থটিতে লেখক বাংলা সাহিত্যের ভাবধারা ও চিন্তাধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধিজীবী মহলের চিন্তা-ধারাকে তোলে এনেছেন। আবদুল মওদুদ কর্তৃক রচিত (১৯৬৯) *মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ ও সংস্কৃতির রূপান্তর* গ্রন্থে রূপান্তরিত সংস্কৃতির সাথে উনিশ ও বিশ শতকে বাংলার মুসলমানদের জীবনধারার উত্থান-পতনকে ‘একস্টার্নাল প্রলেতারিয়েত’[১৫] রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশপর্বের ধারাবাহিক বিবরণ তেমন আলোচনা হয়নি। অর্থ-শিক্ষায় বলিয়ান মধ্যবিত্তশ্রেণির রূপটিকে তিনি নেতিবাচকভাবে রূপদান করেছেন।

সুফিয়া আহমেদ কর্তৃক রচিত *বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় (১৮৮৪-১৯১২)*গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক বিচার-বিবেচনায় বাংলার হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়কে পারস্পরিক প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশের আদলে চিত্রিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি মুসলমান

সম্প্রদায় ও তাদের পূর্বে পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ত্রুটিযুক্ত করে মুসলমানদেরকে বৃটিশ সরকারের আনুকূল্য নির্ভর রূপে অভিহিত করেছেন।

আনিসুজ্জামান কর্তৃক রচিত (২০১২) *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)* গ্রন্থটি আলোচ্য বিষয়ের উপর রচিত নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এখানে লেখক বুঝাতে চেয়েছেন হিন্দু মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ পর্বের সূচনাগার হলো বাণিজ্য, অপরপক্ষে মুসলিমরা মধ্যবিত্তশ্রেণি গঠন করেছে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মধ্যদিয়ে। সমাজে আধুনিক শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে চলার পক্ষে সহায়ক থেকেছেন বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ। আবদুল বাছির কর্তৃক রচিত (২০১২) *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি (১৭৫৭-১৮৫৭)* গ্রন্থটিতে বাংলার কৃষক, কৃষি, কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণির পরিসর সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা হয়েছে। বিনয় ঘোষ রচিত (১৯৬৮) *বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)* গ্রন্থটিতে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে মধ্যবিত্তশ্রেণিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখক গ্রন্থটিতে লিখেছেন, ইংরেজী শিক্ষার একটি বিশেষ দিক হলো ব্যক্তিস্বতন্ত্রবাদ, যা বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণি হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির অনুকরনে লাভ করেছে, একথাটি যেমন নেতিবাচক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট নির্মাণ করে ঠিক তেমনি মুসলিমদের তিনি আবদ্ধ রেখেছেন মাদ্রাসা ও মক্তবে আর হিন্দুগণকে স্থান দিয়েছেন কুলবৃত্তিগত বন্ধনে। ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া কর্তৃক রচিত (১৯৯৫) বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ (১৮৮৫-১৯২১) গ্রন্থটি উক্ত বিষয়টিকে জানার জন্য একটি তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। লেখক এখানে বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে পাটশিল্পের বিস্তর বিবরণ দিয়েছেন। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম কর্তৃক রচিত *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো* গ্রন্থটি পাঠক ও গবেষকদের জন্য তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ একথা স্বীকার্য। Azizur Rahman Mallick কর্তৃক রচিত(1961) *British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856)* গ্রন্থটিতে বাংলার মুসলমানরা যে ধর্ম ত্যাগ করে হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হতে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন সে বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে। স্বপন বসু কর্তৃক রচিত (১৯৭৫) *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)* গ্রন্থটিতে লেখক ১৮৫৭ সালকে চিহ্নিত করেছেন ইংরেজ ভক্তির যুগ হিসেবে। বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষা-চিন্তার পরিসরটুকু নিয়ে বিশদ আলোচনার জন্য ড. শাহজান মনির কর্তৃক রচিত (১৯৯৩) *বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-ধারা (১৯১৯-১৯৪০)* গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। লেখক বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের বাঙালি মুসলমান লেখকদেরকে ঐতিহ্যানুসারী ও উদারনৈতিক লেখক হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। গ্রন্থটিতে লেখক সাহিত্যিকদেরকে বিশেষভাবে নিজের মত করে চিত্রায়িত করেছেন। ফলে চিন্তার জাগতে দ্বি-মত পোষণের সূচনা দেখা দেয়। যা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে বিবেচিত। তথাপি গ্রন্থটি এই বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ।

Dr. A.K. Nazmul Karim রচিত (1956) *Changing Society in India and Pakistan* গ্রন্থটিতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের সাথে সাথে গতিশীল সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য এই গ্রন্থটি বিশেষ সহায়ক অবস্থান তৈরি করে। গ্রন্থটিতে লেখক বাঙালি ও বাংলাদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব, বিকাশ এবং পরবর্তীতে তাদের সামাজিক অবস্থানকে সম্পূর্ণরূপে

অর্থের সাথে সম্পর্কিত রেখেছেন, যে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষিত হওয়া যায়। M.F. Rahman কর্তৃক রচিত (1973) *The Bengali Muslims and English Education (1765-1855)* গ্রন্থটি মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কিত হলেও এর আলোচনা উনিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সীমিত।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে গিয়ে ইতিহাস গবেষণা ও বিশ্লেষণের পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়বস্তু ঘটনার ক্রমানুসারে সমকালীন নির্ভরযোগ্য সূত্রের ভিত্তিতে গভীরভাবে পর্যালোচনাপূর্বক এর যথার্থ বিচার ও মূল্যায়নের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচনায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, যাতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ ও প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা যায়। আমাদের গবেষণায় আলোচনার সূত্র হিসাবে আমরা প্রধানত ব্রিটিশ সরকারের সমকালীন প্রকাশিত-অপ্রকাশিত শিক্ষা বিষয়ক দলিলপত্র ও বিবরণী, বেসরকারি শিক্ষা কার্যবিবরণী এবং পত্র-পত্রিকার উপর নির্ভর করেছি। পরবর্তীতে সরকারের প্রকাশিত জনশিক্ষা পরিচালকের বার্ষিক প্রতিবেদন ও পাঁচশালা শিক্ষা বিবরণীর সবগুলো আমরা এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছি, যে বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে ইতোপূর্বের কোন গবেষণায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। আলোচ্য সময়ে প্রকাশিত বাংলার সকল সেন্সাস রিপোর্ট ও শিক্ষা বিষয়ক সমস্ত কমিশন রিপোর্টও আমরা ব্যবহার করেছি। সমকালীন লেখক, বুদ্ধিজীবী ও ধর্মপ্রচারদের শিক্ষা বিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থ ও পুস্তিকাসমূহের সাহায্য আমরা নিয়েছি। যেকোন সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য নির্ধারিত এলাকার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বিষয়ে উক্ত অঞ্চলের সমকালীন দলিল-দস্তাবেজ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে বলে আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটি লেখার জন্য উক্ত উৎসসমূহ ব্যবহার করেছি। বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষা-চিন্তা (১৮৫৭-১৯৪৭) শীর্ষক গবেষণার প্রয়োজনে বেঙ্গল ডিস্ট্রিকস গেজেটিয়ার ও স্টাটিস্ট্রিক্যাল একাউন্টস অব বেঙ্গল ইত্যাদি সিরিজ থেকে পরিসংখ্যানমূলক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে গবেষণাকর্মটি নিঃসন্দেহে পরবর্তী গবেষকদের জন্য নতুন গবেষণার দ্বার উন্মোচিত করবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

তথ্যসূত্র:

১. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ.২৫

২. M. Fazlur Rahman, *The Bengali Muslims and English Education; A.R Mallick, British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856),* Bangla Academy, Dacca, 1977, P. 85; Latifa Akanda, *Social History of Muslim Bengal (1854-1884),* Islamic Cultural Centre, Dacca, 1981, P. 67; মোজাফ্ফর আহমদ, বঙ্গদেশে মাদ্রাসার শিক্ষা, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৬, পৃ.২৩৩

৩. আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃ.২

৪. R.C. Majumder, *Glimpses Bengal in the Nineteenth Century*, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1960, P. 30; সুফিয়া আহমেদ, *বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় (১৮৮৪-১৯১২)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ.১

৫. A. Howell, *Ducation in India Prior to 1854 and in 1870-71*, office of the superintendent of Government Printing, Calcutta, 1872, P. 4; N.K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1962, Vol-I, P. 16

৬. Azizur Rahman Mallick, *British Policy and Muslims in Bengal*, Bangla Academy, Dacca, 1977, P.67

৭. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ (১৮৮৫-১৯২১)*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.১৪

৮. Syed Mahmood, *A History of English Education in India (1781-1893),* The Honorary Secretery of the M.A.O. College, , Aligarh, 1895, P.150

৯. In Christianity, Evangelism (or witnessing) is the act of preaching the gospel with the intention of sharing the message and teachings of Jesus Christ. Christians who specialize in evangelism are often known as evangelists, whether they are in their home communities or living as missionaries in the field, although some Christian traditions refer to such people as missionaries in either case. Some Christian Traditions consider evangelists to be in leadership position, they may be found preaching to large meetings or in governance roles (Mark.A. Lamport, Encyclopedia of Christianity in the Global South, Vol.2, Rowman & littlefield, USA, 2018, P.148)

১০. রাজা রামমোহন রায় ২২ মে ১৭৭২ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ইংল্যান্ডে ব্রিস্টল শহরে মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। রাজনীতি, জনপ্রশাসন, শিক্ষা ও ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব ছিল স্পষ্ট। রামমোহন রায়কে 'আধুনিক ভারতের জনক' এবং 'ভারতীয় নবজাগরনের জনক' বলা হয়। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ধর্মীয়-সামাজিক পুনর্গঠন আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি একজন বাঙালি দার্শনিক (N. Brahendra Bandyopadyay, *Rommohan Roy*, London University Press, London, 1933, P. 351)

১১. ইয়ং বেঙ্গল হল হিন্দু কলেজের ছাত্রদেরকে সমসাময়িক কলকাতা সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত সামাজিক বুদ্ধিবাদী একটি অভিধাবিশেষ। এরা সবাই হিন্দু কলেজের মুক্তবুদ্ধি যুক্তিবাদী শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর অনুসারী ছিলেন। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর কর্মকাল ছিল ১৮২৬ সাল থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত (N.S. Bose, *The Indian Awakening and Bengal*, Fima K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1960, P.230-232)

১২. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "শিখা গোষ্ঠী: ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা'। যুগান্তর, ঈদসংখ্যা, ২০০৩, মাজহারুল ইসলাম, ৭৪

১৩. খন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, সূচীপত্র, ২০০৬, পৃ. ৭১

১৪. পাঠকের ভাবনা, বাঙালির বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন ৬ই মার্চ ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আকার্ইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১০ই মার্চ ২০১৫, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ

'বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ' বস্তুত বাঙালির সমাজজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সামাজিক স্তরবিন্যাসে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত– এই তিন স্তরের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসাবে মধ্যম স্তরটির অস্তিত্ব লক্ষণীয়। মধ্যম স্তরটির মানুষজন যখন মধ্যমধর্মী সাবলীল চিন্তা-চেতনা নিয়ে একই ধারায় জীবন যাপন করে, তখন তারা আবার সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণির গণ্ডিধারন করে হয়ে যায় মধ্যবিত্তশ্রেণি। সর্বজনীনতার ভিত্তিতে গোটা মানবজাতিই প্রায় এই স্তর বিন্যাস অনুসরণ করে চলছে। বাঙালি জনগোষ্ঠীর যে স্তরটি মধ্যবিত্ত চিন্তাধারা নিয়ে বিকশিত হয় তারাই হল বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি। 'বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ' বিষয়টি আলোচনার পূর্বে বাঙ্গলা, বাঙালি ও বাঙালিত্ব– এই প্রত্যয়সমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রয়োজন। প্রাচীনকালে পূর্বভারতের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বাঙালি জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিলো। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে একটি ভৌগোলিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে কালক্রমে বঙ্গ থেকে বঙ্গাল বা বাঙ্গালা বা বাংলা, সুবে বাংলা, নিজামত, বেঙ্গল, পূর্ববাংলা, পশ্চিমবাংলা, উত্তর বাংলা ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। মূলত বাংলায় বসবাস করে বাংলাকে অন্তরে লালন করে কতিপয় মানবগোষ্ঠী যে চেতনা তৈরী করে তাই বাঙালিত্ব। বাঙালিত্ব বিষয়টি আমাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত। বাঙালিত্ব চেতনাটিকে বুকে লালন করে পরিচয় হয়ে উঠে, আমি বাঙালি অথবা আমরা বাঙালি। গ্রাম বাঙলার স্নিগ্ধ প্রকৃতিতে বসবাস করে, গ্রামের মাটি অংগে মেখে, মাছ-ভাতের সাথে ভাপে উঠা শাক, ভর্তা ও ডাল না হলে মনে হয় এক অকৃত্রিম ভাললাগা পূর্ণতা পায় না। জীবন-যাপনের এমন সুখ আমাদের গ্রাম বাংলায় প্রবাহমান। হিন্দু-মুসলমান এখানে একসাথে সুখে-দুঃখে বসবাস করে। নগরের অস্তিত্ব গ্রামের পরে বলে এখানে গ্রামীণ বাংলার জীবন ধারা আলোচ্য বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পাচ্ছে।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে দক্ষতার প্রশ্নে মানুষের মধ্যে উঁচু-নিচু স্তরের সৃষ্টি হয়। যেখান থেকে প্রতিযোগিতা, আর প্রতিযোগিতা হতেই পরিবর্তন। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্র ছিল সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার নিয়ামক স্বরূপ।[১] সে সমাজে রাজা ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল সমাজ ব্যবস্থাকে রক্ষণ ও পালন করা, আর সমাজের দায়িত্ব রাজা ও রাষ্ট্রকে প্রতিপালন করা। সমাজ আছে বলে রাজা ও রাষ্ট্র আছে, সমাজহীন রাষ্ট্র কল্পনাও করা যায় না। রাজা ও রাষ্ট্রের পক্ষে ধন যেমন অপরিহার্য, সমষ্টির পক্ষেও তাই। ধনব্যবস্থা, ভূমিব্যবস্থা, শ্রেণিব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমস্তই সামাজিক সম্পদকে কেন্দ্র করে। সম্পদ না হলে রাজা ও রাষ্ট্র প্রতিপালিত হয় না। প্রাচীন বাঙলায় সম্পদ উৎপাদনের তিনটি উপায় লক্ষ্য করা যায়, যেমন: কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য।[২] উক্ত তিন উপায় আবার তিন ধরনের শ্রেণি তৈরী করে– ভূস্বামী, শিল্পী ও বণিক বা ব্যবসায়ী শ্রেণি। প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থা এই তিনশ্রেণির দ্বারা অতি সাবলীলভাবে পরিচালিত হত। আলোচ্য তিন উপায়ে উৎপাদিত আয় দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হত। তথাকথিত তিনশ্রেণি ও রাষ্ট্র মিলে উৎপাদিত সম্পদ বণ্টনের

ব্যবস্থা হত। কাজেই রাজা, রাষ্ট্র ছাড়া সমাজব্যবস্থার মধ্যে এই শ্রেণির অর্থাৎ ধনোৎপাদক শ্রেণির বিশেষ স্থান ছিল। রাজা ও রাজকর্মচারীদের অপেক্ষা তারা যে সংখ্যায় বেশী ছিলেন সেটি সহজেই অনুমেয়। ধনোৎপাদন, ধনবন্টন ও ভূমিব্যবস্থায় ভূস্বামীদের সাথে ভূমিহীন কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের সম্বন্ধ, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীদের সাথে রাষ্ট্র ও সমাজের সম্বন্ধ, শ্রেণি ব্যবস্থা ও বর্ণ ব্যবস্থায় বর্ণের সাথে শ্রেণি, বর্ণের সাথে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের সাথে শ্রেণি সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়সমূহ গবেষণার একটি বড় ক্ষেত্র। তথাপি গবেষণার সুযোগ রয়েছে বলেই বোধ হয় প্রাচীন ভারতের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক স্তরবিন্যাস।

প্রাচীন গ্রাম্য সমাজের সামাজিক শ্রেণিরূপও ছিল অচল, যেখানে সবার উপরে দেশের রাজা। রাজা ও প্রজার মধ্যে দূরত্ব এত বেশি ছিল যে কেউ কাউকে চোখের দেখাও দেখতে পেত না, কদাচিৎ খাজনা কিংবা ভোঁজ উপলক্ষ ছাড়া। তৎসময়ের জমিদারের রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীগণ প্রজাদের সাথে জমিদারের হুকুম অনুসারে বিশেষ সংযোগ স্থাপন করতেন। ফলে জমিদারদের সাথে প্রজাদের সাক্ষাৎ ছিল কদাচিৎ। সংগতি সম্পন্ন খোদকায়েস্ত কৃষক ও কারিগররা বিত্তের দিক হতে মধ্যশ্রেণি ভুক্ত হলেও সামাজিক প্রভাব ছিল তাদের চিরন্তন প্রথানুগত; বিত্তগত নয়। আসলে গ্রাম্য সমাজের প্রভাবপ্রতিপত্তি বিত্তনির্ভর ছিল না; কুলবৃত্তিগত ছিল। ব্রাহ্মণ তার কুলবৃত্তির জন্যই গ্রাম্যসমাজে অখণ্ড প্রতিপত্তিশালী ছিলেন; বিত্তের জন্য নয়। কাজেই বিত্তের দিক দিয়ে মধ্যশ্রেণি গ্রাম্য সমাজে থাকলেও সমাজে প্রথানুগত কৌলিক প্রভাব ছাড়া আর্থ প্রভাব কার্যকর ছিল না। তাই আধুনিক অর্থে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথা বলা হচ্ছে তা সে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় গ্রাম্য সমাজে ছিল তা বলা যায় না। শতকরা নব্বই জন স্বল্পবিত্ত দরিদ্র কৃষক নিয়ে তখনকার গ্রাম্য সমাজগুলি গঠিত ছিল। বাকী দশ-পনের জন জমিদার ও আমলা ছাড়া বাকী সবাই মূলত কুলবৃত্তিজীবী।[৩] ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠীর ছোবলে গ্রাম্য সমাজের স্থিতাবস্থায় আঘাত আসতে শুরু করে। কেননা বেনিয়া গোষ্ঠী বাংলার মাটিকেই ভেবেছিলেন অর্থাপোর্জনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তবে একথাও সত্য যে চিরায়ত সবুজ গ্রাম এত দ্রুত পরিবর্তন মেনে নেয় নি। যার শুরু হয় পুরাতনে, আবার নতুনত্বকে প্রয়োজনের খাতিরে ছাড়তেও পারেনি। ফলে তখন গ্রামগুলি পুরাতন ও নতুনের মাঝখানে পড়ে বিপর্স্ত হচ্ছিল। তবে এই অবস্থা থেকে বাঁচার নেশায় মানুষও উপায় খুঁজতে শুরু করে। এভাবেই সমাজ ব্যবস্থায় নিজের অজান্তেই এক ভাঙ্গণের সূর দেখা দেয়। যদিও আমরা চাই সবকিছু যেমন আছে সেভাবেই থাকুক, তবুও তার পরিবর্তন হবে।[৪] এভাবে ক্রমবিবর্তন তথা পরিবর্তন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকল এবং সেই সাথে সামাজিক শ্রেণি ও বর্ণের দিকটিও বিকশিত হতে লাগল।

বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ

বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা করতে গেলে কয়েকটি বিষয় সামনে চলে আসে, যেমন মধ্যবিত্তশ্রেণির সংজ্ঞা, সমাজে এই শ্রেণি কিভাবে আত্মপ্রকাশ করল তথা তার উদ্ভব, সর্বজনিন মধ্যবিত্তশ্রেণি বনাম বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি, মধ্যবিত্তশ্রেণির পরিধি ও বিস্তার, মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ, বিকাশের অন্তরায়সমূহ, শ্রেণি চরিত্র, মধ্যবিত্তশ্রেণির বিভিন্ন পর্যায়ের বিশ্লেষণ ও অবস্থানগত আলোচনা ইত্যাদি। বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্রমধারা অতি

গভীরভাবে আলোচনা করলে সেখানে ‘মধ্যবিত্তশ্রেণি’ চরিত্রটির সন্ধান পাওয়া যায়। সমাজ পরিবর্তনশীল ও বিবর্তনসম। এই বিবর্তন ক্রমানুসারে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এই ক্রমবিবর্তন সময়ের আবর্তে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করে অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটায়। অবস্থানগত এই রূপটি সমাজবদ্ধ মানবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে সাহায্য করে। এভাবেই উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ প্রশাসন কতগুলি প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করে। এগুলির মধ্যে ইংরেজী ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে প্রচলন, ভূমি সংস্কার, রেলপথ স্থাপন এবং শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। এই নতুন পদক্ষেপগুলি এদেশের সমাজে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। ফলে এদেশের সমাজে নতুন শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এই নতুন শ্রেণি সম্পর্কে ১৮২৯ সালের ১৩ই জুন একটি সমসাময়িক পত্রিকায় লেখা হয় ‘যে লোক পূর্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিনে দিনে দীনের হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহাদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।’

এই কথাগুলিতে এটা সুস্পষ্ট যে, সমাজে এই সময়ে একটি নতুন শ্রেণি আত্মপ্রকাশ করেছে। অবশ্য শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আরম্ভ হয়েছিল।[৫] কিন্তু একটি শ্রেণির আত্মপ্রকাশ একটি নির্দিষ্ট বছরে হতে পারে না। তবে এটা বলা যায় যে, এই কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণগণ পরবর্তীকালে এই নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়। মধ্যবিত্তশ্রেণির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আপাতদৃষ্টিতে জটিল হলেও সমাজবিজ্ঞানীরা এই শ্রেণির কতগুলি বৈশিষ্ট্যের সাথে একমত। সাধারণভাবে বলা যায় যে, মধ্যবিত্তশ্রেণি তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এই শ্রেণির লোকেরা প্রধানত সরকারি কর্মকর্তা, সাধারণ ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও শিক্ষক হয়ে থাকেন।[৬] পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীরা মধ্যবিত্তশ্রেণির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এদের মধ্যে গ্রেটেন অন্যতম। তিনি ইংরেজ মধ্যবিত্তশ্রেণির চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, সমাজের সেই শ্রেণিকেই আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে পারি মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রধান নিয়ামক এবং মুদ্রাই তাদের জীবনের প্রাথমিক উপাদান। এদের মধ্য থেকে তিনি জমিদার ও কৃষকদের বাদ দিয়েছেন কারণ ভূ-সম্পত্তি এবং জমি-জমাই এদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, মুদ্রা নয়।[৭] এখানে ইংরেজ মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবিকা নির্বাহ করে অর্থ। অর্থই এই শ্রেণির সামাজিক পদমর্যাদা নির্ধারণ করে থাকে। কখনও এই শ্রেণি সুবিধাভোগী বলে ধরে নেওয়া হয়। কারণ এই শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত লোকেরা অল্প পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং জীবিকা নিশ্চিত করে। আর এই শ্রেণিটির বিচরণ ক্ষেত্র হল নগর অথবা শহর। নাগরিক জীবনের প্রতি তাদের রয়েছে বিশেষ আকর্ষণ। মার্কস মধ্যবিত্তশ্রেণি সম্পর্কে বলেছেন- ‘এই শ্রেণিটি সাধারণত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির উপর নির্ভরশীল থেকে উচ্চবিত্তদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে’।[৮]

এই মন্তব্য থেকে ধারণা করা যায় যে, কায়িক পরিশ্রম পরিহার করেও অপরের শ্রম থেকে এই শ্রেণিটি অর্থ উপার্জন করে এবং উচ্চবিত্তদের বিরুদ্ধে যেকোন ধরনের আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। তবে সাধারণভাবে এটা

ধারণা করা যায় যে, প্রতিটি শ্রেণি বিভক্ত সমাজেই উচ্চবিত্ত এবং বিত্তহীন শ্রেণির মধ্যে অস্তিত্বশীল অভিন্ন স্বার্থের দাবীদার সম্প্রদায়কেই মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলা যায়। এই শ্রেণিটি সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা পছন্দ করে এবং সন্তানদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হয়।[৯] সমাজবিজ্ঞানী নাজমুল করিম এই শ্রেণিটি সম্পর্কে বলেছেন, মধ্যবিত্তশ্রেণির রয়েছে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা, যা এই শ্রেণির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তিনি মধ্যবিত্ত বলতে চান নি।[১০] বিশেষ করে এখানে তিনি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন। সুতরাং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত পটভূমি একজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য।

বাঙলার ইতিহাস আলোচনা করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বহু মানুষের মিলন ধারার মোহনাময়ী বাঙলায় মিলনের ছলে ঘটেছে সংস্কৃতির আদান-প্রদান, উত্থান-পতন, জীবন-জীবীকার বিভিন্নমুখী প্রয়াস। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কাল মার্কস (Karl Marks) ব্রিটিশ শাসন ও শোষণনীতির ফলে বাঙালির সমাজজীবন পরিবর্তনের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "অতীতে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে যত পরিবর্তনই হোক না কেন, সেই সুন্দর অতীত থেকে প্রায় উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত তার সামাজিক জীবনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। তাঁত ও চরকা চিরকাল ভারতের অসংখ্য তাঁতী ও সূতাকাটনির জীবিকা ছিল এবং ভারতের স্থিতিশীল সমাজের প্রধান স্তম্ভ ছিল কারুশিল্প। ভারতের সমাজ জীবনে অনধিকার প্রবেশ করে ব্রিটিশ শাসকরা আবার এই চরকা ও তাঁত ধ্বংস করেছেন"।[১১] মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব মূলত নবজিজ্ঞাসার যুগেরই এক প্রতিফলন, কেননা যেখানে সতেচনতা সেখানেই মধ্যবিত্তশ্রেণি। যেখানে সংস্কৃতির চরম উৎকৃষ্টতা, সেখানেই মধ্যবিত্তশ্রেণি। তাই সমাজগঠনে এই শ্রেণির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভবের ইতিহাস তাই একটি জটিল বিষয়। উনিশ শতকে বাঙলায় এক নতুন যুগের এবং সেই সূত্রে আধুনিকতার সূত্রপাত একথা মোটামুটিভাবে স্বীকার্য। এই নবযুগের পিছনে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবের কথাও স্বীকার্য। অবশ্য প্রতিচ্যভাবই আধুনিকতা নয়, আধুনিকতা আরও ব্যাপক এবং গভীর। তবে পাশ্চাত্যের চলমান সভ্যতা সংস্কৃতির স্পর্শ এদেশে আধুনিকতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। আত্মসচেতনতা, রাজনৈতিক চেতনা, নতুন অর্থনৈতিক ও সেই সূত্রে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, জীবনদৃষ্টির ভিন্নতা ইত্যাদি বাংলার মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থাকে প্রচন্ড আঘাত করেছিল, যার ফলে বাংলায় নতুন একটি যুগের সূত্রপাত হয়েছিল। বিষয়টি সমসাময়িক ব্যক্তিদেরকেও আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। আমরা এর প্রমাণ দেখতে পাই ১৮২৯ সালে রামমোহনপন্থী পত্রিকা 'বেঙ্গল হেরল্ড'-এ। সেখানে পরিবর্তনের এই সময়টিকে 'dawn of a new era' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১২] উনিশ শতকে ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইউরোপীয় সভ্যতা এই পরস্পর বিরোধী দুই ধারার সম্মুখীন হয়েছিল এদেশের মুষ্টিমেয় সচেতন জনমানুষ। আর তাদের আত্ম জিজ্ঞাসা নিয়েই মূলত সৃষ্টি বাঙালির নবজিজ্ঞাসার যুগ। অর্থাৎ দেখা যায় নবজিজ্ঞাসার হাওয়াও বাঙালি মানুষের সীমাবদ্ধ পরিসরে ছিল। এই আত্মজিজ্ঞাসার ব্যপ্তি প্রসারিত ছিল তৎকালীন ধর্ম, সামাজিক রীতি-নীতি ও রাজনীতির উপর। উনিশ শতকে বাংলার এই নবজিজ্ঞাসার পরিধি ছিল কোলকাতাকে কেন্দ্র করে। নবজিজ্ঞাসার ছোঁয়ায় যে বাঙালিরা সবচাইতে বেশি সাড়া দিয়েছিলেন তারা মূলত হিন্দু সম্প্রদায়; বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় নয়। তাই হিন্দু সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব হয় আগে, আর মুসলমান সমাজে আসে পরে। নতুন যুগের নতুন শহর ঘরবাড়ী যেভাবে বিশ্ব মানসপটে

তার শ্রীবৃদ্ধি প্রকাশ করছিল, তার আলোচনা না করলেই নয়। ১৭৮৪ সালে ‘ক্যালকাটা পোস্টে এক ব্যক্তি এক চিঠিতে লিখেন- ‘আমোদ প্রমোদ ও ফ্যাশনের অভিনবত্বে অল্পদিনের মধ্যে কলকাতা ইউরোপের অধিকাংশ শহরের প্রতিদ্বন্ধী হয়ে উঠবে।’[১৩]

১৮২৩ সালে ‘কলিকাতা কমলালয়’-এর লেখক একে ‘মহানগর’ বলে আখ্যায়িত করেন। ১৮২৪ সালে জেমস অ্যাটকিনসনস তার একটি কবিতায় একে ‘সম্পদনগরী’ হিসাবে চিহ্নিত করার পর ১৮৩০-এ ক্যালকাটা ম্যাগোজিনের একজন প্রতিনিধি কোলকাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, অতীত দিনের কবি ও অন্যান্যরা ট্রয়-রোম সম্পর্কে যা বলেছেন তা আমাদের এই কোলকাতা সম্পর্কেও সত্য। অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই এই শহর কনস্টানটাইনের রাজধানীর মতো জগতের বিস্ময় আর মানুষের সৃষ্টি ও কর্মের এক জলন্ত উদাহরণ হয়ে উঠবে।[১৪] কোলকাতাকেন্দ্রিক নবজিজ্ঞাসার এই সময়টিতে যে মনীষীরা ছিলেন তারা মূলত বিশ্বাসের সাথে যুক্তির বিরোধ মীমাংসাতেই ব্যস্ত ছিলেন। আপসহীন এই হিন্দু ভদ্রলোকদের হাতেই মূলত আধুনিক যুগের সৃষ্টি। বাংলার আধুনিকতার জনক রাজা রামমোহন রায়, যিনি একজন বিত্তশালী ছিলেন। চাকুরী করতেন দেওয়ান হিসাবে। সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে সুশীলভাবে অব্যাহত রাখতে বিত্তশালী রামমোহন ছিলেন একজন আদর্শস্বরূপ। বাংলার নবজিজ্ঞাসার চূড়ান্ত একটি পর্যায় সৃষ্টি হয়েছিল মধ্যবিত্তশ্রেণির। যদিও বিত্তের আধিপত্যতা এখানে একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল ইংরেজগণ কর্তৃক সৃষ্ট। তাইত টি.বি. মেকলে বলেছেন- “Indian in blood and colour but English in tastes in monals and intellect.”[১৫] এই মধ্যবিত্তশ্রেণি আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা আধুনিক বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবজাত যুক্তিবাদ, সেই সূত্রে কিছুটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত সম্মানবোধ নিয়ে তাঁরা আত্মসমীক্ষার পথে এগিয়ে গেলেন। উচ্চবিত্তের যুগসঞ্চিত শ্রেণি স্বার্থরক্ষার প্রয়াস ও জনসাধারণকে সার্বিক বঞ্চনার চেষ্টার মধ্যে এই শ্রেণির কিছু মানুষই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাই রামমোহনপন্থী ‘বঙ্গদূতের’ ভাষ্যকার ১৮২৯ সালে বলতে চেয়েছিলেন, ‘এই নতুন শ্রেণি হইতে যেসকল উপকার উৎপাদ্য তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত’। ইয়ংবেঙ্গলের নায়ক ডিরোজিও তার আলোচিত শিষ্যরা তাদের জিজ্ঞাসাকে পূর্ণতাদানের জন্য উচ্ছৃংখলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েও স্থির রক্ষণশীলতার ভীতকে কাপিয়ে দিতে পেরেছিলেন। নতুন জিজ্ঞাসার পূর্ণ আলোয় আলোকিত আরেকজন হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মধ্যবিত্তশ্রেণির গণ্ডিতে ছিলেন তিনি। কিন্তু ছিলেন ভদ্রলোক ঘরের একজন দরিদ্র সন্তান। উদ্ভাসিত সচেতন, নতুন জিজ্ঞাসুর পরিবর্তন দানকারী এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভবকে বিকশিত করতে আলোচ্য সম্প্রদায় ‘সাময়িক পত্রিকা’-কে বাহন হিসাবে ব্যবহার করত। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে দেশীয় সাময়িকপত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটলে প্রচলিত ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছু এর আলোচনার বিষয়বস্তু হল। প্রচলিত ধর্মাচার, সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদির প্রতি জিজ্ঞাসার চিহ্ন ব্যক্তিক সীমাবদ্ধতা ছেড়ে সাময়িক পত্রের মাধ্যমে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করল। এই প্রসারের ফলে পরিবর্তিত হল দেবনির্ভর বাঙালি জীবন, স্থান পেল মানবমুখী বাঙালি জীবন, পরিবর্তিত হল বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রচলিত ধারা। মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশপর্বে উনিশ শতকের ৩০-এর দশক পর্যন্ত ছিল সংস্কারবাদের মধ্য দিয়ে huminism নিষ্পত্তির যুগ। এই বোধ নগরে সৃষ্টি হয়ে খুব অল্প

পরিসরে গ্রামকে আলোড়িত করতে পেরেছিল। উনবিংশ শতাব্দিতে বাংলায় আধুনিকতার সূত্রপাতকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন স্যার যদুনাথ সরকার। তিনি বলেছেন-'১৭৫৭ সালে পলাশীর মাঠে এক গতিশীল জাতির হাতে স্থিতিশীল আরেক জাতির পরাজয়ের মাধ্যমে অর্থ্যাৎ আধুনিকতার আলোকপাতে মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণা অচলামতন কিছুটা বিচরিত হল।'[১৬] অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে তথা উনিশ শতকের শুরুতে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক জয়ের মাধ্যমে বাংলায় যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল কালক্রমে তা আরো সুসংহত হয়। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে কোম্পানি সরকারের গৃহীত নানামুখী প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপের ফলে বাংলার ইতিহাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ হল। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এর আগে বাংলায় কোন প্রকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না। যে বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ঔপনিবেশিক যুগে সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি পূর্বের মধ্যবিত্তশ্রেণির তুলনায় ভিন্ন বৈশিষ্টের অধিকারী ছিল।[১৭] সমসাময়িক জমিদারদের রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীগণ যেমনঃ কানুনগো, পাটোয়ারী নায়েব, গোমস্তা, সেপাই, বরকন্দাজ যারা প্রজাদের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করতেন তারা বৃত্তের মাফকাঠিতে মধ্যবিত্তশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলেও সামাজিব প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা ছিল প্রথাগত। কাজেই আধুনিক অর্থে তারা মধ্যবিত্তশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা বিত্তের দিক হতে প্রাচীন বাংলার গ্রাম্য সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হতো, বরং ক্ষমতার প্রথানুগত মৌলিক প্রভাবই ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণির গঠনের মূল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব পাওয়া যায় তা হলো মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি। কোম্পানি প্রশাসনের কর্মচারীদের মাধ্যমে এই শ্রেণিটি আত্মপ্রকাশ করে। ১৭৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ থেকে পাস করা ছাত্রদেরকে কোম্পানি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশাসনে নিয়োগ দেয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল ব্রিটেন ও এশিয়ার বৃহত্তর এবং সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হয় ব্রিটেনের বাজারের জন্য এশিয়ার পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু পণ্য কেনার উদ্দেশ্যে কোম্পানি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় দ্বিতীয়ভাগে আরেকটি বিষয় জয় করেন। তা হলো ভারতে স্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিবেশ। তারপর কোম্পানি অন্যান্য ব্যবসায়িক সংঘকে ছাড়িয়ে যায়। সময় হল শুধু পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, পরিবর্তন ও গৃহীত পদক্ষেপে, বিশেষয়ত্ব ঔপনিবেশিক কাঠামোর আদলে। ১৬০০-১৮০০ সালের মধ্যবর্তী সময়টি বাঙলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের এক বৈপ্লবিক সময় হিসাবে পরিগণিত। এই সময়ে কোম্পানি অশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে পুরো ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। প্রথমে জুডিসিয়ারিতে উকিল নিয়োগ দেওয়া শুরু হয়, সেক্ষেত্রে হিন্দুদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। চিকিৎসার সুবিধার্থে মাদ্রাসায় স্থানীয় চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২০] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং স্বীকৃত প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে প্রশাসনে নিযুক্ত হবার নীতি কোম্পানি শাসনামলেই শুরু হয়। ইংরেজ সরকার তাদের জনবলের চাহিদা পূরণ করার জন্য স্কুল কলেজ স্থাপন করে। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ভাষাচর্চাও শুরু হয়। ১৮৬১ সালে হিন্দু উচ্চবিত্তের সহায়তায় কোলকাতাকেন্দ্রিক একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বিদ্যালয়টি হিন্দু কলেজ এবং ১৮৬৫ সাল থেকে প্রেসিডেন্সি

কলেজ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং মিশনারীদের প্রচেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হতে থাকে। ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ইংরেজী ভাষা বিষয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। অফিসের ভাষা হিসাবে ইংরেজীর প্রচলন এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে লর্ড মেকলে বিখ্যাত মিনিট উপস্থাপন করেন।[২১]তিনি তার মিনিটে ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে জোড়ালো যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি মনে করেন, ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে এমন একটি শ্রেণির সৃষ্টি হবে, যে শ্রেণিটি হবে জাতি হিসাবে ভারতীয় কিন্তু চিন্তায় কর্মে ও কালচারে ইংরেজ।[২২] মেকলের এই উক্তি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভবের পূর্বাভাস বলা যায়। তার উপস্থাপিত সুপারিশসমূহ ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ লর্ড বেন্টিং-এর সহায়তায় পাস হয়ে যায়।[২৩] সরকারিভাবে ইংরেজী ভাষা প্রচলনের ঘোষণা বাংলার সামাজিক ইতিহাসে বিশেষ ঘটনা। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির আত্মপ্রকাশ সমাজ পরিবর্তনে সুদূরপ্রসারি প্রভাব রাখে। ইংরেজী ভাষা প্রচলনের পরবর্তী দশকে ভারতে রেলপথ স্থাপন করা হয়। এই রেলপথ নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যান্ডের উৎপাদিত শিল্পপণ্যের দ্রুত বাজারজাতকরণ এবং সেই সাথে কাঁচামালের জোগান দেওয়া। রেলপথ নির্মাণের ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকলেও তা ভারতের জন্য ছিল একটি নবজাগরণ। এই প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন যে, রেলপথকে কেন্দ্র করেই ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য দৃঢ় হবে, রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নয়ন ঘটবে, আধুনিক কলকারখানা গড়ে উঠবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ ব্যবস্থা নিঃশেষ হয়ে যাবে, প্রাচীন বর্ণপ্রথা, সংস্কার ইত্যাদির অবসান হবে, আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উদ্ভব হবে'।[২৪] অর্থাৎ মধ্যযুগীয় গ্রামীণ ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটলে স্বভাবত নগরায়ন বৃদ্ধি পাবে। আর এই নগরায়ন বৃদ্ধি ঘটতে প্রধান ভূমিকা রাখবে অফিস, আদালত এবং অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি। ইংরেজী প্রচলনের পরবর্তী দশকে রেলপথ স্থাপন করা হয়। আর তারও দশবৎসর পর বাংলায় প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। ১৮৫৪ সালে বাংলায় প্রথম পাটকল স্থাপিত হবার সাথে সাথে এই অঞ্চলের আর্থ সামাজিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়। পরবর্তী দশকগুলিতে বিশেষ করে ১৮৮০ সালের পর হতে পাটের উৎপাদন ও চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। কলিকাতা কেন্দ্রিক পাটকল এবং নগরীর পাটকলগুলি বাংলায় উৎপাদিত পাটের প্রধান ব্যবহারকারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পাটচাষ এবং পাটশিল্পের বিকাশের ফলে বাংলার অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এই অর্থনৈতিক উন্নতি নতুন শ্রেণি গঠনে সহায়তা করে। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আর্থিক বুনিয়াদ ছিল কৃষি নির্ভর। তাই বাংলায় আধুনিক শিক্ষা ছিল ইতিবাচক। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ শুম্পিটার বলেছেন যে, 'শ্রেণিগত বাঁধা অতিক্রম করে উচ্চতর শ্রেণিতে যাত্রার অন্যতম উপায় হল ব্যক্তির দিক হতে পূর্বনির্দিষ্ট কর্ম ছাড়া সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কোন কর্ম করে প্রতিষ্ঠা লাভ করা' পারিবারিক ও সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ঘটনাচক্রে, দৈব ভাগ্য ও ব্যক্তিগত শক্তির কারনে শ্রেণি সোপানের উচ্চতর ধাপে উঠেছেন, কিন্তু উক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও উপরে উঠার সবচেয়ে বড় উপায় হল- "the method of stribling out along unconventional paths"।সর্বকালে এ কথা প্রযোজ্য। কিন্তু ধনতান্ত্রিক যুগের মত কোন কালে তা এমন ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য নয়– "This has always been the case but never so much as in the world of capitalism" শুম্পিটার এ কথা লিখেছেন প্রধানত ধনতান্ত্রিক যুগের উদ্যোক্তাদের কথা মনে করে। বাংলায় এই উদ্যোক্তা শ্রেণি আমরা বিশেষ দেখতে পাই না; সেদিক থেকে নতুন শ্রেণিগত মর্যাদা আঠারো উনিশ শতকে লাভ করেনি। তবে

কোলকাতা শহরে যারা অভিজাত শ্রেণিতে পদার্পণ করেন তাদের সকলে প্রায় নতুন ধরনের কাজ করেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হল– জুয়াচুরি, পোদ্দারী, ভাড়ামী, দেওয়ানী, বেনিয়ান ও জারাদারী ইত্যাদি। শুম্পিটার বলেছেনঃ This is the case only wherethrnic differences exist the Indian caste system is the outstanding example and has nothing to do with the essential nature of the class phenomenon.[২৫] ধনিকশ্রেণি বা নতুন অভিজাত শ্রেণির বিকাশ বাংলায় হয়েছে, গ্রামে ও শহরে এবং জাতিভেদ প্রথা সমাজ হতে বিলুপ্ত না হলেও শ্রেণি রূপায়নের রেখাগুলি তার মধ্যে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধনিক শ্রেণি, মধ্যবিত্তশ্রেণি ও অন্যান্য শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে আধুনিক বাঙালি সমাজে।

বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি নিয়ে বিস্তর অভিমত ইতিহাসবিদগণ প্রকাশ করেছেন এবং সেসব অভিমত বা ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সুবিস্তর যুক্তিও প্রদর্শন করেছেন। তবে বাঙালি মধ্যবিত্তদের নিয়ে নিরেট কিছু ধারণা একেবারে অপরিবর্তনশীল। বাংলায় নতুন শ্রেণি রূপায়নের ফলে সমাজে যে শ্রেণির বিস্তার হয়েছে সবচেয়ে বেশি এবং অন্যান্য শ্রেণির তুলনায় যার আধিপত্য ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা হলো মধ্যবিত্তশ্রেণি। এই শ্রেণির অর্থাৎ মধ্যবিত্তের সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। মধ্যবিত্ত শ্রেণি এমন একটি বিশেষ পর্ব যে পর্বটি না হলে আধুনিক যুগ বলে কিছু হত না, সমাজ পরিবর্তিত হয়ে সভ্যতা আসত না, হত না সজ্জায়িত নগর ও সেই সাথে শিক্ষার আলোর সম্প্রসারণ। বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি প্রধানত শিক্ষিত অথবা পেশাজীবীদের নিয়ে গঠিত।[২৬] ১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্যদিয়ে মধ্যযুগের অবসান হয়ে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। কোলকাতার ঐতিহাসকগণও কোলকাতার আধুনিকতার সূচনা ধরেছেন ১৭৫৭ থেকে। কোলকাতায় শিক্ষার যে প্রদীপ জ্বলল সেই আলোর বিচ্ছুরনই তৈরী করল উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি। কোলকাতা থেকে যে শ্রেণি উদ্ভব হয়ে পরে সমগ্র বাংলায় প্রসারিত হল। ইংরেজদের পাশ্চাত্য শিক্ষার মশাল খানা তারা ধরেছিল কিছুটা নিজেদের স্বার্থে। এক্ষেত্রে অক্লান্তকর্মী যুক্তিবাদী হেয়ার, শ্রীরামপুর মিশনারীরা উল্লেখযোগ্য, সেই সাথে প্রচুর বিত্ত নিয়ে হাজির রাজা রামমোহন রায় এর অদম্য চেষ্টা।[২৭] ছিলেন ইংরেজ ডিরোজিও ও তার অনুগামী ইয়ং বেঙ্গল। রয়েছেন উইলিয়াম কেরী, উইলিয়াম জোন্স, হ্যালহেড প্রমুখ ইংরেজ বিদ্বান। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসারের ফলে ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত বিভিন্ন সেক্টরে বাঙালি আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণির লোকজন চাকুরীর সুযোগ পেয়ে যায়। চাকুরী প্রাপ্ত এই পেশাজীবী শ্রেণিই মধ্যবিত্তশ্রেণি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে এক্ষেত্রে বাঙালি হিন্দুরা এগিয়ে থাকে। মুসলমানরা কালক্ষেপণের ফলে পিছিয়ে থাকলেও উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের সূচনালগ্নে দুর্বল উত্থানসমেত মুসলিমদের মধ্যে ক্ষুদ্রায়তন অবস্থার পেশাজীবী শিক্ষিত একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি আত্মপ্রকাশ করে।[২৮] বাঙালি শিক্ষিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রকৃতি বলতে মূলত তার বৈশিষ্ট্যাবলীকেই ইঙ্গিত করা হয়। আমাদের বাংলায় বিশেষ প্রকৃতিস্বরূপ মধ্যবিত্তশ্রেণি ছিল এবং চলমান রয়েছে। যেহেতু আমাদের আলোচনায় বিষয়টি (১৮৫৭-১৯৪৭) এর বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি নিয়ে; তাই আমরা উক্ত সময়সীমার মধ্যকার মধ্যবিত্তের প্রকৃতি তুলে ধরার প্রয়াস নিতে আগ্রহী। তবে তথ্যের ভিন্নতার খাতিরে সময়ের গণ্ডিটি পিছনের অবস্থানকে উজ্জীবিত করবে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রকৃতি ও ধরণ মূলত সব দেশের মধ্যবিত্তের আওতাধীন। প্রকৃতির তুলনামূলক সাদৃশ্য রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী কাহল এক্ষেত্রে আমেরিকার

মধ্যবিত্তশ্রেণি সম্পর্কে বিশেষ ধারণা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তার গ্রন্থ ‘The American class structure’ এ মধ্যবিত্তশ্রেণিকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তারাচাঁদ মনে করেন, এই শ্রেণিটির অর্থনৈতিক ভিত্তি হল কৃষি। কৃষি নির্ভর শিল্পের মুনাফা থেকে এই শ্রেণিটি অর্থ উপার্জন করে থাকে।[২৯] কৃষিপ্রধান দেশ বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি হল কৃষি। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণির অর্থনৈতিক বুনিয়াদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল তা যৌক্তিকভাবে সত্য। পেশাগত কারণে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি কৃষির সাথে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও মধ্যবিত্ত এই শ্রেণির অর্থনৈতিক ভিত্তি মূলত কৃষি ব্যবস্থাপনা তৈরি করে থাকে।

বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির শ্রেণিচরিত্রে পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়। এই বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি মূলত আত্মসম্মানবোধ নিয়ে বাঁচতে আগ্রহী। পরিবারের সদস্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে এখানে সদস্যরা একের উপর অপর নির্ভরশীল। অর্থের চেয়ে সামাজিক পদমর্যাদা ও গঠন শৈলী জীবন এই বাঙালি মধ্যবিত্তদের প্রধান বাসনা। দেশপ্রেমের মহিয়ান মর্যাদায় নিজের আদর্শকে তৈরী করে তারা হয়ে উঠে রাষ্ট্রনীতি সচেতন, অধিকার সচেতন। মূলত উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে উন্নত চরিত্রকে আদর্শমান করেই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি এগিয়ে যায়।

বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। এই বৈচিত্রই তাই মধ্যবিত্তশ্রেণিকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেছে। শ্রেণিভেদ হিসাবে এক এক রকম মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন ধারন প্রক্রিয়া এক এক রকম। তথাপি সর্বজনীনতার ভিত্তিতে মধ্যবিত্তশ্রেণির জীবন প্রণালীকে এক কেন্দ্রে মিলিত করে এর কিছু বর্ণনা প্রকাশ করা যায়। মূলত মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর সময়ের একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে। আমাদের আলোচনার সময়সীমার মধ্যে থেকে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন প্রণালি আলোচনা করতে গেলে খেয়াল রাখতে হবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হতে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত।

সে সময়ের বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি যেসব নিয়ামক দ্বারা পরিচালিত হত তা হল মূলত– ধর্মীয় সংস্কারবাদ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভাংগা-গড়ার সময়। উক্ত সময়ের মধ্যে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির জীবনযাপনের ঘটনাক্রম আলোচনা করতে হবে মূলত বাংলার সেই স্থানটিকে কেন্দ্র করে যেখানে পরিবর্তন ছিল কেন্দ্ররূপ। এমনি দুটি কেন্দ্রের নাম দেওয়া যায়, যার একটি কোলকাতা এবং অন্যটি ঢাকা।

সামাজিক ইতিহাসবিদ ট্রেভেলিয়ান তার *English Social History* (1987) গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, “In everything the old overlaps the new-in religion, in thought in family custom. There is never any clear cut; there is no single moment when all Englishmen adopt new ways of life and thought”.[৩০]যেকোন যুগে যেকোন সময় সমাজে ব্যক্তি-জীবন, পারিবারিক জীবন ও নানা রকমের গোষ্ঠীর জীবনধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ নতুন কিংবা সম্পূর্ণ পুরনো ধারা বলে কিছু নেই; নতুন পুরোনো বহুলাংশে মিলে মিশে আছে। চিন্তা ধারায় হোক কিংবা ধর্মচিন্তায় হোক, নতুনের সাথে পুরনো আচরণ মিলে মিশে থাকে। সমাজ জীবনে কোন সময় এমন কোন ক্ষেত্র খুজে পাওয়া যায় না, যেখানে দেখা যায় যে পুরোনো ধারা সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে এবং নতুন ধারা পরিপূর্ণভাবে শুরু হয়েছে। অর্থাৎ স্থিরতা

সমাজের কাম্য নয়। তবে পরিবর্তন যেমন সমাজের সকল মানুষকে সমানভাবে জাগরুক রাখে না ঠিক তেমনি সকল নগর কিংবা গ্রামও সমানভাবে তার মানব শ্রেণিকে পরিবর্তন করে না।

১৮৫৭-৫৮ সালের দিকে বাংলার সামাজিক জীবনে এক নতুন পরিবর্তন দেখা দেয়। আর এই পরিবর্তনটি আসে সচলতা ও চাঞ্চল্যের মধ্যদিয়ে। ১৮৫৭ সালের গোড়ায় দেশীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই বিদ্রোহকে ইতিহাসবিদগণ ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম জাতীয় বিদ্রোহ (সিপাহি বিদ্রোহ) বলে অভিহিত করেছেন। তবে এক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ কতখানি সক্রিয় ছিল সে সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।

এই বিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের সহানুভূতি ছিল না। কেন ছিল না, সে প্রশ্ন নিশ্চয়ই ঐতিহাসিকদের বিচার্য বিষয়। যদি কেউ বলেন যে- শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে দেশপ্রীতির অভাব ছিল বলে তারা এই বিদ্রোহের স্বরূপ ও তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি, তাহলে তার অভিমত শ্রদ্ধার সাথে বিবেচনার যোগ্য বলে মনে হয় না। রামমোহনের কাল থেকে ইয়ংবেঙ্গল, তত্ত্ববোধিনী ও বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের সমাজকর্ম ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থান ছিল স্বগৌরবে। অর্থাৎ তারা ছিলেন সমাজ সচেতন শ্রেণি। যে সচেতন ও স্বগৌরব উপস্থিতির আরও একটি দিক উন্মোচিত হয়– আর তা হল সারা বাংলায় নীলকারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ থেকে। কৃষকরা শ্রেণিগতভাবে মধ্যবিত্তের স্বার্থবিরোধী হলেও শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তরা দৃপ্তকণ্ঠে এই বিদ্রোহ ও কৃষকদের অভিযোগ সমর্থন করেন। আর তখন থেকেই প্রকৃত জাতীয় চেতনার প্রসার ঘটতে থাকে। সময়ের হাত ধরে পরবর্তীতে জাতীয় মেলা, ভারত সভা, প্রভৃতি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে 'জাতীয় সম্মিলন' ও 'জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠার পথে ভারতের জাতীয় আন্দোলন অগ্রসর হয়। সিপাহি বিদ্রোহের সময় যাদের জাতীয় চেতনা লুপ্ত অথবা সুপ্ত ছিল, তাদের সেই চেতনা নীল বিদ্রোহের সময় এবং তার পরে আত্মপ্রকাশ করল, এটা নিতান্ত উদ্ভট বলে আমরা ধারণা করতে পারি। জাতীয়তাবোধের এই পথ ধরেই পরবর্তীতে ইংরেজ শাসকদের নির্মম অত্যাচার থেকে আজীবন রেহাই পেতে ইংরেজ বিরোধী জাতীয় বিদ্রোহের ভাবনাকে সঞ্চারিত করে। রামমোহন ও তার সহযোগীরা, ডিরোজিও ও তাঁর 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠী, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের অনুরাগীরা উন্নতশীল ভাবধারা ও বলিষ্ঠ সংস্কার কর্মের ভিতর দিয়ে বাংলার সমাজ মানসকে উজ্জীবিত ও প্রগতিমুখী করে তুলেছিল। অবশ্য অবাধে করতে পারেন নি, বিপরীতমুখী ভাবধারাকে প্রতিরোধ করেই এগিয়ে যেতে হয়েছিল। আর এই বিপরীত মুখী ভাবধারার সাথে সংঘাত ছিল অনিবার্য। চিন্তা ধারার মেলবন্ধনের অভাব, নতুন সভ্যতায় অবগাহন- করে কে কার থেকে এগিয়ে যাবে সেই প্রতিযোগিতা, প্রথাও রীতি ভাঙ্গার দায় গ্রহণ ও বেচে যাওয়ার লড়াইয়ে ভাবসংঘাতের যে বিস্তরণ বাংলার সমাজ জীবনে দেখা যায়, মূলত তার পিছনে কাজ করেছে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির দ্রুত প্রসার। বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির বিস্তার, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বার্থের সঙ্গে বিদেশী শাসকশ্রেণির স্বার্থের সংঘাত এবং তার ফলে জাতীয়তাবোধের সম্প্রসারণ। ভাবসংঘাতের ফলে যে সমাজ পরিবর্তন হতে থাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেই পরিবর্তনের সুফল মধ্যবিত্ত বাঙালি মননের ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসেবে কাজ

করে। উনিশ শতকের প্রথম ভাগের ব্যর্থতার পর বাঙালির মনটা শতদলের মতো ফুটে উঠে আধুনিক বাংলা কাব্যে, গল্প-উপন্যাসে, কথাসাহিত্যে, নাটকে, রঙ্গালয়ের অভিনয়ে, সঙ্গীতে ও চিত্রকলায়। মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারী লাল ও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন ও তার বিপুল ঐশ্বর্যের সন্ধান দেন। উনিশ শতকের সত্তর দশকের দিকে তাকালে বাংলার নবজাগরণের দ্বিতীয় পর্বের রূপটি পরিলক্ষিত হয়। যে পর্বটিকে সাজিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বঙ্গদর্শনের যুগে (১৮৭২ থেকে ১৮৮২) বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন 'সব্যসাচী'। সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে, এক হস্ত নিবারন কার্যে নিযুক্ত রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঠিক এভাবে– 'একদিকে অগ্নি জালাইয়া রাখিতে ছিলেন, আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন'।[৩১]তার সাথে তাঁর 'গঠনকার্য' চলছিল প্রখর স্বজাত্যবোধ ও দেশকাল সাপেক্ষতার ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত মানবমুখী যুক্তিবাদ ও উদারতার অভিযানে ধর্ম, সমাজ এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীত ও ভাষা সর্বক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভাদীপ্ত অভিমান আরম্ভ হল বঙ্গদর্শনের যুগে, পুরোপুরি এদেশীয় ভঙ্গিতে। ১৮৫৭-এ তার লেখা সেই বিখ্যাত 'কমলাকান্তের উইল, সেখানে বলা হল– "চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকা রূপিনী-অনন্তরত্ন-ভূষিতা- এক্ষণে রালগর্ভে নিহিতা।" তাঁর এই সুরের গভীর পরিণতি হল "আনন্দকণ্ঠ (১৮৮২)"। যেখানে নিহীত রয়েছে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে। নবজাতীয়তাবোধ উদ্ভুত এই নবজাগরণের গুরু বঙ্কিমচন্দ্র।[৩২]বঙ্গদর্শনের এই চিন্তা ও আদর্শ 'ভারত সভা', পুরোপুরি কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। তৈরী হল শিশির কুমার ঘোষের ইন্ডিয়ান 'লীগ' (সেপ্টেম্বর ১৮৭৫)।

উনিশ শতকের পূর্বে বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল না বলে একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে। বার্নিয়ারের ভ্রমন কাহিনীর উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে, অনেক ঐতিহাসিক এ কথা বুঝার চেষ্টা করেছেন যে উনিশ শতকের পূর্বে বাংলায় মধ্যবিত্তশ্রেণির কোন অস্তিত্ব ছিল না।[৩৩]তবে এরূপ ধারণা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা ইংরেজ আগমনের আগেও এদেশে একটি মধ্যবিত্তশ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। ডব্লিও. এইচ মোরল্যান্ড এদেশে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন।[৩৪]তবে এই মধ্যবিত্তশ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। ষোল শতকের কবি মুকুন্দরাম তার সমসাময়িক গ্রামীণ জীবনের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে তিনি একটি 'পরজীবী'শ্রেণির উপস্থিতি উল্লেখ করেছেন।[৩৫]

এই শ্রেণিটি মানুষের আয় থেকে আহরিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করে। ড. নাজমুল করিম, মুকুন্দরাম বর্ণিত শ্রেণিটিকে আধুনিক অর্থে মধ্যবিত্ত বলতে রাজী নন। কারণ তিনি মনে করেন যে, পাশ্চাত্য মধ্যবিত্তের মত বাঙালি মধ্যবিত্তের সামন্তবাদ বিরোধী চরিত্র ছিল না।[৩৬] তবে আধুনিক গবেষক ড. বি বি মিশ্র এদেশে তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। তার মতে, সপ্তদশ শতকের বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি 'পাইকার ও দালাল' ইত্যাদি লোকদের নিয়ে গঠিত ছিল। শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্তশ্রেণিতেও একই ধরনের ব্যক্তিদের দেখা যেত। মুঘল শাসিত যুগে বাংলায় ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে তালুকদার ও মুকারারিদের প্রাধান্য ছিল।[৩৭]শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ঘটে মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই শ্রেণিটি

কোম্পানি শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় আত্মপ্রকাশ করে। কোম্পানি আমলে এদেশের বাণিজ্যিক, শিল্পাশ্রয়ী, ভূমি নির্ভর ও পেশাজীবী (শিক্ষিত) মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়।[৩৮]

১৮২৯ সালে 'বঙ্গদূত' পত্রিকা প্রথম বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথা উল্লেখ করে। পত্রিকায় উল্লেখ ছিল যে, যেসকল লোক পূর্বে কোনো পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে। এই মধ্যবিত্তদিগের উদয়ের পূর্বে সমুদয় ধন এতদদেশের অত্যল্প লোকের হস্তে ছিল। তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত, ইহাতে জনসমূহ দুঃখ অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত, অতএব দেশ ব্যবহার ও ধর্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্বোক্ত প্রকরণ এতদদেশে সুনীতি বর্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক।[৩৯] এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির উৎপত্তির অর্থনৈতিক কারণ বিশ্লেষণ করে বঙ্গদূত উল্লেখ করেছে যে, গত কয়েক বছরের মধ্যে গৌড়দেশের (বাংলাদেশের) অনেক ধনবৃদ্ধি হয়েছে। বাংলাদেশের এই ধনবৃদ্ধির কারণ তিনটি। প্রথম কারণ "পূর্বাপেক্ষা ভূম্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে"। দ্বিতীয় কারণ "এদেশে অবাধে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে"– অনেক ইউরোপীয় মহাশয়ের সমাগম হইয়াছে"। এই কারণগুলি এত সহজে প্রত্যক্ষ যে, 'বঙ্গদূতের মতে তার ভূমিকারও প্রয়োজন নেই। বঙ্গদূত এ সম্পর্কে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে: মাত্র বিশ বৎসর আগেও যেসমস্ত জমির মূল্য ছিল ১৫ টাকা, এখন (১৮২৯-১৮৩০) তার মূল্য হয়েছে ৩০০ টাকা। "এ মতে ভূম্যাদির মূল্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে"। যে লোক আগে কোলকাতা শহরে মাসে 'দুই তঙ্কা বেতন পেত, সে এখন 'চারি-পাঁচ তঙ্কা বেতন পেয়েও সন্তুষ্ট নয়। পূর্বে যে সূত্রধর ৮ টাকা বেতনে কাজ করত যে এখন ২০ টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন পায়। শ্রমের মূল্যও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। পূর্বে এক তঙ্কায় ১২ জন কৃষক লোক সমস্ত দিন শ্রম করিত, এক্ষণে ৪ জনের অধিক এক তঙ্কায় পাওয়া যায় না।" আগে শালি ভূমির এক বিঘের রাজস্ব ছিল এক টাকা, এখন জমির মালিকানা বাড়িয়ে তিন-চার টাকা করেছেন। আগে যে চাল প্রতিমন আট আনায় বিক্রি হত, এখন তার মূল্য দুই টাকা হয়েছে। অতএব এই প্রকার অবস্থান্তর ও রীতি পরিবর্তনের কারণ অবাধে বাণিজ্য বিস্তার ও ইংল্যন্ডীয় মহাশয়দিগের সমাগম ইহাই সাব্যস্ত হইতেছে।"[৪০]

এ সমস্ত কারণ ছাড়াও বঙ্গদূত আজকের সমাজবিজ্ঞানীদের বিস্ময় করে আরও একটি কারণ উল্লেখ করেছেন। কারণটি হল অর্থের সচলতা (Mobility of Money)। সমাজ বিজ্ঞানী সিমেলের আধুনিক যুগের টাকা সম্বন্ধে বিখ্যাত কথা মনে হয়– "There is no more apt symbol than money to show the dynamic character of this world; as soon as it lies idle it ceases to be money in the specific sense of the world the function of money is to facilitate motion".[৪১]বাণিজ্যকর্মের বৈচিত্র্য, বৃদ্ধি ও বিস্তারের ফলে বাংলার সমাজে অর্থের সচলতা দেখা দিয়েছে এবং সে অর্থ এক সময় এদেশের সামান্য সংখ্যক লোকের হাতেই ছিল, তা এখন বহু লোকের হাতে ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজের বিস্তৃত স্তরে টাকার এই চলাচলের প্রত্যক্ষ ফল হল বাংলাদেশে মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ। 'বঙ্গদূতে'র মতে "গৌড়রাজ্যের

মধ্যবিত্ত অবস্থাবস্থিত প্রজা সমস্ত সেরূপ সুস্থ সন্তুষ্ট এরূপ অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্টতর নহে।"[৪২]শহরের মধ্যবিত্ত যারা চাকুরী ও নানারকমের ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং গ্রামের মধ্যবিত্ত যারা প্রধানত জমিদারীর উপস্বত্বভোগী ছিলেন তাঁরা তখনও পর্যন্ত কোনো ক্ষেত্রে, শহরে বা গ্রামে, স্বশ্রেণির (মধ্যবিত্তের) সংখ্যাধিক্যহেতু প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হন নি। কাজেই বঙ্গদূত তখন বাঙালি মধ্যবিত্তের মত 'সুস্থ সন্তুষ্ট' লোক এদেশে আর কোথাও দেখতে পায় নি। কিন্তু উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ পর্বের মধ্যেই (১৮৭৫-১৯০০) বাঙালি মধ্যবিত্তের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শহর ও গ্রাম উভয়ক্ষেত্রেই তার 'সুস্থ সন্তুষ্ট' রূপ বিভিন্নভাবে বিবর্তিত হতে থাকে।

বাংলার গ্রামীণ মধ্যবিত্তের জীবনের যে চিত্র ইতিহাসে পাওয়া যায় সেখানে দেখা গিয়েছে তেমন জীবনচিত্রের তারতম্য তাদের মধ্যে ছিল না। গ্রামাঞ্চলে পাওনিদার ও গাঁতিদাররা মধ্যবিত্তের প্রধান অংশ। একদিকে কৃষকদের দুর্দশা, অন্যদিকে জমিদারি উপসত্বের বহুবিভাগের ফলে এই মধ্যবিত্তের জীবন ক্রমে দুঃসহ হয়ে উঠত। এদিকে নাগরিক সমাজে 'ভদ্রলোক' রূপে পরিগণিত হবার আকষর্ণে তারা নগর অভিমুখী হয়েছেন। ফলে গ্রামের প্রতি তাদের অনাদর-অবজ্ঞা বেড়েছে এবং বাংলার গ্রাম্যসমাজ দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে এগিয়ে গিয়েছে। মধ্যবিত্তের গ্রাম্য ঘরবাড়ি সুন্দর অবয়ব দৃশ্য উনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম পর্বে এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায়।

মানব সমাজের বিবর্তন প্রেক্ষাপট ধরে নির্ভরতাকে অবলম্বন করে নিজের স্বকীয় দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ এরই রূপ মধ্যবিত্তশ্রেণি। তাই মধ্যবিত্তশ্রেণির উপায়সমূহের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। শ্বাশতকাল ধরে বাংলা ও তার জনগণ ক্ষমতাবান মহল দ্বারা শাসিত হচ্ছে, শোষিত হচ্ছে। মূলত বেশিরভাগ সময় ওপনিবেশিক বলয়ে থাকার কারণে বাংলার স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়েছে। তবে পরিবর্তন হয়ে সময়ে সময়ে তার মানবিক জাগরণ বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হতে সক্ষম হয়েছে একথা সত্য।

আঠারো শতকের শেষভাগে যেসব ব্যক্তি বাণিজ্যিক অথবা ব্যাংকিং সংস্থার এজেন্ট হিসেবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারাই বাংলার আধুনিক বাণিজ্যিক ও অন্যান্য মধ্যবিত্তের পূর্বপুরুষ।[৪৩] ব্রিটিশদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কোম্পানীতে নিয়োজিত গোমস্তা, মুনি, শারফ, বৈশ্য, বানিয়া, পাইকার, দালাল, সরকার ইত্যাদি বিচিত্র নামধারী এজেন্ট বা ব্রোকারদেরকে ব্রিটিশগণ নির্বিচারে গোমস্তা বা বানিয়া নামে আখ্যায়িত করত। মাদ্রাজে তাদের নাম ছিল দোভাষী।[৪৪]যেকোন যোগসূত্রে বা কার্যকারণে তারা ছিল ব্রিটিশ বনিকদের নিযুক্ত এজেন্ট মাত্র। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও নবাব মীর কাসিমের পতনে এবং ইংরেজ বনিকদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে তারাই সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[৪৫]ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৭৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর ভারতবর্ষে আসেন। ২২ জানুয়ারি ১৭৭৬ সালে তিনি একটি মিনিটে বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব পেশ করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাথে বাংলার বাণিজ্যনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি যোগ রয়েছে। ভূমি রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে এখান থেকে মূলত রাজস্বকেন্দ্রিক অর্থনির্ভর কিছু পদের সৃষ্টি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক যারা, তাদের ধারণা ছিল জমিদারদের দেয় রাজস্ব স্থায়ীভাবে সুনির্দিষ্ট করে দিলে নিজেদের জমিদারী সুষ্ঠভাবে পরিচালনার ব্যাপারে তাঁরা অনেক

বেশি উৎসাহিত হবে। জমিদারি যদি তাদের কাছে লাভবান হয়, তাহলে স্বার্থের দিক দিয়েও তারা নিজেদের জমিদারির উন্নতি সাধনে তৎপর হবে। ইংরেজ বানিয়াদের ধারণা ছিল উন্নয়নমুখী চাষাবাদের মধ্য দিয়ে বাংলার গ্রাম সমাজ ও দেশের উন্নতি। কিন্তু যেরূপ ফল আশা করা হয়েছিল বাস্তবে সে আশা পূরণ হয় নি।

১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ এবং ১৭৬৫ সালে বাংলার দিওয়ানি লাভের ফলে এদেশের সর্বময় ক্ষমতার মালিক হয় ইংরেজগণ। সেই সময় বাংলায় একটি বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে ওঠে। এই শ্রেণিটি বানিয়াদের স্বার্থেই মূলত সামন্ত ভূ-স্বামীদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতে তাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করে। পরবর্তীকালে কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণের সাথে সাথে বাঙালি বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ইংরেজরা প্রথমে এই শ্রেণির লোকদেরকে কারবারে ও কুঠিতে মূল্য আদান-প্রদানের জন্য এবং পরে টাকা দাদন দেওয়া, পণ্য সংগ্রহ করা, কারিগরদের সাথে যোগাযোগ করা, পরিবহণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত করত। ড. ফেয়ার তাদের সম্পর্কে বলেছেন– "তারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী বলত এবং সামান্য মজুরীর বিনিময়ে বিদেশীদের কাজ করে দিত।[৪৬]যারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী জানত এবং কোম্পানির কাজে সহায়তা করত তাদেরকে দোভাষী হলা হত। তারা ইংরেজদের বাণিজ্যে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ে সহযোগিতা করত। এর পাশাপাশি ইংরেজদের সহাকারী হিসাবে কাজ করত শারফ বা পোদ্দার। তারা কোম্পানিকে টাকা আদান-প্রদান ও ঋণের ব্যবস্থা করে দিত। বেনীদাস নামক এক পোদ্দার মাসিক ৫% হারে রাষ্ট্রীয় কোম্পানিকে দুই লাখ টাকা ঋণ প্রদান করত।[৪৭] অন্য একটি শ্রেণির নাম ছিল পাইকার। এই পাইকাররা টাকা দাদন নিয়ে সরাসরি তাঁতী-শিল্পীদের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করে কোম্পানির আড়ৎ-এ সরবরাহ করত। এছাড়াও ছিল পণ্যের দালাল, গোমস্তা, মুৎসুদ্দি, যারা ছিল এদেশে ইংরেজদের বাণিজ্যিক যোগসূত্রকার।

ইংরেজ সরকারের কল্যাণে এসব দালাল ও পাইকাররা রাতারাতি ব্যবসায়িক মর্যাদা পেয়ে গেল এবং উন্নত মর্যাদা নিয়ে সমাজে নিজেদের মানদন্ড দাঁড় করাতে সক্ষম হল। কোম্পানি নিজেদের স্বার্থে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু পণ্য চাষাবাদের ক্ষেত্রে, যেমনঃ নীল, চা, আফিম, রেশম, চিনি, লবঙ্গ, কফি ইত্যাদি বহু দেশীয় আমলা, দেওয়ান, গোমস্তা নিয়োগ করত। তারা বেতন ও দস্তুরী ছাড়াও নানা উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হত।[৪৮]

ইংরেজগণ যদিও ব্যবসায়িক স্বার্থের পাশাপাশি বাংলার রাজদণ্ড হাতে নিয়ে ফেলেছিল; তথাপি এ দেশের মাটি, পরিবেশ, জলপথ, সেচ-প্রণালী, রাজস্ব বিধি, আইন-আদালত, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অভ্যন্তরীণ নানাবিধ তথ্য, পরিসংখ্যান সংগ্রহ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাদের সম্যক জ্ঞান একক নিয়ন্ত্রণাধীনে লাভ করা অতটা সহজ ছিল না। যার ফলে তাদেরকে এদেশীয় দক্ষ লোকদের শরণাপন্ন হতে হতো। আর নিঃসন্দেহে তারা বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যারা ছিল ব্রিটিশবান্ধব শ্রেণি। ইংরেজদের সহযোগিতার পিছনে দেশীয় শ্রেণির উদ্দেশ্য ছিল স্বার্থ সংরক্ষণ নীতি, যে নীতির পিছনে বাঙালি এই শ্রেণিটি আর্থিকভাবে সাবলম্বি থেকে জীবনমান উন্নত করার পাশাপাশি বৈষয়িক উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়।

কোম্পানি শাসনের একশত বছরের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক গতি-প্রকৃতির ইতিহাস অনুধাবন করলে সহজেই প্রতিয়মান হয় যে, বাঙালি হিন্দু বানিয়ান ও সরকারই বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে স্থানীয়দের প্রতিনিধিত্ব করত। সাম্রাজ্য স্থাপনের সুচতুর ব্যবস্থাপনায় ইংরেজদের দেয় বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা প্রথমে বাঙালি হিন্দুরা গ্রহণে সক্ষম হয়। যে কারণে হিন্দুদের মধ্যেই প্রথমে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে উঠে।[৪৯]

পেশাজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণি:

কোলকাতা শহরের আর্থিক কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে প্রধানত বাংলায় আধুনিক মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ হয়েছে। কোলকাতার কর্মজীবন ছিল বাণিজ্য ও প্রশাসনকেন্দ্রিক। শিল্পকেন্দ্রিক কর্মজীবন সেখানে ছিল সীমিত। 'The cities of underdeveloped countries are commerce and administrative rather than industrial centers'.[৫০]এর ফলে কোলকাতার নাগরিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে কেবল এক ধরণের কর্মজীবনের বিস্তার হয়েছে ও বৈচিত্র্য বেড়েছে, সেটি হল চাকুরী (Services)। রাষ্ট্রসংঘের বিশ্বসমাজ সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, শিল্পোন্নত দেশে এটাই হল আর্থ-সামাজিক জীবনের বড় বৈশিষ্ট্য– "The so called services are the only broad category of employment showing any general increase with urbanization".[৫১] চাকুরির ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালির যে প্রতিমূর্তি চোখের সামনে সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠে, সেটি হল 'কেরানি মূর্তি'। উনিশ শতকের গোড়া হতে আজ পর্যন্ত দেশের আর্থিক জীবনের বিচিত্র আবর্তের মধ্যে থেকেও মধ্যবিত্ত বাঙালি এই কর্মমূর্তিটি অক্ষুন্ন রেখেছে। সেকালে কেরানি পদটি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন– 'Writter', Clerk', 'Copyist'ইত্যাদি। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ উত্তর তখনও কোলকাতার সরকারি ও বেসরকারি অফিসে বাঙালি কেরানিদেরই সংখ্যাধিক্য ও প্রতিপত্তি ছিল চোখে পড়ার মত। ১৮৪০-এর গোড়ার দিকে জনৈক বিদেশি পর্যটক কোলকাতা শহরে ককারেল কোম্পানির অফিসের কেরানিদের সম্বন্ধে লিখেছেন–[৫২]'In the lobby of the office, there are probably eight or a dozen native writers, some of them are seated on the Graund with leg' across and having little books on their knee or on a small box before them, others are seated at desks; some of these bergalees are writing in their our language, others in English, their ways are form four to ten rupees montly. In the common room, there are say five or six East Indian 'writers' having salaries of and from sixty to one hundred rupees and generally. There are about a dozen native writers who have from eight to twenty rupees a month. On the upper floor are the European partners and European clerk's rooms".

কেরানিরা তাদের অফিসাররূপে পুরো বাবুদের মত বসে মাথার উপর টানা পাখা চালিয়ে কাজ করতেন। তারা লিখতেন হাঁটুর উপর হাঁটু ভাজ করে খাটের বাক্সের উপর খাতা রেখে। বাংলা লিখতেন আবার কখনও ইংরেজীও লিখতেন। কেরানিদের বেতনে তারতম্যও ছিল–[৫৩]

কেরানি	মাসিক বেতন
উচ্চ বাঙালি (upper division)	৮-২০ টাকা
নিম্ন বাঙালি (Lower division)	৪-১০ টাকা
ইস্ট ইন্ডিয়ান বা ফিরিঙ্গি	৬০-১০০ টাকা

দেশী-বিদেশী, সরকারি ও বেসরকারি অফিস মিলিয়ে বাঙালি কেরানির সংখ্যা কলকাতা শহরে উনিশ শতকের চল্লিশের মধ্যে যে বেশ বড় আকার ধারণ করেছিল তা বোঝা যায়। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল খাঁটি বাঙালির মতো সাদা ধুতি-চাদর-বেনিয়ান। এ থেকে বোঝা যায়, বাঙালি কেরানি বাবুরা ধুতি পড়তেন বেশ লম্বা করে কোঁচা দুলিয়ে। নাগরিক মধ্যবিত্তের একটি বেশ বড় অংশ ছিলেন কোলকাতার এই বাঙালি কেরানি বাবুরা।

কেরানি বাবুদের পাশাপাশি বাঙালি মধ্যবিত্তের (প্রধানত নাগরিক) আরো একটি মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠে। সেটি হল উমেদারিপটু 'সরকারবাবু'র মূর্তি। এরা অফিসের সরকার নন বিদেশি পরিবারের সরকার এবং সরকার নামে দৈনন্দিন সাংসারিক বা ব্যাপারের সর্বময় কর্তা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ফহানি পার্কস তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখেছেন–[৫৪]'A very useful but expensive person in an establishment in a sircar; the man attends every morning early to receive orders, he then proceeds to the bazaars, or to the Europe-shops and bring back for inspection and approval, furniture, books, dresses, or whatever may have been ordered: his profit is a heavy percentage on all he purchases for the family'.বাঙালি সরকার বাবুর বেতন মাসিক ১০ টাকা থেকে ২০ টাকার বেশি নয়, কিন্তু আসল আয় মনিবভেদে তার দশ-বিশ গুণ বেশি। মনিব যদি কোলকাতার স্থানীয় অভিজাতদের কেউ হন, তাহলে বেতন ও দস্তরির রেট দুইই কম হবার সম্ভাবনা। তবে সম্ভ্রান্ত বাঙালি হিন্দু পরিবারে দুর্গোৎসব, পুজো-পার্বন, বিবাহ-শ্রাদ্ধ ইত্যাদি পালক্রমে চলতেই থাকে। কাজেই কেনাকাটা ও খরচ পত্রের বহর সেখানে অত্যন্ত বেশি। সরকার বাবুর দস্তরির হার সেখানে অল্প হলেও তিনি তা পূরণ করে নেবার সুযোগও পেতেন অনেক বেশি। বিদেশি মনিবদের কাছে এত রকমের সুযোগ পাওয়া যায় না। খরচপত্রের ব্যাপারেও তাঁরা অনেক বেশি নিয়মানুগত ও সংযত। একারণে দস্তরির হার সেখানে একটু বেশি হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীমতি ফ্যানি বলেছেন যে, সরকারের দস্তরি টাকায় দু আনা। তাতেও নাকি সরকারবাবু রীতিমত ব্যয়বহুল ব্যক্তি; তবে দরকারি। সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হল উমেদারি ও মোসাহেরিকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। যিনি তা করতে পারেন তিনি সফল হবেন, মনিবের কাছেও অপরিহার্য হয়ে উঠেন। সরকার চরিত্রের এই গুণটি পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত বাঙালি চরিত্রের একটি বিশিষ্ট উপাদানে পরিণত হয়েছে।

ষোড়শ শতকের দিকে কোলকাতা ছিল বাংলার প্রধান নগর। ১৭৭৩-এ কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি পায়। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের পীঠস্থান ছিল এই কোলকাতাই। উনিশ শতকেই বিকাশমান কোলকাতার শহরে নাধরনের লোক এসে ভিড় জমায়। সুযোগ সন্ধানি যারা, তারা ‘দেওয়ানি বা মুৎসুদ্দিগিরি কাজ করে যৎসামান্য যে পয়সা আয় করত তা দিয়েই তারা মানসম্মত একটি শ্রেণি তৈরির উদ্দেশ্যে কোলকাতায় বসে গ্রামেগঞ্জে জমিদারি কিনল এবং শহরে বসে সেই জমিদারি লাভের বখরী নিয়ে রঙরসে দিন কাঁটাতে লাগল। এই শ্রেণিভুক্ত সবাই কিন্তু শুধুই প্রমোদে গা ভাসিয়ে দেন নি; বরং অনেকে অবসর সময়ে সমকালীন সমাজ-ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন। তাঁদের এই চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের শুরুতে বাংলায় নবজিজ্ঞাসার সূত্রপাত। সেই সাথে বাবুশ্রেণিও কোলকাতায় এক নতুন নামে নতুন অধ্যায় রচনার মধ্যদিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির উত্থান হয়।

তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সতের শতকের ভারতের বিশেষত বাংলার শহরগুলিকে গ্রামীণ শহর বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৫৫]উনিশ শতকের দিকে নাগরিক জীবনের ঐতিহ্যবাহী মাধ্যম ছিল শিক্ষা। সচেতন শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণি খুব সংস্কৃতি সচেতনও ছিলেন। সিউড়ি শহরের জমিদার শ্রেণির সংস্কৃতি মনোভাবাপন্নতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সিউড়ি জেলার প্রথম সংবাদপত্র সাপ্তাহিক দিবাকর (১৮৭৮)-এ সেই শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাব্য, সাহিত্যজ্ঞান, আদর্শ শব্দবিধান রচনা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৫৬] হেতমপুর ও লাফপুরের দুইজন সংস্কৃতিমনা জমিদার ছিলেন জমিদার মহিমারঞ্জন চক্রবর্তী ও নির্বলবিশ বন্দোপাধ্যায়। সিউড়ির নবীন সংস্কৃতিনুরাগী প্রজন্মের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ফলেই ১৯০০ সাল গড়ে উঠেছিল সিউড়ির প্রথম গ্রন্থাগার ও মিলন গৃহে রামরঞ্জন টাউন হল ও পাবলিক লাইব্রেরি। এই আলোকিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিমনা মানুষদের উৎসাহেই পরবর্তীতে শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্য পত্রিকা। আর এই রূপটিই হল সিউড়ি শহরের আধুনিক সাংস্কৃতিক জীবনের এক রূপ। তবে আলোচ্য সংস্কৃতির পাশাপাশি সে সময়ের পত্র-পত্রিকা থেকে সিউড়ির নগরবাসীদের প্রধান চিত্র তুলে ধরতে গেলে দেখা যায় এখানকার মানুষ রাজনীতি সচেতন ছিলেন বটে। দেখা যায় ১৮৯৩ সালে পৌর সভার নতুন হারে কর প্রবর্তনের প্রেক্ষাপটে শহরে একটি করদাতাদের সমিতি Rate Prayers Association সমিতি নামক একটি প্রতিষ্ঠান ছিল।[৫৭] এই হল ইংরেজী শিক্ষার প্রথম পর্বের চাকুরিজীবী বাঙালি নাগরিক মধ্যবিত্তের চিত্র। ইংরেজী শিক্ষার দ্বিতীয় পর্বে (১৮১৭-১৮৫৭) নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণির ছবিগুলিও পরিবর্তনশীল অবয়ব তৈরির মধ্যদিয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। +

শিক্ষিত পেশাজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণি:

বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি প্রধানত শিক্ষিত ও পেশাজীবীদের নিয়ে গঠিত। শিক্ষিত ব্যক্তিরা সাধারণত বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। বাংলার এই শ্রেণি সাধারণভাবে উনিশ শতকে ব্রিটিশ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। এই শ্রেণির সাথে সংস্কৃত, আরবি অথবা ফারসি ভাষায় শিক্ষিতদেরকেও অন্তর্ভুক্ত। হিন্দু শিক্ষিতশ্রেণির তুলনায় মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণির সংখ্যা কম হলেও উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের সূচনালগ্নেই মুসলিমদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পেশাজীবী শিক্ষিত শ্রেণি

আত্মপ্রকাশ করে।[৫৮] সরকারি চাকুরী প্রধানত বাঙালি মধ্যবিত্তের আকাঙ্খার স্থান হিসেবে বিবেচ্য ছিল। মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ পর্বে কোলকাতা শহর ইংরেজ শাসকগণের প্রধান প্রশাসনকেন্দ্র। সেখানে সব ধরনের সরকারি অফিস স্থাপিত হয়েছিল এবং নানা ধরনের সাধারণ চাকুরীর সুযোগও সৃষ্টি হয়েছিল অনেক। ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালি মধ্যবিত্তরাই যেহেতু গোড়া থেকে অগ্রগামী হয়েছিল এবং কোলকাতা শহর ছিল বাংলার রাজধানী, সেইজন্য শিক্ষিত বাঙালিরাই প্রধানত চাকুরীর ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন।

আমরা জানি পরাধীন দেশে স্বাধীন শিল্পোন্নয়ন পদে পদে ব্যাহত হয় বলে নগরায়নের সঙ্গে কেবল চাকুরি ক্ষেত্রটিই প্রসারিত হতে থাকে। কিন্তু এই প্রসার সীমাহীন হতে পারে না। যে হারে চাকুরি প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ে, সেই হারে চাকুরি বাড়ে না। এক সময় সমস্যা ও সংকট দেখা দেয়। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই সমস্যা উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বেই তীব্র হয়ে ওঠে।[৫৯]

ক. ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণি:

প্রাক-ব্রিটিশ বাংলার ভূমি ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভূমিকর আদায়। ভূমির মালিক ছিল গ্রাম প্রধানের নেতৃত্বে সকল গ্রামবাসী।[৬০] নবাব মুর্শিদকুলী খানের শাসনামলে (১৭০০-২৭) এদেশে ভূমি ব্যবস্থার কিছু উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। মুর্শিদকুলী খান বাংলা সুবাকে (বিহার ও উড়িষ্যাসহ) ১৩টি চাকলা এবং চাকলাগুলিকে আবার ২৫টি জমিদারী ও ১৩টি জায়গীরদারিতে বিভক্ত করেন। এই সকল জমিদারি এক একজন বংশানুক্রমিক অথবা অস্থায়ী জমিদার ও ঠিকাদারদের অধীনে ন্যস্ত করেন। মূলত ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয় যে ভূমি ব্যবস্থা গড়ে উঠে তা ছিল মুর্শিদকুলী খানের গৃহীত রাজস্ব ব্যবস্থারই অনুরূপ। কোম্পানী এবং ব্রিটিশ সরকার বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে প্রচুর অর্থ আয় নিশ্চিত করে বাণিজ্য শিল্পের পথ বিকশিত করার যে কৌশল অবলম্বন করে তার ফলশ্রুতিতে বাংলায় ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণির সৃষ্টি হয়।

১৭৬৫ সালে কোম্পানির দেওয়ানি লাভের মধ্যদিয়ে বাংলার ভূমি ব্যবস্থার রূপান্তরের এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। এর ফলে কোম্পানি সরকার বাংলার রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে সর্ববিধ-ভার গ্রহণ করে। কোম্পানি যেহেতু এদেশের শাসন ও রাজস্ব বিষয়ে ছিল অনভিজ্ঞ সেহেতু পরবর্তী ২৮ বছর যাবৎ চলল ভূমি ব্যবস্থায় নানা প্রকার পরিবর্তন ও বিবর্তন। যার প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল বাংলার অর্থনীতিতে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে বিপ্লব সাধিত হতে লাগল। এ বিপ্লব শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়। ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব কেন্দ্রীভূত করার চিন্তাও উদয় হল ইংরেজ মনে। ভেঙ্গে দেওয়া হল প্রচলিত মুঘল রাজস্ব ও প্রশাসন ব্যবস্থা। চলল রাজস্ব ব্যবস্থায় নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ভূমিকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনে প্রবর্তিত দ্বৈতব্যবস্থার (১৭৬৫-৭১) ফলে রায়তের অবস্থা ভীষণভাবে শোচনীয় হয়ে পড়ে। ফলে প্রচলিত হয় পাঁচসনা নিলামী ব্যবস্থা (১৭৭২-১৭৭৭)। এই নিলামী ব্যবস্থায় জমি ইজারা দেওয়া হল, আর এখান থেকে সৃষ্টি হল নতুন জমিদারশ্রেণির। তবে এর ফল ছিল আরও ভয়াবহ। এরপর চালু করা হল এক থেকে তিন বৎসর মেয়াদী জমিদারী বন্দোবস্ত (১৭৭৮-৮৯), তারপর দশসনা বন্দোবস্ত (১৭৯০-১৮০০), আর তিন বৎসর পর তা পরিণত হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। ফলে

ভূমিতে ব্যক্তি মালিকানা সৃষ্টি হল এবং জমি ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যে পরিণত হল। মূলত ইংরেজ বানিয়ানগণের বাংলার ভূমিতে নানাধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসায়ের পুঁজির যোগান এবং রাজ্য সংগঠনের স্তম্ভ হিসাবে একটি শাক্তশালী ও বিশ্বস্ত সমাজ সৃষ্টি করা।[৬১]সরকার আরও আশা করেছিল যে এই শ্রেণিটিই শাসক ও শাসিতের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করবে। অথচ তারা ছিল ভূমির সাথে সম্পর্কহীন। যাইহোক, অবশেষে ১৭৮৬ সালে কোর্ট জমিদারকে জমির মালিক বলে ঘোষণা করে এবং যুক্তি সঙ্গত রাজস্বের ভিত্তিতে জমিদারদের সাথে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার জন্য আদেশ প্রদান করে।[৬২]মুঘল যুগে ভূমধ্যকারীদের মধ্যে যে স্তরবিন্যাস ছিল তাতে প্রথমে ছিল জমিদার, তারপর তালুকদার, মুকাররারীদার, ইজারাদার, চুক্তিদার ও পেশকার প্রমুখ দল অন্তর্ভুক্ত শ্রেণিমানস। এ সময়ে তালুকদারদের সংখ্যা ছিল বেশি। বাংলা, বিহার, গুজরাট, মাদ্রাজ সর্বত্র তাদের অস্তিত্ব ছিল। বেনারস ও উত্তর ভারতের প্রদেশগুলিতে মুকাররারীদের প্রাধান্য ছিল। তারা ছিল জমির যৌথ মালিক। বোম্বাই ও মাদ্রাজে তাদের বলা হতো সিরাসদার বা কৃষি মালিক।[৬৩] জমি রেহেনোবদ্ধ বা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় তাদের ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ। এরা সরকারের নিকট ভূমি রাজস্ব জমা দিত না; বরং জমিদারের নিকট রাজস্ব জমা দিত। মুঘল আমলে জমিদারের স্বত্ব ছিল বংশানুক্রমিক এবং বিক্রয়যোগ্য। এতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির লক্ষণ ছিল স্পষ্ট। জমিদাররা রাজস্ব সংগ্রহের কাজে তহশিলদার নিয়োগ করতেন, রাজস্ব বিষয়ক মামলার নিষ্পত্তি করতেন এবং নিজ এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী থাকতেন।

ইংরেজ সরকারের প্রথম কাজ ছিল মুঘল আমলের জমিদারদের বিচার ও শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা খর্ব করা এবং বৃহৎ জমিদারিগুলিতে ভাঙ্গন ধরানো। এর কারণ হলো– এ সকল জমিদারদের স্থানীয় প্রভাব এত বেশি ছিল যে তারা যেকোন সময় বিপদের কারণ হতে পারত। এ নিরীখে প্রথমে ইজারাদারি সুবিধাজনক বিবেচিত হওয়ায় প্রধানত ইজারা প্রথায় রাজস্ব আদায় করা হত। এ সম্পর্কে রবার্ট ক্লাইভ বলেন যে, দেওয়ানি লাভের পর পুরাতন আমলা ও ইজারাদারদেরকেই নানা কারণে বিশ্বাস করতে হয়েছিল।[৬৪] ইজারা প্রথায় যখন নিলাম ডাক এল তখনই সেখানে দুর্নীতি সৃষ্টি হতে থাকল। এর সুযোগে কোম্পানির বানিয়ান, মুৎসুদ্দি, সরকার, গোমস্তারা ব্যবসায়ে উপার্জিত অর্থ ভূমিস্ব বিনিয়োগ করে। ফলে ভূমিকেন্দ্রিক এক প্রকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব ছিল এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি। এই বন্দোবস্তের উদ্দেশ্যই ছিল স্থায়ীভাবে রাজস্ব প্রাপ্তির সাথে সাথে সুবিধাভোগী শ্রেণি তৈরি করা। এই বন্দোবস্তের প্রভাবে পুরনো জমিদারশ্রেণির পতন ঘটে এবং তাদের স্থলে জন্ম নেয় নতুন ভাবধারায় প্রভাবিত এক নব্য জমিদারশ্রেণি। ব্রিটিশ দাক্ষিণ্যে যারা নতুন জমিদার হলো তারা স্বভাবতই ব্রিটিশ শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হল।[৬৫]এই নতুন ব্যবসায়ী জমিদারশ্রেণির অধিকাংশ ছিল শহরবাসী। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল শহরকেন্দ্রিক। তারা সরকারের নীতির উপর আস্থা রাখতে না পেরে নিজেদের স্বার্থে 'পত্তনিদার' নামে একটি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত মধ্যবিত্তশ্রেণি সৃষ্টি করে নেয়। বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্র সর্বপ্রথম জমি পত্তনি দিয়ে মধ্যস্বত্বভোগী তালুকদার সৃষ্টির পথ প্রদর্শন করেন।[৬৬] এই তালুকদাররা আবার তাদের অধীনে একদল পত্তনিদার সৃষ্টি করে। এভাবে কৃষিভূমির স্বত্বকে কেন্দ্র করে পর্যায়ক্রমে কোথাও সাতটি, কোথাও আটটি, কোথাও বা পঞ্চাশটি পর্যন্ত অধস্তন মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ঘটে।[৬৭]সে সূত্রে জন্ম হয় তালুকদার, পত্তনিদার, জোতদার, গাঁতিদার, হাওলাদার, মেরিসী,

মুকাররারীদার, চাকরান, পাইকান প্রমুখ বিচিত্র নামধারী মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি চরিত্রের। এরাই মূলত বাংলার আধুনিক ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণি রূপে পরিচিত।[৬৮]

খ. শিল্পভিত্তিক মধ্যবিত্তশ্রেণি:

ইংরেজী ভাষা প্রচলনের পরবর্তী দশকে রেলপথ নির্মিত হয়।[৬৯]আর তারও দশ বছর পর বাংলায় প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। ১৮৫৪ সালে বাংলায় প্রথম পাটকল স্থাপিত হবার সাথে সাথে এই অঞ্চলের আর্থ সামাজিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যুক্ত হতে থাকে। বিশেষ করে ১৮৮০ সালের পর থেকে পাটের উৎপাদন ও চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। কোলকাতাকেন্দ্রিক পাটকল এবং ডান্ডি নগরীর পাটকলগুলি বাংলাদেশে উৎপাদিত পাটের প্রধান ব্যবহারকারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পাটচাষ ও পাটশিল্পের বিকাশের ফলে বাংলার অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠে। এই অর্থনৈতিক উন্নতি নতুন শ্রেণি গঠনে সহায়তা করে। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আর্থিক বুনিয়াদ ছিল এই পাটশিল্প। আর তাই বাংলায় আধুনিক শিক্ষা প্রসারে পাটচাষের সুফল ছিল ইতিবাচক। মুসলমান সমাজ অর্থনৈতিক দুর্বলতা কাটিয়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হয়, আর এর ফলে শিক্ষিত মুসলমান তরুণেরা বিভিন্ন পেশায় নিয়ুক্তি লাভ করে। শিল্পভিত্তিক মধ্যবিত্তশ্রেণি বলতে তাই পাটশিল্পেকেই একচেটিয়াভাবে বোঝানো হয়ে থাকে।[৭০]

ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি:

ইংরেজরা বাংলা অধিকারের পর নিজেদের প্রয়োজনেই হোক কিংবা আরও কিছু বিতর্কিত বিষয় মাথায় রেখেই হোক না কেন, বাংলায় আধুনিক যুগের সূচনা কিন্তু এই ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারনেরই ফলস্বরূপ এনে দিল তেমনি আবার ইংরেজী শিক্ষা ছিল এক নতুন জগতের পরিচয় বহনকারী মাধ্যম। আধুনিক যুগে অর্জিত এই বিদ্যা সামাজিক প্রতিপত্তির পরিচায়ক ছিল। তা একদিকে যেমন সত্যনিষ্ঠা সৃষ্টি করল, পাপের প্রতি ঘৃণা ও অন্যায়ের বিরোধিতা– অন্যদিকে নব অর্জিত বিদ্যার জোরে চাকুরীসূত্রে বিত্ত অর্জন করে অনেকে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়। বিদ্যাই হল মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রধান হাতিয়ার। ইংরেজী শিক্ষাকে মর্যাদা দিতে গিয়ে প্রাচীন প্রাচ্যবিদ্যাও মর্যাদা পেতে শুরু করে। আর এই মর্যাদায় সদ্যমিশ্রিত গুরুত্ব নিয়ে সমাজে স্থান পেলেন রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এর সাথে পুরোপুরি ইংরেজ কায়দায় রপ্ত ইয়ংবেঙ্গল। ১৮৩১ সালের চার্টার অ্যাক্টে ঘোষিত নীতি অনুযায়ী বেন্টিং-এর আমলে ভারতীয়দের যখন উচ্চ সরকারী পদ দেওয়া হতে লাগল, তখন তাদের সামাজিক মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। মূলত তখন ইংরেজী শিক্ষা বাংলার মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্তের সামনে এক নতুন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল।[৭১]

বাংলায় ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি মূলত একটি কাঠামো (structure) অনুসরণকরে, যেমন–

ইংরেজী শিক্ষা

↓

চাকরি/টাকা

↓

বিত্ত

↓

‘স্ট্যাটাস’

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ অনেকটা উচ্চশ্রেণির বিত্তশালী পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শোভাবাজারের দেব পরিবার, রামবাগান হাঠখোলার দুই দত্ত পরিবার, জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবার, পালপাড়ার সিংহ পরিবার, মল্লিক-শীল পরিবারের মধ্যে কেউ কেউ এবং এরকম আরও কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ধনিক পরিবার উনিশ শতকে বেশ কিছু সময় ধরে প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল।

উইলিয়াম অ্যাডাম (William Adam) এক কিংবদন্তীর নাম। বাংলায় শিক্ষানীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার অবতারণা ছিল তদানীন্তন শিক্ষার ইতিহাসে এক বিপ্লব যুগের সাধনা। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য বেন্টিংক অ্যাডাম -এর উপর সরেজমিন তদন্তের ভার অর্পন করেন (Minute, Dated the 20th January, 1835), তাঁর ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে সরকারি শিক্ষা নীতি গ্রহণের মাত্র দু' মাস আগে। অ্যাডাম তার প্রথম রিপোর্ট দাখিল করেন ১ জুলাই ১৮৩৫, দ্বিতীয় রিপোর্ট ২৩ শে ডিসেম্বর ১৮৩৫ এবং তৃতীয় রিপোর্ট ২৮ এপ্রিল ১৮৩৮। হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের বুদ্ধি ও চিন্তার পথ দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত করে দেয়। লালবিহারী দে লিখেছেন - বেকন, লক, বার্কলে, হিউম, রীড, স্টুয়ার্ট প্রমুখ মনীষী ও চিন্তানায়কদের রচনা পাঠ করে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা এক নতুন জ্ঞান রাজ্যের সন্ধান পান।[৭২] “There is no class of persons that execrcise a greater degree of influence in giving native society the tone, the form and the charater which actually possesses than the body of the learned, not merely as the professors of learning. But as the priests of religion; and it are essential to the success of any means employed to aid the moral and intellectual advancement of the people that they should not only co-operates but also participate in the progress.”[৭৩] ১৮১৭ সালে কোলকাতায় ‘হিন্দু কলেজ’ স্থাপিত হবার মধ্যদিয়ে পাশ্চাত্যবিদ্যার সাথে প্রকৃত ইংরেজী শিক্ষার সূচনা হয়। আলেকজান্ডার ডাফ বলেছেন “It was the very first English seminary in Bengal, or even in India, as far as I know.”[৭৪] উনিশ শতকের তিরিশ থেকে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণে যারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন।

এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন টি.ভি. মেকলে। তিনি মনে করতেন ইংরেজি হল শ্রেষ্ঠ ভাষা। এর কারণ হল ইংরেজী ভাষায় যে জ্ঞান-সম্পদ আছে, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার সম্পদের চেয়ে তা অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, ইংরেজী ভাষা ভারতের শাসকশ্রেণির ভাষা, উচ্চশ্রেণির– ভারতীয়দের ভাষা এবং বাণিজ্যের অন্যতম

ভাষা।[৭৫]মূলত মেকলের শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল ইংরেজী শিক্ষিত এমন একটি মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে তোলা যে শ্রেণিটি বিদেশি শাসক ও এদেশি শাসিতদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। এরিক স্টোকস (Eric Stokes) মেকলের শিক্ষানীতি সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন-“Substantially if represents the permanent liberal attitude to India. Which servived intact to the end of British rule”এবং মেকলে হলেন এই উদারপন্থীদের সুযোগ্য প্রতিনিধি, দার্শনিক বেনথাম ও মিলের প্রকৃত শিষ্য। ১৮৩৬ সালে বেন্টিং-মেকলের উদ্যোগে আধুনিক ভারতে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া সরকারি নীতি হিসাবে গৃহীত হবার আগেই দেখা যায় যে, বাংলায় আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রাথমিক বিকাশ সাধন হয়ে গিয়েছিল। গড়ে বছরে ২০০ করে ছাত্র, আঠারো বছরে ছাত্র ৩,৬০০, ডাফ সাহেবের স্কুল ও অন্যান্য ইংরেজী শিক্ষার স্কুল হিসেব করলে সব মিলিয়ে ৪০০০-৫০০০ হবে। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালির মনে ধীরে ধীরে আসতে লাগল নবচেতনা, নবজিজ্ঞাসা। সতী, কৌলীন্য, দাসপ্রথা ইত্যাদির মতো প্রচলিত প্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠল। সমাজ এক নতুন চিন্তার প্রস্তুতি নিতে লাগল। একদিকে যুক্তিবাদী সমাজ; অন্যদিকে রক্ষণশীলতার অটুট অবস্থান। এই দু'য়ে মিলে যে সংঘাতের পরিবেশ তাই ছিল মূলত ইংরেজী শিক্ষার এক অনন্য ইতিবাচক দিক। এছাড়াও দেখা গিয়েছে এঁদের ভিতর থেকেও আধুনিক intelligentsia -র অন্তত একটি স্তর বিকশিত হওয়া। বুদ্ধিজীবীদের এই স্তরটি তখন অবশ্য তখন খুবই সংকীর্ণ ছিল। কিন্তু সামাজিক কর্তব্য-কর্মে সক্রিয়তা ও উদ্দীপনার দিক বিচার করলে এই স্তরটির ঐতিহাসিক অবদান অসামান্য। নিঃসন্দেহে এই কথা স্বীকৃত যে, শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে জীয়তাবোধের জাগরণে ও প্রসারণে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীগণ।[৭৬]

উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের আইনজীবীগণই তখন প্রায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন এবং তাদের মধ্যে বাঙালি আইনজীবীরাই সংখ্যাধিক্য ছিলেন। আইন ব্যবসা বৃত্তিটি (এবং অনেকটা ডাক্তারও) স্বাধীন এবং এই স্বাধীনতার জন্যই রাজনীতি ক্ষেত্রে আইনজীবীদের বিচরণের সুযোগ বেশি। এই সুযোগই তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আইনজীবীগণ তখন গ্রহণ করেছিলেন। ‘ভারতবর্ষীয় সভার’ অভিযোগের মূল জায়গাটি ছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বাঙালি আইনজীবীদের প্রতি (ইংরেজী শিক্ষিত)। তাদের বক্তব্য কৃষিপ্রধান দেশ বাংলা, আর তাই এর প্রাণ কৃষক এবং জমিদার। যে কোনো প্রতিনিধিসভায় তাই সর্বাগ্রে নির্দিষ্ট ক্ষমতার স্থানটি থাকবে সম্ভ্রান্ত জমিদারদের জন্য।[৭৭]তখন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের স্রোত এমনভাবে মধ্যবিত্তমুখী ছিল যে উক্ত ভারতবর্ষীয় সভার অসংগতিপূর্ণ অভিযোগটি কার্যকর হতে পারলো না। আর তাই ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ ছিল অপ্রতিরোধ্য। যদিও তার কলেবর উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত খুববেশী স্ফীত হয়নি; তারপরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তার ক্রমবৃদ্ধি তথা বিকাশ অব্যাহত ছিল। ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯০৫-৭ সালের মধ্যে গড়ে প্রত্যেক বছরে ১৯৩৫ জন ‘গ্র্যাজুয়েট’ বের হয়েছে। এই গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে গড়ে প্রায় ৫৪০ জন ওকালতিবৃত্তি গ্রহণ করেছেন (শতকরা ২৫ জনেরও বেশি)। শিক্ষিত ও সাধারণ মধ্যবিত্তের এই প্রসারে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন অভিজাত জমিদারশ্রেণি ও ধনিকরা। ১৮৯২ সালের ‘Indian Councils Act’ পাস হবার পর ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ বাংলা গভর্নমেন্টের কাছে যে আবেদনপত্র পেশ করে তার মধ্যে অভিজাত জমিদারশ্রেণির ক্ষমতালোপ এবং

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ক্ষমতাবৃদ্ধি সম্পর্কে রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে।[৭৮] কাউন্সিল অ্যাক্টে নামমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃতির বলে ধনসম্পত্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত হবে, এই আশঙ্কা আবেদনের মধ্যে উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আবেদনপত্রটি উপলব্ধি করলে দেখা যায় যে, বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে উকিল, মোক্তার ও স্কুল মাস্টারদের সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষীয় সভার' ভয় ছিল সবচেয়ে বেশি।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি অনুধাবন করা যায় যে, আন্দোলনের গোড়া থেকে, উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বে, ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তদের আধিপত্যতা ছিল কর্তৃত্ব ছিল প্রধানত আইন-ব্যবসায়ীদের অর্থাৎ উকিল-ব্যারিস্টারগণের। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে আইনজীবীদের আধিপত্য কতটুকু ছিল তা ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত (এবং তার পরেও) এই দেশের সংসদ-সদস্যদের ক্রমবর্ধিত পরিসর থেকে বোঝা যায়। মনে হয় যেন বক্তৃতায় ও বাক চাতুর্যে যাঁরা দক্ষ তাঁরাই বাংলার শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক গুণের অধিকারী। বাংলায় ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দ্রুত প্রসারের ফলে ক্রমে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানে তাঁদের আধিপত্যতা বাড়ছিল। এদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, রাধানাথ শিকদার প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নামের তালিকাখানি নিশ্চয়ই আরও অনেক দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু এই কয়েকজনের পারিবারিক ইতিহাসের মধ্যদিয়ে মোটামুটি ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের শ্রেণি রূপায়নের যুগবৈশিষ্টটি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে। বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যে উপরোক্ত ইংরেজী শিক্ষিতরা বেশ ক্ষমতাশালী পর্বে অধিষ্টিত ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা গোড়া থেকে 'mercenary' ও 'commercial' হয়ে উঠেছিল বলে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাংলায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলায় দ্রুতাহরে বৃদ্ধি পায়। চাকুরী হয়ে উঠেছিল ইংরেজি শিক্ষিতের প্রধান লক্ষ্য। তাই চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তই (salariat middle class) ইংরেজী শিক্ষিতদের প্রধান অংশে অবস্থিত। শিক্ষিত বাঙালির স্বাধীন বৃত্তির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ওকালতি, ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়য়ারিং। কিন্তু এই বৃত্তির ক্ষেত্রে তখনকার প্রয়োজন অনুপাতে প্রতিযোগীর সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে দাঁড়াল। এছাড়াও সাথে সাথে এগিয়ে যোতে থাকল ব্যবসায়ীগণ। "এক্ষণে উকিল-ডাক্তার-ব্যবসায়ী লোকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ঐ সকল ব্যবসায়ে নতুন বংশানুক্রমে কোলকাতাকেন্দ্রিক বাংলার বিদ্বৎ সমাজে প্রভূত্ব করেছিলেন। এদের বিপরীত পথে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যে তাদের সংখ্যা অনেক বেশি। অর্থাৎ তাঁরা প্রথমে বিদ্যা অর্জন করে, পরে তার বিনিময়ে বিত্ত অর্জন করে। উনিশ শতকে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে পাওয়া যায়। যাঁরা প্রধানত বিদ্যার বদৌলতে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, তাদের পারিবারিক ইতিহাস থেকে তার প্রমাণ। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগর, মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন এই শ্রেণির অন্যতম প্রমাণ।

তথ্যসূত্র:

১. নিহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালির ইতিহাস আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, ১৩৬৫, পৃঃ-৪৫।

২. *ঐ*।

৩. বিনয়ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*, বুক ক্লাব, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃঃ ১১।

৪. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, *The Leopard*, Pantheon, Italy, 1991, P.195.

৫. বিনয় ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬।

৬. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪৫-৪৬।

৭. R.H. Gratten, *The English Middle Class*; উদৃত্তঃ বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃঃ ৬২-৬৩।

৮. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।*

৯. T.B. Bottomore, *Dictionary of Sociology,* Allen and Unwin, London, 1971, P. 70

১০. A.K. Nazmul Karim '*The Role of Middle Class in Bangladesh'* Bangladesh Journal of Sociology, Vol.11. Issue-1, Dept. of Sociology, University of Dhaka, Dhaka, 1984, P.1-4.

১১. বিনয় ঘোষ, *প্রাগুপ্ত*, পৃঃ ৮৮।

১২. স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস" (১৮২৬-১৮৫৬)*, পুস্তক বিপনি, কোলকাতা, ১৯৭, পৃ. ৬৯।

১৩. *ঐ*।

১৪. The city of Palaces, 'The Calcutta Magazine and Manthly Regtster', 1830, vol. 11, P. 763.

১৫. স্বপন বসু, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২০।

১৬. H.E.A. Cotton, *Calcutta Old and New,* (2nd Ed. 1980), Oxford University Press, Calcutta, 1979, P. 61

১৭. আবদুল বাছির, বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ, দর্শন ও প্রগতি, ২৪শ বর্ষঃ ১ম ও ২য় সংখ্যাঃ জুন-ডিসেম্বর, ২০০৭

১৮. A.K. Nazmul Karim, *Dynamics of Bangladesh Society*, Vilcas, New Delhi, 1980, P: 178

১৯. মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী, *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্তশ্রেণি (১৯৪৭-১৯৭০)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ২০২

২০. B.B. Misra, *The Indian Middle Classes: Their growth in modern tmes,* Oxford University Press, London, 1961, P: 10-11

২১. T.B. Macaulays, *Minutes on Indian Education* , 2nd February 1935, C.P.O., Calcutta, 1835

২২. T.B. Macaulays, *Minutes on Indian Education* , 2nd February 1935, C.P.O, Calcutta, 1835

২৩. A.R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal. (1757-1856),* Bangla Academy, Dacca, 1977, P: 231

২৪. Karl Marks, 'Notes on Indian History', *The first Indian War of Independence, (1857-1859),* People Publising House, Bombay, 1978, P. 35

২৫. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১-১৪২

২৬. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯

২৭. তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি ধর্মীয় সামাজিক পুর্নগঠন আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠাতা করেছিলেন। তিনি একজন বাঙালি দার্শনিক, তাঁর জন্ম ১৭৭২ সালে বৃহত্তর বাংলা প্রদেশের রাধানগর গ্রামে, পিতার নাম রামাকান্ত রায়, ও মা তারিণী দেবী।

২৮. মু.ইদ্রিস আলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

২৯. Tara Chand, *History of Freedom Movement in India,* 2 Vol, Ministry of Education, Delhi, 1965, P: 350.

৩০. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৯।

৩১. মাসুদুজ্জামান, *রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিক্ষা ভাবনা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৯৫।

৩২. বদরুদ্দীন উমর, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৯৪-৯৬।

৩৩. Francois Bernier,*Travels in the Maghul Impire,* S. Chanel and Co. New Delhi, 1972, P. 94.

৩৪. W.H Moreland, *India at the Death of Akbar,* Oxford University Press, London, 1920, P.24.

৩৫. A. K. Nazmul Karim, *The Changing Society of India and Pakistan,* Nawroze Kitabistan, Banglabazar, Dhaka, 1956, P.178.

৩৬. A. K. Nazmul Karim, *the Role of Middle class in Bangladesh, Bangladesh Jounal of Sociology,* Dhaka, 1976, Vol. II, No.1, P. 4.

৩৭. B.B. Misra, Op.Cit., P. 92.

৩৮. আবুদল বাছির, 'বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির (১৭৫৭-১৮৫৭) উদ্ভব ও বিকাশ: একটি পর্যালোচনা', *দর্শন ও প্রগতি*, ২৪ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ২০০৭, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১২২।

৩৯. জয়গোপাল গুপ্ত, *গীতরত্ন*, মডার্ন বুক এজেন্সী, কোলকাতা, ১২৬৩, পৃ. ৭-৮।

৪০. রাজ নারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সংগ্রহীত: রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী তহ্ফাৎ-উল-মুয়াহহিদিন, বেদান্ত (১৮০৩), শক, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ.৮।

৪১. আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৯৪।

৪২. Datta Ray (ed.), *The Emergence and Role of Middle Class in North-East India,* Uppal Pub: House, New Delhi, P. 37.

৪৩. আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর*, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৬৪।

৪৪. *ঐ*, পৃ. ৬৬।

৪৫. *ঐ।*

৪৬. *ঐ*, পৃ. ৬৯।

৪৭. আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২৪।

৪৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, রামমোহন রায় (সাহিত্য সাধক চরিতমালা ১৬) রামমোহনের গ্রন্থাবলির তালিকা দ্রষ্টব্য।

৪৯. Johnson's Ingland; *An Account of the life and Manners of His Age,* ed by A. S. Iurberville, Oxford University Press, Oxford 1933, Vol.1, p. 210-211.

৫০. Karl Mannheim, *Manand Society,* London, 1940, Cambridge University Press, P. 84.

৫১. F. Parkes: *Wanderings of a Pilgrim,* Pelham Richardson, London, 1850,P. 95.

৫২. F. parkes, *ibid,* p. 95 E.Roberts, Scenes and Charaeteristies of Hindostan with sketches of Anglo-Indian Society, W.H. Allen and Co., London, 1835, P.97.

৫৩. শেখর ভৌমিক। অরিন্দম চক্রবর্তী, *বাংলার শহর ঔপনিবেশিক পর্ব*, ইন্ডিয়ানা লিমিটেড, কোলকাতা, ২৩০১৫, পৃ.৯।

৫৪. মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী, *বীরভূম বিবরণ*, তৃতীয়খন্ড, সিউড়ি, ২০০৯ (১ম প্রকাশ ১৩৩৪ সন), পৃ. ১৯১-৯২।

৫৫. স্বপন বসু, হর্ষদত্ত (সম্পাদিত), *বিশ শতকে বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, অজয় সেন, স্বদেশী আন্দোলন ও বাঙালি সমাজ*, পুস্তক বিপণী, কোলকাতা, ২০০০, পৃ. ৪৬।

৫৬. মু. ইদ্রিস আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২।

৫৭. Alexander Duff, *India And Indian Mission,* R. Groombridge, London, 1843, P. 82.

৫৮. সালাহউদ্দিন আহমদ, *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-চিন্তা ও বিবর্তন (১৮১৮-১৮৩৫)*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০০, পৃ.৩০।

৫৯. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ (১৮৮৫-১৯২১)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১০০।

৬০. এ সম্পর্কে বিবরণের দ্রষ্টব্য, Ajit K. Neogy, *Partitions of Bengal A Mukherjee & Company*, Calcutta, 1987, Chapter-8.

৬১. বঙ্গিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়, *বঙ্গদেশের কৃষক* (২য় খন্ড) বঙ্গিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, ১৩৬১, পৃ. ২৯৪।

৬২. Muin Ud-Din Ahmad Khan, *History of the Faraidi Movement*, Pakistan Historical Society, Karachi, 1965, P. 202.

৬৩. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, বুক ওয়ালর্ড, কোলকাতা, ১৯৮০, পৃ.২০৫।

৬৪. Radha Kamal Mukherjee, *Land Problems of India*, Langmans, Delhi, 1933, P.98.

৬৫. Sirajul Islam, *The Permanent Settelment in Bengal, A Study of its operation (1790-1817)*, Bangla Academy, Dhaka, 1979, P. 17.

৬৬. আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২০০-২০১।

৬৭. স্মরণীয়, ১৮৫৭ পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ৯৫% ছিলেন ব্রাহ্মণ, কায়েস্থ অথবা বৈদ্যসন্তান। দ্র. 'Socila Change, Benoy Ghosh, *Renascent Benal*, International Publishing House Limited, Calcutta, 1355 (Bengali era), P. 18.

৬৮. Lal Behari Day, *Recollections of Alexander Duff*, Macmillan and Company, London, 1879, P, 22.

৬৯. আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯৮।

৭০. সালাহউদ্দিন আহ্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২।

৭১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চ বিংশতি বছরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ*, কোলকাতা, ১৮১৭, পৃ. ১৪-১৫।

৭২. T.B. Macaulay, *Minutes on Indian Education*, Dated 2nd February, 1934, Victoria Institutions, Calcutta, 1835, P.195.

৭৩. Baboo Krishna Mohana Banarjea, *The Persecuted on Bramatic Seenes illustrative of the present state of Hindoo Society in Culcutta*, Monrio & Co's East Indian Press, Calcutta, 1831, P. 203.

৭৪. India Home proceedings Vol. 5414,PP. 2327-32, India Office Library (C.lt.Philips ed. Selected Documents of the History of India etc, London, 1962, Vol. IV, PP . 130-33.

৭৫. Indian Councils Act 1892, A Collection of Act passed by the Governor General of India in council, the superintendent of government printing, Calcutta, 1892.

৭৬. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* (৩য় খণ্ড), প্রকাশভবন, কোলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৩৪৯-৫০, ৩৬০-৬১, ৩৬৩-৬৪।

৭৭. *ঐ*, পৃ.৬৫।

৭৮. স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৫-১৮৫৬)*, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৭১-৮৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ

'মুসলমান' কথাটি উচ্চারণ করলে প্রথমেই তাদের ধর্মের বিষয়টি সামনে চলে আসে। মানবজীবনের সমস্ত কার্য, সমস্ত বিষয়ে সাহায্য করার মধ্যেই ধর্মের স্বার্থকতা নিহীত। জীবনধারার যতগুলি স্তর রয়েছে সবগুলির ভিতর দিয়ে মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকায় সহায়তা করতে পারলেই মূলত ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পৃথিবীর সকল জাতির ভিতরে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা আছে। এই প্রতিযোগিতায় যে জাতি, সমাজ, দেশ যত বেশি এগিয়ে সেই তত বেশি উন্নত। আর যে গাফিলতি করবে, পুরোনো সম্মান দৃষ্টির মর্যাদার মায়া কাটিয়ে বর্তমানের সাথে তাল রেখে চলতে না পারবে, অস্তিত্ব এর নিজের কাছেও স্বয়ং বেমালুম মনে হবে। ঠিক এমনি বেমালুম ছিল ইংরেজ অধীনে থাকা বাঙালি মুসলিমগণ। একসময়ের রাজশাসনকারী উঁচু শির মুসলমান হতে হিন্দু জাতি উন্নয়নের দৌড়ে এগিয়ে গেল, পিছিয়ে দিল মুসলিম জাতিকে। পিছিয়ে পড়া মুসলিমগণ অবশেষে ঠিকানা খুঁজতে বের হয়।

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা মুসলিম শাসনাধিনে চলে যায়।[১] তারপর মুসলমানগণকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সাড়ে পাঁচশ' বছর প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে মুসলিম সুলতান-সুবেদার-নবাব-নাজিম বাংলাদেশে রাজত্ব করেছেন। মাঝখানে রাজা গণেশ (১৪১৪-১৪১৮) চার বছর বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[২] রাজা টোডরমল (১৫৮০-৮২) এবং মানসিংহ (১৫৮৯-৯৬) বাংলা শাসন করেছিলেন; কিন্তু তারা ছিলেন আকবরের প্রতিনিধি নাজিম।[৩] ঐতিহাসিক তথ্য মতে বাংলা বিজিত হওয়ার অনেক আগে অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে আরবীয় মুসলিমদের আগমন ঘটে। ক্রমে তারা ভারতের অধীশ্বর হয়ে উঠে। পর্যায়ক্রমে মামলুক, খিলজি, তুঘলক, সৈয়দ, লোদী, শূর, মোঘল বংশের নৃপতিগণ এদেশে রাজত্ব করেছেন। মোঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭)[৪] মৃত্যুর পর দিল্লির কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এর পঞ্চাশ বছর পর ইংরেজগণ প্রথমে বাংলা এবং প্রায় একশত বছরের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশ দখল করে সমগ্র ভারতবর্ষে একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৫৭ সালের ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজ তাদের রাজদন্ড হারিয়ে একেবারে শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায়।

ক্ষমতা হরণকারী বেনিয়া এই ইংরেজদের প্রতি প্রাথমিক পর্যায় থেকেই মুসলিমদের ছিল বিশেষ ক্ষোভ ও বিদ্রোহ মনোবৃত্তি। তাই উনিশ শতকে বাংলায় যে জাগরণ ঘটেছিল তাতে মুসলিম সমাজের উক্ত মনোভাবের জন্য তারা সম্পৃক্ত ছিল না বলে অনেক মনীষী মনে করেন। বাংলার মুসলিমদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি প্রথম থেকেই বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো। মনে মনে তারা ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ ও বিদ্রোহভাব পোষণ করতেন।[৫] বস্তুত এ ক্ষোভ ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহেরই নামান্তর। আরবী-ফারসী ও মাদ্রাসা-মক্তবের শিক্ষার প্রতিই তারা ছিলেন বিশেষ অনুরাগী। খোলস থেকে বের হয়ে

নতুনত্বকে গ্রহণ করতে মুসলিম সমাজের প্রায় শত বছরেরও বেশি সময় লেগে গেল। অন্যদিকে ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে শুরু থেকেই হিন্দুরা সজাগ ছিল এবং পাশ্চাত্যদের কাছ থেকে যতটুকু সুবিধা নিজেদেরকে উন্নত ও সফল করবার জন্য প্রয়োজন ছিল ঠিক ততটাই তারা নিয়ে নিতে ব্যতিব্যস্ত ছিল। এক্ষেত্রে মুসলিমদের সম্পৃক্ততা তেমন চোখে পড়ে নি। এই সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ মুসলিমদেরকে তাদের অস্তিত্বের লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য ইংরেজদের সাথে আপোষ নীতি প্রয়োগ করে চলার দীক্ষা দিয়েছিলেন। বিশেষ করে সৈয়দ আমির আলীর '*দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম*, নামক গ্রন্থখানি ছিল মুসলিমদেরকে জাগরুক রাখার এক অস্ত্র স্বরূপ। মুসলিমদেরকে জাগিয়ে তোলার ঠিক এমন সময়ে বড় একটি আঘাত এসে পড়ে তাদের উপর। সেই আঘাতটি হচ্ছে কর্নওয়ালিস ও স্যার জন শোর প্রবর্তিত সংস্কার পরম্পরা, যার পরিণতি হল ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজরা সেই আসনটি পেল, যে আসনটি ছিল একসময়ের উচ্চ মুসলিমদের আসন। যে আসনে বসে মুসলমনগণ রাজস্ব বা ভূমিকর আদায় করতেন।[৬]

১৮৩৬ সালে যখন ফারসি জায়গায় ইংরেজীকে রাজভাষা হিসেবে স্থান করে দেওয়া হয় তখন থেকে শুরু হয় মুসলিম দূরাবস্থার আর এক করুণ পর্যায়। এতে মুসলমানগণ আরো বেশি কোনঠাসা হয়ে পড়ল। এর ফলে দেশের রাজকাজ প্রধানত হিন্দু কলেজের শিক্ষিত যুবকদের করায়ত্ত হতে থাকল, তাদের মধ্যে মুসলমানদের উপস্থিতি ছিল না।[৭] হিন্দু সমাজের ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে আগ্রহ এবং মুসলমানদের অনাগ্রহ এই যে দুই অসম চাওয়া-পাওয়া, এর কারণ খুঁজতে গেলে ঐতিহাসিকদের শারণাপন্ন হতে হয়। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণ মুসলমানদের অনাগ্রহের প্রথম কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমান সমাজে পদস্থরা সবাই জমিদার অথবা উচ্চ রাজকর্মচারী। অন্যদিকে হিন্দু সমাজের পদস্থরা ছিল কিছু সংখ্যক জমিদার এবং বড় একটি অংশ ছিল ব্যবসায়ী। ইংরেজরা ছিল যেহেতু বানিয়ান এবং ব্যবসার নিমিত্তেই তাদের এদেশে আগমন; সেক্ষেত্রে হিন্দুরা যত তাড়াতাড়ি বানিয়ানদের সাথে সখ্যতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছিল তত তাড়াতাড়ি মুসলমানগণ তা পারে নি।

দ্বিতীয় কারণ হিসাবে ধর্মীয় কারণকেই সামনে আনা যেতে পারে। হিন্দু সমাজ আচার-আচরণে অনুদার হলেও অন্যের ধর্মের প্রতি তারা মোটামুটি উদার মনোভাব পোষণ করত। যার ফলে ভিন্নধর্মী ইংরেজদের ভাষাকে তারা সরাসরি তুচ্ছজ্ঞান না করে স্বকীয়তায় কাজে লাগাতে অগ্রসর হতে পেরেছিল। অন্যদিকে মুসলমানরা আচার-আচরণে উদার হলেও ধর্মের ব্যাপারে তারা ছিল গোঁড়া। আর সেজন্যই তারা বিদেশী ভাষা, আচার সম্পর্কে খুব কৌতূহলী ছিলেন না।[৮] যাইহোক, এ-ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে শাসন করার ফলে পরিবর্তনের এক ধারাবাহিকতায় মুসলমানদের মধ্যে যে পতনদশা শুরু হয়েছিল মুসলমানদের দুর্দশার জন্য তাকে উল্লেখ করা যায়। সৈয়দ গোলাম হোসেন তাবাতাঈ তাঁর প্রখ্যাত *সিয়ারুল মোতাখেরিন* নামক গ্রন্থে[৯] মুসলিমদের এই পতনদশাকে খুব সুন্দর করে চিত্রায়িত করে তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থে দেখা যায় মুসলমানরা তাদের ধর্মের মৌলিক বিষয়ের চেয়ে নানা মতবাদকে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করতে শুরু করেন। বিশেষ করে ওহাবী মতবাদের সূচনা এখান

থেকেই। ১৮২৬ সালে উগ্রপন্থি শিখদের সাথে ওহাবী মুসলমানগণের এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।[১০] তখন আরও ব্যাপকভাবে কট্টর ইসলামপন্থীদের দমনে ইংরেজরা আরও সচেতন হয়।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। যে ঘটনার জন্য মুসলমানগণ ইংরেজদের আরও চক্ষুশূল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ইংরেজী না শিখলে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাদের হার ভিন্ন আর কিছুই হবে না তা মোটামুটি স্পষ্ট। তাই উপায়ন্তর না দেখে বুদ্ধিজীবীদের দৃঢ় কথায় ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে মুসলমান সমাজ ইংরেজদের সাথে উনিশ শতকের ৬০-এর দশক হতে আপোষ নীতিতে চলার চেষ্টা শুরু করে। এছাড়া আফসোসও করতে থাকে এই বলে যে-'সময়ে তারা ইংরেজী শেখেননি বলে জীবিকা অর্জনের সুবন্দোবস্ত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।[১১]

১৮৭০-এর দশকে বাংলায় পাট শিল্পের বিস্তার ঘটে, যা মুসলমানদের জন্য ছিল এক আশীর্বাদ। কেননা এই শিল্পকে নির্ভর করেই পশ্চাদপদ মুসলমানগণ নিজেদেরকে আর্থিকভাবে লাভবান করে আধুনিক বা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে এসে স্বাধিকার সচেতন হয়। উনিশ শতকের পরিবর্তন যখন নবজাগরণের দিকে, ঠিক তখনই (১৮৮১-৮২ সালের দিকে) জামাল উদ্দিন আফগানি[১২] নামক বিখ্যাত দার্শনিক আসেন ভারতীয় উপমহাদেশে। কোলকাতাকে কেন্দ্র করে তিনি মুসলিম সমাজে সংস্কার আনার চেষ্টা করলেন। তিনি তাদেরকে অতীত গৌরব স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন। তিনি প্রচার করলেন- ইসলাম আর বিজ্ঞানের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। তিনি চান বিজ্ঞান আয়ত্ত করে মুসলিমগণ নতুন করে শক্তিশালী হোক।[১৩]

১৮৮৫-১৯০৫ পর্যন্ত এই বিশ বৎসর ধরে কংগ্রেসে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদেরকে বলা হয় উদারনৈতিক বা নরমপন্থী।[১৪] কিন্তু আফসোস কংগ্রেস মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির উচ্চ আওয়াজেও বাঙালি মুসলমানদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। তাই তাদের মনে পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দাবি উঠে। অবশেষে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে দেশভাগ করার প্রস্তাব দেন।[১৫] কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির আধিপত্যতা হতে দূরে গিয়ে সেদিনকার পূর্ববাংলার উত্থিত সচেতন বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি বঙ্গভঙ্গকে বিশেষভাবে স্বাগত জানান। বিশেষ করে নবাব সলিমুল্লাহ[১৬] এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। ১৯১১-এ বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও বাংলা বিভাগের এই প্রয়াস তৎসময়ের হিন্দু-মুসলিমদের মনোজগতে দারুন রেখাপাত করে। এরপর ১৯০৬ সালে মুসলিম সমাজ আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে নিজেদের বিকাশকে প্রস্ফুটিত করল আর তা হল মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা। এ ছিল রাজনীতি সচেতন বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ সাধনের ফল। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল পূর্ববাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির অগ্রযাত্রাকে সামনে ত্বরান্বিত করার এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ। বাঙালি মুসলিম জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় যেন প্রাণ ফিরে পেল। তবে কোলকাতার বাবু শ্রেণির মত ঢাকায় কোন বাবু শ্রেণির উত্থান সম্ভব হয় নি। তারপর চলল হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায়ে অসম বিকাশ।[১৭] বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির চূড়ান্ত বিকাশের পরে অবাঙালিরা এসে পরবর্তীতে যোগ দেয় তাদের সাথে। যার পরিণতি ১৯৪৭ সালের দেশভাগ। নতুন জাগরণে জাগরুক বাঙালি মুসলিম

নেতারা হাজার চেষ্টা করেও পরবর্তীতে শুধু ধর্মের নাম করে নিজেদেরকে ভাগ করে নেয়। তারা ভেবেছিল মুসলিম সম্প্রদায় বলিয়ান হয়েছে। কিন্তু এর ভয়ানক পরিনতি দেখা গেল ১৯৪৭-এর পর হতে।

বাঙালি মুসলমান ও মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি:

মুসলিমদের ভারত বিজয় থেকে ইংরেজদের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত মধ্যবর্তীকালকে ভারতের মধ্যযুগ ধরা হয়। কমবেশি এ সময়ের ব্যবধান ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলায় মুসলিম সমাজের পত্তন, গঠন, বিকাশ ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। ভারতের হিন্দু ধর্মনীতিতে ও সামাজিক আচরণবিধিতে কতক বিষয়ে কঠোর মনোভাব পোষণ করা হত, বিশেষ করে বর্ণভেদ প্রথা, দাসপ্রথা, অস্পৃশ্য প্রথার কারণে নিম্নশ্রেণির মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও মানবিক অধিকার বলতে বিশেষ কিছু ছিল না।[১৮]

মূলত ইসলামে জাতিভেদে, বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্য প্রথার স্থান নেই, বরং তা নীতিগতভাবে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ সমর্থন করে। ইসলামের প্রথম গৌরবোজ্জল যুগের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পীর-দরবেশগণ মানব সেবায় ও পরাহিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। গ্রাম-বন্দর ছাড়া রাজদরবারেও দরবেশগণের প্রভাব পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে লক্ষণসেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র'র *সেক শুভোদয়া*গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায়। শেখ জালাল উদ্দীন আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান ছিলেন। তিনি বহু জনপদকে নিপীড়নের হাত থেকে উদ্ধার করেন এবং তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।[১৯]

কেবল বণিক ও পীর-দরবেশ নয়, বাংলায় বেতনভোগী তুর্কিসেনাদের আগমন এবং আবাস স্থাপনের প্রমান আছে। ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী বিজয়ের ফলে বাংলায় পীর-দরবেশদের যেমন সংখ্যা বাড়ে, তেমনি ধর্মান্তরীতকরণও ত্বরান্বিত হয়। তখন উচ্চ পদ, ব্যবসায়ে সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি ক্ষেত্রে লোভ ও লাভের প্রশ্ন দেখা দেয়। কোথাও কোথাও তরবারীর ভয়ও উপস্থিত হয়েছিল। ধর্ম প্রচারে সুলতান জালালুদ্দিন (১৪১৮-৩২) এবং সোলায়মান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড় (১৫৬৫-৮৩) তরবারী প্রয়োগ করেছিলেন।[২০]

জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার কারণে লোকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ত। এঁদেরই একটি স্রোত বাংলায় এসে মিলিত হয়। পরে শান্তি স্থাপিত হলেও তাঁদের অনেকেই আর ফিরে যান নি। তাঁরা বসতি গড়ে তোলেন এবং স্থানীয় নারী-পুরুষের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। শাসক, সৈনিক, বণিক ধর্মপ্রচারক প্রভৃতি বহিরাগত মুসলমান, ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনসাধারণ এবং বৈবাহিক সূত্রে জাত মিশ্র রক্ত-ধারার মানুষ এই ত্রিবিধ পদ্ধতিতে বাংলায় মুসলমান সমাজের সৃজন, গঠন ও বর্ধনের কাজ সমগ্র মধ্যযুগ ধরে চলেছিল। সুতরাং বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং মুসলমান সমাজের পত্তন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, দীর্ঘকালের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই বাঙালি মুসলমানের গঠন ও বিকাশের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।[২১]

মধ্যযুগে লোকগণনার কোন রীতি ছিল না। ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ রাজকর্মচারী এবং পণ্ডিতগণ শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের আলোকে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা জানতে পারি যে বাংলার ৩,৫৭,৬৯,৭৩৫ জন জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ১৭,৬০,৯,১৩৫ এবং হিন্দুর সংখ্যা ১,৮২,০০,৪৩৮।[২২] বাকীরা অন্য সম্প্রদায়ের লোক। ১৮৭২, ১৮৮১ এবং ১৮৯০ সালের সেন্সাস রিপোর্টের দিকে তাকালে বাংলার মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে একটি ধারণা করা যাবে। যাহোক, মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি যা বেশ আগে থেকেই শুরু হয়েছিল।[২৩] এর কারণ হিসাবে আধুনিক গবেষকগণ উল্লেখ করেছে যে, প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার, বহুবিবাহ, প্রাচুর্যময় পূর্ববঙ্গ অথবা নিম্নবর্ণের দরিদ্র হিন্দুদের পাইকারি ধর্মান্তর এই সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।[২৪] তাছাড়া মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহ ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত ছিল। যার ফলে জন্মহার বৃদ্ধি ছিল অবধারিত। অন্যদিকে হিন্দু সমাজে এই ধরণের প্রথা ধর্মবিগর্হিত কাজ হিসাবে পরগণিত ছিল। প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের কারণে মুসলিম সমাজে সন্তানের আধিক্য সম্পর্কে আধুনিক লেখকরাও ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন।[২৫]

সাল	মোটসংখ্যা (জনসংখ্যা)	হিন্দু	মুসলমান
১৮৭২	৩,৫৭,৬৯,৭৩৫	১৮,২০০,৪৩৮	১৭,৬০৯,১৩৫
১৮৮১	৩৫,৬০৭,৬২৮	১৬,৩৭০,৯৬৬	১৭,৮৬৩,৪১১
১৮৯১	৩৫,৭৩৪,৩৭৭	১৬,৩৭০,৯৬৬	১৯৯৩৬৩৪১১

সূত্রঃ গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ (১৮৮৫-১৯২১)

বাংলার মুসলিমদের ভাষা, ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, দৈহিক গঠন ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেই মূলত সংখ্যা বৃদ্ধির কারণটির নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ সহকারে দৃষ্টিগোচর হয়। গ্রিয়ার্সন, হান্টার, ডালটন, উইলিয়াম ক্রুক, জেমস ওয়াইজ, হার্বাট রিজলি, জেমস লঙ প্রমূখ গবেষকগণের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। তাঁরা বাংলার জনতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, শিক্ষা , সমাজ ও ধর্ম-সংস্কৃতির সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।[২৬]

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে কোরান নিয়ে মুসলমানগণ ধর্ম প্রচার করেছেন। মুসলিম পণ্ডিতগণের কেউ কেউ আবার ইউরোপীয়দের এ-তত্ত্ব মানতে চাননি। মুর্শিদাবাদ স্টেটের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রাব্বি তাঁর '*হকিকতে মুসলমানে বাঙালা*, ১৮৯১, গ্রন্থে এ সম্পর্কে প্রথম প্রতিবাদ তোলেন। তিনি বাংলার মুসলিম আমলের নবাব-সুলতানদের ধারাবাহিক ইতিহাস, পারিবারিক ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও অন্যান্য লক্ষণ বর্ণনা করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বিদেশ থেকে আগত অভিজাত শ্রেণির লোক।[২৭] খোন্দকার ফজলে রাব্বির

বক্তব্যের ভিতর কিছু সত্যতা আছে, কেননা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বিদেশাগত বনেদী মুসলিম দ্বারা গঠিত হয়েছিল, এটি মেনে নেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে মুহাম্মদ আবদুর রহিম এর বক্তব্যটি বেশিমাত্রায় জনপ্রিয়। তিনি তুর্কি ও মুঘল আমলে আগত বিদেশী মুসলিম অপেক্ষা হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত দেশীয় মুসলিমদের সংখ্যা বেশি বলে উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে ভারত বর্ষে দুই ধরণের মুসলিমদের অস্তিত্ব দেখা যায়। যেমনঃ ১. বাঙালি সুফীবাদী এবং ২. অবাঙালি ওহাবী মতবাদ পুষ্ট। আমাদের আলোচনার মূল জায়গাটিই হচ্ছে উক্ত বাঙালি মুসলিমদের নিয়ে।

একটি সনাতন সমাজ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার জন্য মুসলিম সমাজের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন, যা উৎপাদন পদ্ধতি বিকাশের কারণে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত এবং অর্থনৈতিক মানদণ্ডের নিরীখে সমাজে বিকশিত হয়। শ্রেণি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণার নিমিত্তে বলা যায় যে, 'শ্রেণি হলো একটি আধুনিক অর্থনৈতিক সংজ্ঞা যা নতুন উৎপাদন পদ্ধতি বিকাশের কারণে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।[২৮] শ্রেণি নানা ধরনের হতে পারে। যেমনঃ Occupational,Industrial,Social,Ideo-politico-economic and incom classes.[২৯]

উপরোক্ত বিন্যাসটির কারণে বাংলার মুসলিমদের ক্ষেত্রে যদিও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র বা রক্ত ভিত্তিক চতুবর্ণের রক্ত ভেদরীতি অনুযায়ী শ্রেণিগত প্রথা ছিল না তথাপি এখানে এসেছে আশরাফ, আতরাফ, আজলাফ, আরজল প্রভৃতি নাম।[৩০]

সমাজের মানুষের মধ্যে এই শ্রেণিভেদ প্রধানত 'খানদান' বা রক্তধারা দিয়ে চিহ্নিত হয়েছে। বিত্ত ও বিদ্যা সমাজ স্তর গঠনে প্রভাব ফেলতে পারেনি। সৈয়দ, শেখ, মোঘল ও পাঠান প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলমানগণ নিজেদের আশরাফ বলে পরিচয় দেন। মুহাম্মদের বংশধর সৈয়দ, আসহাব বা মুহাম্মদদের অনুসরণকারীদের বংশধর শেখ, তুরস্ক ও আফগানিস্তানের অধিবাসীরা পাঠান ও মোঙ্গলীয় রক্তধারার লোকেরা মোঘল নামে পরিচিত। সৈয়দ বংশজাত লোকেরা সিদ্দীকী, ফারুকী, আব্বাসী ইত্যাদি পদবী ব্যবহার করতেন। ধর্মীয় নেতাগণ শাহ, খোন্দকার উপাধি ব্যবহার করতেন। পাঠানেরা খান, শূর প্রভৃতি এবং মোঘলরা মীর্জা, বেগ, মীর, মল্লিক, লস্কর, প্রভৃতি উপাধি ধারণ করতেন।[৩১]

বিশ্বের অন্যান্য মুসলিমদের ন্যায় ভারতবর্ষের মুসলিমদের মধ্যেও দুটি প্রধান সম্প্রদায় আছে- শিয়া ও সুন্নি। উভয়ে তৌহিদবাদে বিশ্বাসী এবং মুহাম্মদের নবীত্বে আস্থাবান; তাদের মূল বিরোধ 'ইমামতি' ও 'খলিফাত্ব', নিয়ে। মূলত ইরান, আফগানিস্তানে শিয়া মতাবলম্বী এবং তুরস্ক ও ভারতে সুন্নিদের প্রভাব বেশি।[৩২] ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বৃহৎ বাংলার সুন্নি ও শিয়ার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২০,৯৬৪,৬৫৭ ও ২৬২, ২৯৩ জন। উভয়ের অনুপাত ৮০:১। বাংলার রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং হুগলীতে শিয়াদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। সে হিসাবে সুন্নিদের সংখ্যা প্রায় সর্বত্রই বেশি ছিল।[৩৩]

বাংলার ইসলাম প্রচারক পীর-দরবেশগণ এই সুফীমতের ধারক ছিলেন। বাংলার মাটিও আবহাওয়া যেমন নরম, বাঙালির মনও ও তেমনি আবেগ প্রবণ; এই আবেগ প্রবণ মনোভূমি সুফীমতের উত্তমক্ষেত্র। ইরানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে বাংলার সবুজ শ্যামল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মিল আছে। এই জন্য পীরবাদী-মারীফতি মতবাদও যেন বাংলায় বেশি প্রভাব ফেলেছে। এছাড়াও গুরুবাদ, থেরবাদের স্রোত, নাম বৌদ্ধ সাধনার মধ্য দিয়ে পূর্ব হতে প্রবাহিত ছিল।[৩৪] এজন্য সুফীবাদ যখনই প্রচারিত হয়েছে দলে দলে মানুষ এই মর্মে দীক্ষিত হয় ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে সর্বজনস্বীকৃত। এক্ষেত্রে এম.টি টাইটাসের অভিমত- "In fact, it was through sufism that Islam really found a point of contact with Hinduism and on effective entrance to Hindu hearts."[৩৫] তিনি আরও বলেছেন- "It (Sufism) is rather a natural revolt of human heart against the cold formalism of a ritualistic religion."[৩৬]

সতেরো শতকের পর হতে বাংলায় পীরবাদী সুফী সাধকদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি তাদের শিষ্যদের সংখ্যাও যখন ক্রমে ক্রমে আরও বেড়ে চলছিল এবং সেই সাথে তাঁদের আরাধনার কেন্দ্র মাজার-মকবেরা-দরগাহ ইত্যাদি স্থানে শিরনি, মানত, ধূপধূনা দেওয়া, জিয়ারত করা, উরস পালন করার রীতি যখন তুংগে তখনই বিরোধ বাঁধতে শুরু করল শরীয়তপন্থী ওহাবী মতবাদের গুরু ও শিষ্যদের সাথে। সুফীদের বিরুদ্ধে আঠারো শতকে সংস্কার আন্দোলনের নিমিত্ত তাবৎ ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের জোয়ার সর্বপ্রথম যিনি সংগঠিত করতে পেরেছিলেন তিনি হলেন আরবের আবদুল ওহাব (১৭০৩-৯২)। তিনি কেবল কোরান এবং হাদিসের নির্দেশমত নিয়মতান্ত্রিক ধর্ম পালনের মতবাদ প্রচার করেন। আবদুল ওহাবের আন্দোলনের আদর্শ বহন করে ভারতবর্ষে প্রথম ধর্ম সংস্কার আন্দোলন করেছিলেন রায়বেরেলীর শহীদ সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬-১৮৩১০)। বাংলায় ঐ আদর্শে আন্দোলন করেন ফরিদপুরের হাজী শরীয়ত উল্লাহ (১৭৬৪-১৮৪০) এবং তাঁর পুত্র দুদু মিঞা (১৮১৯-১৮৬২)। প্রথমটি 'ওহাবী আন্দোলন' এবং পরেরটি 'ফরায়েজী আন্দোলন' নামে বিশেষ পরিচিত।[৩৭] উনিশ শতকের প্রথমার্ধে উভয় আন্দোলন ব্যাপকতর আকার ধারণ করে। উভয় আন্দোলনেরই মূল লক্ষ্য ছিল 'ইসলামীকরণ'। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের ওহাবী অভ্যুত্থানের ঢেউ উনিশ শতকে বাংলাকে যখন আন্দোলিত করেছিল, ওহাবী প্রচারক মোল্লারা তখন ফতোয়া দিয়েছিলেন ইংরেজ শাসনের অধীনস্থ এই দেশ মুসলিমদের জন্য দারুল ইসলাম নয়, দারুল হব্র। অত্রএব মোমিন মুসলিমদের অবশ্য করণীয় দেশত্যাগ। হিজরত করে মুসলিম শাসনের দেশ আফগানিস্তান, আরব, ইরান, তুরস্কে কোথাও চলে যাওয়া। সেই সময় গ্রাম বাংলার বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ সরল বিশ্বাসে যথার্থই গৃহত্যাগ করেছিল। তারপর এল বিশেষ করে নগরাঞ্চলে প্যান ইসলামীদের ডাক। উনিশ শতকের কোলকাতায় তখন আশ্রয় নিয়েছেন ভারতের নানান কেন্দ্র থেকে আগত ক্ষমতাচ্যুত সাবেক নবাব-বাদশার ক্ষয়িষ্ণু বংশধর, সভাসদ পরিষদবৃন্দ। তাঁদের ভাষা, তাহজীব, তমদ্দুন ইত্যাদি সমস্ত কিছুই সর্বাংশে বাঙালিত্বের বিপরীত এবং বিরোধী। শরাফতির দাবিতে তাঁরাই ছিলেন সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী।

মুসলিমদের পতনের চূড়ান্ত কাল হিসাবে ধরা হয় ১৮৩৭ সাল হতে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত পঁচিশ বছর ধরে প্রবাহমান সময়টিকে। কিন্তু এই পতন ঠিক কবে থেকে, কিভাবে, কোন ক্ষেত্রগুলিতে আঘাত করে এসেছিল সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। তার সাথে আবার এই বোধটুকুও মনে জাগ্রত করতে হবে এই পতনের জন্য দায়ী কারা। আলোচনার পরিধিতে পতন-এর যুগটিকে দেখতে হবে কেননা পতনের পরে হয়েছিল মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির উত্থান। প্রকৃতপক্ষে ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ে রাজক্ষমতাচ্যুতি, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারীর সংখ্যা হ্রাস। ১৮২৮ সালে বাজেয়াপ্ত আইনে নিষ্কর ভূমির রায়তিস্বত্ব লোপ এবং ১৮৩৭ সালে ফারসির রাজভাষাচ্যুতি পরপর এই চারটি বড় আঘাতে মুসলমানগণ নিঃস্ব, রিক্ত, নিরক্ষর, নিষ্ক্রিয় নির্জীব জাতিতে পরিণত হয়।[৩৮] মূলত ইংরেজদের প্রশাসনিক আইন ও শিক্ষানীতির ফলেই এরূপটি হয়েছে। মুসলিমদের পতনের প্রথম ধাপটিই ছিল অভিজাত শ্রেণির ধ্বংস হওয়া। কৃষক, শ্রমিক, বিত্তহীন লোকেরা এসব আইনের বাহিরে ছিল। এক্ষেত্রে প্রথম আঘাতটি তাদের গাঁয়ে লাগেনি তবে ইংরেজ শোষণনীতি থেকে তারা কিন্তু রেহাই পাননি। কোম্পানির বাণিজ্যনীতির ফলে তাঁতী সর্বস্বান্ত হয়। বিদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টিকরণ নীতি এদেশের কুটির শিল্পকে করে ধ্বংস। নীল চাষের অপ্রতিরোধ্য ধারাবাহিকতায় নীল চাষে কৃষকের হয় মহা সর্বনাশ।[৩৯] এর উপর রোগব্যাধি, দূর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে তারা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে। অশিক্ষা, দারিদ্রতা, চেতনাহীন জড়, জীবন মুসলিম সমাজটিকে যেন এক কালো দৈত্বের মত অন্ধকারের গহীন আড়ালে টেনে হেঁচড়ে, নিংড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। উপরোক্ত নিয়ামকগুলিকে নিম্নে একটু বিশদভাবে আলোচনা করে দেখা যাক।

১৭৫৭ সালের পূর্বে বাংলার নবাব ছিলেন বাংলার সর্বময় কর্তা। পলাশীর যুদ্ধে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পর নবাব বৃটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রীড়ানকে পরিণত হয়। কোম্পানি নবাবের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার সাথে সাথে তার ব্যক্তিগত আর্থিক সুযোগ-সুবিধার উপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ধীরে ধীরে নবাবের সকল ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। নবারের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি হারানোর অর্থনৈতিক আঘাত আসে অভিজাত শ্রেণির উপর। বাংলার মুসলিম অভিজাত শ্রেণির তিনটি প্রধান আয়ের উৎস– সামরিক বাহিনীর চাকরি, রাজস্ব আদায় এবং বিচার বিভাগে নিয়োগ ক্রমাগত বন্ধ হতে থাকে। উচ্চবিত্ত বা অভিজাত শ্রেণির মুসলমানগণ জীবীকার অন্যতম উৎস ছিল সামরিক বাহিনী। হান্টার মনে করেন যে, সেনাদলে মুসলিমদের নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।[৪০] তাছাড়া তিনি মন্তব্য করেন যে, কোন উচ্চ বংশজাত মুসলিম তখন আমাদের সেনাদলে প্রবেশাধিকার পায় নি।[৪১]

সামরিক বাহিনীর চাকুরীর সুযোগ বন্ধ হওয়ার ফলে অভিজাত মুসলমানগণ আর্থিক প্রতিপত্তি ও প্রভাব সীমিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া অনেক অভিজাত মুসলিম খ্রিস্টান শাসকদের অধীনে সামরিক চাকরি গ্রহণকে অবমাননাকর মনে করত। এই অবস্থায় বহিরাগত মুসলমানগণ অনেকেই ভাগ্যান্বেষণে উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরের উদ্দেশ্যে বাংলা ত্যাগ করে। আবার সামরিক ও বেসামরিক কিছু প্রাক্তন কর্মকর্তা নবাবী আমলে প্রাপ্ত তাদের জায়গীর নিয়ে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করে। সুতরাং ব্রিটিশদের ক্ষমতা দখলের প্রভাবে প্রাক-ব্রিটিশ অর্থাৎ মোগল আর্থ-সামাজিক অবস্থা দ্রুত অবসান ঘটতে থাকে।[৪২]

রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পর থেকে বাংলায় মুসলিম শাসক তথা অভিজাত শ্রেণি সরকারী সুযোগ-সুবিধা থেকে ক্রমাগত হারে সরে যেতে থাকে। ঐতিহাসিক ক্রামফিল্ড এই অবস্থায় বাংলার মুসলমানদের 'Depressed Group' বলে অভিহিত করেছেন।[৪৩] রাজস্ব বিভাগের চাকরির ক্ষেত্রে অভিজাত মুসলমানগণের অবস্থা ক্রমাগত শোচনীয় হতে থাকে। হান্টার উল্লেখ করেছেন, মুসলিম উচ্চবিত্তশ্রেণির দ্বিতীয় অবলম্বন ছিল রাজস্ব আদায় এবং এতে তাদের ছিল একচেটিয়া অধিকার।[৪৪] কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, প্রাক-ব্রিটিশ যুগেও রাজস্ব বিভাগের উচুস্তরের পদগুলি ছাড়া অন্য পদগুলিতে মুসলিমদের তুলনায় হিন্দুদের প্রাধান্যই বেশি ছিল।[৪৫] মুসলিম অভিজাত শ্রেণির অর্থনৈতিক দূরাবস্থার বিশেষ কারণ বাংলার রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে আদায়ের উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) প্রবর্তন।[৪৬] রাজস্ব খাত থেকে বিশেষ লাভের উদ্দেশ্যে ইংরেজ বানিয়ানগণ যখন দেখল দেশীয় গোমস্তা, দেওয়ান, আমিল, কোতআল দিয়ে রাজস্ব সংগ্রহ করে ঠিক পোষাচ্ছে না তখনই ইংরেজ সরকার বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতির (ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে) প্রয়োগ ও পরীক্ষা-নিরিক্ষা শুরু করেন। প্রথমে ওয়ারেন হেস্টিংস ও পরে লর্ড কর্নওয়ালিশ ভূমি ব্যবস্থার নানা জটিল পদ্ধতি তুলে দিয়ে একটা সুষ্ঠু ও সমন্বিত পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করেন। একশালা, পাঁচশালা, দশশালা এবং পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) চালু করে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রয়োগ সাধন করেন।[৪৭] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ভূমি ও ভূমিস্থ প্রজার মালিক হন। তিনি সরকারকে নিয়মিত বাৎসরিক কর প্রদান করে বংশ পরম্পরায় জমিদারী ভোগ করার অধিকার পান। এর সাথে যুক্ত হয় আবার 'সূর্যাস্ত আইন'। এই আইনের বলে নির্দিষ্ট সময় জমিদারগণ তাদের খাজনা রাজকোষে পৌছে দিতে না পারলে উক্ত জমিদারি নিলাম হয়ে যেত। তখন বিত্তশালী জমিদারগণ জমিদারি নিলামে কিনে নিতেন। সরকারের এইসব উপর্যুপরী ব্যবস্থার ফলে বনেদী জমিদারিগুলি বিপর্যস্ত হয়; এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয়শ্রেণির রাজা, মহারাজা, জমিদার, জায়গীরদার দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন। বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, নাটোর থেকে শুরু করে ছোট-খাট জমিদারী এক হাত হতে অন্য হাতে চলে যায়। যারা জমিদারী ক্রয় করত তারা বেশিরভাগ কোলকাতার নব্য বিত্তবান।[৪৮] তারা কোম্পানির দেওয়ানী, বেনিয়াগিরী, মুৎসুদ্দী, দালালী, গোমস্তাগিরী, পোদ্দারী, মহাজনী করে টাকা উপার্জন করেছিল। বলা বাহুল্য এ শ্রেণি ছিল হিন্দু সমাজের লোক। পুরাতন হিন্দু ও মুসলমানদের জমিদারী গুলি নব্য হিন্দু ও বিত্তবানের হাতে চলে যায়। ১৮৭২-৭৩ সালে বাংলা ও বিহারের মোট ৩৮টি জেলায় জমিদারের সংখ্যা নিয়ে যে তালিকাটি তৈরি হয়েছে তা নিম্নরূপ:[৪৯]

বড় জমিদারী (২০,০০০ একর তদূর্ধ্বে)	৫৩৩
মাঝারী জমিদারী (৫০০-২০,০০০ একরের মধ্যে)	১৫,৭৪৭
ছোট জমিদারী (৫০০- একরের নিচে)	১৩৭,৯২০
সর্বমোট:	১,৫৪,২০০

১৭৯৩ সালে জমিদারীর সংখ্যা ৩১৭টি। সিটনকারের হিসাব মতে ১৮৬৮ সালে ‘সদর জমিদারী’র সংখ্যা ছিল ৪,৫৬০টি। ইছামতী হতে গঙ্গা পর্যন্ত এই সদর জমিদারীগুলি বিস্তৃত ছিল। এগুলির মালিক ছিলেন যথাক্রমে হিন্দু ৩,৮৫৫টি (৮৫%) মুসলমান ৬৪৩টি (১৪%) এবং ইউরোপীয়ান ৫২টি (১%)।[৫০] মুসলমানদের জমিদারীগুলির বৃদ্ধি ছিল না। উপরন্তু এগুলি উত্তরাধিকার আইনের ফলে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ফলে এক কালের জমিদার কয়েক পুরুষের ব্যবধানে ভূমি কৃষকে পরিণত হয়।[৫১] ১৯১০ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় যে, জমিদার শ্রেণিতে প্রধানত হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। হিন্দু ও মুসলিম জমিদারদের সংখ্যানুপাত ছিল যথাক্রমে ৭:৩।[৫২] মুসলমান ভূস্বামীদের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান লিখেছেন- ‘লাখেরাজ ও দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলে হিন্দু ও মুসলিম উভয়পক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তবে নগদ টাকা হাতে থাকায় বিত্তশালী হিন্দুরা একই প্রক্রিয়ায় পুন:প্রতিষ্ঠার যে সুযোগ পায় মুসলমানগণ তা লাভ করতে পারেনি।’ [৫৩]

এই লাখেরাজ সম্পত্তির উপর মুসলিম অভিজাত শ্রেণির একটি অংশ বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। মোগল শাসনামলে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সামাজিক প্রয়োজনে প্রায় পনের ধরনের রাজস্বমুক্ত ভূমি মঞ্জুরি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল।[৫৪] মোগল আমলে লাখেরাজ বা নিষ্কর রায়তিস্বত্বের অধিকারী এক শ্রেণির ভূমি মালিক ছিলেন। সমাজের উচ্চ বংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক নেতা এবং গুনী ও জ্ঞানী ব্যক্তি এসব লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ করতেন। মসজিদ, মন্দির, দরগাহ নির্মাণ, এমনকি নিঃস্ব ভিখারী ও মুসাফিরের জন্য লাখেরাজ দানস্বত্ব ছিল। খোন্দকার ফজলে রাব্বি এই রকম প্রায় ২৭ প্রকার নাম করছেন। যেমন: আল তমঘা, মদদ-ই-মাশ, আয়মা, মসকন, মা-আফি, পীরান, খারিজ, জমা, মিনহাই, মালেক, মালেকানা, দেবোত্তর, শিবোত্তর, সুরুজ-পর্বত, হনাম, মানকর, জায়গীর, নুজরত, খানকাহ, ফকিরান, নজরি দরগাহ, নজরি ইমামাইন, জমিন-ই- মসজিদ, নজরি হযরত, খরচি মুসাফিরান, মেহতেরান প্রভৃতি (এগুলির মধ্যে ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, শিবোত্তর, সুরুজ,পর্বত, মানকর শুধু হিন্দুদের ছিল)। এগুলির মধ্যে ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, শিবোত্তর, সুরুজ ও পর্বত এই পাঁচটি কেবল হিন্দুদের এবং জায়গীর, আল-তমঘা, খারিজ- জমা, মিনহাই, মালেকানা, ইনাম ও আনবার এই সাতটি হিন্দু-মুসলিম উভয় এবং বাকী পনেরটি মুসলমানগণ ভোগ করত। রাব্বী সাহেব কয়েকটি জেলার কেবলমাত্র আয়মা সম্পত্তির একটি তালিকা দিয়েছেন এরূপে:[৫৫]

বর্ধমান	= ১,৭০৫
হুগলী	= ৮৯৪
মুর্শিদাবাদ	= ৭০০
বগুড়া	= ৬৯৪
চব্বিশ পরগনা	= ১৬

মেদিনীপুর = ১২

সর্বমোট: ৪,০২১

১৮২৮ সালের 'নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইনে' এসব সম্পত্তির অধিকাংশ মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার দরিদ্র অথবা ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮৩৩-৩৮ সালের মধ্যে লর্ড বেন্টিংক বিচার বিভাগ তথা অফিস-আদালতে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষাকে রাজ ভাষা হিসাবে ব্যবহার করার ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে বিচার বিভাগে মুসলিমদের চাকুরীর ভিত ভেঙ্গে পড়ে। লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ সালে আরেকটি নিয়ম করেন আর সেটি হল- সরকারী চাকুরীতে তারাই অগ্রাধিকার পাবে যাদের ইংরেজীতে ডিগ্রী রয়েছে।[৫৬] এক্ষেত্রে হিন্দুরা ইংরেজী জানতেন বলে তারা সরকারী চাকুরী করতে পেরেছে, অপরপক্ষে মুসলমানদের ইংরেজী বিদ্যা ছিল না বলে তাদের কপালে আর সরকারী চাকুরী জুটল না। ধ্বংস তাদের নিত্যনৈমেত্তিক ব্যাপার হয়েই যেন সামনে আবার দাঁড়াল।

১৮৩৫ সালে লর্ড টমাস ব্যাবিন্টন মেকলের পরামর্শ অনুযায়ী আইন হয় যে, কেবল ইংরেজী বিদ্যালয়গুলি সরকারী সাহায্য পাবে, অন্য কোন প্রতিষ্ঠান পাবে না।[৫৭] ভারত সরকার কর্তৃক ৭ই মার্চ ১৮৩৫ সালের ১৯ ধারার প্রস্তাবটি ছিল - "His lordship in council is of the opinion that great of the British government ought to be promotion of European Literature and science amongst the natives of India, and all the funds appropriated for purpose of education would be best employed on English Education alone" প্রকৃতপক্ষে এসব প্রশাসনিক নতুন নিয়ম প্রবর্তন ও পরিবর্তনের ফলে সম্প্রদায় নির্বিশেষে শিক্ষিত ভারতীয় চাকুরীজীবীরা ইউরোপীয়দের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। হিন্দুরা ইংরেজী ভাষা গ্রহণের ফলে মুসলিমদের তুলনায় এগিয়ে থাকলেও চাকুরীর ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট ছিল না। ১৮৪৯ সালের বেতনের তালিকা হতে এ তথ্য পাওয়া যায়। নিম্নোক্ত তালিকায় ভারতীয় চাকুরীজীবীদের সংখ্যা এবং বাৎসরিক বেতন দেখানো হয়েছে।[৫৮]

সারণি

সংখ্যা	বাৎসরিক বেতন
১ জন	১,৫৬০/ টাকা
৮ জন	৮৪০/- টাকা ৯৬০/- টাকা
১২ জন	৭২০/- টাকা ৮৪০/- টাকা
৬৮ জন	৬৮০/- টাকা ৭২০/- টাকা

৬৯ জন	৪৮০/- টাকা	৬০০/- টাকা
৬৮ জন	৩৬০/- টাকা	৪৮০ টাকা
২৭৭ জন	২৪০/- টাকা	৩৬০/- টাকা
১,১৭৩ জন	১২০/- টাকা	২৪০/- টাকা
১,১৪৭ জন	২৪/- টাকা	১২০/- টাকা
মোট: ২,৮১০ জন		

উৎস:- সূত্র: গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ (১৮৮৫-১৯২১)

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, নয় ধরণের বেতন স্কেল থাকলেও শেষোক্ত দু'টি স্কেলেই ভারতীয়দের স্থান ছিল বেশি। ২৪০ টাকা থেকে ১২০ টাকা বাৎসরিক বেতন হওয়ায় মাসিক হার ছিল মাত্র ২০ টাকা থেকে ১০ টাকা। এই ধরনের চাকরিগুলি যে একেবারে নিম্ন পর্যায়ে ছিল তা সহজেই অনুমেয়। ব্রিটিশ প্রবর্তিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রচুর বেতনভোগী কর্মচারীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এগুলির মধ্যে বেশিরভাগ ছিল করণিক ও নিম্ন পর্যায়ের প্রশাসনিক। এই পদগুলির জন্য ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন ছিল এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই সুযোগ গ্রহণ করে লাভবান হয়েছিল।[৫৯] মুসলিমদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকলেও ইংরেজী শিক্ষা না থাকায় তারা ছিল একেবারেই পশ্চাৎপদ। ফলে অভিজাত মুসলিমদের পক্ষে এসব চাকুরী পাওয়া দুস্কর হয়ে পড়ে। বাংলার অভিজাত শ্রেণির চাকুরিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে হান্টার মন্তব্য করেছেন যে, 'মুসলমানগণ ছিল হিন্দুর অনুপাতে ৭ ভাগের এক ভাগেরও কম, ইংরেজদের তুলনায় ১৪ ভাগেরও কম'।[৬০] মুসলিমদের অন্যতম পেশা ছিল আইন ব্যবসায়। এই ব্যবসাতে তাদের প্রায় একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল বলা চলে। কিন্তু কোর্টের ভাষা হিসাবে ইংরেজী চালু করার কারণে মুসলিমদের সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। এমনকি ইংরেজী চালু করার পূর্বেই এই অবক্ষয় শুরু হয়। কর্ণওয়ালিশের সংস্কারের পর মুসলিম উকিলদের সংখ্যা শতকরা পঁচিশ ভাগে নেমে আসে।[৬১] ১৮৬৯ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, হাইকোর্টের আইনজীবী এবং পদস্থ কর্মচারীর মধ্যে মুসলিম একজনও নেই।[৬২] উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও সেখানে মুসলিম ছাত্র ছিল না। আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে অনীহার কারণে এই প্রতিষ্ঠানে মুসলমানগণের অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। ১৮৬৯ সালের সরকারী বিবরণীতে বলা হয় যে, এম.ডি., এম.বি উপাধিধারীদের মদ্যে একজনও মুসলিম ছাত্র ছিল না। একশত চারজন এল. এম. এফ উপাধিধারী প্রাপ্তদের মধ্যে মাত্র একজন ছিল মুসলিম।[৬৩] অভিজাত মুসলিমদের এই অবস্থার জন্য মূলত তাঁদের ধর্মীয় গোঁড়ামিই দায়ী ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে মুসলমানগণ ব্যর্থ হয়। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে এই শ্রেণির অনীহা এই ক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা হিসেবে দাঁড়ায়।[৬৪]

বাংলা ভাষাকে যখন হিন্দুরা অন্তরে ধারন করে সম্মান দিতে ব্যস্ত ঠিক উল্টোদিকে বাঙালি মুসলমানরা উর্দু নিবে, না ফার্সি নিবে, না আরবী নিবে না সংস্কৃত নিবে, না বাংলা নিবে, না ইংরেজী নিবে সেসমস্ত জটিলতার অংক কষছেন। নির্বুদ্ধিতার এত বড় প্রমাণ আর কোথায় আছে। জাতির আশা-আকাঙ্খা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করে হিন্দু সাহিত্যিক ও মনীষীগণ সমাজের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। সেখানে মুসলমানগণ ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। কোলকাতায় হিন্দুগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন; কোলকাতার নগরজীবনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করে তারাই বেশি পরিমানে সুবিধা ভোগ করেন। ইংরেজদের সংস্পর্শে ও সহযোগিতায় চাকুরী ও ব্যবসা করে তারা অর্থের মালিক হন, তারাই জমিদারী কিনে প্রভাবশালী হয়ে উঠেন। কয়েকটি ধনী পরিবারকে কেন্দ্র করে কোলকাতায় একটি নব্য অভিজাত শ্রেণির সাথে 'নব্য বাবু' বা মধ্যবিত্ত শ্রেণিরও উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে তিন শ্রেণির লোকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যেমনঃ (ক) রক্ষণশীল, (খ) প্রগতিশীল এবং (গ) প্রতিক্রিয়াশীল।[৬৫]

উক্ত তিন শ্রেণির মধ্যে সর্বদাই একটি দ্বন্দ্ব চলছিল তথাপি আধুনিক জীবনের মূল্যবোধে বিশ্বাসী প্রগতিশীল শ্রেণিটিই সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে পার করে তৎসময়ের (উনিশ শতকের প্রথমার্ধ) সমাজকে অযৌক্তিক আচার-সংস্কার, কুসংস্কার, কু-প্রথা, গ্লানি মিথ্যা বন্ধন থেকে মুক্ত করেন এবং সমাজদেহে সতেজ ও নবপ্রাণ সঞ্চায় করতে সক্ষম হন। সেক্ষেত্রেও মুসলমান সমাজের আলোচিত মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব নেই। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতির যেসব সংস্কার-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজ এগিয়ে যায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সেসব ধরণের আন্দোলন মুসলমান সমাজে হয় নি। মুসলমানেরা হিন্দুদের এসব আন্দোলনে যোগদানও করেনি। উর্দুর সাথে বাঙালি মুসলমানের কোন আত্মিক যোগ না থাকলেও বাংলার সাথে তাদের আত্মিক যোগ ছিল। প্রতাপাদিত্যকে বীর চরিত্ররূপে আঁকা হয়েছে, কৃষচন্দ্রকে মহৎ করে দেখানো হয়েছে। স্কুল বুক সোসাইটি, ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির সাথে যে আটজন, মুসলমান বিদ্বান ছিলেন তারা বাংলা ভাষার চর্চা করেন নি বটে, উপরন্তু অনাগ্রহ হেতু সমাজেও কোন প্রভাব রাখতে পারেন নি। এ হলো মুসলিমদের অবস্থা।

তৎসময়ে বাংলা ও ইংরেজী পত্রিকার সাথে মুসলিমদের যোগ কোথাও দেখা যায় না। উর্দু ও ফার্সিতে মুসলমানগণ কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন বটে কিন্তু ভাষার ব্যবধান পেরিয়ে সমাজকে পত্রিকাগুলি বিন্দুমাত্রও আলোচিত করতে পারেনি। তৎসময়ের সমাজ-সংস্কৃতিমূলক কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ছিল। যেমনঃ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সমিতি যেগুলিতে গোড়ামিবশত মুসলমানগণ যোগদান করেন নি। প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী চিন্তার আদর্শ নিয়ে যে জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৬) ও ইয়ংবেঙ্গল এসেছিল সেই গোষ্ঠীর সাথে মুসলিমদের কোন সম্পর্কই ছিল না।[৬৬] অতএব দেখা যায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পুরো সময়টা পর্যালোচনা করলে কেবল মুসলিম সমাজের নিষ্ক্রিয়তা, নির্জীবতা, নিশ্চলতা ও ঘোর গোড়ামির চিত্রই ফুটে উঠে। এরূপ অবস্থায় মুসলিম সামাজের কাছ থেকে জাগরণের গীত পাওয়া বৃথাই আস্ফালন ছাড়া আর কিছু নয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ: মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ

১৭৫৭-১৮৫৭ পর্যন্ত পূর্ণ এক শতককে সংক্ষেপে বলা যায় মুসলিমদের ঘন তমসাবৃত পতন যুগ। পতন দশা থেকে তারা যে উঠতে চায়নি এ কথা ঠিক না। তারা উঠতে চেয়েছিল বার বার। কিন্তু যে পদ্ধতিতে তারা উঠতে চেয়েছিল সেই পদ্ধতিই বরং তাদেরকে আরও গহিনে এনেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ক্ষমতার কেন্দ্রে থেকে ক্ষমতাচর্চা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আর সেখানে মুসলমানগণ নিম্নশ্রেণির ছিল ক্ষমতাবানদেরকে অনুসরণ করা যন্ত্রমানবসম। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কতিপয় মুসলিম বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি মানুষের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাঙালি মুসলিম সমাজ যেন চেতন পেতে শুরু করল। তবে অচলায়তন এত গভীরে ছিল যে, পুরোপুরি চেতন মুসলিমদের শরীর মনে আনতেও সময় লেগে গেল আরও কয়েক যুগ। অবশেষে পাশ্চাত্য শিক্ষার মর্ম মুসলিম সমাজ বুঝতে পারলেন এবং সচেতন নাগরিক সমাজ গড়ে তোলার অভিপ্রায় নিয়ে জাগরণ শুরু করল। মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব সাধন হয়ে বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে মুসলিম সমাজের জাগরণ নিহিত।

মূলত বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ হল আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের ফল।[৬৭] আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এই মধ্যবিত্তশ্রেণির সামাজিক পদমর্যাদা, রাজনৈতিক আদর্শ বাংলার মুসলিম সমাজে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। পরবর্তীতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ মূলত হিন্দু এবং মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাস্তব ঘটনা।

বিত্তের মাপকাটিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টিকরণ। আর এই বিত্তের উৎস হতে হবে পেশাভিত্তিক। তাহলে এই দাড়ায় যে, "মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি হল তারাই যারা কোন না কোন পেশার সাথে সংযুক্ত থেকে, নির্দিষ্ট একটি বেতনভুক্ত হয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে সচেতনভাবে জীবন-যাপন করে থাকে। সমাজ বিজ্ঞানী কার্ল মার্কসের সমাজতত্ত্বের আলোকে মধ্যবিত্তের একটি সংজ্ঞা দাঁড়ায় ঠিক এভাবে - "...a middle class in the liferal sense of the term is interpreted... as a previleged upper minority feeding on surplus value and state favouratism and inexorably driving its victims into marks of the proletariat".[৬৮] এর সাথে ডক্টর বি. বি. মিশ্রের ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণির বিশ্লেষণ করে যে এগারটি গ্রুপ নির্ণয় করেছেন, সেগুলির একটি সন্নিবেশন দেওয়া যায়।

১. আধুনিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মার্চেন্ট, এজেন্ট প্রোপাইটার সংশ্লিষ্ট পার্টনার ডিরেক্টর ইত্যাদি।

২. ব্যাংক, বাণিজ্য ও শিল্প-ব্যবসায়ে নিযুক্ত উচ্চ কর্মকর্তা তথা ম্যানেজার, ইনস্পেক্টর, সুপারভাইজার এবং প্রযুক্তিবিদ।

৩. ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, জনকল্যাণমূলক সংস্থা, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের উচ্চ বেতনভূক কর্মচারী।

৪. সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবৃন্দ।

৫. আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার, অধ্যাপক, উচ্চ ও মাঝারী শ্রেণির লেখক, সাংবাদিক, গায়ক, চিত্রশিল্পী, ধর্মপ্রচারক ও পুরোহিত।

৬. মাঝারি ধরণের জোতদার, খামার মালিক ইত্যাদি।

৭. অর্থসম্পন্ন ভাল পয়সা আছে এমন দোকান, হোটেল ইত্যাদিও মালিক এবং সেগুলিতে নিযুক্ত ম্যানেজার, একাউন্টট্যান্ট প্রভৃতি কর্মচারী।

৮. কৃষি খামারের মালিক ও কর্মচারী।

৯. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

১০. বিপুল সংখ্যক কেরানী, সহকারী এবং অনুরূপ কায়িক শ্রমহীন কর্মচারী।

১১. মাধ্যমিক স্কুলে উচ্চপদের শিক্ষক, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অফিসার এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ।[৬৯]

বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির সাথে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা কিন্তু প্রায়ই এক ও অভিন্ন। কিন্তু আয়তন, গঠনগত উপাদান ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও পার্থক্য ছিল। এর সাথে কালগত পার্থক্যের কথাও স্বীকার করতে হয়। ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, "আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান লুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে মুসলমানগণ কেমন করে দ্রুত গতিতে শ্রেণিচ্যুত হয়ে গেল সে কাহিনী আর বলার প্রয়োজন নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে প্রায় একশ বছর ধরে বাংলার হিন্দু যে অর্থনৈতিক ধারার ভেতর দিয়ে এসেছে, বাঙালি মুসলমানগণের জীবনে সে অবস্থা এসেছে মাত্র সেদিন– উনিশ শতকের শেষের দিকে। এই সময়গত পার্থক্য ছাড়াও হিন্দু-মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির জন্মের ইতিহাসের একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, যা এই দুই সম্প্রদায়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সাংস্কৃতিক পরিণতিকে সতন্ত্র করেছে। মুসলিম আমলে হিন্দুরা যে সুবিধা ভোগ করেছে, রাষ্ট্রশাসনে বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে নির্দিষ্ট স্থান তাদের ছিল, ইংরেজ আগমনের ফলে তা কিয়ৎ পরিমানে আলোড়িত হলেও মূলত ধ্বংস হয়নি। ব্যবসায় বা শাসন ক্ষেত্রে তারা শাসক শ্রেণির একান্ত প্রয়োজনীয় সহকারীরূপে চিরকালই একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে। এক যুদ্ধকার্য ছাড়া ধনোৎপাদন ও ব্যবসায়ী হিসাবের জন্য বিতরণ, সরকারী চাকুরি ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেক জীবিকাই তাদের মুসলমান আমল থেকে আজ পর্যন্ত অব্যহত আছে এবং ফলে তাদের আর্থিক স্থায়িত্ব রয়েছে অক্ষত। মুসলিম শাসক ও তাদের সহযোগী শ্রেণির যুদ্ধ ও শাসনকার্য ছাড়া অন্য জীবিকা ছিল না, সেজন্য নতুন শাসক শ্রেণির আগমনের সাথে সাথেই তাদের অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা গেল ধ্বংস হয়ে। .. হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির গঠন যত সহজ হয়েছিল (কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাদের মধ্যে চিরকালই একটা না একটা ছিল) মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি তত সহজে দ্রুত তৈরী হতে

পারে নি।[৭০] রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন ছাড়াও হিন্দুর মধ্যে উন্নতশীল মধ্যবিত্তশ্রেণি গঠিত হবার একটা মজ্জাগত ক্ষমতা আছে, মুসলমানগণের নেই এবং নেই বলেই এদের মধ্যবিত্তশ্রেণি রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া সত্ত্বেও এখনও (বিভাগোত্তর কালে) সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। বাঙালি মুসলমানগণ এখনও বুর্জোয়ারমত পরিবর্তনবিমুখ বা আত্মপরিতৃপ্ত হয়ে উঠেনি।[৭১]

ভারতীয় উপমহাদেশে তথা বাংলার হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষগণের দিকে দৃষ্টি দিলে একটি শ্বাসত রূপের পরিচয় মেলে যা কিনা মুসলিমদের মধ্যে ছিল না। তা হল এই যে যুগের পরিবর্তন অনুযায়ী হিন্দুদের চিন্তা, মানসভাবনা, সাংস্কৃতিক কার্যকালপের পরিবর্তন হয়েছে এবং এরূপ হয়েছে বলেই এতে গতিশীলতা এসেছে। কায়িক শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করে না বলে তাঁরা রাজপুরুষের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নিজ অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রেখেছেন। হিন্দু আমলে হিন্দুরা সংস্কৃত, মুসলমান আমলে ফারসি, ব্রিটিশ আমলে ইংরেজী ভাষা ও বিদ্যা রপ্ত করে ধর্ম-কর্ম, রাজকর্মও ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন যখন পৃষ্ঠপোষকতা পান নি; তখন সুবিধা কম ভোগ করেছে এই যা পার্থক্য নচেৎ তাদের বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্ব, সামাজিক মর্যাদা এবং সাংস্কৃতিক সমুন্নতির বিশেষ তারতম্য ঘটেনি। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির তাৎপর্য এখানেই নিহিত।

অপরদিকে মধ্যযুগের বাংলার মুসলিম সমাজের উপর নজর দিলে মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্পর্কে যে চিত্রটি পাওয়া যায় তার রূপ-প্রকৃতি হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে কথা হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম গোত্রে প্রতিযোগিতা নয়, আলোচনার স্বার্থ প্রেক্ষাপট অর্থাৎ যে প্রেক্ষাপট রচিত হলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান সহজ হয় ঠিক সেই প্রেক্ষাপটটুকুর অনুসন্ধান। মধ্যযুগে রাজকর্ম, ভূমি, ব্যবসায়ে লিপ্ত যে মধ্যস্তভোগী শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল, তার মধ্যে বিদেশগত মুসলিম (আরব, তুরস্ক প্রভৃতি সেমিটিক ও তাতার রক্তধারাজাত), স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং বিবাহের মাধ্যমে উভয়ের সংমিশ্রণজাত মুসলমান এই বিবিধ উপাদান আছে।[৭২] ধর্মের ভাষা আরবি, সংস্কৃতের ভাষা ফারসি এবং মাতৃভাষা রূপে বাংলা (অংশত উর্দু) চর্চা করেছেন এবং ভাবও আধ্যাত্মিক জীবনে তার মধ্যে অবগাহন করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা দেশীয় ঐতিহ্যকেও গ্রহণ করেছেন এবং সেই সূত্রে উভয় ঐতিহ্যর মধ্যে একটা সমন্বয়ের ধারা রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে আবার দেশীয় ভাষা, দেশীয় ভাবধারা, ঐতিহ্য বর্জন করারও আন্দোলন হয়েছে। উনিশ শতকে পুরো এবং বিশ শতকেও বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দু না বাংলা হবে এ নিয়ে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করেছে। উনিশ শতকে ইসলামীকরণ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশীয় ভাবধারা ও কৃষি বর্জন করার প্রশ্ন উঠেছে মুসলিম আমলে এ শ্রেণি সেরূপ সুবিধা ভোগ করেছিলেন, বৃটিশ আমলে তা পান নি। রাজনৈতিক ক্ষমতার হাত বদল হয়ে নিজেদের অদূরদর্শিতা ও অন্যান্য সংস্কার এবং নতুন শাসকশ্রেণির প্রশাসনিক নীতির দরুন এই শ্রেণি ধ্বংস হয়ে যায়। কোম্পানি আমলের প্রথম একশবছর ধ্বংসের-পতনের এই পালায় মুসলিম চলছিল। রাজকার্য, ভূমি ও অন্যান্য পেশার সুযোগ লাভ করে যে মধ্যবিত্তশ্রেণির গঠন হয়েছিল, কোম্পানির আমলে তাদের একটা বড় অংশ গ্রামে শ্রমজীবী কৃষক ও ক্ষেত মজুরে পরিণত হয়েছে। আর একটি ক্ষুদ্র অংশ কম-বেশি পূর্ব পেশায় টিকে থেকে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।[৭৩] আর্থিক দিক থেকে এই পরিবর্তনকালে

মুসলমান সমাজে রক্তধারার আবার পরিবর্তন হয়। শরিফ-আশরাফ মিলন মিশ্রণে এক সামাজিক সংস্কার ছাড়া ধর্মগত কোন বাধা ছিল না; আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে শরিফশ্রেণি কৃষক-মজুর-মাঝি-মাল্লার সমপর্যায়ে আসে এবং এরূপ অবস্থায় সংস্কৃতির ও বৈবাহিক লেন-দেন চলে। এতে সামাজিক স্তর অবনতি হয়।[৭৪] মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির গঠনগত দিকটি বেশ জটিল। এক্ষেত্রে প্রগতিবাদী যে গোষ্ঠীটি তথা প্রগতিশীল মধ্যবিত্তশ্রেণি ছিল পাশ্চাত্যের সেক্যুলার শিক্ষার পক্ষপাত, রক্ষণশীলরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করলেও উর্দু ও ফারসী ভাষার চর্চা করে দিয়েছেন নিয়মতান্ত্রিকতায় এবং প্রাচীনপন্থী প্রাচ্য বিদ্যার প্রতিও গভীর অনুরাগ তারা পোষণ করতেন।[৭৫] আর যারা প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যবিত্তশ্রেণি তারা বিত্তের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে চলমান শিক্ষা গ্রহণ করলেও মনে প্রাণে ইংরেজী বিদ্যাকে ঘৃণা করতেন এবং নিজেদেরকে সাফ-সফেদ ইসলামী কাণ্ডারী মহাশয় জ্ঞান করে ধর্মীয় শিক্ষা ও শরীয়ত শিক্ষায় নিজের ধ্যান-জ্ঞানকে আবদ্ধ করে রাখতেন। তাহলে যে কথাটি বোঝা গেল সেটা ঠিক এইরকম দাড়াল যে, মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যকার গঠন বৈচিত্রতাহেতু বিষম এক বিকাশ নিজেদের মধ্য থেকেই ক্রমান্বয়ে উত্থিত হচ্ছিল এবং পরবর্তীতে জাতিগত দ্বন্দ্বের সূত্রপাত তৈরি করে। মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যে মধ্যমপন্থী রক্ষণশীল শ্রেণিটি সবচাইতে বেশি দ্বন্দ্ব-সংকুল পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক হয়।[৭৬] কেননা তৎসময়ে মধ্যমপন্থী সংস্কারবাদীরা দেশীয় বাংলা ভাষা ও ভাবের উপর আরবীয় ও ইরানী প্রভাব মিশিয়ে ইসলামী বর্ণ ও চরিত্র দিয়ে একধরনের মিশ্র ধর্মী সংস্কৃতির সৃষ্টি করে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত মুসলিম উঠতি মধ্যবিত্তের এইরূপ পরিবর্তনশীল, দ্বন্দ্ব-সংকুল মিশ্র রূপ বিদ্যমান ছিল। নাজমুল করিমের একটি বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন - "The Bengal Muslim Middle class, like its hindu counterpart had its roots in agrarian set-up but, unlike its counterpart, began to be recruited from various muslim social classes as the 19th century was to a close and this feature began to get more opportunities in jobs, etc. with the first partition of Bengal (1905) and introduction of reserved quota for muslim in government service."[৭৭] এভাবে অনেক আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করে বলা যায় যে, মুসলিম তথা মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব হচ্ছে সামাজিক বিবর্তনধারার ক্রমবিকাশেরই এক অনিবার্য ফলস্বরূপ।

বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ সাধন সম্ভব হয়েছিল যখন অর্থ শিক্ষার পিছনে ব্যয় করার মত শক্তি মুসলিম জাতি তৈরি করতে পেরেছিল। শিক্ষা গ্রহণে প্রধান বাধা ছিল অর্থনৈতিক। এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা কাটিয়ে উঠার বিষয়ে ভারতে শিল্পায়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ব্যাপক প্রভাব রাখে। বাংলার মুসলিম সমাজের আর্থিক উন্নতি হয় প্রধানত পাট চাষের প্রসার ও পাট শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে।[৭৮] ইংল্যান্ডের ডান্ডি এবং কলিকাতাকেন্দ্রিক পাটশিল্পের জন্য পাটের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। পাট উৎপাদন সরবরাহ এবং বাজারজাতকরণে মুসলিম কৃষক, ব্যবসায়ী, আড়তদার, ফড়িয়াদের ভূমিকা ছিল প্রধান।[৭৯] পাট শিল্পের ইতিহাস এবং এই শিল্পের অর্থনৈতিক ভূমিকা মুসলিম সমাজের আর্থিক উন্নতির সহায়ক ছিল। এই উন্নতির কথা সাহিত্যকর্মেও পাওয়া যায়। যেমন তদানীন্তন মুসলিম বুদ্ধিজীবী মুনশী মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *আমার সংসার জীবন*-এ নিজ গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন- পূর্বে যে মুসলিমদের চালে খড় ছিল না, এক্ষণে সেই শ্রেণির অনেকের টিনের ঘর তৈয়ার হইয়া গিয়াছে, বাড়ি ঘরের পরিস্কার-

পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতে হয়।[৮০] এ প্রসঙ্গে ১৯১১ সালের আদমশুমারিতেও উল্লেখ আছে। বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসাবে তাদের বস্তুতান্ত্রিক উন্নতি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। আর এই সময়টি ছিল উনিশ শতকের শেষার্ধ এবং বিশ শতকের শুরু। পাট উৎপাদন এবং পাট শিল্পের বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায় ছিল এই সময়। বাংলার একমাত্র অর্থকারী ফসল হিসাবে পাট কৃষকদের অর্থনৈতিক জীবনে এনেছিল সমৃদ্ধি। এর ফলে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হয়ে মুসলিম তরুণেরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তি পেয়েছিল। যারা ছিল মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির মেরুদন্ড স্বরূপ।[৮১] বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ প্রক্রিয়াটি অত সহজ বিষয় নয়। কেননা এর সাথে সম্পর্কিত রয়েছে বিভিন্ন মতবাদের অনুসারী ইসলাম ধর্মানুসারী ব্যক্তিবর্গের অযৌক্তিক সম্পৃক্ততা এবং সেই সাথে হিন্দুজাতির উন্নতির চরম শিখরে যাওয়ার ব্যাপারটিকে মেনে নিতে না পারার যাতনা। তাছাড়াও রয়েছে বানিয়ানদের পক্ষ হতে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় তথা তাবদ সমাজ পরিবর্তনের নিমিত্তে নিজেদের নানাবিধ পরিকল্পনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমন্বয়করণ।

অর্থনৈতিক বিষয়টি দিয়ে শুরু করার পিছনে যুক্তি রয়েছে এবং এটি ব্যাখ্যা করা যাক - অর্থের ক্ষমতা যখন মুসলমান সম্প্রদায় হারিয়ে ফেলল তখনই তার অবক্ষয় শুরু। আবার যখন আর্থিক স্বচ্ছলতা তৈরি হল, তবে সুশীল জীবন-যাপন করবে, তো কিভাবে? - চাকুরীহীন থেকে সেটা সম্ভব নয়। মুসলিমগণ তা বুঝতে পারল। কিন্তু সময়ের সাথে তাদের পিছিয়ে পড়াকে তারা ফেরৎ আনতে সংকটে নিমজ্জিত হচ্ছিল। আবরণ থেকে বের হয়ে অবশেষে মুসলমানগণ কয়েকটি প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়ে অবশেষে নিজেই নিজের রাস্তাটি খুঁজে বের করে নেয়। আর সেই রাস্তাটি হল ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে চাকুরী প্রাপ্তি। বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ পর্বটিকে উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে বিশ শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত ধরা যেতে পারে।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের ফলে ভারতীয় মুসলমানগণ ইংরেজদের চোখে আরও খারাপ হতে থাকে।[৮২] উক্ত সিপাহী অভুৎথানের প্রথম ফল হল ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের পরিসমাপ্তি। এই অভ্যুত্থানের কালে উভয়পক্ষে যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল, তার বিবরণ ইংল্যান্ডে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। অনেকটা এই সূত্র ধরেই ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা ভারতবর্ষকে সরাসরিভাবে মহারানীর শাসনাধীনে আনার সংকল্প প্রকাশ করেন। ১ লা অক্টোবর রাণী ভিক্টোরিয়া তার বিখ্যাত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই ক্ষমতা হস্তান্তরের অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে রমেশ দত্তের উক্তি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন- By this singular clause [See. 42 of the Act for the better Government of India] the capital stock and the debts of the East India Company were virtually added to the Public Debt of the India; and the annual tribute which India has so long paid as interest on the stock was made perpetual. The crown took over the magnificent empire of India from the company without paying a shilling; the People of the India paid, and are still paying the purchase money. It was an act of injustice towards a British Dependency unexampled in the history of British Empire. It was an act of injustice which piessed heavily on the people, after the expenditure of forty millions sterling for

suppressing the mutiny had been saddled on them.[৮৩] রানীর উক্ত ঘোষণাপত্রে পরাধীন ভারতবাসীর অধিকার সম্পর্কে অনেক রকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও সেসব কার্যে পরিণত হতে পারেনি। কেননা, যে শোষণের মনেবৃত্তি দীর্ঘকাল ধরে ইংরেজ মানসে লালতি হয়েছিল, তার কোন পরিবর্তন হয়নি। এই কারণেই মহারানীর রাজত্বের প্রথম দু বছরে ভারতের আমদানী অনুযায়ী অপরিমিত অর্থ বিদেশে চলে যেতে থাকল। ভারতবর্ষের কৃষিরপক্ষে প্রধানতম প্রয়োজন ছিল সেচের সুব্যবস্থা। ইংরেজ রাজত্বে এটি অবহেলিত হয়েছিল বলে বারবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।[৮৪] দুর্ভিক্ষের জন্য শস্যের অভাব যতটা দায়ী, তার চাইতে বেশি দায়ী, আর্থিক নীতির জন্যে উদ্ভূত পরিস্থিতি অর্থাৎ গ্রামীণদের সর্বনিম্ন ক্রয়ক্ষমতার অভাব।

বাংলায় উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত স্বাধীন দেশীয় শিল্প গড়ে উঠে নি বা উঠতে দেওয়া হয়নি। বাংলার অধিকাংশ মুসলিম ছিল কৃষিজীবী। ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। প্রতি দশ হাজার মুসলিমদের মধ্যে ৭,৩১৬ জন ছিল কৃষিজীবী। অন্যদিকে একই সংখ্যার হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই সংখ্যা ছিল ৫,৫৫৫ জন। অন্যদিকে প্রতি দশ হাজারে হিন্দু জমিদারের সংখ্যা ছিল ২১৭ জন।[৮৫] সুতরাং এটা ধারণা করা যায় যে বাংলার অধিকাংশ মুসলিম ছিল সাধারণ কৃষিজীবী। মুসলিম সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ এই কৃষি নির্ভর পরিবার হতেই উদ্ভব। বাংলার কৃষকদের অর্থকারী ফসল পাটের প্রধান অঞ্চল ছিল পূর্ববাংলা। কাঁচা পাটের সরবরাহের উপর নির্ভর করে কলিকাতার আশেপাশে পাটকল স্থাপনের চেষ্টা চলতে থাকে। ১৮৫৫ সালে শ্রীরামপুরের সন্নিকটে বিশরা নামক স্থানে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। ডান্ডি থেকে জর্জ অকল্যান্ড এই পাটকল নিয়ে আসেন।[৮৬]

১৮৭০ এর দশকে গিয়ে পাটশিল্পের বিস্তার ঘটে। নতুন নতুন কোম্পানি গঠিত হয় এবং পাটজাত দ্রব্যাদির রফতানি বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৪ সালের দিকে পাটজাত দ্রব্যাদির রফতানি ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলার পাটশিল্পের উৎপাদন ডান্ডির উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যায়। পাটকল মালিকেরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে এবং পাটের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে সার্বিকভাবে কাঁচা পাট বিক্রি করে অর্জিত অর্থে কৃষকদের সংসার জীবনের উন্নয়নে ব্যয় করা হত। এর মধ্যে কৃষিনির্ভর পরিবার থেকে সামর্থ অনুযায়ী পরিবারের কোন সদস্যকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে প্রেরণ করা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে নীলের ব্যবসা ছিল অত্যন্ত লাভজনক। এদেশের উর্বর ভূমিতে নীলচাষের উদ্দেশ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিছুসংখ্যক 'প্লান্টার্স' নিয়ে আসেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে। এদেশে ক্ষয়িষ্ণু নীলশিল্পের সমৃদ্ধি সাধন করলেও প্রকৃতিগতভাবে এই নীলকরেরা ছিলেন কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত আইন-অমান্যকারী অত্যাচারী। আলোচ্য নীলকরদের বিরুদ্ধে তখন শ্রেণি সংগ্রামের প্রেক্ষিতে যে দূর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন তিতুমীর ও শরীয়ত উল্লাহ করেছিলেন তৎসময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটে তা মূলত শহরের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের সমর্থনের অভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও এর গুরুত্ব ছিল ব্যাপক। ১৮৬০ সালে সংগটিত নীল বিদ্রোহে মধ্যবিত্তশ্রেণি কৃষককে সমর্থন দিয়েছিলেন।[৮৭] রাজা রামমোহন রায় কৃষকদের সমর্থন দেয় কেননা শিল্পে কৃষকদের ব্যাপারটিকেও উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। নীল শিল্পকে কেন্দ্র করে বৃটিশ সরকারের কাছে

শ্রেণি সংগ্রামহেতু যে প্রতিরোধ আন্দোলনের ভাষা উত্থাপিত হয়েছিল, এক্ষেত্রে তাই গুরুত্বপূর্ণ। এরই প্রেক্ষিতে অবশেষে নীলকর কমিশন গঠিত হয়।[৮৮]

সামাজিক শ্রেণি হিসাবে নগর কেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশের মূল উৎস যন্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য। বাণিজ্যিক পুঁজিপতি ও শিল্পপতিরাই ইউরোপীয় সামন্ত শাসনের অবসান ঘটান এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এদের কলকারখানা, ফার্ম, ব্যাংক, পার্টি, এজেন্সী চালাবার জন্য এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কায়েমী স্বার্থবাদী মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়।[৮৯] ইংরেজ কর্তৃক শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ভারতবর্ষে সামন্ত সমাজ ব্যবস্থাই চালু ছিল। ভূমি রাজস্ব ছিল রাজভান্ডারের মূল উৎস। যা আসত কৃষকের ঘর হতে। বণিক সরকার কোম্পানির দ্বারাই বাংলায় আধুনিক মধ্যবিত্তশ্রেণির পত্তন করে। কোম্পানি কর্তৃক দেশের শাসনভার গ্রহণের পর কোলকাতা রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। ফলে সেখানকার প্রশাসনের বড় বড় পদগুলি ইংরেজদের একচেটিয়া অধিকারে যায় আর অধস্তন পদগুলি দেশীয় কর্মচারী দ্বারা পূরণ হতে থাকে। একদিকে দেশীয় শিল্পের ধ্বংস অবস্থা তদুপরী যন্ত্রশিল্পের আমদানি বন্ধ হেতু দেশীয় লোকের কাছে ক্ষুদ্র ব্যবসা, চাকুরী ছাড়া আর উপায় ছিল না। চাকুরী প্রাপ্তির লক্ষ্যে তাঁরা কোলকাতায় সমবেত হয়। ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে সরকারী, বেসরকারী পদে চাকুরী নিয়ে সংখ্যা বাড়াতে থাকে এবং সেই সাথে পদমর্যাদা নিয়ে বিভিন্ন পেশা যেমন আইন, ডাক্তারী, শিক্ষকতা প্রভৃতি স্বাধীন পেশার সৃষ্টিও করে সচেতন শিক্ষিত শ্রেণি। আর তারাই হলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি। পরবর্তীতে বাংলার প্রায় সব মফস্বল শহরগুলিতে কলিকাতার আদর্শেই মধ্যবিত্তের বিকাশ সাধিত হয়।

বাঙালি মুসলিম সমাজ বিশ শতকের প্রথম দিকে সর্বক্ষেত্রে তাদের সম্প্রদায়গত পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হওয়ায় বিভিন্নভাবে নিজেদের অবস্থা উন্নয়নের প্রয়াস নেয়। সমসাময়িক পত্রপাত্রিকায় মুসলিম সমাজের প্রতিকূল অবস্থা দূরীকরণের বিভিন্ন সুপারিশ লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম সমাজ বাণিজ্যে অংশ নিয়ে সফল হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য যে মুসলমানগণ সমাজে অবহেলিত হয়ে আছে সে সম্পর্কে একটি পত্রিকার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য- "... কত দেওয়ান সাহেব, কত চৌধুরী সাহেব ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার হিসাব বললেই হৃদয়ে দারুন আঘাত লাগে। ... ব্যবসায়টা মুসলিম জমিদারদের মধ্যে কোন শ্রেণিতেই নাই। মুসলমানগণের মধ্যে একটু গণ্যমান্য হইলেই ব্যবসায়কে হেয় জ্ঞান করেন"।[৯০] এই ধরণের প্রচার ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু ব্যক্তির ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হতে দেখা যায়। ১৯১১ সালের আদমশুমারিতে শিল্প ও বাণিজ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের হার দেখলে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।[৯১]

পেশা	হিন্দু	মুসলমান
শিল্প ও পরিবহন বাণিজ্য	১১.০০	৪%
বাণিজ্য	১১.০০	৪%

মূলত সুয়েজখাল খোলার পর বাণিজ্য পথটি আরও প্রশাস্ত হয়, আমদানি ও রপ্তানির হার প্রচুরভাবে বর্ধিত হয় এবং তার দরুন জীবন যাত্রার মানও বেড়ে যায়। পুরাতন জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্তিত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে পাশ্চাত্য শিল্পজাতদ্রব্য, যেমন ঔষধ, বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, কারিগরি যন্ত্রপাতি, কাগজ ও মুদ্রণশিল্প, মদ-সিগারেট, ঘড়ি, বাসন-কোসন, কাঁটাচামচ, দেহসজ্জার বিবিধ উপকরণ, গৃহসজ্জার দ্রব্যাদির ব্যবহার বিপুল পরিমানে বেড়ে ওঠে। তেমনি এসবের বাণিজ্যিক ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। আর এসব ক্ষেত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তদের কর্মের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়।

উনিশ শতকের শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবধারা থেকেও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তৎকালীন ইংরেজ রাজনির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণির সংগে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয় নি। হয়তো বন্ধনটি ক্ষীণ হতে আরম্ভ হয়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, এই বন্ধন সূত্রটি অবলম্বন করে মধ্যবিত্ত সমাজ তখনও স্বপ্ন দেখত।[৯২]

> "তৎকালীন সামাজিক আলোড়ন থেকে উদ্ভূত ব্যক্তিদের চিন্তায়, রাজনৈতিক কর্মেও আদর্শে, সামজিক আচরণের একটি বৈপরীত্য অন্তর্বিরোধ ও গলদ দেখতে পাওয়া যায়। একই নিঃশ্বাসে তাদের পক্ষে ভারতবর্ষের জন্য দুঃখ ও ইংরেজের জয়গান করাও সম্ভব হয়েছে; ইংরেজের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেও ইংরেজরা রাজা হবে বলে বিজয়ের গৌরব বিসর্জন দিতে হয়েছে।"

১৮৭০ সালে পাঞ্জাব ও এলাহবাদে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি এতে আগ্রহ দেখান নি। ১৮৬২ - ১৮৯২ পর্যন্ত মধ্যবিত্তশ্রেণি পর্যায়ের মোট ৩৫ জন সদস্য বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন এবং তারাই দেশের কৃষি, বাণিজ্য ও বৃত্তি বিষয়ক স্বার্থসমূহের প্রতিনিধিত্ব করতেন। ১৮৮২ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 'বেঙ্গল রেন্ট বিল' বিধানসভায় উপস্থাপিত হয়।[৯৩] তার মধ্যে প্রজার স্বার্থ রক্ষার্থে এরূপ বিধান ছিল–

> "কোন স্থিতিবান রায়ত বারো বছর কোন গ্রামের জমি কর্ষক থাকলে তার স্বত্ব স্থায়ী হবে ও হস্তান্তরযোগ্য হবে; কেউ জমির প্রজা থাকলে তাকে আইনের চক্ষে স্থায়ী প্রজা ধরা হবে, অপ্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, জমিদার ও প্রজার মধ্যে পূর্বের চুক্তিসমূহ বাতলি গণ্য হবে; অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ হলে প্রজা জমিদারের নিকট ক্ষতিপূরণ পাবে, দখলি

স্বত্বের প্রজাকে ইচ্ছেমত উচ্ছেদ করা যাবে না, কোন জমির খাজনা উৎপন্ন ফসলের এক-পশ্চমাংশের উর্ধ্বে কখনই বর্ধিত হবে না"।

বিষয়টি জমিদারী স্বার্থের পরপন্থি ছিল কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণির অপার সংগ্রামের ফলে অবশেষে বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন ১৮৮৫ তে পাস হয়।[৯৪] এই আইনের সুফল তখন অতটা ফলপ্রসূ না হলেও এর অন্ত:সারের মদ্যে যে কথাটি নিহীত ছিল তা হল অত্যাচার হতে মুক্তি , খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা চাই।

১৮৮৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবাদিতে ভারতীয় জনগণের ক্রমর্বধিত দুঃখ-দুর্দশায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে।[৯৫] তবে দু:খের বিষয় মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা তাদেরকে কংগ্রেস থেকে দূরেই রাখতেন। তাই ঠিক সেই সময় দেখা গিয়েছে নওয়াব আব্দুল লতিফ ও স্যার সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ হিন্দু কলেজে মুসলিম ছাত্র ভর্তি হতে পারছে না তাকে ইস্যু করে শিক্ষায় অনগ্রসর মুসলিম জাতির শিক্ষা ক্ষেত্রে শোচনীয় দূরাবস্থা তুলে ধরার প্রয়াসে বড়লাট লর্ড মেয়োর (১৮৭১-এ প্রথম বার) সাথে সাক্ষাতের ধারাবাহিকতা অব্যহত রাখতে ব্যস্ত ছিলেন। এছাড়াও নওয়াব আব্দুল লতিফ মহসিন ফান্ডের টাকার অপব্যবহার নিয়েও বড়লাটের সাথে আলোচনা করেন। বৃটিশ ভারতে ১৮৮২ সালে জনাব হান্টারকে সভাপতি করে 'এডুকেশন কমিশন' গঠিত হয়।[৯৬] এতে হান্টারকে মুসলিম শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে দেখা গিয়েছে। সৈয়দ আমীর আলী ও নওয়াব আব্দুল লতিফ কমিশনে মুসলিম সমাজের পক্ষ হতে সাক্ষ্য দেন এবং সেই সাথে একটি লিখিত স্মারকলিপি প্রদান করেন। পরবর্তীতে শিক্ষা কমিশন '১৮টি সুপারিশসহ, স্বতন্ত্র ১৫ শ অধ্যায় নিয়ে 'মুসলিম শিক্ষা' বিষয়ক একটি প্রস্তাব পাশ করেন।[৯৭] আলোচ্য সুপারিশের '১৭ নং প্রস্তাবটি, ছিল পক্ষপাতমূলক প্রস্তাব। বড়লাট লর্ড ডাফরিন উক্ত প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন। যদিও স্যার আজিজুল হক হান্টারের ১৭ দফা সুপারিশকে বাংলার মুসলিমদের শিক্ষা অধিকারের সনদ বলে উল্লেখ করেন।[৯৮] এভাবে দেখা যায় যে মুসলিম নেতৃবৃন্দের কংগ্রেস উদাসীনতার ফাঁকে গিয়েও শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের সক্রিয় সহযোগীতা কামনা করে, আন্দোলন ও কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে আলোচ্য নেতৃবৃন্দ তথা বুদ্ধিবিদ্যৎগণ অচলায়তনের মুসলিম সমাজের মানস-এ আলোড়ন তৈরি করতে পেরেছিলেন।

১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট অনুযায়ী ১৮৯২-তে ভারতীয়দের কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচনের অধিকার সম্বলিত যে ভারত শাসন আইনটি পাস হয় তার পিছনে বঙ্গীয় আইনসভার প্রভাবশালী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সাথে ছিলেন মুসলিম সমাজের পক্ষে প্রতিনিধিত্বশীল যোগ্য বুদ্ধিজীবী মৌলবী সিরাজুল ইসলাম, মৌলবী আবদুল জব্বার প্রমুখ দুই ব্যক্তি। এই আইন যদিও ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্খা ঘটাতে ব্যর্থ ছিল তথাপি পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার তাগিদে তা মুসলিম রাজনীতিবিদদেরকে দারুনভাবে জাগিয়ে তোলে। তিলক ছিলেন চরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের গুরু।[৯৯] এই ঘটনার পর মুসলমানরা ভাবল হিন্দু জাতির কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য আসলেই কোন অর্থ রাখে না। তারা ইংরেজদের হতে অধিকার প্রাপ্তির লক্ষ্যে আপন জাতিয়াতবোধে জাগরণ তৈরি করে স্বকীয় প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রত্যয়ে নেমে পড়ে। হিন্দু মুসলিম

অসম বিকাশ এবং তারপর ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ-এ পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলিম স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের পদার্পন ও স্বাগতবাদ জ্ঞাপন।

১৯০৫ সালের ঘটনা বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির মনোজগৎকে কতখানি ছুতে পেরেছিল এবং পরবর্তীতে বাংলার মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি তথা ধর্মীয় প্রেক্ষাপট কিভাবে উক্ত ১৯০৫ কে ঘিরে বিবর্তিত হয়েছিল তা জানা জরুরী। বিভিন্ন দৃষ্টিতে বঙ্গভঙ্গের মূল উপজীব্যকে দেখা হয় তার মধ্যে প্রধান ব্রিটিশ শাসন বিরোধি মনোভাবের উদ্রেক ঘটান। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা বাঙালি হিন্দু সমাজে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করে। যার পিছনে ছিল কায়েমী অর্থনৈতিক স্বার্থ। বঙ্গভঙ্গ ছিল মূলত বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির অসম বিকাশ ধারায় ঐতিহাসিকভাবে যে ভিন্নতার সৃষ্টি হয়, বৃটিশ কর্তৃক তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার।[১০০] ঢাকাকে রাজধানী করে গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে পশ্চাৎপদ মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতিও অগ্রগতির দিক বিবেচনা করে বৃটিশ সরকার এই পরিকল্পনা করাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা ভাবলেন ১৮৭০-এর পর ইংরেজ সরকার বুঝি মুসলিমদের আনুকূল্যে কাজ করার আগ্রহ বোধ করেছেন।[১০১]

এই আনুকূল্য মৌখিক ছিল কার্যক্ষেত্রে এর কোন প্রভাব দেখা যায় নি। ১৮৭০-এ সরকারী চাকুরীতে বাঙালি মুসলিমদের যে শোচনীয় সংখ্যালঘুতা, ১৮৭৬ সালেও তার পরিবর্তন হয় নি। এর পরের যে ধারাবাহিকতা সেটাও ছিল অপরিবর্তিত।[১০২] এরপর মুসলমানগণ চাকুরী পেতে আরম্ভ করে, তার কারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা। বাঙালি এই মুসলমানগণের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের মূলে রয়েছে: (১) সমাজনেতাদের আন্দোলন, (২) নিম্নমধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থার উন্নতি, (৩) নব্য মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষা সচেতনতা ও আর্থিক উন্নতি এবং (৪) সরকারী শিক্ষানীতির উদারতা।

ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ও নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী বঙ্গভঙ্গের পক্ষে তাদের স্ব-স্ব ক্ষমতার প্রভাব প্রায় পুরোটাই খাটিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের তুমুল আন্দোলনের মুখে ১৯১১-তে গিয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেল। হতাশ হয়ে পড়েছিল অগ্রগামী পূর্ব-বাংলার মুসলিম নেতারা।

১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবরে সিমলায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে উচ্চবিত্ত ভারতীয় মুসলিমদের একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন।[১০৩] মহামান্য আগা খান ছিলেন দলের নেতা। নবাব সলিমুল্লাহর প্রস্তাবে নবাব ভিকার-উল-মুলক এতে সভাপতিত্ব করেন। এই সংগঠনের বড় প্রাপ্তি ছিল দূদর্শাগ্রস্থ মুসলিমদের হারানো ঐতিহ্যে ফিরে পাওয়া। আর তা হলো, জন্মগত মর্যাদা, সামাজিক অবস্থান এবং ব্রিটিশদের সমর্থন ও আনুকূল্য লাভ এবং গঠনমূলক পেশা নিশ্চিতকরণ। বিশ শতকের প্রথম দশকে মুসলিম মধ্যবিত্তের দ্রুত অগ্রগতি সম্পন্ন হয়। ডক্টর দেশাই বলেছেন- ১৯১২ থেকে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির রাজনৈতিক চেতনা বেশ বেড়ে উঠে।[১০৪] স্মিথও দেখিয়েছেন যে, ১৯১২ এর দিকেই মুসলিম মধ্যবিত্ত বিশেষভাবে ইংরেজ বিরোধী চেতনার পরিচয় দিতে থাকে। নবগঠিত মুসলিম মধ্যবিত্তের মনে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করার যে বাসনা জেগেছিল, ইংরেজ শাসনাধীনে এবং তখনকার অর্থনৈতিক অবস্থায় তা বাস্তব রূপ গ্রহণ করতে পারছিল না।[১০৫]

মুসলিম মধ্যত্তিশ্রেণির বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ দশক ছিল ১৯১১ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত সময়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গভঙ্গ এবং এর রদ বাঙালি মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক জীবন প্রভাবিত করে। সচেতন পেশাজীবী মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি মুসলিম লীগের মাধ্যমে অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়। এর ফলে শিক্ষিত মুসলিম তরুণেরা চাকরির ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান উন্নত করে। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত প্রগতিবাদী নেতাগণ একটি যুগোপযোগী চিন্তা করে বসলেন। তারা যখন দেখলেন ইংরেজ সরকার মুসলমানদের স্বার্থকে হিন্দু সম্প্রদায়ের চাপের মুখে জলাঞ্জলি দিল এবং সামান্য আলাপ-আলোচনারও প্রয়োজন বোধ করেন নি, ঠিক তখনই নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থে সরকারের প্রতি অন্ধ অনুগত্যের নীতি মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনবোধে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণের নীতি অনুসরণের চিন্তা-ভাবনা মুসলিমদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে শুরু হয়। এর প্রবক্তা ছিলেন তরুণ নেতা ফজলুল হক। ১৯১৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল বঙ্গীয় আইনসভায় বক্তৃতাদানকালে এ ব্যাপারে ফজলুল হক বলেন-To me it seems that Government has arrived at a parting of the way… in spite of their aversions to agitation, Muhammedans are drifting owing to sheer force of circumstances, into the arena of political warfare. We feel that we have got to move with the times or else we are doomed. Let not the officials think that the feelings of the entire community can be soothed simply by the bestowal of titles and decorations on our leaders… We require something more than a mere concession to our sentiment…[১০৬]

মিলনের এই পথচলারই বড় সফল ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তি। এভাবে উত্থান বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি নিজের অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটাল। ১৯১৮ সালে খিলাফত আন্দোলনেরও দু' বছর পূর্বে মসলিম জনসাধারণ নিজেদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুরস্কের বিপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে তাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। নেতারা তখন স্পষ্ট দু'ভাগে বিভক্ত। সরকারের পক্ষে আর সরকারের বিপক্ষে। অর্থনৈতিক সংকটও কম তীব্র নয়। এই বিভ্রান্তিকর অবস্থা হতে মুক্তির উপায় সেদিন তাদের জানা ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতের নব নব উত্থিত শ্রেণির প্রতিবাদের ভাষাও পরিবর্তন হতে লাগল কিন্তু ইংরেজ সরকার ১৯১৯ সালে লীগ-কংগ্রেসের সকল বাধা সত্ত্বেও তৈরি করলেন মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড পরিকল্পনা বা ভারত শাসন আইন।[১০৭] সরকারের দৃঢ় ব্যঞ্জক মনোভাবের পরিবর্তন ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের (১৯০৯) ভিতর দিয়ে। এই তীব্র দমন নীতির মুখেও বাঙালি হিন্দু-মুসলিম, অবাঙালি মুসলিম হিন্দু তীব্র প্রতিবোধ আন্দোলন গড়ে তুলল। ১৯২০-এর খিলাফত আন্দোলন তারই সূচনা। মুসলিমদের পাল্টা সমর্থন প্রত্যাশা করে সারা ভারতব্যাপী শুরু হল আবার অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), যা ছিল ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম গণঅভ্যুত্থান।[১০৮]

১৯২১ সালে অপরদিকে পূর্ববাংলার চেহারাও পাল্টাতে থাকে। পূর্ববাংলার সংখ্যাগোরিষ্ঠ মুসলিমদের এক বিরাট অর্জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। পূর্ববাংলার মুসলিম বাঙালি (যদিও তখন মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর চেয়ে হিন্দুই বেশি ছিল) মানস-এর জাতি, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির মেরুদন্ডটি যেন মজবুত হওয়ার ভিত খুজে পেল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য

পেশাভিত্তিক শিক্ষার হার বেড়ে গেল, সেই সাথে ঢাকার মর্যাদা। দিনের পর দিন চাকুরীর হার বর্ধিত হতে গিয়ে বেড়ে গেল জীবন যাত্রার মান। মুসলিম বাঙালি সংস্কৃতি লালনের ক্ষেত্র হয়ে উঠল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯২২-৪৭ পুরোটা সময়ই যেন বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি ছিল স্বরাজ্য পাওয়ার আকাঙ্খা। ১৯২৩-১৯২৯ সালের মধ্যেও কোলকাতায় চলল একের পর এক দাঙ্গা। বাঙালি মুসলমানগণ নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজার লড়াইয়ে কখনও থাকতে চাইল হিন্দুদের কাছে আবার কখনও অবাঙালি মুসলমানগণের সাথে মিলে বাংলার আকাশ-বাতাসকে রজ্ঞিত করতে লাগল শুধু ধর্মে এক এইটাতে সকল সমস্যার কেন্দ্র ছিল তখন। কিছু কিছু সমকালীন পত্রিকা তখন প্রকাশও করতে থাকল বাংলার প্রদেশগুলি মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত- মুসলিম ভারত ও কংগ্রেস ভারত। *টাইমস অব ইন্ডিয়া*র একজন প্রাক্তন সম্পাদক লেখেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন প্রতিষ্ঠায় মুসলিমদের সন্দেহ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার ১৯৩৯ সালে ভারত সচিব বেসরকারীভাবে ভারত ভ্রমন করে বলেছিনে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ কেবল ধর্মীয় কারণে নয়; জীবন ধারায় দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীর্ষণ পার্থক্য আছে।[১০৯] বহু ব্রিটিশ পর্যবেক্ষক যেমনঃ ক্রেরার, জমেরি, রাশব্রুক উইলিয়ামস, স্যার লভেট ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারত সরকার সংস্কারকর্মে সদিচ্ছা দেখাতে গিয়ে কংগ্রেসকে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠারই পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছে। কিন্তু তার ফলশ্রুতিতে ভারত বিভাগ অনিবার্য বলেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিতর্কিত প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজাদ পাকিস্তান প্রশ্ন যখন আসল ভারতের বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রগতিবাদী দলটি প্রথমে বুঝতে পারল না যে শুধু ধর্ম দিয়ে নয় সংস্কৃতির অস্তিত্ব বলেও কিছু কথা থাকে, সামাজিক মেলবন্ধন ও শ্রেণিকরণেরও কিছু বিষয় থাকে। কিন্তু ভারতে বাঙালি মুসলমানগণ কোথায় যাবে, কোলকাতার বাঙালি হিন্দুরাও তখন নিজেদেরকে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের ছায়ায় আলাদা করে রাখার নিমিত্তে কট্টর হয়ে পড়েছে। আবার অন্যদিকে মুসলিম লীগের বাঙালি নেতারা কোনঠাসায় অবগাহন করছে। বাঙালি জাতীয়তার প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সাথেও না বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের সাথেও না এমন প্রত্যয়ে ১৯৪০ সালে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেন।[১১০] কিন্তু বাঙালি মুসলিম নেতাদের দ্বন্দ্ব সত্ত্বে মনমানসিকতার কারণে সেই প্রস্তাব বাংলায় না হয়ে পাকিস্তান প্রস্তাবে চলে যায়। ঐতিহাসিক এই প্রস্তাব থেকে সাহস নিয়ে ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লীর এক সংবাদ সম্মেলনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলেন। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়িক সংগঠন বিগত সময়ের হিন্দু-মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ রাজনীতির আলোকে হিন্দু-মহাসভা বাংলাকে বিভক্ত করে কোলকাতাসহ হিন্দু প্রধান অংশ নিয়ে একটি আলাদা প্রদেশ গঠনের আন্দোলনে ব্যস্ত। এমতাবস্থায় শ্রমিক দলীয় নতুন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলির ফেব্রুয়ারি ঘোষণার ফলে সারা ভারতব্যাপী অস্থিরতার আমেজ।[১১১] এদিক দিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কিরণ শংকর রায়, শরৎচন্দ্র বসুর সাপোর্টে বাঙালি মুসলিম আশার আলো দেখার সাথে সাথে সচেতন বাঙালি মুসলিম নেতারাও যেমন আবুল হাশিম, যুবনেতা শেখ মুজিবুর রহমান, এ.কে. ফজলুল হক বাঙলা অখণ্ডভাবে স্বাধীনই থাক।[১১২] কিন্তু দুই ধর্মের বিগত সময়ের অসম বিকাশের ফলে অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র ১৯৪৭ আর সম্ভব হল না। ভারত ভাগ হল সেই সাথে সাথে বাংলাও ভাগ হল। অতএব দেখা যায় বাংলার তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির পটে, অঙ্গনে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির দৃপ্ত পদচারনা ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কখনও জাগরণের বার্তা

মুসলিম মানসকে জাগরিত করত, কখনও আবার সম্প্রদায়ের টানে বাঙালি মুসলিম অবাঙালি মুসলিম একাত্ম হত আবার কখন সংস্কৃতি, ভাষা, সুর-তাল, কাছাকাছি সম্পর্কের জোড়ে বঙ্গমাতার হিন্দু-মুসলিমের সন্তান এক সাথে পদচরণ মেলত। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির গঠনগত পার্থক্য ও অসম চলমান বিকাশ পরবর্তীতে বাংলার সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মীয় ও সংস্কৃতির পটকে বিবর্তিত করতে থাকে। হিন্দু-মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির রাজনীতি দুটি সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে নিয়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে ভারত বিভক্ত হয়। এই বিচ্ছিন্নতাবাদের রাজনীতি সম্পর্কে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন- How rigid adherence to political dogmas intensified communal rift and led to the division of India in 1947. India won freedom but was divided.[১১৩]

ভারত বিভক্তিতে মধ্যবিত্তশ্রেণি যারা সমাজ ও রাজনীতি সচেতন তাদের অনেকেই উল্লাসিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি স্থায়ী কোন সমাধান ছিল না। পরবর্তীতে মুসলিমরা আবার বিভক্ত হয়। বাঙালি বনাম অবাঙালি মুসলিমদের মধ্যে চিন্তার সমন্বয় ঘটেনি। তাই পুনরায় বিভক্তি হয় পাকিস্তানের, সৃষ্টি হয় অনেক সংগ্রামের, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে রচিত স্বাধীন বাংলাদেশের। স্বাধীনতার সাধ নিতে বাঙালি তথা পূর্ববাংলার মুসলিম জনমানসের স্বপ্ন ছিল দূর্বার। ভারত ভাগ ছিল যেমন দুই সম্প্রদায়ের (হিন্দু-মুসলিম) মধ্যবিত্তশ্রেণির কর্মফসল, তেমনি ১৯৪৭ সালের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টিও ছিল বাঙালি-অবাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির আরেক কর্মফসল। এক্ষেত্রে অবাঙালি মুসলমান ছিল আত্মকেন্দ্রিক, অত্যাচারি। আর বাঙালি জাতি ছিল স্বাধীনচেতা মন-মানসের উজ্জ্বল প্রতীক।

সংবাদ-সাময়িক পত্র ও বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির মানস ভাবনার উন্মেষপর্ব

উনবিংশ-বিংশ শতকের সন্ধিপর্ব বাংলার মুসলিমদের জন্য নব জাগরণের যুগ, নবীণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্প্রসারণের যুগ। বাঙালি মুসলিম জাতির নবজাগরণ নিয়ে বিতর্ক আছে; আছে হিন্দু জাতির নবজাগরণ নিয়েও। কেননা যখন বাংলায় অসমভাবে হিন্দু ও মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির উন্মেষ ও বিকাশ হতে শুরু করেছিল (হিন্দুরা আগে, মুসলিমরা পরে) তখন দুই জাতি নিজেদেরকে নিজেদের প্রতিযোগী করে অগ্রসর হচ্ছিল। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' আদর্শে তারা কখনওই সম্মিলিত হয় নি। তাই ইংরেজী শিক্ষা নিয়ে জাগরণ ছিল মূলত হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তার রিভাইভালিজম বা পুনরাভ্যুত্থান। স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ ওয়াকিল আহমদ এই যুক্তিটি ব্যক্ত করেছেন[১১৪] - তবে চলমান ইতিহাস নির্মাতারা বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে বাংলার ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে বাংলার জাগরণ শোভা পেয়েছে তাই আমাদের পথ চলতি ইতিহাসে জাগরণ তথা নবজাগরণ উল্লেখিত হল। সুপ্তোত্থিত মানুষ যখন তার অতীতে গৌরব সন্ধানের অভিযান করে, তার ইতিহাস-ঐতিহ্য নির্মাণ করে, সমকালে প্রতিষ্ঠা অর্জনের সংগ্রাম করে, আর ভবিষ্যতের জন্য অতি কাঙখিত কল্পলোক গড়ে তোলে, তখনই নবজাগরণ সৃষ্টি হয়। বাঙালি মুসলমানগণ সম্পাদিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাময়িকীতে আলোচিত বিষয়াবলি বিশ্লেষণ করলে এই সত্যের তথ্য পাওয়া যায়। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, নারীমুক্তি, চলতি ঘটনা-প্রবাহ ইত্যাদি যাবতীয় প্রসঙ্গ তৎকালীন মুসলিম মানসে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। সাময়িকপত্রসমূহের

প্রচ্ছদ ও আখ্যাপত্রে মুদ্রিত হত নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক পরিচিতি যেমন- ‘ধর্ম বিয়ষক পত্র’, ‘ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক পত্র’ ‘সাহিত্য পত্র’, শিক্ষা বিষয়ক পত্র’, ‘চিকিৎসা বিষয়কপত্র’ ‘ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক পত্র’, ‘স্বাস্থ্য ও গার্হস্থ্য বিষয়ক পত্র’ ‘বিবিধ পত্র’ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ধর্ম বিষয়ক, ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক পত্রিকারই ছিল সংখ্যাধিক্য।[১১৫] অন্যদিকে কেবলমাত্র কবিতা নিয়েও নানা বিষয়িনী কবিতাময়ী সমালোচনা পত্রিকা ‘লহরী’ প্রকাশিত হয়েছে ১৯০০ সালে।[১১৬] ধর্ম বিষয়ক পত্রিকার পরে আসে সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকার কথা। রাজনীতিতে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির চূড়ান্ত উত্থানের সময় ছিল ১৯২০-১৯৪৭ এর দশকে।[১১৭] এভাবে বিচিত্র বিষয়ের সমাহারে পরিপূর্ণ ছিল সেকালের বাঙালি মুসলিম সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি।

এসমস্ত পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা ও সংগঠন এর পিছনে কারা ছিলেন সেটা দেখতে গেলেই মধ্যবিত্তশ্রেণির নাম চলে আসে। এভাবে স্বধর্ম চেতনার পথ ধরে বাঙালি মুসলিম জনমতের উদ্বোধন। স্বভাবতই সাময়িকপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করেন সমাজকর্মী, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। প্রধানত এরা মৌলভী-মাওলানা-মুন্সি শ্রেণির ব্যক্তি। মকতব, মাদ্রাসায় আরবী-ফারসি-উর্দুর পরিমণ্ডলে এদের মানস পরিপুষ্ট।[১১৮] ওদিকে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের সাথে এদের ছিল ঘনিষ্ঠ সংযোগ। এঁরা বাস্তব বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, এবং ভাল করেই জানতেন যে, মাতৃভাষা ব্যতিত জ্ঞানচিত্ত সংগঠনের বিকল্প কোন উত্তম মাধ্যম নেই। এই কারণে বাংলা ভাষায় মুসলমানের সাময়িকপত্র সাধনার উন্মেষ ও প্রসার উক্ত মৌলভী-মাওলানা-মুন্সি আখ্যায়িত ব্যক্তিদের উদ্যোগে। লক্ষ্যণীয় যে, বিংশ শতকের তৃতীয় দশক অবধি সাময়িকপত্র সম্পাদনা-পরিচালনার কর্মকাণ্ডে এঁরাই প্রাধান্য বিস্তার করে রাখেন।[১১৯]

১৯২০-১৯৩০ ছিল মূলত সরকার-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নির্ভর। এ প্রসঙ্গে যে যে পত্রিকার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে সেগুলি হল- ‘নবযুগ’, ‘ছোলতান’, ‘দৈনিক সেবক’, ‘মুসলিম জগত’ ইত্যাদি। অপরদিকে ‘মোসলেম দর্পন’, ‘রওশান হেদায়েত’ ইত্যাদি ছিল সরকারের সমর্থক এবং সক্রিয়ভাবেই স্বরাজ খিলাফত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধী। নজরুল ইসলামের ‘ধূমকেতু’র সমর্থন ছিল চরমপন্থী রাজনীতির প্রতি। ‘লাঙল’, ‘গণবাণী’তে নতুন কথা শোনা গেল - কৃষক শ্রমিকের কথা, সাম্যবাদমূলক রাজনীতি বলশেভিক বা কমিউনিস্ট ভাবধারার কথা। তাছাড়াও ঐ দশাকেই দেখা যায় বিশেষ করে নারী মুক্তি ও নারীর অধিকারের স্বার্থে প্রকাশিত হয়, ‘আন্নেসা’, ‘নারী শক্তি’। শিশু-কিশোর পাঠ্য পত্রিকাও ছিল - ‘আঙ্গুর’, শিশু সওগাত’, ‘মকতব’, ‘জমজম’, ইত্যাদি।[১২০] এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা অগ্রগণ্য। বাংলায় বৃটিশ প্রশাসন সৃষ্ট পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা বিকাশ লাভ করে এবং ব্রিটিশ আমলের শুরুতেই এদেশে সংবাদ সাময়িকপত্র প্রকাশের সূচনা ঘটে। মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহার শুরু হওয়ার ফলে উনিশ শতকের প্রথমভাগেই কোলকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সংবাদ সাময়িকপত্রগুলির উদ্যোক্তারা অধিকাংশক্ষেত্রেই ছিলেন মধ্যবিত্তশ্রেণির অন্তর্গত।[১২১]

১৭৮০ সালে জেমস হিকির সম্পাদনায় প্রথম সংবাদপত্র ‘বেঙ্গল গেজেট’ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে ১ম বাংলা সাময়িকপত্র ‘দিগদর্শন’ প্রকাশিত হয়, শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিষ্ট মিশন থেকে। পরবর্তী এক মাসের

মধ্যে প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পন' এর ফার্সী সংস্করণও প্রকাশ করেছিল।[১২২] এরপর একই বছরে একাশিত হয় 'বাঙ্গাল গেজেটি'। এই সাময়িকপত্রটি ছিল বাঙালি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম সাময়িকপত্র।[১২৩] উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শুরু করে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত হিন্দু সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পাদনায় মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।১৮৩১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর', প্রকাশ বাংলা ভাষা ও বাঙালির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রিকাটির মাধ্যমে বাংলাগদ্য রীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল এবং আবির্ভাব হয়েছিল অনেক নুতন লেখকের।[১২৪] একই বছরে প্রকাশিত হয় (১৮৩১) শেখ আলীমুল্লাহ সম্পাদিত 'সমাচার সভারজেন্দ্র' নামে ফারসি-বাংলা দ্বিতীয় সাপ্তাহিক। রজব আলীর সম্পাদনায় 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল একটি পঞ্চভাষী পত্রিকা। বাংলা, উর্দু, ফার্সী, ইংরেজী, সাপ্তাহিক হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়েছিল।[১২৫] পরবর্তীতে কলিকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চল তেকে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক সাময়িকপত্র। বাংলা সংবাদ, সাময়িকপত্রের পাশাপাশি ইংরেজী ভাষাতেও অনেক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। তবে ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকার প্রাধান্য ছিল বেশি। প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল মনোরঞ্জন ও মুনাফা অর্জন এবং দ্বিতীয়াটির উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সংস্কার ও জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি করা।[১২৬] ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ সাময়িক পত্রের সংখ্যা ছিল ৯০৫টি। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ২৪০টি।[১২৭] ১৮৭৮ থেকে ১৮৮৮ সালের এক দশকে বাংলায় স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা এবং প্রচারের সংখ্যা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কোলকাতা কেন্দ্রিক পত্র-পত্রিকা বেশি হলেও অন্যান্য মফস্বল শহরগুলি থেকেও সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হওয়া শুরু করে। এগুলির মধ্যে যশোর থেকে প্রকাশিত 'অমৃত বাজার' পত্রিকা এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ঢাকা প্রকাশ' উল্লেখযোগ্য। 'ঢাকা প্রকাশ' প্রায় একশত বছর প্রকাশিত হয়েছিল এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা' অদ্যাবধি কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রসারে পত্রিকাটি বিশেষ অবদান রাখে।[১২৮] ১৮৭৮-৮৮ দশকে বাংলায় স্থানীয় ভাষায় সংবাদপত্র এবং এগুলোর প্রচার সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল।[১২৯]

বছর	পত্রিকার সংখ্যা	যে কয়টি পত্রিকার প্রচার সংখ্যা দেখানো হয়েছে	মোট প্রচার সংখ্যা
১৮৭৮	৩৯	২৩	২৩,৮৯৩
১৮৭৯	৪৪	২২	১৭,৮২৬
১৮৮০	৪০	৩৫	২২,১৮৭
১৮৮১	৩৭	২৯	১৯,১১০

১৮৮২	৪৮	২৭	১৯,০৭৯
১৮৮৩	৫৫	২৮	১৮,৮৮৯
১৮৮৪	৬৪	৩৬	২৫,৬৮০
১৮৮৫	৫২	৪১	৩৮,৮৯৪
১৮৮৬	৬৩	৪৫	৭২,৮২৩
১৮৮৭	৬২	৪৩	৬৪,১০২
১৮৮৮	৬২	৩৭	৭৭,১৯০

উক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, একশত বছর পূর্বে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ সাময়িকপত্রের প্রকাশক ও গ্রাহক সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য ছিল। বলাবাহুল্য যে, এই প্রকাশক ও গ্রাহক প্রায় অধিকাংশই হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি। তাহলে দেখা যাচ্ছে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির অস্তিত্ব এখানে কোথায় কিংবা কেমন। ১৯২০-এর দশকের পূর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নবজাত মধ্যবিত্তশ্রেণির কাংক্ষিত ভূমিকা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় তেমনটিও নয়। বস্তুত প্রাক ১৯২০ সালে 'নবনূর' সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী কিংবা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' সম্পাদক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর ন্যায় দু'চারজন ব্যতিত কৃচিৎ তেমন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে বলা যায় কোন পত্রিকারই আর্থিক নির্ভরতা সুদৃঢ় ও সন্তোষজনক ছিল না। উদ্যোক্তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন মধ্যবিত্ত অথবা নিম্নমধ্যবিত্ত। নিজেদের সামান্য সংগতি সাধারণের নিকট হতে দান সংগ্রহ আর পত্রিকার বিক্রয়মূল্যের উপর নির্ভর করে তাঁরা দুঃসাধ্য প্রয়াসে ব্রতী হন।[১৩০]

বিশেষ আদর্শের প্রচারই ছিল তাঁদের একমাত্র মূলধন। সাময়িকপত্র প্রকাশনারও যে ব্যবসায়িক দিক অপরিহার্য সেজন্য রীতিমত পুঁজি বিনিয়োগ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে এই বাস্তব বিষয় সম্পর্কে তৎসময়ের মুসলমানরা সচেতন ছিলেন না। ফলে প্রায় সকল পত্রিকার আয়ুই ছিল স্বল্প সীমিত। দীর্ঘকাল স্বায়িত্বের দিক হতে সম্ভবত 'মোহাম্মদী' আর 'সওগাত' ব্যতিত অন্য কোন পত্রিকা অনুরূপ সাফল্য অর্জন করে নি।[১৩১] অবিভক্ত বাংলায় সকল কর্মোদ্যোগের কেন্দ্র ছিল কোলকাতা।[১৩২] কাজেই তৎকালীন অধিকাংশ পত্রিকা প্রকাশিত হয় কোলকাতা থেকে। তবে বাইরের বিভিন্ন জেলা শহর, মহকুমা শহর, এমন কি গ্রামাঞ্চল (যেমন ফরিদপুরের পাংশা, কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া, রংপুরের বাকিনা , টাঙ্গাইলের করটিয়া, দেলদুয়ার, মানিকগঞ্জের পারিল) থেকেও প্রকাশনার সংখ্যা কম নয়। তাই এটা বলাবাহুল্য যে, বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির সাময়িকপত্র সাধনার প্রয়াস একদিকে উড়িষ্যার কটক, অন্যদিকে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল। এক বিজ্ঞপ্তি তে জানা যায় যে, কোহিনুর পত্রিকার প্রচার সুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এতদসত্ত্বেও

পতিকাসমূহের প্রচার আশানুরূপ ছিল না। উদ্যম আয়োজনের আন্তরিকতার কোন অভাবই ছিল না বরং অভাব ছিল ব্যবস্থাপনার। তাছাড়া আরেকটি ব্যাপারও হবে যে তৎকালে সংগঠিত, অভ্যস্থ পাঠক সম্প্রদায়ও তেমন গড়ে উঠেনি। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম পত্রিকা হিসাবে ইসলাম প্রচারক 'আল-এখলাস', 'ছোলতান', 'ধূমকেতু' ইত্যাদি মুষ্টিমেয় কয়েকটি পত্রিকার দাপট ছিল।[১৩৩] ইসলাম প্রচারক 'আল এখলাস' ন্যায় পত্রিকার জনপ্রিয়তা এবং প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রধানত ধর্মপ্রচারক বক্তা ও তাদের কর্মীদের কল্যাণে। বঙ্গ-আসামের গ্রামে গ্রামান্তরের গিয়ে গিয়ে এঁরা ওয়াজ করতেন, সেই সাথে ধর্ম বিষয়ক পত্র-পত্রিকার প্রচার করতেন। এসকল পত্রিকার প্রচার করতেন। এসকল পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধিতে মুন্সি মেহেরুল্লাহ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মাওলানা মনিরুজ্জামান এছলামবাদী, মাওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং তাদের সহকর্মী অনুসারীবৃন্দ। ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকরের আশীর্বাদ ও সমর্থন পুষ্ট পত্রিকার তাঁর ভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে। অপরপক্ষে 'ছোলতান' ছিল খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের মুখপত্র। অতএব আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা সহজেই পতিক্রার প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। 'ধূমকেতু', সকল আপোষে-রাজনীতির প্রস্তাব বর্জন করে 'পূর্ণ স্বাধীনতার' ডাক দেয়। তখনকার মানুষের প্রাণের ভাষা'ই যেন ছিল 'ধূমকেত' পত্রিকা।[১৩৪] প্রায় রাতারাতি 'ধূমকেত', যে বিষ্ময়কর জনপ্রিয়তা অর্জন করে সাময়িকপত্রের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। কিন্তু 'ছোলতান', 'ধূমকেতু' উভয় পত্রিকাই ছিল স্বল্পকল স্থায়ী। রাজনীতির উত্তেজনায় ভাটির টান যখন লেগেছে, তার সাথে যে রাজনীতি মুখপত্রের আয়ু নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে।

সব সাধনাই জয় হয়ে যায় যদি কিনা তার বিকাশ না হয়। এভাবে বলা যায় জন্মের পর বিকাশ এর উপরই জন্মের স্বার্থকতা নির্ভরশীল। বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি উদ্ভব হল ইংরেজী শিক্ষার ছোঁয়ায়; তবে বিকাশটি কিন্তু এই শ্রেণি ঘটিয়েছে নিজস্ব বিচক্ষণতা ও বুদ্ধি খাঁটিয়ে। কিন্তু সময়ে সময়ে বিশেষ সহযোগীতা রাজশক্তির হাত থেকে নিতে হয়েছে, এ কথা স্বীকৃত তথাপি কৃতিত্ব এই মধ্যবিত্তশ্রেণির আপন ক্ষমতার নামান্তর তা যুক্তিযুক্ত। স্বধর্মচেতনা বাঙালি মুসলমানের একটি চিরজীব মহিমা। প্রত্যক্ষ এবং প্রধানত স্বধর্মচেতনা উদ্বোধনের স্বাথেই বাঙালি মুসলিমদের সাময়িকপত্র সাধনার বিকাশ।[১৩৫]

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে প্রতিবেশি সমাজে সাংবাদিকতার যে সূত্রপাত হয় তার প্রত্যক্ষকরণ ছিল হিন্দু-ব্রাহ্ম-খ্রিস্টান ধর্মকলহ। শতাব্দীর শেষ বিশ বছরে মুসলিম সাংবাদিকতারও উদ্ভব ও বিকাশ ঘটল ধর্মবিরোধ এরই কারণে এ সময়ে বিশেষ করে পশ্চিম ও মধ্য বাংলার কয়েকটি জেলায় মুসলিম জনসাধাণের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম প্রসার লাভ করে। সমগ্রভাবে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে হিন্দু সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রভাব ও মুসলিমদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। খ্রিস্টান এবং হিন্দু প্রভাব থেকে মুসলিমদের রক্ষা করবার জন্য ইসলামের মহিমা কীর্তন, ইসলামের অতীত ইতিহাসের গৌরব প্রচার করবার প্রয়োজন দেখা দিল। স্বাভাবিকভাবেই এ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সমাজের ধর্মীয় নেতারা।[১৩৬]

দেশের বিভিন্ন স্থানে সভানুষ্ঠান করে, সমিতি গঠন করে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ক্রমে তাঁরা এক ব্যাপক ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলন উত্থিত হয় বাংলার সমাজ জীবন থেকে। বাংলার মুসলিমদের জন্য এই আন্দোলন

ছিল ধর্ম আর সমাজগত দিক হতে আত্মচেতনা লাভের আন্দোলন। ইতোমধ্যে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ, '৮০ দশকে জামাল উদ্দিন আফগানীর কোলকাতা সফর , ১৮৯৭ খ্রি; গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধ বাংলার তথা ভারতের বিকাশোন্মুখ মুসলিম মানসে এক জাগরিত পরিবর্তনের সূচনা করে। মুসলিম বিশ্বের ঘটনাবলী বাংলার মুসলমানগণকে তার আত্মচেতনা অর্জনের পথে, তার জনমত সংগঠনের ক্ষেত্রে মানস ভাবনার স্বাধীন প্রকাশের ক্ষেত্রে, মুক্ত বুদ্ধি প্রয়োগ ও সাধনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে তুলছে।

আপন ধর্মের প্রতি চেতনা থেকেই মূলত উদ্ভব হয় ধর্মান্দোলন আর ধর্মান্দোলনের নিমিত্তেই গড়ে উঠে বিশ্ব ইসলমাবাদ (অবশ্য মুসলমানদের ক্ষেত্রে)। বাঙালি মুসলিমদের সাময়িকপত্র সাধনার মূলে সক্রিয় ছিল তার নবলব্ধ 'মুসলমানত্বের' প্রেরণা। ১৮৭৭-এর 'মহাম্মদি আখবার' থেকে আরম্ভ করে ১৯৩০ অবধি প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার নামকরণ ও সম্পাদকীয়র উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করলে আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। অধিকাংশ সাময়িকপত্রেরই নাম মুখ্যত 'ইসলাম' আর 'মুসলিম' এই দুই বিশেষ শব্দ ব্যঞ্জিত।[১৩৭] নামকরণে এতদসহ আরো ব্যবহৃত হয়েছে 'হাদিস', 'শরিয়ত', 'মসজেদ', 'তবলীগ', 'মোয়াজ্জিন', 'ইমান', 'হেদায়েত' ইত্যাদি ধর্মীয় দ্যোতনাবাচক শব্দাবলী।

সেকুলার ভাবদর্শে লেখনি ধারন করেনি সে যুগের মুসলমানগণ কর্তৃক পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলিও। পত্র-পত্রিকা যৌথকর্ম সাধনের ও মুক্তচিন্তা প্রকাশের একটি উত্তম মাধ্যম। মুসলিম সম্প্রদায়ের ১ম শ্রেণির লেখগণই সাময়িকীগুলি চালাতেন; কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত সাময়িকীগুলিতে সাহিত্যকর্ম ও সাংবাদিকতাকর্ম একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে তা দৃষ্টত। উদাহরণস্বরূপ 'আখবারে এসলামীয়া' (১৮৮৪), 'ইসলাম প্রচারক')১৮৯১) প্রভৃতি পত্রিকার সাথে মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, শেখ আব্দুর রহিম প্রমূখ সম্পাদক জড়িত ছিলেন।[১৩৮] তাঁরা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের যে আন্দোলন করেন, তার মূলবৃত্ত ছিল 'ইসলামীকরণ'। কেউ কেউ আবার প্যান-ইসলামী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁরা মুসলিম ধর্মশাস্ত্র ও ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে জাতীয় প্রেরণার উৎস খুঁজে পেলেন। বাংলার ও বাঙালির ইতিহাস প্রায় উপেক্ষিত হল: সমকালের বাস্তব সমস্যাগুলিকেও যুক্তিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও সহনশীল মনোভাব নিয়ে তাঁরা বিচার-বিশ্লেষণ করেননি। ফলে প্রতি বেশি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি অসহিষ্ণুতার মনোভাব প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে; তখনকার হিন্দু নেতা ও পত্র-পত্রিকাগুলির কাছ থেকেও যথেষ্ঠ পরিমাণে উদারতার ও মিলনের লেখা পাওয়া যায় নি।

যেখানে উদারতাবিহীন দর্শন মতবাদ নিয়ে স্বকীয় শ্রেণির উদ্ভব সেখানে যে মধ্যবিত্তশ্রেণির সূচনা তা মূলত রক্ষণশীল পর্যায়ে পড়ে। ১৮৮০এর দশক থেকে ১৯০৩ সালে মধ্যে অন্তত ৩৩টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মুসলিম সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িক পত্রসমূহের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:[১৩৯]

প্রকাশের বছর	পত্রিকার নাম	শ্রেণি	সম্পাদক	প্রকাশের স্থান
১৮৭৩	বালারঞ্জিকা	সাপ্তাহিক	সৈয়দ আবদুল রহিম	বরিশাল
১৮৭৪	আজিজননাহার	মাসিক	এীর মশারফ হোসেন	চুচুঁড়া
১৮৭৪	পারিল বার্ত্তাবহ	পাক্ষিক	আনিস উদ্দীন আহমদ	ঢাকা
১৮৭৭	মোহম্মদী আখবার	অর্ধ-সাপ্তাকি	কাজী আব্দুল খালেক	কলিকাতা
১৮৮৪	আখবারে এসলামিয়া	মাসিক	মোহাম্মদ নইমুদ্দীন	করটিয়া
১৮৮৪	মুসলমান	সাপ্তাহিক	মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	কলিকাতা
১৮৮৪	মুসলমান বন্ধু	সাপ্তাহিক	মো: রেয়াজুদ্দীন আহমদ	কলিকাতা
১৮৮৫	ইসলাম	মাসিক	একিনউদ্দিন আহমদ	কলিকাতা
১৮৮৬	নব সুধাকর	সাপ্তাহিক	মো: রেয়াজুদ্দীন আহমদ	কলিকাতা
১৮৮৭	হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনী	মাসিক	গোলাম কাদের	কলিকাতা
১৮৮৯	সুধাকর	সাপ্তাহিক	শেখ আবদুর রহিম	কলিকাতা
১৮৯০	হিতকরী	পাক্ষিক	মোহাম্মদ আবেদীন	কলিকাতা
১৮৯১	ভিষক দর্পন	মাসিক	এম. জহিরুদ্দীন আহমদ	কলিকাতা
১৮৯১	ইসলাম প্রচারক	মাসিক	মো: রেয়াজুদ্দীন আহমদ	কলিকাতা
১৮৯২	মিহির	মাসিক	শেখ আবদুর রহিম	কলিকাতা
১৮৯২	টাঙ্গাইল হিতকরী	সাপ্তাহিক	মোসলেমউদ্দিন খাঁ	টাঙ্গাইল
১৮৯৫	মিহির সুধাকর	সাপ্তাহিক	শেখ আবদুর রহিম	কলিকাতা
১৮৯৮	কোহিনূর	মাসিক	মুহম্মদ রওশন আলী	পাংশা
১৮৯৯	প্রচারক	মাসিক	মধু মিঞা	কলিকাতা
১৯০০	লহরী	মাসিক	মোজাম্মেল হক	শান্তিপুর
১৯০০	ইসলাম	মাসিক	মধু মিঞা	-

১৯০০	নূর অল ইমান	মাসিক	মির্জা মুহাম্মদ ইউসুফ আলী	রাজশাহী
১৯০১	মোসলমান পত্রিকা	মাসিক	মাহতাব উদ্দিন আহমদ	যশোহর
১৯০১	সোলতান	মাসিক	এম. নাজিরুদ্দীন আহমদ	কুমারখালী
১৯০১	নূরুল ইসলাম	বার্ষিক	মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ	যশোহর
১৯০১	বালক	সাপ্তাহিক	এ.কে. ফজলুল হক ও নিবারণ চন্দ্র	বরিশাল
১৯০৩	নবনূর	মাসিক	সৈয়দ এমদাদ আলী	কলিকাতা
১৯০৩	মোহম্মদী	মাসিক	মোহাম্মদ আকরাম খাঁ	কলিকাতা
১৯০৩	সুহৃদ	মাসিক	নূরুল ইসলাম কায়েমপুরী	ময়মনসিংহ

যদিও উনিশ শতকের শেষের দিকে প্রকাশিত সংবাদ সাময়িকপত্রগুলির অধিকাংশই ছিল স্বল্পায়ুসম্পন্ন। তথাপি এগুলির মধ্যদিয়েই নবশিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি তাদের চিন্তা-ভাবনার স্বরূপ প্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করেছে। বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা এবং সম্পাদনা দেখে সেটা মনে হয় তার প্রেক্ষিতে একথাটি এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রথম দিকে পত্র-পত্রিকাগুলি বেশিরভাগ চালাতেন প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যবিত্তশ্রেণির মুসলমানগণ, মাঝখানে ছিল রক্ষণশীলদের একচ্ছত্র দাপটে আবার পরে চলে প্রগতিশীল মধ্যবিত্তশ্রেণি এবং তার সাথে তারই পথ ধরে রক্ষণশীল মধ্যবিত্তশ্রেণির মিশ্র প্রচেষ্টায়।

মাতৃভাষা-চেতনা, বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি

“বিদেশী ভাষায় কাঁদিবার জন্য

কে আমাকে উপদেশ দেয়?”[১৪০]

এই প্রশ্নটির মধ্যেই যেন লুকিয়ে রয়েছে মাতৃভাষার চেতনা। হাসি-কান্নার সুর এক মোহনায় মিলিত হবে যেখানে সেইখানেই খুঁজে পাওয়া যায় মাতৃভাষার স্বাদ। মাতৃভাষার স্বাদ কি সবাই উপলব্ধি করতে পারে? মনে হয় না। এটাই সত্য, এটাই চিরন্তন। তবে সব সত্য ও চিরন্তন ব্যাপারটি সর্বসময় সর্বজনগ্রাহ্য হয় না আর তখনই লড়াই করতে হয় মায়ের ভাষার জন্য। বাঙালি মুসলিম মানে তুমি বাংলার মাটিতে জন্ম নেওয়া, বিকশিত হওয়া মুসলিম। যে মুসলিমের সংস্কৃতির একটি নিজস্ব অবয়ব রয়েছে, সে বিশ্বশ্রেণির মুসলিমদের সংস্কৃতি ধারন করতে পারে না। ধর্মকে বিশ্বাস করে ইসলামী শরীয়তে জীবনযাপনে ব্রত হয়ে ও সে স্বতন্ত্র বাংলার সংস্কৃতি পালন করবে। গামছা, লুঙ্গি, ফতোয়া, তাঁতের কাপড়, ভাটিয়ালী, মারফাতী গীত, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, পহেলা বৈশাখ, হেমন্ত উৎসব, শীতকালীন পিঠা, বর্ষায় নৌকায় মেঝবান

প্রভৃতি আমাদের বাংলার সংস্কৃতি বলে সর্বজনবিদীত। ১৭৫৭ সালে পলাশীল যুদ্ধের পরে বাংলা যখন ইংরেজদের অধীনে চলে যায় তখনও তার সাথে সাথেই বাঙালার মানুষ আধুনিক হয়ে যায় নি; আধুনিকতার সূচনা বাংলায় হয়েছে উনিশ শতকের ১ম প্রহর থেকেই চূড়ান্তভাবে তবে তা হিন্দুদের হাত ধরে। মুসলমানগণ তখন আধুনিক সভ্যতার মানুষ জন থেকে মুখ ফিরিয়ে অনেক দূরে। বাঙলার মুসলমানগণও বাঙালি, হিন্দুরাও বাঙালি তাহলে বিভেদ কোথায় ? - ধর্মের বিভেদ। তাইত বাঙালি হয়েও ধর্মের খাতিরে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আন্দোলনে[১৪১] অবাঙালি মুসলিমদের সাথে বাঙালি মুসলিমদের একসাথে আজাদ পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন করতে। তবে অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র যারা চেয়েছেন যেমন: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, এ. কে ফজলুল হক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।[১৪২] ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি গঠিত হয়েছে, বিকশিত হয়েছে নবযুগের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে নিজেদেরকে পরিপূর্ণ করেছে তবে নিজের সংস্কৃতি, ভাষা চেতনাকে কখনও কালিমা দিয়ে নয়। হ্যাঁ এটা সত্য যে, রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি আরবী ও উর্দুভাষাকে বাংলার চেয়েও বেশি জ্ঞান করেছেন তথাপি বাঙলা ভাষার চেতনাকে বাঙালির অন্তর থেকে কেউ মুছে ফেলতে পারেনি। ভাষা নিয়ে তথা বাঙালির বাংলাভাষা নিয়ে বিতর্ক আলোচনার মুখ্য বিষয় নয়; আলোচনার মুখ্য বিষয় বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি তাদেও বিকাশ পূর্বে বাংলা ভাষাকে কতখানি গুরুত্ব দিয়েছে। আপন সংস্কৃতিকে কতটুকু লালন করে এগিয়ে চলেছেন আধুনিক সভ্যতার দিকে। বাংলার বাঙালির শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রের সরকার ও সরকারী ক্ষমতার প্রভাব সর্বগামী ও সর্বগ্রাসী। শতকের পর শতক ধরে বাংলা শাসন করেছে অবাঙালি শাসকগোষ্ঠী, যাদের রাজনৈতিক আধিপত্যের সাথে অবিচ্ছেদ্য ছিল সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ ও আধিপত্যবাদ। ব্রাক্ষণ্য সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, ইসলামি সংস্কৃতি এবং সর্বশেষে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বাঙালি সমাজকে পর্যায়ক্রমে প্রভাবিত করেছে এবং সেটা সম্ভব হয়েছে প্রধানত রাজনৈতিক আধিপত্যের কারণেই। বাঙালি জাতির ধর্ম, বর্ণ, সংস্কার, অভ্যাস, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, আইনকানুন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদেশী শাসকশ্রেণির ছাপ সুস্পষ্ট এবং সেটা রাজনৈতিক আধিপত্যেরই প্রত্যক্ষ ফল। সুদূর অতীতে বাংলাকে যখন মুসলমানরা শাসন করতে আসে তখন তাদেরকে পরাভূত করতে হয়েছে এ অঞ্চলের স্থানীয় রাজা, মহারাজা, ভূ-স্বামীদেরকে। বৃহত্তর বঙ্গশাহী প্রতিষ্ঠিত হয় সুলতানী আমলে শাহী সুলতানদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায়।[১৪৩] শাহী সুলতানদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় বিকাশলাভ করে বঙ্গভাষা, বঙ্গীয় সমাজ ও সংস্কৃতি। বাংলা ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতি আরো সুসংহত হয় পাঠান ও মুঘল শাসনামলে, যখন বাঙলাকে প্রতিবেশী আসাম, ত্রিপুরা, আরাকান, উড়িষ্যা ও পশ্চিম- উত্তরাঞ্চলীয় আগ্রাসন থেকে সযত্নে রক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয় নিজস্ব সত্তা ও পরিচয়।[১৪৪]

তখনই উৎপত্তি লাভ করে বঙ্গসমাজ সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ প্রথা প্রতিষ্ঠানসমূহ। মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বাত্মক সহযোগীতার উপর ভিত্তি করে আঠারো শতকের শেষ অব্দি, এমন কি উনিশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত বঙ্গ সংস্কৃতি ছিল হিন্দু-মুসলিমের অভিন্ন উত্তরাধিকার। অভিন্ন সংস্কৃতির মানুষজন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে যখন মধ্যবিত্তশ্রেণির গন্ডিতে প্রবেশ করল তথনই বঙ্গ সংস্কৃতি এক গোত্রের এগিয়ে যাওয়া ও আরেক গোত্রের

পশ্চাৎপদ ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হওয়া শুরু করল। ভিন্ন ধারা তৈরি করল হিন্দু ও মুসলিম ভিন্ন জাতীয়তাবাদের।[১৪৫] পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ এবং এর ফলশ্রুতিতে দেশ বিভাগ বাঙালি সংস্কৃতির এ অভিন্ন উত্তরাধিকারকে সাময়িকভাবে স্তব্ধ করতে সক্ষম হলেও অচিরেই পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের পুর্নমূল্যায়ন শুরু হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালি ও অবাঙালি মুসলিমদের মধ্যে দূর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার সচেতন ছিল এবং যে ব্যবধানকে অতিক্রম করার লক্ষেই প্রণীত হয়েছিল বিশেষ ভাষা ও শিক্ষানীতি; প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন। কিন্তু বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির সচেতন সমাজের বলিষ্ঠ লেখনি, নেতৃত্বে মুক্তবুদ্ধির দৃষ্টিদাহনে গঠিত সর্বশ্রেণির বাঙালির প্রতিবাদের জোয়ারে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ গণভিত্তিক ইস্যু তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। বরং উপরন্তু পাকিস্তান অর্জনে শ্রেষ্ঠ অবদান রেখেছেন এমন বড় নেতা পর্যন্ত পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদে আস্থা হারিয়ে ধিক্কার দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদে পত্যাবর্তন করেন। আর এই পত্যাবর্তন এর যাত্রা শুরু বাংলাভাষার প্রতি মমতা ও সচেতনতা থেকে। বাঙালি তথা পূর্ব বাংলার মানুষ ভাষাকে অবলম্বন করেই যেন সভ্যতা ও সংস্কৃতির শেকড় সন্ধানের এক নতুন যাত্রা শুরু করে। এবার আসা যাক বাঙালির মাতৃভাষা বাঙলা এবং বাঙালি মুসলিম সেই ভাষা সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ, চেতনার অবয়ব প্রকাশ তদুপরী ভাষাকে শেকড় ধরে আস্তে আস্তে করে পূর্ণাঙ্গ একটি বৃক্ষের ন্যায় একটি বাঙালি জাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর্বটি কেমন ছিল। বাঙালি মুসলিমদের ভাষা-ভাবনা তার আত্ম পরিচয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান সহায়ক। বাঙালি মুসলিমদের মাতৃভাষা প্রশ্নে মাওলানা আকরম খাঁ একটি উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন - "বঙ্গে মোসলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষাই তাহাদের লেখ্য ও কথ্য মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে"।[১৪৬] ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ হওয়ার পর ১৯১১ সালে তা আবার রহিত হলেও বৃটিশ কর্তৃক 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতি ধারাবাহিকভাবে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। জনমানসে এর প্রতিক্রিয়াও লক্ষিত। বৃহত্তর বাংলার কোলকাতা কেন্দ্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিম বাংলায় হিন্দু জনগণ এবং ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ব বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ প্রত্যেকে নিজেদেরকে আলাদাই ভাবতে থাকে। তখন বৃহত্তর বাংলা ভূ-খণ্ডে বসবাস করে বাংলায় কথা বলা মানে বাঙালি কিন্তু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের বাঙালিরা হল বাঙালি হিন্দু আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলভিত্তিক বাঙালিরা হল বাঙালি মুসলিম। তাই এই আলোচনা পর্বে মাতৃভাষা চেতনার স্থানটিতে যেহেতু বাঙালি মুসলিম কথাটি এসেছে সেজন্য আলোচনার সীমাবদ্ধতা ঢাকাকেন্দ্রিক বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়, পেশাধারী মধ্যবিত্তশ্রেণি। যে মধ্যবিত্তশ্রেণি মাতৃভাষা সচেতন, রাজনীতি সচেতন, সংস্কৃতি সচেতন, শিক্ষা সচেতন অর্থাৎ জীবন-জীবিকা সচেতন এক জাগরণের প্রতিভূ।[১৪৭]

পাঠান রাজত্বে রাষ্ট্রভাষা ছিল পশতু, আর মোগল আমলে ফারসি। মোগল পাঠানেরা বিদেশী হলেও এদেশকেই জন্মভূমি রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং দেশের অবস্থা জানবার জন্য দেশীয়ভাষাকে যথেষ্ঠ উৎসাহ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে বাংলায় পাঠান রাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ন ও মহাভারত সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। তাছাড়া ভাগবত এবং পুরানাদিত্ত রচিত হয়। এরপর এল ইংরেজ রাজত্ব। কিছুদিন পরে ইংরেজী হল রাষ্ট্রভাষা।[১৪৮] হিন্দুরা সানন্দে নতুন প্রভু ও তার ভাষাকে বরণ করে নিল, কিন্তু মুসলমানেরা নানা কারণে তা' পারল না। রামমোহনের যুগেও তাঁর উক্তি থেকেই আমরা জানতে পারি,

হিন্দু ও মুসলিম ভদ্রলোকের মধ্যে তুলনায় মুসলিম ভদ্রতার বিচারবুদ্ধিতে এবং কার্যপরিচালনায় শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উপরোক্তকারণ এবং ভেদ নীতির ফলে আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক সমুদয় ব্যাপারে মুসলমানগণ নিচে পড়ে গেল এবং হিন্দু-মুসলমানগণ উভয়ের মনে পরস্পরের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ও হিংসার সৃষ্টি হল। বাংলা ভাষাও দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ল। উচ্চশিক্ষিত পন্ডিতেরা একে সংস্কৃতের আওতায় নিয়ে কেবল হিন্দু সভ্যতার বাহন করে তুলল। আর মুসলিম অর্ধ শিক্ষিত মুন্সীরা আরবী-ফার্সী বহুল এক প্রকার ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি করল। দুই দিকেই বাড়াবাড়ি হল। কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার জোরে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাংলা টিকে গেল, মুন্সীয়ানা বাংলা লুপ্ত হল। অবশ্য বর্তমান জ্ঞান প্রাধান্যের যুগে ক্রমে ক্রমে পাণ্ডিত্যের দাবীদার বাংলাও সরল হয়েছে। একসময় ইংরেজ প্রভূত্বের অবসান হল বাংলায়। ১৮৩০-৪০ সালে ওহাবী আন্দোলনের ব্যর্থতা, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের শোচনীয় পরিণাম।[১৪৯] সব গ্লানি স্বার্থক হবে ১৯৪৭ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র নিয়ে আজাদ পাকিস্তান সৃষ্টির নেশায়ও মুসলিম সামজের বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানগণের উর্দুভাষী মুসলিমদের সাথে একত্মায় চলা সংকটের জন্ম দিচ্ছিল। ১৯৪৭-এ দেশভাগ ভাষার ভিত্তিতে নয় বরং ধর্মের ভিত্তিতে রচিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দ সামনে অগ্রসার হওয়ার অভিপ্রায় খুঁজে নেয়। দূদর্শাগ্রস্থ পূর্ব পাকিস্তান তখন স্বপ্ন দেখল সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসী যদি চেষ্টা করে তাহলে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে দারিদ্র্য, স্বাথ্যহীনতা, অশিক্ষা এবং অন্তদ্বন্দ্ব দূর হয়ে পূর্ব পাকিস্তান তার সৃষ্টি নেশায় মেতে উঠবে। কিন্তু হল কি তাই? না; বরং প্রথম প্রহরের ভাষার প্রতি আঘাত পূর্ব বাংলার মুসলিম জাতিকে স্তম্ভিত ও আতংকিত করে তোলে। আস্তে আস্তে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলিমদের মোহ কেটে যেতে লাগল। তাদের মনে পড়তে লাগল বিগত সেই মাতৃভাষার প্রতি উর্দু ভাষার মানুষদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। মধ্যবিত্তশ্রেণি এখন অনেকটাই প্রতিবাদী। প্রশ্ন উঠল বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণিভূক্ত নেতাদের মধ্যে "ওরা কারা? পূর্ব বাংলার উত্থিত মধ্যবিত্ত মুসলিমরা"দেশের অগ্রগণ্য থেকে ভাষার ব্যাপারে প্রতিটি বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। যেমন: ১৯০৬ সালের ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেই প্রতিষ্ঠালগ্ন অধিবেশনে ভাষা নিয়ে প্রশ্ন উঠে; এ ছিল উর্দু বনাম বাংলা নিয়ে প্রথম ভাষা বিতর্ক অথচ হিন্দু ভাষাভাষী মধ্যবিত্তশ্রেণি কখনও পশ্চিম বাংলার বাংলাভাষী জনগণকে কখনও বাংলাভাষা নিয়ে প্রশ্নের কাঠগড়ায় ফেলেননি। পশ্চিম পাকিস্তানের এ কেমন দোষ যে বাংলাভাষী মুসলিমকে বাংলায় কথা বলতে দিবেন না।[১৫০]

১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে দলের দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে প্রবর্তনের একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাঙালি প্রতিনিধিদের বিরোধিতার কারণে সে দিনকার সে উদ্যোগ সফল হয় নি।[১৫১] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বাহ্নে ভাষা বিতর্ক আরও স্পষ্ট রূপ নেয়। ১৯৪৭ সালের মে মাসে হায়দারবাদে অনুষ্ঠিত এক উর্দু সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের নেতা চৌধুরী খলিকুজ্জামান ঘোষণা করেন যে, 'উর্দু হবে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা'। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুর পক্ষেই এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। এ সময় ভাষাতত্ত্বিক ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ 'আমাদের ভাষা সমস্যা' শিরোনামে এক প্রবন্ধে ড. জিয়াউদ্দিনের বক্তব্য খন্ডন করে বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেন।[১৫২]

ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম ও তাঁর অনুসারীরা এ সম্পর্কে বাঙালিদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন।[১৫৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে গেলেও উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক পর্যন্ত ফার্সীকে এখনকার সরকারি রাজকর্মের ভাষারূপে বহাল রাখা হয়। এই ফার্সীও কিন্তু বাংলার জাত ভাষা নয়। মুঘলরা যখন ক্ষমতাশীল ছিলেন তখন গাম্ভীর্য সহকারে তাকে রাজভাষা করেছিলেন। তবে মুঘলরা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষকে কখনও চাপ তৈরি করে তাদের ঘাড়ে বাধ্যতামূলক ফারসি ও উর্দু মিশ্র ভাষা চাপিয়ে দেননি। স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষমতাবান ইংরেজরা সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজীকে চালু করা শুরু করলেন। ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় বুৎপত্তি অর্জনে সম্ভব হয়ে আধুনিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে জ্ঞানের জটিল সমাধান সম্ভব করে কুসংস্কারাছন্ন জীবন থেকে মুক্তির নেশায় ভারতবাসী সেই সূত্রে বৃহত্তর বাংলার মানুষ দলে দলে ইংরেজী শিখতে শুরু করে (হিন্দু আগে, মুসলিম পরে)। খ্রিষ্টান মিশনারীরা **১৮১৩** সালের দিকে খ্রিষ্টতত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন।[১৫৪]

ভিনদেশীরা এসে বাংলা শাসন করেছেন, তাঁর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সংস্কৃতির সাথে সংস্কৃতির মেলবন্ধন করে তাতে বিবর্তন এসেছেন কথা সত্য। কিন্তু উর্দুভাষী অবাঙালি মুসলিমদের মত করে বাঙালি মুসলমানকে কেউ এত বড় জায়গায় আঘাত করার সাহস পায়নি, আর সেই জায়গাটি হচ্ছে চেতনার জায়গা- বাংলা ভাষার জায়গায়। বাংলা ভাষা কেড়ে নেওয়া মানে অস্তিত্বকে কেড়ে নেওয়া। বাংলা ভাষা কেড়ে নেওয়া মানে বাঙালি সংস্কৃতির মূলৎপাটন করা। বিংশ শতকের গোড়া থেকে হিন্দুদেরকে প্রতিযোগী ভেবে ইসলামী ঐতিহ্যে সুমহান মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি ভাষা বিতর্কে জাড়িয়ে পড়ে। তাদের প্রশ্ন ছিল বাংলার মুসলিমদের জাতীয় ভাষা কি হওয়া উচিৎ।[১৫৫] সম্মুখ অবস্থানে উর্দু বনাম বাংলা বিতর্ক। মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যেও ফাটল ধরল। কমসংখ্যক উর্দু প্রিয় বাঙালি মুসলিমদের যারা ভাবল উর্দু হলে তাদের পক্ষে সহায় হবে তারা বলতে লাগল 'বাংলা হল হিন্দু ঘেষা ভাষা. পহেলা বৈশাখ হিন্দুদের, মুসলিমদের নয়, রবীন্দ্র সঙ্গীত হিন্দুদের মুসলিমদের নয়। এই যে যুক্তি তা নিত্যান্ত নিছক বলেই গণ্য। বাংলাভাষার বিরুদ্ধে অবস্থানকারী শ্রেণির ভদ্র মহোদয়গণ যারা কিনা বাংলাভাষী হয়েও উর্দুর সমর্থন করেন তারা হলেন 'ময়ূরপুচ্ছে দাঁড়কাক, না হয় হিজ মাস্টারস ভয়েস' বা জো হুজুরের দল, না হয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবিহীন ভাগ্যান্বেষী। তা না হলে পৃথিবীর উন্নতর ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম বাংলা ভাষাকে ত্যাগ করে উর্দুর ন্যায় একটি বিদেশি ভাষা আমদানী করার পক্ষে ওকালতী করা তাদের পক্ষে শোভা পায় না। তা ভীষণ অস্বাভাবিক ও অদ্ভুদ ধরনের বটে। এক্ষেত্রে এই শ্রেণির লোকদের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি 'নূরনামা'র, লেখক নোয়াখালির সন্দ্বীপনিবাসী আবদুল হাকিমের (আনু. ১৬২০-১৬৯০) ইতিহাস 'নূরনামা' কাব্যের প্রাসঙ্গিক রচনাংশটুকু উদ্ধৃত করা যায় -

'যে সব বঙ্গতে জন্মি হিংসে বঙ্গবানী।

সে সব কাহার জন্ম নির্নয় ন জানি ॥

দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।

নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে না যায় ॥

মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।

দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি –

(নূরনামা)[১৫৬]

রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যদি বিদেশী ভাষারই আমদানী করতে হয়, তবে ইংরেজীই বা কি দোষ করল? প্রশ্ন উঠে। ভাষা বিতর্কের এই সময় ইংরেজী তখনও রাষ্ট্র ভাষায় অবস্থিত ছিল। ইংরেজীকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্থান না দেওয়ার পক্ষে যুক্তি যদি হয় তা বেদ্বীনদের ভাষা; সর্বোপরি বিদেশী ভাষা। যে ভাষার ধুম্রজালে থেকে ইংরেজ জাতি বাঙালিকে শাসন-শোষন করেছেন। এই ভাষাজ্ঞানের মাপকাঠিতে এতকাল আমাদের সুশীল সমাজের, মধ্যবিত্তশ্রেণির মান নির্নীত হয়েছে। তাহলে বলা যায় ইংরেজী বিদেশী ভাষা বলে পারিতাজ্য তাহলে উর্দু নয় কেন? মাতৃভাষা সচেতন, বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির অবস্থান সমাজের কোথায় ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় মুসলিম সংকটের মধ্য থেকে। এই সংকট পরবর্তীতে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন রূপে বাঙালি জাতিকে রক্তাক্ত করেছিল।[১৫৭] হাসিমুখে রক্ত দিয়ে দাম চুকিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করে ভাষা শহীদের মর্যাদা পেলেন ছাত্র, যুবক মধ্যবিত্তশ্রেণির মন-মানসিকতায় গড়া দামাল ছেলেরা। মধ্যবিত্তশ্রেণির অংশগ্রহণ ভাষা আন্দোলনের বীজকে তরান্বিত করে এবং তা অবশেষে স্বার্থকতায় রূপ নেয়।

ভাষাকে নিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির সচেতন অংশটি সেভাবে নিজেদেরকে তৈরি করেছিলেন তা এক-দুই দিনে হয়নি; বরং তা ছিল দিনের পর দিন ঘটে যাওয়া নানান স্ব জাতীয় অধিকার বোধ থেকে। ইংরেজ জাতির অধীনতার শৃঙ্খল যখন বাঙালি জাতি ভেঙ্গে দিতে পারে মূলত তাঁরাই স্বাধীন জাতির ভীত রচনা করতে পারে। জাতীয়তাবোধ তখন ছিল দুর্বার।ভাল হউক, মন্দ হউক, মুক্তি চাই, আলো চাই, স্বাধীনতা চাই। সেজন্য বাংলা ভাষা প্রশ্নে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভাষা বিতর্ক উত্থানের সুযোগ আর রইল না। একটি কথা না বললে নাই হয় - ১৯০৬ থেকে যদি বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির নেতাগণ মাতৃভাষা তথা বাংলাভাষাকে আরও একটু যত্নে রাখতেন, চর্চা করতেন, অসীমভাবে ঠেকাতে পারতেন তার বিকাশের উপর আসা প্রতিটি ঝড়কে তাহলে হয়ত দানবদের অত্যাচার থেকে ‘বাংলা ভাষা’ মুক্তি পাওয়ার আগেই মুক্তি পেত, যত্ন পেত।

তথ্যসূত্র:

১. রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস* (২য় খন্ড), বইপত্র, ঢাকা, ২০১৩, পৃ,২৭।

২. *ঐ*, পৃ, ১০৭।

৩. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, মোগল আমল* (১ম খণ্ড), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা,১৯৯২, পৃ, ১৪৭।

৪. *ঐ*, পৃ, ১৫০।

৫. মাহবুবুর রহমান, *বাংলার ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, বুকস ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৬, পৃ, ১১৪।

৬. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*, প্রকাশ ভবন, কোলকাতা, ২০০৯, পৃ, ১২৯।

৭. কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ*, আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পাদিত, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ, ১০৯।

৮. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ,২৭।

৯. গোলাম আহমদ খান (উর্দু অনুবাদ),*সিয়ারুল মোতাআখখেরীন*, মুসলিম প্রেস, দিল্লী, ১৯৭৫, পৃ, ২৫।

১০. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৭।

১১. কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ*, চন্দ্রবিন্দু প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ, ১১৪।

১২. বিশ্ব মুসলিমবাদের জনক জামাল উদ্দিন আফগানি যে বিশ্ব মুসলিমবাদ ছিল উনিশ শতকে একটি রাজনৈতিক চেতনা। ইসলামের সাম্য, সৌভাতৃত্বের আদর্শে বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য এবং পারস্পারিক সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করা বিশ্ব মুসলিমবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। ওয়াকিল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৫৪৩।

১৩. হারুণ-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি, সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০)*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ, ৪৭।

১৪. *ঐ*, পৃ, ৫৪।

১৫. Harun-or-Rashid, *The Dhaka Nawab Family in Bengal Politics(1936-1947), Dhaka University Press, Dhaka, 2003, P, 120.*

১৬. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ, ১৯৭।

১৭. মাহবুবুর রহমান, *বাংলার ইতিহাস (প্রাচীনযুগ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত)*, বুকস্ ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৬, পৃ, ৭৯।

১৮. বৈদিক যুগে বর্ণভেদের বাড়াবাড়ি ছিল না। পৌরানিক যুগে বর্ণভেদের উপর বাড়াবাড়ি নিয়ম প্রবর্তিত হয়। মনুসিংহতার শূদ্রের বিরুদ্ধে ঘৃণা, অবজ্ঞা এমন কি যুদ্ধ করার কথা বহু জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* আছে যে প্রভু অবাধ্য দাস শূদ্রকে হত্যা' পর্যন্ত করতে পারেন। নিম্ন বর্ণের লোকের এবং বৌদ্ধ শ্রমণের দর্শনে, স্পর্শে পাপ একথা প্রচার করা হত। গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পনি, কোলকাতা, ১৯৬৫, পৃ, ১৭৩-৭৫।

১৯. Shakumar Sen (edited),*Sekasuvodaya*, The Asiatic Society, Calcutta, 1962, P, 20.

২০. কালাপাহাড় বাংলার স্বাধীন সুলতান সোলায়মান কররানির (১৫৬৫-৭২) সেনাপতি ছিলেন। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করে ধ্বংস করেন এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করেন। তার পূর্ব নাম ছিল রাজু। গনেশ পুত্র সুলতান জালালউদ্দিনের পূর্বনাম ছিল যদু। জালালুদ্দীন এবং কালাপাহাড় উভয়েই ধর্মান্তরীত হন। Jadunath Sarkar (edited),*History of Bengal*, Vol. II, University of Dacca, Dacca, 1972, PP,183-84, 202.

২১. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩

২২. আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ, ১৪৬

২৩. Report on the Sensus of Bengal, Vol. III, 1891, P, 147.

২৪. S.N. Mukerji, *Class caste and Politics in Calcutta (1815-38)*: in leach and S.N. Mukherji (ed), *Elites in South Asia,* Cambridge University Press, London, 1970, P, 38.

২৫. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ (১৮৮৫-১৯২১)*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ, ২৪.

২৬. S.N. Mukherji, *Op.cit.*, P, 38.

২৭. Report on the Sensus of Bengal, Calcutta, 1872, PP.XXXII-XXXIII (general statement IB); Report on the Sensus of Bengal, 1881, P-74; Report on the Sensus of Bengal, Vol.III, 1891, P.147; Amalendu De, Roots of Seperatism in Ninteenth Century Bengal, Ratna Prakashan, Calcutta, 1974, P, 31.

২৮. Grierson- Linguistic Servey of India (5 Vols), Hunter – Annals of Rural Bengal (1868), Te Indian Mussalmans (1871), Dutton- Deseriptive Ethrology of Bengal (1872), Wise- The Races, Castes and Tribes of Eastern Bengal (1883), Crooke- The Popular Religion and Folklore of Northern India (1893). Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*. (vol.1, 1200-1576), Vol.11, (1576-1757), Karachi, 1961, P, 209.

২৯. B.B. Misra, *The Indian Middle Classes: their growth in Modern Times*, Oxford University Press, London, 1962, P, 4.

৩০. চতুবর্ণ প্রথমে পেশা বা কর্মভিত্তিক ছিল শেক, হূন, শ্লিক প্রভৃতি বিদেশী শক্তির আক্রমনের ফলে ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরেছিল। সপ্তম শতকে মনু সামজ কাঠামো রক্ষার এবং একটা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য ঐরূপ কর্মের ভিত্তিতে সমাজের মানুষের শ্রেণিকরণ করেন। পরে এটি কৌলিক ভেদ প্রথায় রূপান্তরিত হয়। এক শ্রেণির সাথে অপরশ্রেণির মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা প্রকার বিধি নিষেধ আরোপিত হয়। শরিফ (আরবি) শব্দের অর্থ পবিত্র, মান্য; শরিফের বহুবচন আশরাফ; অনুরূপ তরফ (শ্রম) শব্দজাত আতরাফ 'জিলফ' (নীচ) শব্দজাত আজলাফ 'রজীল' (ইতর) শব্দজাত 'রজীল' (ইতর) শব্দজাত আরজল। F.J Steingass (edited), A Comprehensive *Persian English Dictionary*, University of Chicago, London, 1954 (4th edition), P, 373.

৩১. ১৮৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট মোট ২০টি 'উপাধির' উল্লেখ আছে: অক্ষরানুক্রমিক সাজালে সেগুলির নাম হয় আখন্দজী, আতরাফ, খান, শাহীন, গাজী, চৌধুরী, দফাদার, দেওয়ান, নায়ক, পাঠান, বিশ্বাস, বেগ, মীর, মীর্জা, মোঘল, শেখ, শানা, সরদার, সৈয়দ ও হাজরা। Census of India, 1891, Vol.V (Lower Provinces of Bengal and Their Feudatories), Calcutta, 1893, P,17.

৩২. Khondker Fuzli Rubbe, *Opcit,* P, 101-102.

৩৩. Census of India, 1891, Vol. IV, P, 17-19.

৩৪. Amalendu De, Islam in India (a Research Paper), Calcutta, 1974, P, 8.

৩৫. M.T. Titus, *Indian Islam,* Oxford University Press, London, 1930, P, 25.

৩৬. "It (Sufism) in rather a natural revolt of human heart revolt of human heart against the cold formalism of a ritualistic religion." M.T.Titus, *Op.cit,* P, 35.

৩৭. মুঈন উদ-দীন-আহমদ খান (অনুবাদ, ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া), *বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ, ৪৩.

৩৮. A.R. Malick, *British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1857),*Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1961, P, 35.

৩৯. উইলিয়াম হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, আব্দুল মওদুদ অনূদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ, ১৫৩।

৪০. উইলিয়াম হান্টার, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ১৫৪।

৪১. উইলিয়াম *প্রাগুক্ত*, পৃ,১৫৪।

৪২. A.K.Nazmul Karim, *Dynamics of Bangladesh Society*, Vikas, New Delhi, 1980, P, 67.

৪৩. J.H. Broomfield, *Elite conflict in a plural society: Twenty Century of Bengal*, Berkeley, University of California Press, 1968, P. 44

৪৪. উইলিয়াম হান্টার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪

৪৫. S.N. Mukherji, *Op.cit*, P.38

৪৬. ১৭৯৩ সনের ২২ মার্চ গর্ভনর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষিত হয়। বিমূর্তভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইডিয়া প্রথম দেন সমকালীন ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ আলোকজান্ডার দাও(Alexander Dow) ও হেরী পেট্রুল্লো (Herry Pattullo)। দাও-পেট্রুল্লো প্রদত্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিমৃত আইডিয়ার (১৭৭০-৭২) মূর্তরূপ প্রথম দেন ফিলিপ ফ্রান্সিস। ১৭৮৬ সনে কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার জন্য দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে এবং এ বন্দোবস্ত সম্পাদনের জন্য নতুন গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পন করে।

৪৭. Hailing Berry, *The Bengal Administration Report of 1872-73*, Vol.1, (Appendix) P, 314.

৪৮. Abdul Khair Nazmul Karim, *The Modern Muslim Political Elite in Bengal*, Ideal Publications, Dacca, 1956, P,442.

৪৯. Owing to the Muhammadan Law of Inheritance, there is a tendency for all Muhammadan families to gradually become impoverished and many of Ashraf (noble born) have thus been merged into the mark of the Ajlaf (Low born)" Census Report of India, 1901, Vol, IV, P,442.

৫০. Census of India 1911, Vol.V, Bengal Part-I, Resolution on the Report dated 14July, 1913, P, 6.

৫১. Resolution Act No. 1, Calcutta, 10 October, 1844.

৫২. ভারত সরকার কর্তৃক ৭ই মার্চ ১৮৩৫ সালের ১৯ ধারার প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপ- "His lordship in council is of the opinion that great of the British government ought to be promotion of European Literature and science amongst the natives of India, and all the funds appropriated for purpose of education would be best employed on English Education a lone" [A.R. Mallick, *Op.cit.*, P, 222.]

৫৩. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলাদেশের সমাজ রাজনীতি ও সংস্কৃতি*, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০২, পৃ, ১৪।

৫৪. S.N. Mukherji, *class, caste and politics in Calcutta (1815-38)*; in leach and S.N. Mukherji (ed), *Elities in south Asia*, Cambridge University Press, London, 1970, P, 42.

৫৫. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ (১৮৮৫-১৯২১)*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ, ২৯।

৫৬. *ঐ*।

৫৭. স্বপন বসু, *বাংলার নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)*, পুস্তক বিপনী, কোলকাতা, ১৯৭৫, পৃ, ৮৪-৮৬, ৮৬-৯০।

৫৮. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ২৩।

৫৯. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, চয়নিকা, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ, ৩৫-৩৬।

৬০. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ, ৬০।

৬১. Edwin R.A. Seligman (ed).. .. Encyclopedia of social Sciences Vol.9, The Macmillan company, New York, 1950,P, 407 (Reprinted).

৬২. সালাহউদ্দীন আহমদ, *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন (১৮১৮-১৮৩৫)*, ইন্টার ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, রুম নং ১১০৭, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০০, পৃ,২৪।

৬৩. General Characteristics of Native Newspapers, *The Calcutta Christian observer*, Calcutta, October, 1832, P, 231.

৬৪. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৭৪।

৬৫. Ranjit Das Gupta, Factory Labour in Eastern India: Sources of Supply (1885-1946), Some Preliminary Findings, Indian Economic and Social History Review, Vol. XIII, No.3, P, 280.

৬৬. Edwin R.A. Seligman (ed).. .. Encyclopedia of social Sciences Vol.9, The Macmillan company, New York, 1950,P. 407 (Reprinted)

৬৭. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া; *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৭৪।

৬৮. *ঐ*।

৬৯. J. A. Vas, Preface to the Census Report, 1911, Calcutta, P, 3.

৭০. R. C. Dutt, Economic History of India in the early British Rule, Kegan Paul Irench Jrubner& Co. Ltd, London, 1906, P, 343-344.

৭১. R.C. Dutt, *Op.cit,* P,360-361.

৭২. A.R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism* (2nd ed.) Popular Book Depot, Bombay, 1959, P,113.

৭৩. Vera Anstey, The Economic Development of India, Longmans Green and Co. London, 1952, P, 279.

৭৪. ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ, ৩৮।

৭৫. বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ, ৬৫-৬৬।

৭৬. আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ, ১৪৭।

৭৭. Nazmul Karim, Op.cit, P, 257.

৭৮. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৭৫।

৭৯. Report of the Bengal Jute Enquiry Committee, Vol. I, P, 11.

৮০. মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন আহমেদ (মৃ. ১৯৩৩) বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় স্থায়ী বসবাসকালে মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন।

৮১. স্যার আজিজুল হক, 'বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা (মোস্তাফা নূরউল ইসলাম অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ, ৪০।

৮২. A.R. Desai, *Social Background of India Nationalism,* Popular Book Depot, Bombay, 1947, P, 166.

৮৩. R.C. Dutt, *Economic History of India in the early Britsh Rule,* Kegan Paul Irench Jrubner & Co. Ltd, London, 1906, P, 230.

৮৪. W.W. Hunter, Report of the Indian Education Commission, 1882.

৮৫. ইসলাম প্রচারক, ৮ম, ১১শ সংখ্যা, আশ্বিন ১২৫৮।

৮৬. Report of the Bengal Jute Enquiry Committee, Vol. I, P, 11.

৮৭. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ, ৪৬।

৮৮. মোস্তফা নূরউল ইসলাম, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, একুশের বইমেলা, ২০০৪, পৃ, ৬৩।

৮৯. স্বপন বসু, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৫৫।

৯০. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৭২ শক, ৮৮ সংখ্যা

৯১. Census of India 1911, Vol.V, Bengal Part-1, Resolution on the Report dated 14 july,1913, P, 6.

৯২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *উনবিংশ শতাব্দির পথিক*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৬১, পৃ, ১৩২।

৯৩. W.C. Smith, *Modern Islam in India: A Social Analysis,* Ripon Printing Press, London, 1947, P, 166.

৯৪. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮)*, সাক্ষরতা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ, ২০২।

৯৫. Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism,* Cambridge, at the University Press, London, 1971, P,367.

৯৬. W.W. Hunter, Report of the Indian Education Commission, 1882.

৯৭. ১৭-সংখ্যাক সুপারিশটি ছিল এরূপঃ That the attention of the local government be invited to the question of proportion in which the patronage is distributed among educated Mahomedans and others" Report of the India, Indians Education Commission, 1882.

৯৮. ওয়াকিল আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৫১।

৯৯. Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom*, Orient Blackswan Private Limited, Hyderabad (Telangana) India, 1959, P,31.

১০০. ড. হারুণ-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০)*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ, ৫৫।

১০১. A.R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism* (2nd edn), Popular Book Depot, Bombay, 1954, P, 289.

১০২. মুনতাসির মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ, ২৩১।

১০৩. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1905-1947*, Asiatic Society of Bangaldesh, Dhaka, 1987, P,300 (Note. 155).

১০৪. A. R. Desai, *Op.cit*, P, 113.

১০৫. W.C. Smith, *Op.cit*, P,135 ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ 240, 246.

১০৬. J.H. Broomfield, '*The Forgotten Majority' The Bengal Muslim and September 1918; DA* low (ed.) *Soundings in Modern South Asian History*, Oxford University Press, Bombay, 1968, P, 203.

১০৭. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মন্টেগু-চেমসফোর্ড পরিকল্পনা অনুযায়ী গভর্নর ছিলেন প্রদেশের প্রধান এবং সমগ্র প্রশাসনযন্ত্রের মূল স্তম্ভ। প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *বৃটিশ ভারতে রাজনৈতিক উন্নয়ন*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ২০০৩, পৃ, ১৩৯।

১০৮. A. R. Desai, *Op.cit*, P, 289.

১০৯. আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ-সংস্কৃতির রূপান্তর*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ, ২২৯-২৩০।

১১০. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics 1906-1947* (Hardback) P, 255-256.

১১১. এটলির ফেব্রুয়ারি ঘোষণা (১৯৪৭) এর ৩রা ফেব্রুয়ারি) তিনি ছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। এটলি তার ঘোষণা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, ব্রিটেন ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত থেকে হাত গুটাতে চায় এবং এর মধ্যে বৃহৎ দুটি দল কংগ্রেস ও মসলিম লীগ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সমঝোতায় পৌছাতে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় বিবেচিত হবে। Enclosure to 511, Nicholas Mansergh and Penderal Moon (eds), The Transfer of Power, Volume X (London 1981), 497-901, 308-309, Secret Report (অতঃপর SR) on the Political Situation of Bengal (Home Dept.) Y, 1st half, March 1947, Governor's Forinightly Report (অতঃপর GFR), L/P & J/5/154, 64, India Office Library, London, Star of India, 11 March 1997, 2 (editorial)

১১২. W.H. Morris-Jones, *Pakistan Post-Mortem and the Roots of Bangladesh*, Political Quarterly, Vol.18 (April-June 1972)

১১৩. Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom*, Orient Blackswan Private Limited, Hyderabad (Jelangana) India, 1957, P,31.

১১৪. ওয়াকিল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ,৭১।

১১৫. সমাচার দর্পন, ২১ জুলাই, ১৮৩২ এবং সংবাদপত্র সেকালের কথা, ১৮২।

১১৬. সুফিয়া আহমেদ, *বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় ১৮৮৪-১৯১২*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ, ১৬২।

১১৭. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, একুশের বইমেলা, ২০০৪, প, ৬৩।

১১৮. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, বাঙালি মুসলিম জনমত-উন্মেষ পর্বের রূপরেখা, পৃ, ৬৩।

১১৯. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ, ৬২।

১২০. মুনতাসির মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র* (১ম খন্ড), অনন্যা, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ, ৩৮।

১২১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র* (১ম খন্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা ১৩৫৯ (২য় সং), ১৩৭৯ (৪র্থ সং) সাহিত্য সাধক চরিত্রমালা-২৯, বঙ্গিয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৬৫, পৃ, ৬-৮।

১২২. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাংলার সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮), সাক্ষরতা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ, ১০২।

১২৩. আনিসুজ্জামান মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮৩১-১৯৩৩), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ, ২৪।

১২৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র* (১ম খন্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা ১৩৫৯ (২য় সং), ১৩৭৯ (৪র্থ সং) সাহিত্য সাধক চরিত্রমালা-২৯, বঙ্গিয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৬৫, পৃ, ৩৮।

১২৫. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বাংলার সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮), সাক্ষরতা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ, ৪।

১২৬. মুনতাসির মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৮৬, , পৃ, ২৩১।

১২৭. মুনতাসির মামুন, 'ঢাকা প্রকাশ' সম্পর্কে লিখেছেন 'ঢাকা প্রকাশ' ছিল ঢাকার প্রথম বাংলা সংবাদ পত্র। পত্রিকাটি টিকে ছিল প্রায় একশো বছর। দ্রষ্টব্য. মুনতাসির মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র* (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ, ২৩১।

১২৮. Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism,* Cambridge, at the University Press, London, 1971, P, 367.

১২৯. কতিপয় ক্ষেত্রে জমিদারদের অর্থানুকূল্য পাওয়া গেছে এদের মধ্যে করটিয়া মাহমুদ আলী খান পন্নী, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, দেলদুয়ারের করিমুন্নেছা চৌধুরাণী, আবদুল হালিম গজনবী, ধনবাড়ীর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, পশ্চিম গাঁও-এর নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী, ঢাকার নবাব স্যার খাজা সলিমুল্লাহ, বাহাদুর প্রমূখের নাম উল্লেখযোগ্য। কোলকাতার মুসলমান ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯২৬ এ দৈনিক সুলতান, প্রকাশিত হয়।

১৩০. সুব্রত শংকর ধর, সুশীল কুমার গুপ্ত, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫. পৃ, ৬৭; নজরুল চরিত্রমানস, দেজসংস্করণ, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৩৮৪, পৃ, ৬৭।

১৩১. সুব্রত শংকর ধর, সুশীল কুমার গুপ্ত, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫. পৃ, ৬৭; নজরুল চরিত্রমানস, দেজসংস্করণ, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৩৮৪, পৃ,১৩১।

১৩২. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ, ৪৬।

১৩৩. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেনির বিকাশ(১৮৮৫-১৯২১),* খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ, ১৩৩।

১৩৪. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *নির্বাচিত প্রবন্ধ,* অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, একুশের বইমেলা, ২০০৪, পৃ, ৬৩।

১৩৫. মুসলিম বাংলা (২য় সংখ্যা), ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ, ২৪।

১৩৬. আব্দুর কাদির, *'মহাম্মদি আখবার' মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র'*, পাকিস্তান পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ, ২১।

১৩৭. আব্দুর কাদির, 'মহাম্মদি আখবার' মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র', পাকিস্তান পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ, ২১।

১৩৮. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেনির বিকাশ(১৮৮৫-১৯২১),* খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ,১২৪।

১৩৯. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*, ১ম খন্ড, পৃ, ৪৪২-৪৪৩; মুস্তফা নূরউল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, পৃ, ৪; আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃ, ৪।

১৪০. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩২৮।

১৪১. হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ, ২৩।

১৪২. Syed Sharifuddin Pirzada, Foundations of Pakistan, All-India Muslim league Document, 1906-1947, Vo. II, National Publishing House, Karachi, 1964, P,1-15.

১৪৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস* ২য় খন্ড [সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, (১৭০৪-১৯৭১)], বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ, ২৩।

১৪৪. M.R. Tarafdar, Husaln Shahi Bengal (1494-1538): A Socio Political Study, Dhaka University, Dhaka, 1965, P,35.

১৪৫. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম; *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, বাঙালি মুসলমানের ভাষা-ভাবনা এবং নানা জিজ্ঞাসা, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা একুশের বইমেলা, ২০০৪, পৃ, ৪৩।

১৪৬. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলাদেশ ইতিহাস*, সমাজ ও রাজনীতি, অনিন্দ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ, ৪৭।

১৪৭. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, আমাদের মাতৃভাষা-চেতনা ও ভাষা আন্দোলন, কাজী মোতাহারহোসেন, প্রবন্ধ, রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা, পাকিস্তানের রাষ্ট্রবাষা বাংলা না উর্দু, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭, অন্য প্রকাশ, একুশের বইমেলা, ঢাকা, ২০০০, পৃ, ৮৪।

১৪৮. Harun-or-Rashid, Opcit, P, 300 (note 155).

১৪৯. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics 1906-1947* (Hardback) p, 255-256.

১৫০. East Bengal Legislative Assembly Proceedings, 1952, *ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু*, পৃ, ৯৮-৯৯ (পরিশিষ্ট ৩)।

১৫১. বদরুদ্দীন ওমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ, ৩-৫।

১৫২. Harun-or-Rashid, "The Lahore Resolution: Bengali Ideas of Statehood, Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Hum, Vol. 39, No.1, June, 1994, P, 59-67.

১৫৩. *Ibid*, P, 67.

১৫৪. স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৬৫)*, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, ১৯৭৫, পৃ, ৫৫।

১৫৫. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত) *আমাদের মাতৃভাষা-চেতনা ও ভাষা আন্দোলন*, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (অভিভাষণ), অন্যপ্রকাশ, একুশের বইমেলা, ঢাকা, ২০০০, পৃ, ১২২।

১৫৬. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত) *আমাদের মাতৃভাষা-চেতনা ও ভাষা আন্দোলন*, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (অভিভাষণ), অন্যপ্রকাশ, একুশের বইমেলা, ঢাকা, ২০০০, পৃ, ১২২।

১৫৭. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত) আমাদের মাতৃভাষা-চেতনা ও ভাষা আন্দোলন, কাজী মোতাহার হোসেন, প্রবন্ধ রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭, অন্য প্রকাশ, একুশের বইমেলা, ঢাকা, ২০০০, পৃ, ৮৪।

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

অর্থনীতিকে কেন্দ্র করেই মূলত সামাজিক কাঠামো তৈরী হয়। তাই অর্থ ও সমাজ একে অন্যের পরিপূরক। আবার অর্থের মাপকাঠিতে সমাজে মানুষের শ্রেণিকরণ হয়ে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই শ্রেণিকরণেরই এক চূড়ান্ত ফল। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ও সামাজিক ইতিহাস প্রণেতা Trevelyan বলেছেন, "সামাজিক ইতিহাস কেবল মাত্র অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে শুধু যে প্রয়োজনীয় যোগসূত্র স্থাপন করে তাই নয়, তার রয়েছে নিজস্ব সুনিশ্চিত মান স্বাতন্ত্র্য সূচক সম্পর্ক। এর উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করা যেতে পারে দেশের অধিবাসীদের অতীতযুগের দৈনন্দিন জীবন বলে। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন শ্রেণির অধিকন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্ক, পরিবার এবং গৃহস্থালী জীবনের প্রকৃতি, জীবনের এই সাধারণ কারণ থেকে সৃষ্ট সংস্কৃতি এবং ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, শিক্ষা এবং চিন্তার সদা পরিবর্তনশীল রূপ।[১] মানুষের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছাড়া বাকী সবই সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। কোন জাতির বা দেশের সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠন সহজসাধ্য নয়। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাসের চেয়ে সামাজিক ইতিহাসের পরিধি অনেক বিশাল এবং ব্যাপক। একটি দেশের সামাজিক ইতিহাস হচ্ছে সেই দেশের মানুষের অতীতের দৈনন্দিন জীবনের সকল চিন্তাশক্তি ও কর্মকাণ্ডের উজ্জল প্রতিবিম্ব। সমাজে ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মকাণ্ড রূপ লাভ করে পরিবারে, জাতিগোষ্ঠীতে, শ্রেণিতে, গ্রামে বা শহরে তথা সমগ্রদেশে। সর্বস্তরের ব্যক্তির ঐ চিন্তা ও কর্মকাণ্ড অবধারিতভাবে প্রভাবিত হয় সমাজ ও রাষ্ট্রের নানাবিধ প্রতিষ্ঠানাদি, যেমনঃ ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, আচার-অনুষ্ঠান, অভ্যাস, পাপ-পুন্য ও ন্যায়নীতিবোধ, সমিতি,দল, শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম, প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রশান্তি ও পুরস্কার ইত্যাদি দ্বারা। এসবই হল সামাজিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু। এগুলোর মূল্যায়ন থেকে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বিশেষ সমাজের গতিধারা। গতিধারার টানে স্থিতিশীলতাও আসে অবধারিতভাবে। ধর্ম,বর্ণ, শ্রেণি, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামাজিক স্থিতিশীলতা। এই স্থিতিশীলতায় যারা অবদান রাখেন তারাই সমাজের সবচাইতে গ্রহণযোগ্য সদস্য। তবে সমাজ যেহেতু একটি জীবন্ত সত্ত্বা, সেহেতু স্থিতিশীলতার পরিবেশেই সুপ্ত থাকে পরিবর্তনের বীজ। সমাজে তাই কখনও এমন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব দেখা যায়, যারা কিনা প্রশ্ন তোলেন, ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করেন, সমাজে বিদ্যমান অবস্থায় দুর্বলতা চিহ্নিত করেন এবং আদর্শ হিসেবে অনুসরণের জন্য নতুন পথ প্রদর্শন করেন। এখানে নতুন পথপ্রদর্শক ও পুরাতনপন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি খুবই স্বাভাবিক। এ দ্বন্দ্বে যেকোন একটি শক্তি জয়লাভ করে, উভয় শক্তির মধ্যে আবার কখনও কখনও আপস সমঝোতাও ঘটে। নতুন চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের বিজয় ঘটলে সমাজ সত্তায় আসে নতুন গতিধারা, আর তখনই সৃষ্টি হয় নতুন ইতিহাস। তাই বলা যায়– সামাজিক স্বত্ত্ব ও সংগঠনে, চিন্তা ও কর্ম-কাণ্ডের সকল ধরনের পরিবর্তন এবং একইসাথে পরিবর্তন আনয়নকারী ব্যক্তিসহ সকল আন্দোলন এবং বিপ্লবও সামাজিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এর সাথে এও জেনে রাখা দরকার যে, সমাজের সব সদস্য সমান মেধা কর্মক্ষমতার অধিকারী নয়, সবার রুচি-অভিরুচি আকাঙ্খা-অভিলাষও একমাত্রিক নয়। অতএব, পেশাগত মেধাগত বৈষম্য সমাজ সম্পর্ক ও সংগঠনে যে পরিবেশ পরিস্থিতি, অস্থিরতা ও জটিলতা

সৃষ্টি করে তাও সামাজিক ইতিহাসের প্রত্যক্ষ বিষয়। সমাজে মানুষ যেন সু-শৃঙ্খলভাবে বসবাস করতে পারে সেজন্য প্রণীত হয় নানারকম আইন-অনুশাসন, রীতি-নীতি ও আচার-প্রথার। সামাজিক ধর্ম ও পরিবর্তন ধারায় এসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মূল্যায়ন করাও সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম লক্ষ্য। এক কথায় সামাজিক ইতিহাসের ছায়া পড়ে সাধারণ ব্যক্তি ও পরিবার থেকে শুরু করে সমাজসত্তার সর্বস্তরে ধর্ম, বর্ণ,বিশ্বাস,জাত, শ্রেণি, আচার-প্রথা, শিক্ষা, সমিতি-সংগঠন, সংস্কার আন্দোলন, সাহিত্য, সংগীত,উৎসব, স্থাপত্য, চিত্রকলা, কারুশিল্প, লোকগাথা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, আন্তঃশ্রেণি সম্পর্ক, দলা-দলি, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলাধূলায়। সামাজিক ইতিহাস রচনায় এসবের কোন একটিকেও উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। তবে এ আদর্শকে অনুসরণের মাধ্যমে সমাজ ইতিহাস বিনির্মান খুব একটা সহজ বিষয় নয়। বস্তুত সমাজ সত্তার ভিতরে প্রবেশ করে সর্ববিষয়ে সার্বিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যকে বেছে নিয়ে সামাজিক ইতিহাস রচিত হয়।

বাঙালির অভ্যাস, আচার-প্রথা, রীতি-নীতি, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানাদিতে বিদেশি আবং বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। কেবল একটি ক্ষেত্রে বাঙালিরা ছিল বাহ্যিক প্রভাব হতে মুক্ত। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাঙালিরা ছিল চির স্বাধীন। ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের সময় এবং এরও আগে সমগ্র বিশ্বে বাংলার শিল্প পণ্যের ব্যাপক পরিচিতি ছিল। গ্রিক ঐতিহাসিক প্লিনির লেখায়ও বাংলার শিল্প পণ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার ইতিহাসে একটি বিষয় বারবর লক্ষ্য করা যায় যে, বহির্বিশ্বে বাংলার পরিচয় ঘটেছে পাল, সেন, তুর্কি, পাঠান প্রভৃতি জাতি-গোষ্ঠীর শাষকশ্রেণি বা সমর নায়কাদের দ্বারা নয়; সাধারণ কারিগরদের উৎপাদিত পণ্যই ছিল বর্হিবিশ্বে বাংলার দূত। শৈল্পিক ও প্রযুক্তিগতভাবে বাংলার শিল্পপণ্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, এদেশ রাজনৈতিকভাবে প্রায়শই বিদেশিদের প্রভাবমুক্ত। অতএব বাইরের প্রভাবমুক্ত পরিবেশে স্থানীয় কারিগরগণ বিভিন্ন শিল্পের– বিশেষ করে বয়নশিল্পের যে উৎকর্ষ সাধন করেছে তা স্থানীয় বাজারেতো বটেই, বিশ্ব বাজারেও নন্দিত হয়েছে। বিশ্ববাজারের সাথে বাংলার যে সংযোগ তা হয়েছে সতেরো ও আঠারো শতকে পশ্চিমা তথা ঔপনিবেশিক বাণিজ্যিক দেশসমূহের মাধ্যমে– এ কথাটির কোন ভিত্তি নেই।[২] মূলত ইউরোপীয়রা এদেশে আগমনের বহুপূর্ব হতেই বাংলার পণ্য ইউরোপীয় বাজারে প্রবেশ লাভ করেছিল। বস্তুত ইউরোপে বাংলার পণ্যের পরিচয় ছিল বলেই ইউরোপের বণিকেরা জলপথে এদেশে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করে, কারণ তুর্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মাঝে সংযোগকারী বাণিজ্যপথগুলি তুর্কি সম্রাটের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তুর্কি সরকার বাধ্যতামূলক বাণিজ্য কর আরোপ করলে ইউরোপীয়রা বিকল্প জলপথে প্রাচ্যের পণ্যলাভের চেষ্টা চালায়।[৩] সতেরো শতকে সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ আবিষ্কারের ফলে অধিকপণ্য ইউরোপে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা স্থলপথে সম্ভব ছিল না। যোগাযোগ বিপ্লবের আরেক ধাপ হচ্ছে বিপুলহারে মূল্যবান ধাতব পণ্য আমদানি–যা বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যের এক নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করে। জলপথে বাণিজ্যিক লেনদেন ধাতব লাভ করায় বাংলার অর্থনীতির জন্য উন্মোচিত হল এক নতুন দিগন্ত।

বাণিজ্য পরিচালনায় তথা অর্থ পরিচালনায় যে বিষয়টি নিয়ামক সরূপ তা হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা। রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার না করলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে টিকে থাকা মুশকিল। তাছাড়াও নৌ সমুদ্রে একচ্ছত্র আধিপত্য যার যত বেশি হবে

তার অধীনে সেই কোম্পানি ততবেশী মসৃণ বাণিজ্য পথ দখলে নিতে পারত। ফলে সমুদ্র পথ জয়ের পর সেই জয়কে ধরে রাখায় সর্বদা নৌসেনা মোতায়েন রাখা হত। বলা হয়ে থাকে ভারত মহাসাগরে ফরাসিদের হটিয়ে ইংরেজ বানিয়ানরা নিজেদের অস্তিত্বকে দৃঢ় করার জন্য যে নৌসেনাদের মোতায়েন রেখেছিলেন তারাই পরবর্তীতে ভারতীয় উপমহাদেশ জয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলেই বিশ্বের সনাতন বাণিজ্য শক্তিগুলির মধ্যে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে স্থানীয় রাজনীতিতে। এমন ঘটনা ইতিহাসে বিরল নয়। বাংলার ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধও এমনি একটি ঘটনা, যার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ পর্যন্ত বাংলার বাণিজ্যধারার মূল গতিপথকে সম্পূর্ণরূপে এক নতুন ধারার দিকে ধাবিত করে। তাই পলাশীর যুদ্ধ স্থানীয় অর্থনীতি থেকে বিশ্ব অর্থনীতির ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচ্য। তার মানে ইংরেজরা তথা পশ্চিমারা বাংলার বাণিজ্যকে বিশ্ববাজারে সর্বপ্রথম সম্পৃক্ত করে।[৪] তাহলে প্রশ্ন আসে বিশ্ব অর্থনীতে বাংলার অর্থনীতির সম্পৃক্ততায় কে বেশী অবদান রেখেছিল? এক্ষেত্রে পতুর্গীজরাই এগিয়ে রয়েছে। নৌ-বাণিজ্যে পর্তুগালের সঙ্গে বাংলার প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয় ষোল শতকের শেষভাগে। কিন্তু অচিরেই পর্তুগীজরা বাণিজ্যের চেয়ে জলপথে দস্যুবৃত্তিতে বেশী উৎসাহী হয়ে উঠে। বাংলায় ব্যাপক বাণিজ্য শুরু করে প্রথম ওলন্দজরা। সতেরো শতকে ওলন্দাজরা বাংলা বাণিজ্যে প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। ওলন্দাজদের পর যুক্ত হয় ফরাসি, ইংরেজ, ওসেন্ডার (বেলজিয়াম) ও অন্যান্য ইউরোপীয় নৌ-জাতি। মুঘল সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কতিপয় বাণিজ্যিকগোষ্ঠী এদেশে বাণিজ্য করার সুযোগ পায়। এর সুবাদে বাংলা বাণিজ্যে আমদানি-রপ্তানি ভালই চলত। বিদেশীদের নিকট হতে আমদানির খাতিরে চটের থলেতে করে রৌপ্যমুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণের পর দেশ এমন মুদ্রাসংকটে পড়ে যেত যে টাকার সরবরাহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সময় লাগত ন্যূনতমপক্ষে ছয় মাস।[৫] মুদ্রা অর্থনীতির সুযোগ নিয়ে ইউরোপীয়রা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও যোগদান করে। তারা একবাজার থেকে পণ্য কিনে অন্য বাজারে বিক্রি করত এবং প্রাপ্ত মুনাফা দিয়ে রপ্তানি পণ্য কিনে দেশত্যাগ করত। মূলত ১৭১৭ সালে বাদশা সম্রাট ফররুখ শিয়রের ফরমান লাভের পরই ইংরেজরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে।[৬] মুঘল সরকার অনেক সোনা-রূপা লাভ করতে পারত। রপ্তানি বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত সোনা-রূপা বাংলার সরকার কি প্রয়োজনে ব্যয় করত তা একটি প্রশ্ন। এর প্রেক্ষিতেই মূলত প্রদত্ত বিষয়টি এত ব্যাপক পটভূমিসহ আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। ইতিহাসবিদগণ মনে করেন যে, আমদানিকৃত এইসব ধাতব, সোনা-রূপা দিয়ে মুঘল সরকার পণ্যবদল অর্থনীতির স্থলে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি চালু করেন- (ধাতব দিয়ে মুদ্রা বানানো হত)। রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে মুঘল সরকার ব্যয় নির্বাহ করত, সেনাবাহিনী যেমন পোষত তেমনি হাটে বাজারে কেনাবেচার মাধ্যম হিসেবে এই রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহৃত হত। হঠাৎ করে বাংলার অর্থনীতি সংকটময় হয়ে উঠল আর তার কারণ হিসাবে দেখা গেল আলোচ্য ঐ মুদ্রা কেননা তখন তা দিল্লীর বাদশাহর রাজস্ব আদায়ের মাধ্যম হয়ে পড়ে। পূর্বে বাংলা হতে রাজকীয় রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরিত হত হুন্ডিতে। দিল্লীতে মুদ্রায় যখন রাজস্ব পাঠানো শুরু হল তখন দেখা গেল প্রতিবছর প্রায় দেড় কোটি টাকা দেশ থেকে পাচার হচ্ছে।

১৭১৭ খ্রি. মুর্শিদকুলী খান বাংলার দিউয়ান হিসেবে আসীন ছিলেন। পরবর্তীতে দিউয়ান পদের সাথে সাথে সুবে বাংলার সুবাদার পদেও তিনি নিযুক্ত হন। এক সাথে এই দুই পদ লাভ করে মুর্শিদকুলী খাঁন স্বাধীন নবাবির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় থেকেই বাংলার প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজও সংস্কৃতি– প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। সেই সময় বাংলা-ইউরোপ বাণিজ্যের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তা-ঠিক দ্বি-পাক্ষিক ছিল না; বরং বহুপাক্ষিক ছিল। স্থানীয় পণ্যের সঙ্গে ইউরোপীয়দের মূল্যবান ধাতবের বিনিময় ছাড়াও ইউরোপীয়দের মাধ্যমে বাংলার পণ্যের সঙ্গে অনেক প্রাচ্যদেশের পণ্যের বিনিময় হতো। ঐ বিনিময় ছিল বাংলা ইউরোপ বাণিজ্যিক লেন-দেনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই বাণিজ্যের প্রকৃতি ছিল একদিকে সরাসরি বাংলা-ইউরোপীয়; অপর দিকে বাংলা-প্রাচ্য-ইউরোপীয়।[৭] বহুপাক্ষিক বাংলার অর্থনৈতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধারনা লাভ করা যায়–

> ‘আঠারো শতকে রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলার ব্যাপক ভূমিকা উল্লেখ করে ওম প্রকাশ তথ্য প্রদান করেন: সতেরো শতকের শেষ সিকিতে ইউরোপীয় বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের হামলা ইউরোপ-ভারত বাণিজ্যে এক নতুন পর্বের সূচনা করে। এপর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিাক কর্মকান্ডে বাংলা শুধু ভারতের মধ্যেই নয় সমগ্র এশিয়ায় ছিল সেরা। আঠারো শতকের প্রারম্ভে ওলন্দাজরা এশিয়া থেকে যে পণ্য সম্ভার হল্যান্ড রপ্তানি করত এর শতকরা চল্লিশভাগই সংগৃহীত হতো বাংলা থেকে। আর ওলন্দাজ কোম্পানি এশিয়া হতে যে পরিমান পণ্য রপ্তানি করত, মূল্যের নিরিখে এর অর্ধেকেরও বেশি রপ্তানি হতো বাংলার বস্ত্রাগারে। বাংলায় সবচেয়ে বড় রপ্তানি অংশীদার ছিল ইংরেজ কোম্পানি এবং এদের বেলায়ও প্রায় অর্ধেক পণ্য রপ্তানি হতো বাংলা থেকে’।[৮]

এক্ষেত্রে তাহলে পরিষ্কার হওয়া গেল যে, এশিয়ার বাণিজ্য জগতে বাংলার স্থান ছিল সর্বোচ্চ। সতেরোশতকে সুবাহ বাংলাকে ‘জান্নাতাবাদ’ বা ‘স্বর্গরাজ্য’ বলে অভিহিত করা হতো। দ্বিতীয় মুঘল সম্রাট হুমায়ুন স্বয়ং বাংলার এ নামকরণ করেছিলেন।[৯] আওরঙ্গজের বাংলাকে ‘শহরের স্বর্গ, বলে উল্লেখ করতেন। আঠারো শতকের মাঝামাঝি কাশিম বাজারের ফরাসি কুঠির প্রধান জাঁল’র মতে, সুবাহ বাংলার এ বর্ণনা যথার্থ।[১০] আঠারো শতকের প্রথম ভাগে নবাবি আমলেও যে বাংলা সতেরো শতকের মত সমান সম্পদশালী ও ক্রমোন্নতিশীল ছিল তার প্রমাণ মেলে তখনকার প্রায় সমসাময়িক ফার্সি ইতিহাসগ্রন্থ *রিয়াজ-উস-সালাতিন* রচয়িতার লেখায়। তিনিও বাংলাকে ‘জান্নাত-উল-বালাদ’ বা স্বর্গ শহর বলে অভিহিত করেছেন।[১১] ইংরেজ কোম্পানির পদস্থ কর্মচারী চার্লস গ্রান্ট প্রাক-ব্রিটিশ যুগের বাংলা সম্পর্কে বলেন: “[তখন] এ রাজ্য ছিল সচ্ছল, ব্যয় বেশী নয়, স্বাধীন রাজ্য পরিচালনায় ব্যয় ও দাস-দাসিত্ব থেকে মুক্ত। এদেশের মানুষ কৃষিও ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে সুখী। তারা প্রাচুর্য ও শান্তিতে জীবন যাপন করত।[১২] এসব থেকে বলা যায় যে, সে সময়ে বাংলার শ্রীবৃদ্ধির প্রয়োজনীয় সম্পদ অর্থনৈতিক আবহে বিদ্যমান ছিল। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তি থেকে আরম্ভ করে ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ রাজের কর্তৃত্ব হস্তান্তরের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার সার্বিক মূল্যায়ন করার

সময় ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার দিকে একটু বিশেষ নজর দিতে হয়। কেননা ক্ষমতা ও শাসন ব্যবস্থার উপরই একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভিত নির্ভর করে। ক্ষমতা অর্থাৎ দেশের একক আধিপত্য বিস্তারকারী সরকার প্রবর্তিত রাজনীতির গতি ধারা দেশ চালাতে গেলে এমন কিছু শাসনতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করে যা কিনা দেশের সার্বিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে। তার প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া যায় ১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানি লাভ ও দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যদিয়ে ইংরেজ সরকার কর্তৃক বৃহত্তর বাংলার সার্বিক অবস্থার ওলট-পালট-এর মধ্যদিয়ে ১৭৬৬ সালে কোম্পানির শেয়ার বাজারের দিকে দৃষ্টি দিলে এ অবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। পুঁজিবাদের ম্যানিফেস্টো তথা আকর গ্রন্থ *ওয়েলথ অফ নেশনস* এর লেখক অ্যাডাম স্মিথ তার বইটির যুক্তিখণ্ডনে বলেন, "মনোপলি ক্রেতা, বিক্রেতা, মালিক, শ্রমিক সমাজের জন্যই মন্দ, কারণ ব্যক্তিস্বার্থের সুস্থ ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের জন্য প্রতিযোগিতা অপরিহার্য। আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি ব্যক্তিস্বাধীনতা বা 'ন্যাচারাল লিবার্টি'। কিন্তু তার সঙ্গে চাই প্রতিযোগিতার 'অদৃশ্য হাত।" স্মিথের কথার বিশ্লেষণ করে দেখলে কোম্পানির 'শেয়ারহোল্ডারের' প্রমাণ পাওয়া যায়। যেখান থেকে শ্রমবিভাজন সৃষ্টি হয়ে বাংলার অর্থনীতিকে আপাদমস্তক জড়িয়ে নিয়েছিল। শ্রমবিভাজন পদ্ধতিতে মালিকের অলস সন্তান কর্ম না করেও ব্যবসা চালাতে পারতেন। অ্যাডাম স্মিথ বাংলা বিজয়ের পর ১৭৬৬ সালে কোম্পানির শেয়ারের দাম যে বৃদ্ধি পেতে থাকে তার উল্লেখ করেছেন। পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য শেয়ার হোল্ডার হওয়ায় কোম্পানি পুনর্গঠিত হয় এবং এর সাথে সাথে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবস্যার ভিত্তি দুর্বল হতে থাকে।[১৩] ১৮০০ শতক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোম্পানি চূড়ান্ত পতন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায়। এরপর ১৮২০-১৮৫৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে কোম্পানি তার ব্যবসায়িক স্বার্থ হারানোর ফলে রাজনীতিই হয়ে উঠে বাংলায় কোম্পানির একমাত্র নীতি ও উদ্দেশ্য। ইংরেজদের রাজনীতি বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল তার কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) এমন এক ব্যবস্থা ছিল যার সাথে বাংলার কৃষকশ্রেণির স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়েছিল; অন্যদিকে লাভবান হয়েছিল জমিদার শ্রেণি (বিশেষ করে নব্য জমিদার শ্রেণি)। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে কৃষকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া নানাবিধ ভার জমিদাররা যখন তাদের নিজস্ব নায়েব গোমস্তা, পাইক, পেয়াদাদের মাধ্যমে তুলতে দিত তখন তারা রাজনৈতিকভাবে অসচেতন কৃষক প্রজার উপর নিদারুন অত্যাচার চালাত। অত্যাচার হতে বাঁচার কোন লড়াই কৃষক সমাজ করতে যেত না ঠিকই, তথাপি ধর্মীয় সংস্কারের আঁড়ালে আন্দোলন ও বিদ্রোহের উৎস তৈরী করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে মুসলমান নেতাগণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু আন্দোলন সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে তিতুমীর এবং হাজী শরীয়তউল্লাহর পরিচালিত আন্দোলনসমূহ।[১৪] উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদার এবং সাধারণ মুসলমান কৃষকদের মধ্যে উনিশ শতকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এই ধরনের সংঘাত গভীর তাৎপর্য বহন করে।[১৫] ১৮৫৯ সালের রাজস্ব আইন-এর এক উদাহরণ। এই আইনের বলে রায়তদের অধিকার সংরক্ষিত হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নীলকরদের অত্যাচার চরমে উঠে। বাংলার অর্থনীতির লাভজনক পন্থা হিসাবে নীলচাষের সুফল বার্তা রাজা রামমোহন রায় স্বীকার করেছিলেন। তবে নীলকরদের অত্যাচারের বিষয়টি অস্বীকার করা অসম্ভব। নীলকরদের অত্যাচারের ফলে ফরিদপুর, যশোর, রাজশাহী, নদীয়া, মালদহ

এসব অঞ্চলের বাতাস বিশেষ ভাবে দূষিত হয়ে পড়েছিল বলে ইতিহাসবিদরা মনে করেন। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিটি জেলায় অসন্তোষ প্রকট আকার ধারণ করে, যা বাংলার ইতিহাসে 'নীল বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।[১৬] নীল বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করায় এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারকদের নিরন্তন প্রতিবাদের ফলে ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ প্রশাসন নীলকর কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয়।[১৭]

তাঁত ও তাঁতি এ যেন বাংলার এক চিরচেনা চেহারা। মূলত ভোগ প্রধান অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল গ্রাম বাংলার কারুশিল্প এবং কারিগর শ্রেণি। অর্থনীতির যুগে বহিবার্ণিজ্যের প্রভাবে হাতে তৈরী বস্ত্রের জায়গায় আস্তে আস্তে স্থান করে নিল মেশিনে তৈরী বস্ত্র। ব্যক্তিগত রুচি, শখ, বিলাসিতা চরিতার্থ করার জন্য বাংলার গ্রাম্য অভিজাতশ্রেণি একদা বাঙালি কারুশিল্পীর উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ইংরেজ শাসকদের নতুন রাজস্ব বন্দোবস্তের ফলে তাঁরা একে একে ধ্বংস হয়ে গেল। তাঁদের পরিবর্তে যে নতুন গ্রাম্য অভিজাত ও ধনিকশ্রেণির উদ্ভব হল, তারা অধিকাংশই এক পুরুষের হঠাৎ ধনী। তারা প্রধানত শহরে দালালি-বেনিয়ানি-দেওয়ানি করে অর্থ রোজগার করে এবং নিশ্চিত নিষ্ক্রিয় আয়ের নিষ্কটক পথ অন্বেষণ করে জমিদারি কিনে 'চিরস্থায়ী' জমিদার হয়েছেন। তারা দেশীয় বস্ত্রের চেয়ে বিদেশীবস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট ছিলেন বেশী। তাছাড়াও সামাজিক পদমর্যাদার ধারক ও বাহক হিসাবেও বিলাতি দ্রব্য বেশি জনপ্রিয় ছিল। ফলে একটা সময় অবহেলায়, অনাদরে, উপেক্ষায় ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দেশীয় কারু ও তাঁতশিল্প কারিগর ধ্বংস হয়ে গেল। মসলিন শিল্প– যার কিনা দুনিয়া জোড়া খ্যাতি ছিল; কোম্পানির অনুসৃত বাণিজ্যিক নীতি এবং তাদের স্থানীয় এজেন্টদের দৌরাত্মে ঐতিহ্যময় তাঁত শিল্পের বিনাশ সাধিত হয়।[১৮]এভাবে কোম্পানির বাণিজ্য নীতির ফলে বাঙালি নিম্ন শ্রেণির জীবনমান আরও নিচের দিকে নামতে থাকে। এক্ষেত্রে সমাজে অবস্থানরত হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থানটি একমাত্রায় পরিবর্তিত হয়নি। যেমন– হিন্দুরা একদিকে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করছে; অপরদিকে তাদের বহুবিবাহ এবং বিধবা বিবাহের প্রচলন না থাকায় জন্মহার ছিল কম। ফলে জমির উপর তাদের চাপও থাকে সীমিত। অপরপক্ষে বাঙালি মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহ এবং বহুবিবাহে বাধা না থাকায় জন্মহার বাড়ে এবং তাদের নির্ভরশীলতাও বাড়তে থাকে।

ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পকারখানায় প্রথম ইস্পাত তৈরী হয় ১৯১৩ সালে। মূলত ব্রিটিশ শিল্পনীতির ভিত তৈরি হয় লোহা ও ইস্পাত শিল্পের মাধ্যমে। জনৈক হীদ সাহেব মাদ্রাজে উনিশ শতকের তিরিশের দশকে (১৮৩০) লোহা-ইস্পাত উৎপাদনে প্রয়াসী হন। তবে ভাল জ্বালানী, কাঁচামালও পরিচালনার অভাবে তিনি ভাল করে লোহাই উৎপাদন করতে পারেন নি; ইস্পাততো দূরের কথা। মাদ্রাজ সরকারের সহযোগিতা থাকা সত্ত্বেও ১৮৭৪ সালে হীদের লোহাকারখানা উঠে যায়। পরবর্তীতে ১৮৮৯ সালে স্থাপিত হয় 'বেঙ্গল আয়রণ অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি'। উনিশ শতকের শেষ অবধি এই কোম্পানি ইস্পাত তৈরীতে বিশেষ সফলতা পায়নি।[১৯] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রেলপথ নির্মাণের ফলে ইস্পাতের চাহিদা ভীষণ বাড়লেও সেই তুলনায় ইস্পাতের কারখানা নির্মাণের উদ্যোগ বাড়েনি। জামসেদজি টাটা ১৮৮০ সালে ইস্পাত কারখানা নির্মাণে উদ্যোগী হলেও তা প্রত্যাখাত হয়।[২০] মূলত বিশ শতকের গোড়ায়, কার্জনের শাসনকালে, লোহা-ইস্পাতের কারখানা স্থাপনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় এবং ইস্পাত তৈরীও ঐ সময় থেকে আরম্ভ হয়। ব্রিটিশ আমলে বাঙালি সমাজে যে নতুন

ধনিক শ্রেণি ও মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ হয় তাদের চরিত্র কতগুলি বিশেষ উপাদানে গঠিত। ইংরেজ শাসক ও বনিকদের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ তাঁরা নানাদিক থেকে পেয়েছিলেন। এই সান্নিধ্য বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে নানা উপায়ে তাদের অর্থোপার্জনের পথ খুলে দিয়েছিল। অধিকাংশ পথই সত্যিকার'enterprise'-এর পথ নয়; অনুগ্রহজীবীর মসৃণ পথ। এ পথে চলতে হলে প্রকৃত বুদ্ধিমান না হলেও ধূর্ত ও শট হওয়া প্রয়োজন এবং সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ব্যক্তিগত (জাতিগত বা সমষ্টিগত নয়) উগ্র স্বার্থচেতনা। মহারাজা নবকৃষ্ণ, মদনদত্ত, রামদুলাল, মতিলালশীল ও অন্যান্য বাঙালি হিন্দু ধনীরা আঠারো শতকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তারা উগ্র ব্যক্তিস্বার্থ চেতনা থেকে পরস্পরের সাথে অবিরাম দ্বন্দ ও সংঘাতে লিপ্ত থেকেছেন এবং শুধু নিজেদের আর্থিক আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য স্বার্থক করার জন্য যেকোন পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করেননি। এ কথা সত্য যে, Enterprise is action of a relatively high order of vigor, inspired by the vision of achievement of some desirable and ambitions objective.[২১]এই এন্টারপ্রাইজ বা শিল্পোদ্যম বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে অর্থনৈতিক ভাবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা অনেক পিছিয়ে ছিল। অর্থ কম থাকার ফলে সমাজে মুসলমনরা নিজেদের অবস্থানকেও অতটা সুসংহত করতে পারেনি।

বাংলার পাট, চা, কয়লাখাতের অর্থনীতিক অবস্থা ও তৎসংলগ্ন বাণিজ্যেও দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ১৮৯৭ সালে বর্ধমান বিভাগে ভারতীয় মালিকানায় ৪০টির মত কয়লাখনি ছিল। এর মধ্যে অবাঙালিরা যুক্ত ছিল মাত্র দুটির সাথে। এসব খনির অধিকাংশই ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন। তবে কমপক্ষে ৪ টি বাঙালি কোম্পানি– আর.এল.দত্ত অ্যান্ড কোং, ভোলানাথ ধর এন্ড কোং, যঙেশ্বর রায় এন্ড কোং এবং নায়েব এন্ড কোং এখানে তৎপর ছিল।[২২]অনুরুপভাবে ১৮৯০-এর দশকের শেষ নাগাদ ছোট নাগপুরের মানভূম জেলায় বাঙালি মালিকানাধীন ৬২টির মতো খনি ছিল। এসব কয়লাখনির জন্য বিপুল পুঁজির মালিকানাধীন অধিকাংশ খনি ছিল পিট কয়লার ছোট খনি। সবচেয়ে ভাল কয়লাখনি গুলি নিয়ন্ত্রণ করত ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউজগুলি।[২৩]

চা-বাগান খাতে বাঙালির পুঁজি বিনিয়োগ কেমন ছিল সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়– জলপাইগুড়ি জেলায় ১১টি চা-কোম্পানির অধিকাংশই ছিল বাঙালি মালিকানাধীন। অধিকাংশ বাঙালি উদ্যোক্তা ছিলেন শহুরে 'মধ্যবিত্তশ্রেণির'। মূলত নানাবিধ বারণ এখাতে বাঙালি পুঁজি প্রবেশের সুযোগ এনে দিয়েছিল। এছাড়া চা বাগান চালু করতে বড় ধরনের পুঁজি লাগত না। উৎপাদন প্রক্রিয়া ছিল সরল ও সস্তা। শৃঙ্খলা পরায়ণ আদিবাসী শ্রমিকের কোন ঘাটতি ছিল না।[২৪]পাটকল ও পাটের ব্যবসার জন্য বাংলাদেশ বিখ্যাত। এই পাটের ব্যবসার সাথে বাঙালির সম্পর্ক সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন (১২৮৭):

> "চটের ব্যবসায়-সংঘর্ষে বঙ্গদেশ স্কটল্যান্ডকে পরাজয় করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে বঙ্গবাসীর কি লাভ হইয়াছে? বাঙালীরা ঐ ব্যবসায়ের লাভের কত অংশ পাইতেছেন? প্রণিধান পূর্বক, যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায় দৃষ্ট হইবে, লাভ অতি অল্পই হইয়াছে। বঙ্গীয় কৃষকেরা পাটের চাষ করিয়া লাভবান হইয়াছে সত্য এবং কতকগুলি বঙ্গীয় শ্রমজীবী কলে কাজ করিয়া জীবীকা নির্বাহ করিতেছে সত্য, কিন্তু উক্ত শ্রমজীবীদের সংখ্যা পূর্বকার শিল্পজীবীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা

অনেক লক্ষ। কালের সমস্ত টাকাই ইংরেজের, বাঙালীর কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙালিরা যে থলিয়া ও চটের কার্যে আর অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে, তাহার যো নাই। আর অধিক কল চলিলে ব্যবসায় প্রস্তুত করিয়া গুনের কারবার করিলেও কলের সহিত বুঝিয়া ওঠা যাইবে না।

... যদি বাঙালি ধনীগণ অধিক পরিমানে চটের কলে অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে তাহার পরিনামে বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারিতেন। কারণ বাঙ্গালায় অনেক সুবিধা আছে। যেখানে পাট জন্মে সেখানেই কল, পৃথিবীর আর কুত্রাপি এমন সুবিধা নাই। এই সুবিধা থাকাতেই বাঙ্গালায় পাটের কলের এত সমৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, অনুদ্যম ও অনুৎসাহ ধনী বাঙালীদের একটি প্রশস্ত আয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।[২৫] এখানে পাটশিল্পকে চটশিল্পের ধ্বংসের জন্য বিতর্কিত করা হয়েছে। পাটকল প্রধানত বৃটিশ মূলধনে গড়ে ওঠে। তাই এক্ষেত্রে বিতর্ক থাকা স্বাভাবিক। ১৮৫৪ সালে বাংলায় প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। পাটকল স্থাপন ছিল বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের এক বৃহত্তর সোপান। ১৮৮০ সালের পর থেকে পাটের উৎপাদন এবং চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে কলিকাতা কেন্দ্রিক পাটকল এবং ডান্ডী নগরীর পাটকলগুলি বাংলাদেশে উৎপাদিত পাটের প্রধান ব্যবহারকারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পাটচাষ এবং পাটশিল্পের বিকাশের ফলে বাংলার অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এই অর্থনৈতিক উন্নতি নতুনশ্রেণি গঠনে সাহায্য করে। মূলত কৃষিনির্ভর মুসলমান সমাজ অর্থনৈতিক দুর্বলতা কাটিয়ে ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণের ফলে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির গণ্ডিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রভাব শালী শক্তি হিসাবে মাড়োয়ারিদের অভ্যুদয় ইতিহাসের এক প্রধান আলোচ্য বিষয়। বাঙালি ব্যবসায়ী বনাম মাড়োয়ারি যেন বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের এক সূচকসরূপ। ১৯০৭-১৯০৮ সালে বাংলার অর্থনীতি আলোচনা করলে দেখা যায় সেখানে শিল্প বাণিজ্যেও প্রতি বাঙালির আগ্রহ প্রবলতর। যার ফলে অভ্যান্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বার খুলে যায়, যেমন- পরিবহন, ব্যাংক, বীমাখাত প্রভৃতি। বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির ভদ্রলোকদের পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান সুফলভোগী ছিল অবাঙালি শিল্প ও বাণিজ্য পুঁজি। এভাবে দেখা যায় যে পরিবর্তনশীল অর্থনীতি বাংলায় বিভিন্ন ক্ষমতাসীন বাণিজ্যগোষ্ঠীর আবর্তে ঘোরপাক খাচ্ছিল, তার মধ্যে ইংরেজ বানিয়ানদের রাজত্বের সময়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনীতির পরিবর্তন হয়, অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ পরিবর্তিত হয়। সমাজের মানুষদের জীবনধারার পরিবর্তন মানে শ্রেণিগত পরিবর্তন, আর এই শ্রেণিগত পরিবর্তন নিয়ে আসে বৈচিত্রময় জীবন যাপন– যেখানে প্রকাশ পায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন-প্রনালী এবং সমাজে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী সামাজিক স্টেটাস।

ব্রিটিশ আমলে (১৮৫৭-১৯৪৭) বাঙালি মুসলমানের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তৎসময়ের রাজনীতি, অর্থনীতি, গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর গড়ন, শ্রেণিবিন্যাস, বর্ণ বৈষম্য, উৎপাদন ব্যবস্থার প্রকৃতি, জমিদার ও আমলাতন্ত্রের গঠন কাঠামো এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা বাঞ্চনীয়।

বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থাটিকে বেশ জটিলতর না করে সহজতর করে আলোচনা করা যেতে পারে। বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভবই মূলত বাংলার আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের ফল। এ কথা স্বীকার্য। এই আর্থ-সামাজিক বিবর্তন নির্দিষ্ট একটি সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল না– এর আলোচনা ব্যাপক। বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থা মানে হল তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সন্নিবেশন। অর্থের উপর ভিত্তি করে সমাজে মানুষের অবস্থান তৈরী হয়, আর্থিক সচ্ছলতা থাকলে সামাজিক জীবন গতিশীল হয়, প্রাণবন্ত সমাজ সভ্যতার উচ্চস্থানে পৌছে, জাতি, গোত্র, রাষ্ট্রকে করে তুলে উন্নত। অর্থাভাবে সমাজ জীর্ণ হয়, আধপেটা না-খাওয়া, অশিক্ষায় সমাজ আস্তাবলে পরিণত হয়। তাই কোন দেশের বা জাতির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ও অবনতির নিরীখে সেই দেশ। জাতির সার্বিক অবস্থার একটি ধারণা পাওয়া সম্ভব। যেমন ভারতের হিন্দু জাতি ও মুসলমান জাতির মধ্যকার যে পার্থক্য, তা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপট থেকেই সৃষ্ট।

বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও গঠন প্রক্রিয়াটি দেরী করে শুরু বলে বিকাশ পর্বও সংগটিত হয় খুব অতি ধীরে তথাপি বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ বাংলার ইতিহাসের যে প্রেক্ষাপটটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তার গুরুত্ব ইতিহাসে অধিক। উদ্ভবের সেই সময়টিকে থেকে বিকাশ সাধন পর্যন্ত সে ব্যাপ্তিকাল বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তকে ঘিরে রচিত তৎসময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান প্রয়োজন। কয়েকটি ধাপে আলোচনাটি সম্পাপ্ত করা হলো।

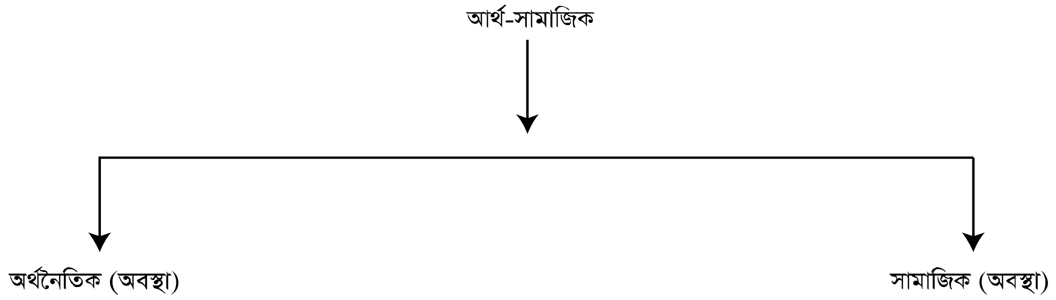

ম্যাকডোনাল্ডের ভাষায় -"...A society with a generally high level of an Achievement will produce more energetic entrepreneurs who, in turn, produce more rapid economic development."[২৬] আলাদা আলাদা ভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়টি আলোচনা করলে আর্থ-সামাজিক অবস্থা (বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের) আরও গাম্ভীর্যপূর্ণ হয়ে, আরও তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে দৃশ্যপট স্পষ্টতর করবে।

সামাজিক অবস্থা ও বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি:

মধ্যবিত্তশ্রেণি মূলত বিত্তের মাপকাঠিতে গড়ে উঠে। এই শ্রেণিটি তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে জীবিকা উপার্জন করে থাকে। সরকারি ও আধাসরকারি বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা, সাধারণ ব্যবসায়ী আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক

এই শ্রেণিভুক্ত।[২৭]বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির সামাজিক অবস্থা আলোচনা করতে গেলে প্রথমে সমাজ অবয়বের পূর্ণ অবকাঠামোগত অবস্থাটি তুলে ধরতে হবে; যে অবয়বে মধ্যবিত্তশ্রেণির বিচরণ রয়েছে। এর সাথে সম্পর্কিত আরও অনেকগুলো শ্রেণিরও আলোচনায় প্রাষঙ্গিকতা পাবে। একইসাথে সেইসব মানুষজনের কথা উঠে আসবে যারা সমাজে ক্ষমতার কেন্দ্রে থেকে ক্ষমতা বণ্টন করে। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি, তাদের দৈন্দিন জীবন-যাপন, সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, শ্রেণি সংকট, সামাজিক বিবর্তন, বিভিন্ন প্রথার বেড়াজালে মুসলমান সমাজ ব্যবস্থা, নগর ও গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থা, স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলন, সমাজে নারীর অবস্থান, নানা কুসংস্কারও সংস্কার নিয়ে সমাজে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির অবস্থান।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভারতীয় মুসলমান মানেই অভিবাসী মুসলিম সম্প্রদায়। পরবর্তীতে বহিরাগত মুসলমানরাই অবাঙালি হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। আমাদের আলোচনারবিষয়বস্তু হল সুফীবাদী বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে; তবে এ কথাও অস্বীকার করার জোঁ নেই যে,বাঙালি মুসলমানদের আলোচনার ক্ষেত্রেসামগ্রিক ভারতীয় মুসলমানদের নিয়ে আলোচনাও গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে স্থান পায়। ভারতীয় উপমহাদেশের অভিবাসী মুসলমানরা অবস্থানুযায়ী নিশ্চিতভাবেই তাদের মাতৃভাষা আরবি, ফার্সি বা তুর্কী নিয়ে এসেছিল। তবে স্থানীয় মুসলমানদের (ধর্মান্তরিত) ভাষা অবশ্যই ছিল বাংলা। মুসলিম বিস্তারনের সময়ের একটিমাত্র সংস্কৃত শিলালিপি ছাড়া সকলই ছিল আরবী ও ফার্সি ভাষায়।[২৮] যেমন: শিলালিপিতে ব্যবহৃত সর-ই-লসুর, শিকদার, মীর-ই-বহর, কোতয়াল, শরাবদার-ই-গায়েব-ই-মুহাল্লি, জামদার-ই-গহয়ব-ই-মুহাল্লি এসবই ছিল ফার্সী ভাষায়। ১৪২৫-১৪৩২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মা-হুয়ান কর্তৃক সংকলিত চৈনিক বিবরন বলছে যে, সার্বজনীনভাবে ব্যবহৃত ভাষা হচ্ছে পাং-কি-লী (বাংলা)।[২৯] সমাজে বসবাস করত বিভিন্ন পদবিধারী ব্যক্তিবর্গ যেমন: ইকতাদার বা মুকতা, ওজির, দবির-ই-খাস, সর-ই-লসুর, আরিজ-ই-লস্কর মিলাহদার, কাজী, শিকদার, মীর-ই-বহর, কোতয়াল, জামদার-ই-গায়েব-ই-মুহল্লী, শরাবদার-ই-গায়েবী-উমুহাল্লী, খান-ই-জাহান, মজলিস-ই-আলা। তৎসময় তথা ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলমানগণ এভাবে ধর্মীয় ও আরবি-ফার্সি কেন্দ্রিকতায় নিজেদেরকে জড়িয়ে রাখতেন।

বাংলার অভ্যন্তরে প্রবাহমান বহু শাখা-প্রশাখা বিজড়িত নদী ও ছোটনদীগুলি ছিল মানুষের প্রানস্বরুপ। তাছাড়াও যেসব ডোবা-জলাশয় ছিল যেসব স্থান হতে আহরিত মাছ, কৃষিজাত জীবন-জীবিকায় অভ্যস্থ ধান হতে প্রাপ্ত চাল, খুদ, শাক-সবজি প্রতিটা মৌসুম ঘুরে বাঙালিদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। চলমান প্রক্রিয়ার বাঙালিত্ব যেন মুখের বাংলা কথায় সুদূর আবহকালের মত স্নিগ্ধ পরশ দিয়ে যেত। এছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহর লখনৌতি ও পান্ডুয়া ছিল এর রাজধানী। সাতাগন (সাতগাঁও) শহর টি মুসলমানদের একটি মোটামুটি সুন্দর শহর হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়।[৩০] গ্রাম বাংলার সামাজিক জীবনপ্রবাহে সমাজ কাঠামোটিকে আঁকড়ে ধরে রাখেবাংলার কৃষক সম্প্রদায়। বাঙালি মুসলমানদের এক বিরাট অংশ কৃষি কাজে নিয়োজিত থাকত, হোক সেটা নিজেদের শখে কিংবা পূর্বপুরুষদের পেশাকে জিয়িয়ে রাখতে। সমাজবদ্ধ মানুষের খাবারের জোগান দিতে নিদারুন কষ্ট, রোদ, ক্লান্তি-ঝড়া কৃষক সম্প্রদায় মাথা পেতে নিত। অত্যন্ত স্বল্প খরচে বাঙালিরা বসতভিটা গড়ে তুলত গ্রামীণ সমাজে বাঁশের বেড়া দিয়ে খড় ও ছনের ছাউনি ছাদ দিয়ে ছোট বারান্দা টেনে ঘর বানাত

সাধারণ মানুষজন; আর শহরে ছিল বেশিরভাগ ইটের ঘর বাড়ি। গ্রাম বাংলার পুরুষরা নদীতে চলে যেত স্নান করতে আর পর্দায় ঘেরা পুকুরে রমনি-আবাল, বৃদ্ধারা নামত স্নান করতে। কেরোসিনের বাতি ঘরে উঠে সন্ধ্যা আমন্ত্রণের পূর্বে প্রতিবেশীরা একজন আরেকজনের গৃহে বসে গাল-গল্প করে সময় কটাত আর পান-সুপারী খেত। শহুরে সমাজ ও গ্রামের শিক্ষিত অভিজাত পরিবারগুলি এই বেলা সান্নধ্য চা পান করত। গ্রাম্য সমাজে বেশি রাতজাগা হত না; ধর্মপ্রান গ্রামের (নারীরা বেশি) প্রাপ্ত বয়স্করা তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাজের আশায় তাড়াতাড়ি শয্যা গ্রহণ করত। এভাবেই চলত বাংলার সমাজ ব্যবস্থা বিবর্তনের ধারায় প্রতিটি আচরণই পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়। বিশ্বায়নের যুগে কোন কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়; তথাপি বাংলার সামাজিক জীবন চিত্তের যে সম্যক রূপ তা ধ্রুব সংখ্যার মত সত্য। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিংশশতকের চল্লিশের দশকের শেষপদ-এ এসে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব, বিকাশ এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করলে দেখা যায় মুসলিমজাতি পরিবর্তনের ধারায় চলতে চলতে নিজেদেরকে সমাজ বিন্যাসের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্বে এনে দাড় করিয়েছে। ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যর্থতা, হাজার হাজার মুঘল শাহজাদা ও আলেমকে হত্যা, বাহাদুর শাহ জাফরের রেঙ্গুনে নির্বাসন, ভারতে মুঘল বা মুসলিম শাসনের অবসান প্রভৃতি ঘটনাপ্রবাহের পটভূমিতে সমগ্র ভারতের অগ্রণী মুসলিম নেতৃত্ব মুসলমান সমাজের ভবিষ্যত সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এইসব ঘটনার প্রেক্ষিতে ভারতে মুসলমান সমাজে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। মুসলমানদের এই সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল একটু অন্যরকম। এখানে একদিকে কেউ বাংলাভাষার চর্চার মধ্যদিয়ে বিবর্তন ঘটাতে ব্যস্ত, অন্যদিকে আবার কেহ উর্দু-ফার্সিকে চর্চা করে বিবর্তন ঘটাতে ব্যস্ত। তবে ইংরেজী শিক্ষা এখন তাদের সকলের কাছে মহামূল্যবান। ইংরেজ শাসনকে গ্রহণ করে এবং ইউরোপের আধুনিক সভ্যতার সাদরে বরন করে বাংলা ও ভারতের মুসলমান সমাজের অগ্রগতি সাধিত হচ্ছিল। আরেকটু সুন্দর করে বললে বলা যায় যে, বাংলায় নবজাগরণ এর শুভসূচনা (মুসলিম) শিক্ষাও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় মুসলমানরা এগিয়ে আসে। ভারতের মুসলমান সমাজের সাথে সাথে বাংলার মুসলমান সমাজও সচেতন হয়ে উঠে। একই সাথে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসক মহলের নীতিরও ব্যাপক পরিবর্তনঘটে।

বাংলা ও ভারতের মুসলিম সমাজে উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে নতুন মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির। সমাজে সভা-সমিতি গঠন, পত্রিকা প্রকাশ, মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশে এ মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি এক অসাধারণ ভূমিকাপালন করে।

বিশ শতকে এসে গোটা বাংলা অঞ্চলে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠে। ১৯০৫ সালের লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, ১৯০৯ সালে মর্লিমিন্টো সংস্কার, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের কর্মের পরিসর বিস্তৃত করে দেয়। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য অন্বেষণ প্রভৃতি বহুমাত্রিক ধারায় বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ অগ্রসর হয়। বিশেষত মুসলিম সমাজ হতে কুসংস্কার দূরীকরণ, সাহিত্য সাধনা, হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস পুনরুদ্ধার মুসলিম মনন সাধনায় এই শ্রেণিটি বিশেষ স্থান দখল করে। উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজের চিন্তা-চেতনার ধারায় উপরোক্ত বিষয়গুলি বিশেষ স্থান দখল করে আসছে। একটি সনাতন সমাজ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে

আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার জন্য মুসলমান সমাজের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। শ্রেণি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, 'শ্রেণি হল একটি আধুনিক অর্থনৈতিক সংজ্ঞা যা নতুন উৎপাদন পদ্ধতি বিকাশের কারণে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।[৩১] বৃটিশ শাসনের ফলে সৃষ্ট সামাজিক অবস্থায় বাংলার মুসলিম সমাজে আমরা প্রধানত দুইটি বিভক্তি লক্ষ্য করি যথা: সনাতন বা Traditionalএবং আধুনিক বা Modern।

Traditional শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রাচীন বাঙালার সমাজের দিকে একটু দৃষ্টি নিবন্ধ করতে হয়। সনাতন শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কে. এম. আশরাফ এই শ্রেণিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন- ক) উলামা ও সাধারণ ধর্মীয় সম্প্রদায়, খ) আহল-ই-কালাম বা বুদ্ধিজীবী এবং গ) আহল-ই-তিঘ্ অথবা সৈন্য বাহিনী।[৩২] এই তিন ভাগের সদস্যরা অভিজাত শ্রেণির অন্তর্গত এবং সাধারণভাবে শাসকদের দেওয়া অর্থানুকূল্যে অথবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে তারা সমাজে টিকে ছিল।[৩৩] তৎকালীন অর্থাৎ প্রাক ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ কাঠামোতে অন্যতম মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন জমিদার। নবাবি শাসকগণ প্রশাসন ব্যবস্থা বিশেষত রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারদের উপর নির্ভশীল ছিলেন। জমিতে বহু ধরনের উচ্চতর স্বার্থের সমন্বিত রুপ হলো জমিদার।[৩৪] নবাবী আমলে ভূমি রাজস্ব পরিচালনায় জমিদার শ্রেণি অপরিহার্য বলে বিবেচিত হতো। সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জমিদারের ছিল দ্বৈত সত্তা। একদিকে সে ভূমিসত্তভোগী প্রজা, অন্যদিকে সে মধ্যস্বত্বভোগী। আধুনিক গবেষক ড. শিরীন আখতার (১৯৮২) বাংলার জমিদারকে সীমান্ত, প্রান্তিক, বড়জমিদার ও ছোট জমিদার– এ চারভাগে ভাগ করেছেন।[৩৫] জমিদারদের এরূপ বিভাজন থেকে অনুমিত হয় যে, বাংলার সব জমিদারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সমান ছিল না। নবাবী বাংলায় প্রাকঔপনিবেশিক বাংলায় জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে একটি বিদ্বান ও ধর্মীয় শ্রেণি গঠিত হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে যদিও তাদের উচ্চ অবস্থান এবং অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য ছিল না; তবুও সমাজের সকলশ্রেণির মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করত। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।[৩৬] তাদের প্রচেষ্টায় বাংলায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটে। বাংলার নবাবগণ বিশেষ করে মুর্শিদকুলী খাঁন ও আলীবর্দী খাঁন অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা ছিলেন এবং তারা বিদ্বান ও গুণীজনের বিশেষ সমাদর করতেন। এই সময়ে বিজ্ঞান ও ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন পাটনার হাজি বদিউদ্দিন।[৩৭] নবাব আলীবর্দীর সময় তাঁর দরবার অলংকৃত করেন মীর মুহাম্মদ আলি ফাজিল। বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন হাকিম হাদি আলী খান। তিনি সে যুগের গ্যালেন ও প্লেটো নামে অভিহিত ছিলেন।[৩৮] *মোজাফফরনামার* লেখক করম আলি (১৭৭২) ছিলেন আলিবর্দীখানের আত্মীয়। *সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন*-এর সৈয়দ গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ (১৭৮১) ছিলেন বিখ্যাত শিয়া পণ্ডিত। তিনি সিরাজ-উদ-দৌলা ও মীরকাশিমের নিকট হতে অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিলেন। বিদ্বান ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা ছিলেন সে যুগের প্রতিভূ। শেখ ও সুফীরা ছিলেন নৈতিক দিক থেকে আদর্শস্থানীয়। নবাব মুর্শিদকুলী খান শেখদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। সৈয়দগণ মহানবীর বংশধর বলে জনগন তাদেরকে খুব সম্মান করত। নবাবী যুগে সুন্নীদের তুলনায় শিয়ারা ছিলেন বেশি সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত। সম্ভবত নবাবদের শিয়া আনুকূল্যই এর প্রধান কারণ। অন্যদিকে হিন্দুসমাজে শিক্ষাদীক্ষায় ব্রাক্ষণদের প্রাধান্য ছিল অক্ষুণ্ন। তবে

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও সামাজিক অধিকার সকলের জন্য উন্মুক্ত হওয়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যান্যশ্রেণির লোকেরাও এর সদ্ব্যবহার করতো। এ সময়ে বৈদ্যরা চিকিৎসা শাস্ত্র এবং কায়স্থরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল। মুসলমানদের ন্যায় হিন্দু প্রভাবশালীরাও এযুগে কবি সাহিত্যিকদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেন। কবি ভারতচন্দ্র ও বানেশ্বর বিদ্যালংকার ছিলেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণদেবের সভাকবি।[৩৯] প্রসিদ্ধ হিন্দু গণিতবিদ শুভংকর ছিলেন এযুগের প্রতিভূ।[৪০] নবাবি আমলে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহলের ভাষা ছিল ফার্সি। মুসলমান হিন্দু উভয় শ্রেণিই আর্থ-সামাজিক কারনে এ ভাষা রপ্ত করতো। এ যুগে (প্রাক ঔপনিবেশিক) হিন্দু-মুসলিম সমাজের এটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মপ্রীতি। নবাবি বাংলায় শেখ, সৈয়দ, পাঠান, মুঘল ছাড়াও কাজি, মোল্লা, ওলামা, ফকির ও সন্ন্যাসীরা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এদের নিয়েই তখন গঠিত হয়েছিল একটি পেশাজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণি। তবে এই মধ্যবিত্তশ্রেণিটিই মূলত নবাব,অভিজাত ও জমিদারদের অনুগ্রহ নির্ভর ছিলো।[৪১] ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার সমাজকে দুইভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। প্রথমত; অভিজাতশ্রেণি যারা শাসনামল হতেই প্রশাসনের সাথে যুক্ত এবং দ্বিতীয়ত, সাধারন শ্রেণি বা স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান।[৪২] অভিজাত শ্রেণির সদস্যরা যুগযুগ ধরে বাংলায় বসবাস করলেও তারা তাদের পূর্বের ভাষা ও সংস্কৃতির লালন করতে থাকে। আর এক্ষেত্রে দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ ছিল তাদের আদর্শ।[৪৩] ফলে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি তাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রবেশ করতে পারেনি। অন্যদিকে মুসলমান সমাজের শতকরা ৯০ ভাগ যারা প্রধানত কৃষিজীবী এবং সমাজের অন্যান্য ছোট খাট পেশায় (কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে ইত্যাদি) নিয়োজিত ছিল, তারা সাধারণ অথবা নিম্নশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪৪] উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজে এই দুটি শ্রেণি 'আশরাফ' (উচ্চ বংশীয়) এবং 'আতরাফ' (নিম্ন বংশীয়) নামে পরিচিত ছিল। ১৮৭২ সালের আদম শুমারীতে দেখা যায় বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা ১.৫২ ভাগ ছিল বহিরাগত মুসলমান।[৪৫] মূলত আধুনিক (Modern)শ্রেণিটি গড়ে উঠে কলিকাতা কেন্দ্রিক। এই শ্রেণিটি প্রধানত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসারের ফলে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে।[৪৬] এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে তিনটি প্রধানভাগে পরিচিত দেওয়া যায়– ক) বাণিজ্যনির্ভর মধ্যবিত্ত খ) পেশাজীবী মধ্যবিত্ত গ) ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত। এই সময়ে গ্রামাঞ্চলেও শিক্ষা সচেতনতার ফলে নতুন সামাজিক শ্রেণির উন্মেষ ঘটে– ক) ব্রিটিশ প্রশাসন সৃষ্ট নতুন জমিদার শ্রেণি খ) নতুন জমিদারের প্রজা গ) জোতদার ঘ) ব্যবসায়ী ঙ) মহাজন শ্রেণি।[৪৭] ১৮৫৮ সালে যখন ভারতীয় উপমহাদেশ বৃটিশ শাসনের আওতার্ভুক্ত হয় তখন আবারও বাংলার সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের রূপটি পরিবর্তিত হতে থাকে। যেহেতু, ব্রিটিশ প্রবর্তিত বিভিন্ন প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে এই নতুন সামাজিক শ্রেণিগুলি সৃষ্টি হয় তাই এই শ্রেণিগুলিকে জানতে হলে সর্বাগ্রে তাদের বিত্তের মাপকাঠির দিকে নজর দিতে হবে। যেমন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দুর্বল বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব যা কিনা বিংশ শতকের বিশের দশকে গিয়ে শক্তিশালী হতে শুরু করে।

ভারতে মুসলমানদের আগমন যে একটি পুরাতন যুগের অবসান ঘটিয়ে নতুন যুগের সূচনা করেছে তা কিন্তু পুরোপুরি সঠিক নয়। এখানে যে পরিবর্তনটি হয়েছিল তা ছিল মূলত ধর্মকে উৎস করে কতিপয় প্রথাগত রূপান্তর। বিশ্ব বিজয়ের গতিপথে মুসলমানরা যেসব বিভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল তাদের মধ্যে ভারতবাসীদের চেয়ে অন্য কেউ আদর্শগতভাবে তাদের

চেয়ে অধিকতর সম্পূর্ণ বিপরীতে ছিল না। ইসলামী আন্দোলনের উৎপত্তি তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক কালের এবং এটা ভারতের প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোর ওপর জোর করে চেপে বসেছিল। এ ঘটনা ছাড়া এটাও সতঃসিদ্ধ বিষয় যে, এটা ছিল মৌলিক বিশ্বাসের সংঘর্ষ। এটা ছিল বাস্তববাদের সঙ্গে ভাববাদের সংঘর্ষ, বাস্তবের সঙ্গে কাল্পনিকের মূর্তের সঙ্গে বিমূর্তের সংঘর্ষ।[৪৮] ভারত উপমহাদেশ প্রসঙ্গে পার্সি ব্রাউনের উপরোক্ত মন্তব্য বাংলা সম্পর্কেও নির্ভুল। কিন্তু বাংলায় ধর্মন্তরণের ফলাফল যে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের চেয়ে গভীরতম ছিল তার প্রমান এই বদ্বীপ অঞ্চলের মুসলমান জনসংখ্যার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়া। বাংলায় ইসলামের জন্য সমস্যাটি সম্ভবত ততটা দুরহ ছিল না, কারণ (১) এ অঞ্চলে সবসময় অনার্যদের প্রাধান্য ছিল;[৪৯] (২) জন্মভূমি অর্থাৎ উত্তর ভারত থেকে সমূলে উৎপাঠিত বৌদ্ধধর্ম ইসলামের আগমনের সময় বাংলার হিন্দু ধর্মের একটি বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।[৫০] অনার্য জনগোষ্ঠী যেকোনভাবেই হোক প্রাক মুসলিম যুগের মর্যাদাবাহী বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নিজেদের অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত করে ফেলেছিল। দেশে যখন এমন একটা প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলছিল তখন ইসলাম ত্রাণশক্তি হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল, যার মধ্যে অনেকেই সহজ-পরিত্রাণ ও সাফল্যের পথ খুঁজে পেয়েছিল। প্রধানত সুফিদের সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার মাধ্যমে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের সাম্য ও ভাতৃত্বে আকৃষ্ট হয়ে বাংলায় দলবদ্ধভাবে ধর্মান্তণ ঘটেছিল। ধর্মান্তরিতদের মধ্যে অনেকেই অন্যান্য ইসলামী গ্রন্থের চেয়ে তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দীর্ঘদিনের রীতি, সামাজিক আচার-আচরণ এবং এমনকি প্রাচীন হিন্দু মহাকাব্য ও সাহিত্যের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত ছিল। অবস্থা যখন এরকম তখন এটা অনুমান করা অস্বাভাবিক নয় যে, কিছু লোকপ্রিয় উপাদান বাংলার মুসলমানদের সাধারন বিশ্বাসে ঢুকে পড়েছিল। বাংলার মুসলমানরা কিভাবে গোঁড়া ইসলামের অনুশীলন করে এবং সেই সাথে সমাজে নানা ধরনের প্রথার সমাবেশ সৃষ্টি করে, সেই সাথে রীতি-নীতিকে ঐতিহ্য হিসেবে বংশের পর বংশ সমাজে চালিয়ে নিতে থাকে তাই বড় দেখার বিষয়। বাংলায় ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে কিভাবে ইসলামীয় প্রথা মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাগুলিকে উপজীব্য করে সাদাত, উলামা ও মাশায়েখরা মুসলমান সমাজের স্নায়ুকেন্দ্রে প্রবেশ করিয়েছিলেন তা আমরা নিম্নোক্ত কতিপয় আলাপচারিতাময় উক্তিরর মধ্যদিয়ে প্রকাশ করতে পারি।

"সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও হরিদাসের আলাপচারিতা"

"সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ হরিদাসকে (বৈষ্ণব সাহিত্যের যবন হরিদাস) বলেছিলেন -

'এটা তোমার সৌভাগ্য যে তুমি যবন হয়েছিলে; তুমি কোন হিন্দু আচার অনুসরণ কর? হিন্দুকে দেখলে আমরা খাদ্য গ্রহণ করি না; তুমি তা (হিন্দু ধর্ম) ত্যাগ কর, যদিও তুমি মহাবংশের (উচুঁ পরিবার) লোক। তুমি তোমার নিজের সম্প্রদায় ও ধর্মের নিয়ম ভংগ কর; পরকালে তুমি কিভাবে (শাস্তি) এড়াবে? অজ্ঞাতবসত তুমি যেসব পাপ করেছ, কালিমা পড়ে তা দুর কর।"[৫১] হরিদাস সম্পর্কিত প্রশ্নটি বাংলা সাহিত্যের একটি বিতর্কিত বিষয়। হিন্দু বর্ণনানুযায়ী চৈতেন্যের জন্মের বহু আগেই তিনি ইসলাম থেকে বৈষ্ণবধর্মে ধর্মান্তরিত হন। কিন্তু যেসব অদ্ভুত ঘটনাবলী তার উপরে আরোপ করা হয় তা সম্পূর্ণ কাহিনী সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করে। চৈতন্য ভগবতের এ উদ্ধৃদাতাংশটিও হিন্দু বর্ণনা। কথিত আছে যে, আলাউদ্দীন

হোসেনশাহ বলেছিলেন কোন হিন্দুকে দেখলে মুসলমানরা আর খাদ্য গ্রহণ করে না। ইসলামে এ ধরনের বাঁধা নেই। মনে হয় হিন্দু কবি অসতর্কতাবশত হিন্দু আচরণের কথা মুসলমানদের মুখে বলিয়েছেন।

এখানে উদ্ধৃত অংশে তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ব, আল্লাহ বার্তাবহ হিসাবে রসূল এবং শেষ বিচারের দিনের প্রতি বিশ্বাসের মতো ইসলামের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতির উল্লেখ করেছেন।

বিজয়গুপ্তের *পদ্মপুরাণে* দেখা যায়–

'হাসানহাটির লোক যখন সাপের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল তখন জনৈক মোল্লা এরকম বলেছিলেন,

"পীর থাকতে তোমরা শয়তানকে অভিবাদন কর কেন এবং আল্লাহ থাকতে কেন তোমরা শয়তানের কাছে মাথা নত কর?"[৫২] এই অংশে আল্লাহ সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও পীরের অতিমানবীয় শক্তিতে বিশ্বাসের উল্লেখ করা হয়েছে।

"কোন এক মুসলমান বসতির কথা বলতে গিয়ে কবি মুকুন্দরাম বলেন, "কলিঙ্গনগর ত্যাগ করে সব জাতের রায়তরা বীর নগরে বসতি স্থাপন করেছিল। বীরের পান গ্রহন করে (চুক্তিতে সম্মতির প্রতীক রুপে) মুসলমানরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। শহরের পশ্চিমপ্রান্তে তাদের দেয়া হয়েছিল। ঘোড়ায় চড়ে সেখানে মুঘল, সৈয়দ এবং রাজীরা এসেছিলেন। গৃহ নির্মাণের জন্য বীর তাঁদের করমুক্ত জমি দিয়েছিল। তাঁরা পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তে তাদের বাড়িঘর তৈরী করে তার নাম দিয়েছিলেন হাসানহাটি। তারা অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে এবং একট লালপাটি বিছিয়ে দিনে পাঁচবার নামায পড়ে। সুলেমানী পুঁতি গুণে তারা পীর ও পয়গম্বরের ধ্যান করে এবং পীরের দরগাতে বাতি দেয়। দশ-বিশজন একসাথে বসে তারা কোরআন-কিতাব পড়ে ও আলোচনা করে, ঢোল বাজায় এবং পতাকা উড়ায়। তারা অত্যন্ত দানিশমন্দ বা জ্ঞানী, তারা কারওর পরওয়া করে না এবং জীবন থাকতে তারা কখনও রোজা বাদ দেয় না। তাদের চেহারা ভয়ংকর, তাদের মাথা কামানো, কিন্তু তারা বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়ি রাখে। তারা সবসময়ই তাদের নিয়ম মেনে চলে, মাথায় দশভাঁজওয়ালা টুপি পড়ে এবং কোমর শক্ত করে বাঁধা হজার (পায়জামা) পরে। টুপি বিহীন কারও সঙ্গে তাদের দেখা হলে তারা কোন শব্দ উচ্চারণ না করে তাকে কাটিয়ে চলে যায়। কিন্তু একপাশে গিয়ে তারা তার দিকে মাটির ঢেলা ছুড়ে মারে।[৫৩] বাংলার মুসলমান সমাজের বিকাশ সম্পর্কিত ব্যাপারটিতে এভাবে দেখা যায় বাংলার সুলতান, উলমা এবং মাশায়েখের এধরনের প্রচেষ্টার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মুকুন্দরামের বর্ণনা থেকে এটাও দেখা যায় যে, তারা ইসলামে দৃঢ়বিশ্বাসী লোক ছিলেন এবং তাদের কর্মতৎপরতা ছিল ব্যাপক। কর্ম তৎপরতার নিরিখে বিভিন্ন ধরনের লোকপ্রিয়, অপ্রিয় উপাদান সম্বলিত প্রথার মেলা বাংলার মুসলমান সমাজে প্রবেশ করেছিল। যেমন- বর্ণ প্রথা, পীরপ্রথা, মোল্লাপ্রথা, পর্দাপ্রথা, রসূল (দঃ)-এর পদচিহ্নের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

মুসলমান সমাজে বর্ণপ্রথা যে ছিল না তা সর্বাংশে সঠিক নয়; মুসলমান সমাজেও হিন্দু সমাজের ন্যায় বর্ণপ্রথা যে রয়েছে তা গবেষণায় পাওয়া গিয়েছে।[৫৪] উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম দিকে প্রতিপত্তি ও মর্যদানির্ভর বিভক্তি মুসলিম সমাজের জন্য ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। যেমন: আশরাফ, আতরাফ, আজলাভ ও আরজাল প্রভৃতি। তা মূলত হিন্দু সমাজের সেই চারটি প্রধান বর্ণের বিভক্তি করনেরই একটি রুপান্তর।[৫৫]ইংরেজীতে 'Caste system' কে বাংলায় জাতিভেদ প্রথা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পর্তুগীজCaste থেকে ইংরেজীCaste শব্দ এসেছে। শব্দটি দ্বারা'Race-Breed'অথবা 'Kind' বুঝায়।

প্রকৃতপক্ষে ‘জাতি’ এবং ‘বর্ণ’ সমার্থক নয়।[৫৬] হিন্দু সমাজের মূল চারশ্রেণিকে ‘বর্ণ’ নামে অভিহিত করা হয়, আর এই কারনেই এই প্রথাকে চতুর্বর্ণ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ‘জাতি’ শব্দটি মূল চারটি শ্রেণি ছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট সামাজিক গোষ্ঠীকে বুঝায়। হিন্দু সমাজে প্রচলিত এই ‘বর্ণ ও জাতি’ সম্পর্কিত ধারনার ভিত্তিতে মুসলমান সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক এই ভেদপ্রথাকে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজের ‘বর্ণ’ বিভক্তি অনুধাবন করার ক্ষেত্রে ‘পেশা’ বা বৃত্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা পেশার মাধ্যমেই একজন ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা নিরুপিত হয়।[৫৭]মূলত পেশাগত বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং ‘বর্ণ’ বিভক্তির জন্ম দেয়। ইসলাম সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্য শিক্ষা দেয়। পবিত্র কোরআনে বর্ণ, জাতি এবং এলাকা নির্বিশেষে সব মুসলমানদেরকে সমান ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে যে কোন ধরনের সামাজিক বৈষম্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু কালের বিবর্তনে ইসলাম ধর্ম দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং নানাধরনের সামাজিক রীতি-নীতি মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে। সুতরাং সামাজিক সাম্য প্রচার করলেও মুসলমান সমাজে এই বর্ণ প্রথা দৃষ্ট হয়। ইসলামের প্রাথমিক পর্বেও এই ধরনের বৈষম্য দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ‘আরব’, ‘আযম’ এবং ‘মাওয়ালি’।[৫৮]হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে এসে মুসলমান সমাজ হিন্দুদের ‘বর্ণ’ প্রথায় প্রভাবিত হয়। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মন্তরিত হলেও তাদের আচার এবং বৃত্তি ছাড়তে পারেনি।

গোত্র এবং বংশ উপাধিও বর্ণ বৈষম্যকে তুলে ধরে। সৈয়দ বংশজাত লোকেরা হোসাইনী, নকভী, ইসমাইলী, বোখারী, কিরমানী প্রভৃতি উপাধি ধারন করতেন। অন্যদিকে শেখ বংশজাত লোকেরা সিদ্দিকী, ফারুকী, আব্বাসী ইত্যাদি এবং পাঠানরা খান, শূর প্রভৃতি, আর মোঘলরা মীর্জা, বেগ, মীর, মল্লিক, লস্কর প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করে।[৫৯] বলা বাহুল্য যে, এইগুলি পেশা বা বৃত্তিগত উপাধি ছিল। শেখ,খান, মালিক ইত্যাদি পদবি ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণ সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী গ্রহণ করত।[৬০] সাম্যের গান ভুলে গিয়ে বর্ণ বৈষম্য যে মুসলমান সমাজকে কতটুকু কলংকিত করেছিল তা আমরা স্বনামদন্য লেখক, ঔপন্যাসিক কাজী ইমদাদুল হক সাহেবের ‘আবদুল্লাহ্’ উপন্যাসে দেখতে পাই। তৎসময়ের সমাজচিত্রের দু’খানি রূপ তুলে ধরলে বর্ণবৈষম্যের মমার্থ স্পষ্টতর হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে ‘আশরাফ’ এবং ‘আতরাফ’ সম্পর্কে সম্মক ধারণা প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলার মুসলমান সমাজের উচ্চতর স্তরে ছিল আশরাফ। আশরাফ মুসলমানেরা প্রধানত বিদেশ হতে আগত (আরব, পারস্য ও আফগানিস্তান) এবং স্থানীয় উচ্চবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত। সামাজিক দিক হতে নিচুস্তরের ‘আতরাফ’ মুসলমানেরা সাধারণ কৃষক, যারা নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত কর্মঅনুযায়ী তাদের মানসম্মান ও সামাজিক মর্যাদা নিরুপিত হত। আশরাফ মুসলমানেরা আতরাফের প্রতি বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে, যেমনঃ ‘রসিল’, ‘আরজাল’ (অতি নিম্নমানের ব্যক্তি), ‘কমিনা’ (ইতর) বা ছোটজাত।[৬১] সাধারণত আতরাফ, আজলাফ ও আরজাল শ্রেণির লোকদের ধর্মান্তরিত দেশীয় অধিবাসী হিসাবে গন্য করা হত। মোঘল ও পাঠানের মধ্যেও কিছু লোক পেশার কারনে আতরাফ-আজলাফের স্তরে অন্তর্ভুক্ত ছিল। আব্দুল্লাহ্ উপন্যাসে সৈয়দ সাহেব লোকদেখানোর জন্যে তার বাড়ির মকতবে ‘আতরাফ’ ছেলেমেয়েদের পড়াতে নিষেধ করতে পারছেন না, অথচ মৌলভী সাহেবকে পরামর্শ প্রদার করেছেনতাদেরকে সবক কম দিতে। ইসলামধর্ম সম্পর্কে এত

খোঁজাখবর রেখেও তিনি সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী নন।"[৬২] পীরপ্রথা আলোচনা করতে গেলে মনে হয় পীর-দরবেশ বসে আছেন আর সবাই তার পায়ের ধূলা নিচ্ছে মাথায় টেকে। যুগের পর যুগ ধরে গ্রামবাংলা ও শহর বাংলার এই রূপের পরিবর্তন তেমন হয়নি যেমনটা হয়েছে সেটা হল পোশাক ব্যবহারে পীর হয়েছেন আরেকটু রুচীসম্পন্ন। তবে কবি মুকুন্দরাম বাংলার সমাজচিত্রে পীরকে চিত্রিত করেছেন পীরকে শিরনি দেওয়ার কথার বাস্তবিক সত্য থেকে। শব্দের মূল বুৎপত্তি অনুসারে পীর শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধ। মানুষ যেসব শিক্ষকের কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করে তিনিই পীর। সুতরাং বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নিম্নরূপ বিভক্তি দেখা যায়– ১৯১০ সালের আদমশুমারিতে এই ধরনের প্রধান ও অপ্রধান মিলিয়ে ৮০ টি পেশা বা বৃত্তির কথা বলা হয়েছে।[৬৩] 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে সৈয়দ সাহেবের প্রকান্ড ব্যক্তিত্ব, তাঁর চারপাশের জগতের উপরে তাঁর প্রভাব, আর সমাজে অপ্রিয় কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও বিচক্ষণ মীর সাহেবের অনাড়ম্বর কিন্তু সুনিশ্চিত সংস্কার-প্রয়াস। -তাছাড়াও আবদুল্লাহ উপন্যাসের, -আবদুল্লাহ, আবদুল কাদের, আবদুল খালেক, রাবেয়া, হালিমা,প্রমুখ মুসলীম নবীন-নবীনা হচ্ছেন বাংলার মুসলিম সমাজের এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষজাত স্ফুলিঙ্গ। এই স্ফুলিঙ্গই অবশ্য ভবিষ্যতের অচঞ্চল আলোকের পূর্বাভাস।[৬৪] 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের সৈয়দ সাহেবের একটি আলোচিত চিত্রন থেকেও সমাজচিত্রে বর্ণ বৈষম্যের সরুপ চিত্রায়িত হতে দেখা যায়-

সাধারণত তাদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।"পীর শব্দটি ইসলামের সুফী বা অতীন্দ্রিয়বাদীদের মধ্যে আধ্যাত্মিক নির্দেশ বা প্রদর্শককে বুঝায়। এ উপাধিধারী ব্যক্তি শেখ, মুর্শিদ, ওস্তাদ নামেও পরিচিত। পীর ফার্সি শব্দ,কিন্তু জন্মভূমির চেয়ে ভারত ও তুরস্কের আধ্যাত্মিক গুরুকে বুঝাতে সাধারণত এটা বেশি ব্যবহার করা হয়। বিশেষ অর্থে শেখ ইসলামের সর্বত্রই সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে; মুর্শিদও ব্যাপক প্রচলিত তবে তুর্কি বা আরবী ভাষা-ভাষী দেশে, ভারতে তেমন নয়। ওস্তাদের প্রচলন পারস্যে দেখা যায়।[৬৫] বাংলার মুসলমানদের সমসাময়িক শিলালিপি গুলোতে শেখ ও মখদুম শব্দগুলিও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও পীরের উল্লেখ নেই। এই একটি ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, বাংলার সুলতানদের প্রায় সবগুলি শিলালিপিই আরবীতে উৎকীর্ণ এবং এগুলিতে ফার্সী প্রক্ষেপ অতি বিরল হওয়ায় এগুলিতে পীরের কোন উল্লেখ নেই। যাই হোক মুকুন্দরামের সাক্ষ্য এই ইঙ্গিত দেয় যে, বাংলায় সুলতানী আমলেও সুফীরা জনসাধারণের কাছে পীররূপে পরিচিত ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণেও পীর শব্দটি পাওয়া যায়। শেখ বা পীর কে নৈবদ্য প্রদান, যাকে মুকুন্দরাম শিরনি বলেছেন এবং সে শব্দটি আজও লোকপ্রিয় বাংলায় এবং ভারত উপমহাদেশের অন্য একটি অত্যান্ত জনপ্রিয় এবং ব্যাপক প্রচলিত রীতি ছিল এবং এখনও আছে। শেখ বা পীরকে নৈবেচ্য প্রদানের বহু দৃষ্টান্ত আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মুকুন্দরায়ের উল্লেখিত শিরনি সম্ভবত একজন জীবিত পীরকে দেবার নির্দেশ না করে বরং সুফীদের দরগাহে শিরনি দানের নির্দেশ করছে। সুতরাং দরগাতে শিরনি প্রদান এবং উরস অনুষ্ঠান যা আজও অত্যন্ত জনপ্রিয়, এগুলির শুরু হয়েছিল সুলতানী আমলে। শেখ, মখদুম বা পীর যে নামেই তাদের ডাকা হোক না কেন, তারা ইসলামের আদর্শ নীতির প্রতি গভীর নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত অনাড়ম্বর এবং নীতিনিষ্ঠ জীবন-যাপন করতেন। সম্পত্তির মালিক হতে তারা ছিলেন বিমুখ এবং তাদের অনেকেই জাগতিক কোন লাভের প্রতি মনোযোগী ছিলেন না। শাসকদের সঙ্গে কোনরুপ যোগাযোগ

রাখাও তাঁরা পছন্দ করতেন না। কিন্তু কালক্রমে পীরপ্রথার এ নীতি নিষ্ট জীবনে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল।পীরপ্রথা একটি বংশগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। একজন পীরের ছেলে অপরিহার্য ফলসরূপ পীর নন; একজন ব্যক্তি তিনি শেখের বংশধর হলেই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারেন না। বাংলায় শেখ আলাওল হকের পরিবার অন্তত পক্ষে পঞ্চম প্রজন্ম পর্যন্ত কিছুসংখ্যক আধ্যাত্মিক উন্নত সুফী সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন পীরপ্রথা, অবশ্য পীরের অতিমানবীয় শক্তির ধারনা এবং দরগাহকে কেন্দ্র করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচরনের জনপ্রিয় উপাদান গুলির উৎপত্তি বাংলায় জন্ম নেয়নি, বরং উত্তর ভারতের মধ্যদিয়ে অধিবাসীরা প্রথাটিকে মধ্যএশিয়া থেকে আমদানি করেছিল। তবে বাংলায় একটা উর্বর ভূমি পেয়ে বিষয়গুলি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার স্থানীয় বৌদ্ধ জনগোষ্টীর মধ্যে চৈত্য এবং স্তুপগুলিকে ফুল ও জলন্ত ধূপ দিয়ে পূজা করার রীতি প্রচলিত ছিল। হিন্দুদের মধ্যে অবতারবাদে অনুরুপ একটি ধারণা ছিল। তাদের মধ্যে পীরতান্ত্রিক গুরু বা শক্তি সম্প্রদায়ের শিক্ষকরূপে দেখা দেয়। কাজেই অবাক হওয়ার কিছুই নেই যে, ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা পীরবাদকে তাদের নিজেদের ঐতিহ্য কুসংস্কারের সদৃশরূপে দেখতে পেয়েছিল যেখানে মুসলমান পীরদের সমাধি বা চিল্লাখানা এখন রয়েছে তাদের অনেক গুলিই আদিতে হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থান ছিল।[৬৬]

মোল্লা শব্দটি একজন স্কুল শিক্ষক, চিকিৎসক, জ্ঞানী ব্যক্তি, বিচারক এবং যাজককে বুঝায়। সুতরাং মোল্লা হচ্ছে আলিমদের সমতুল্য এবং মুসলমানদের প্রাথমিক ইতিহাসে তাকে সেভাবেই বিবেচনা করা হত। বাংলা সাহিত্যে মোল্লা শব্দের ব্যবহার এক রকম আবার মোল্লাশব্দটি মূলত অর্ধশিক্ষিত মুসলমান যাজকশ্রেণিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয় যারা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি পালনে সাহায্য করে। সুলতান নাসির উদ্দীন নসরত শাহের একটি শিলালিপিতে মোল্লাকে একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। একটি মসজিদের ওয়াকফ সম্পত্তি সম্পর্কে শিলালিপিতে বর্ণনা করা হয়েছে কবি বিজয়গুপ্ত মোল্লাদের ক্রিয়াকর্মের সাথে আবার আরেকটি বিষয় যুক্ত করেছেন তা হল– সমাজজীবনে বিপদে পতিত হওয়া মনুষকে বিপদ হতে উদ্ধার হওয়ার জন্য তাবিজ দেওয়া।[৬৭]মোল্লাপ্রথা সম্পর্কে বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা একটি ছোট্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তখনকার দিনে টাকায় আটমণ ত্রিশ সের চাল বিক্রি হত। যাই হোক না কেন তাদের আয় ছিল অনিয়মিত। কারণ তাঁরা বেতনভূক্ত চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন না। সুতরাং মোল্লারা ধর্মীয় বা সামগ্রিক অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করে যে সামান্য আয় করতেন তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

'ক্রীতদাস প্রথা ও বাঙালি মুসলিম সমাজ' বিষয়টি যতটা সহজ মনে হয় প্রকৃতপক্ষে ততটা সহজ নয়। দাস প্রথা প্রাক ইসলামী যুগে প্রচলিত ছিল, দাস প্রথা পাশ্চাত্যে ছিল, দাসপ্রথা প্রতীচ্যে ছিল, প্রাচ্যে ছিল এবং সর্বত্র আজো আছে; তবে ব্যপকতর ভাবে নয়। বাঙালি মুসলিম সমাজের অবয়বের দিকে তাকালে ক্রীতদাস প্রথার ঐতিহাসিক চিত্রটি পরিস্ফুট হয়। উচুঁ শ্রেণির ব্যক্তিরা মূলত গৃহকর্মের জন্য ক্রীতদাস রাখত। এইভাবে মসজিদটি ওয়াকফ শ্রেণিভুক্ত মোল্লা এবং আরবগন (জমিদার বা কর্মচারী বা গ্রাম প্রধান) বিশ্বাস করত ওয়াকফকে প্রতারনা করলে আল্লাহর অভিশাপের শিকার হতে হয়, বিধায় এ ধরনের প্রতারনা নিরোধ করা গভর্নর ও কাজীদের আন্তরিক দায়িত্ব, যাতে শেষ বিচারের দিনে তাদের দুষ্কর্মের জন্য তারা ধরা না পড়ে।[৬৮] মুকুন্দরাম মোল্লাপ্রথার একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'নির্বাহ এবং বিয়ে অনুষ্ঠান

সম্পাদন করার জন্য মোল্লাহকে ডাকা হতো এবং পারিশ্রমিক হিসাবে তার চার আনা দেয়া হতো। মুরগি ও ছাগল জবাই করার জন্যও মোল্লাকে ডাকা হত। একটি মুরগী জবাই করার জন্য পারিশ্রমিক হিসাবে তাকে দেওয়া হত দশ গণ্ডা কড়ি অর্থাৎ এক পয়সার এক তৃতীয়াংশের মতো। ছাগল জবাই করার জন্য তাকে ছয় কুড়ি কড়ি অর্থাৎ এক পয়সার মতো এবং তাকে ছাগলটির মাথাও দেওয়া হতো।[৬৯]এ জন্য ক্রীতদাসও ক্রীতদাসী উভয়ই নিযুক্ত করতেন। রিয়াজে সারওয়া, গুল এবং লালাহ্‌ নামের তিনজন ক্রীতদাসীর প্রতি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজমশাহের স্নেহের উল্লেখ রয়েছে।
আজমশাহের পরবর্তী গৃহের একজন বাঁদির (ক্রীতদাসী) কথা বিজয়গুপ্ত উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী সুলতানদের দ্বারা নিযুক্ত আবিসিনীয় ক্রীতদাসরা সিংহাসনের জবরদখলকারী হয়ে দাঁড়ায়।

বাজারে ক্রীতদাস বেচা-কেনা হতো। ইবনে বতুতা আশুরা নামে এক সুন্দরী ক্রীতদাসী কিনেছিলেন।

আরেক বিখ্যাত পর্যটক বারবোসা বলেছেন যে, তাদের পিতা-মাতার কাছ থেকে যারা তাদের চুরি করে নিয়ে আসত তাদের কাছ থেকে ধর্মহীন বালকদের কেনার জন্য মুসলমান ব্যবসায়ীরা দেশের অর্ন্তভাগে যেতেন। এভাবে কেনা বালকদের খোঁজ করে (যে প্রক্রিয়ায় অনেকেই মারা যেত) ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হতো। লোকেরা এসব বালকদের তাদের স্ত্রীদের বা সম্পত্তির পাহারাদার হিসাবে বা অন্যান্য গৃহকর্মে নিযুক্ত করত।
বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির সামাজিক অবস্থান আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি ক্রীতদাস প্রথা এখনও বহন করছে। বিশ শতকের ক্রীতদাসীরা আজ পরিচিত গৃহপরিচারিকা হিসেবে। ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীরা সামান্য অর্থের বিনিময়ে, এক-দুবেলা খাবার খেয়ে বড়ই অমানবিক জীবনযাপন করে। পরবর্তীতে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির উন্মেষের ফলে মুসলমান সমাজ হতে ক্রীতদাস বা দাস প্রথার সাময়িক বিলুপ্তি ঘটে।
বাঙালি মুসলিম সমাজে বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ সবটা ঘিরে যদি কোন আলোচনা যা মুসলিম সমাজ হতে উত্থিত তা হলো নারীর অবস্থান তথা নারীর কথা। নারীর কথা বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনেকগুলি চরিত্র স্বংবলিত কতকগুলি নারীর মুখাকৃতি। সমাজপ্রেক্ষিতে মুখাকৃতিগুলি কিন্তু বাস্তব সত্য। যেমন– গ্রাম্যসমাজে নারীর চিত্র এক আবার শহুরে সমাজে আরেক, আবর শিক্ষিত সাত্ত্বিক নারীর চরিত্র এক, অশিক্ষিত তবে সংস্কৃতি সচেতন এক, কোথাও আবার অশিক্ষিত সচেতন (সর্বদিকে) এক। যে যেমনই হোক প্রয়োজন আবরণ। আদিম যুগে বস্ত্র আবিষ্কার বা নব্যপ্রস্তর যুগের আবিষ্কারের সাথে সাথে মানুষ সভ্য হতে শুরু করে। তার মানে হল মানব শরীর বস্ত্র দিয়ে ঢেকে চলার এক অপর নাম সভ্যতা (civilization)। সভ্যতা কিন্তু কখনও বিতর্কিত হয় না বরং মানুষই সভ্যতার ধ্বংসকারী আবার সৃষ্টিকারী। নোংরা সভ্যতা মানবের কথ্য হয় না। তাহলে মুসলিম সমাজে নারীর এমন কোন চলাফেরা সমাজপতিরা অবলোকন করল যেখানে বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তাকে ছাপিয়ে তাদেরকে এমন ভাবে ঢেঁকে দেওয়ার ব্যবস্থা হলো যে চোখ দেখলেও পাছে নোংড়া সভ্যতার উন্মোচন হয়, প্রশ্ন থাকতেই পারে? ইসলাম ধর্ম ও নারী সর্বদাই যেন এক সংঘর্ষের বিষয়। যে সমাজে নারী কোনঠাসা হতে হতে শূণ্যে বিলীন হয় যেখান হতে তার গলার একটি শব্দও শোনা যাবে না, তার আর্তনাদ কারওর মন ছোঁবে না, যেখান থেকে হাঁটার সময়

পায়ের আওয়াজ শোনা যাবে না, নবউত্থিত সূর্যের আলো, স্নিগ্ধ চাঁদের আলো, বৃষ্টির পানির একটি ফোঁটাও যেখানে প্রবেশ করবে না; ঠিক সেখানেই যেন হয় কামিয়াবী ইসলাম। সেই ঘরের পুরুষরা গর্ব করে, সেই সমাজের সবাই আত্মতৃপ্ত হয় পাপাচার হীন সমাজ বটে যেখানে ইসলাম মানেই শান্তি। সংঘর্ষ ঠিক এই মনোবৃত্তি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সাথে সমস্ত মুসলিম নারী জাতির। তবে এওত সত্য সমাজে বিদ্যমান কিছু সংখ্যক নারী নিজেই নিজেকে শতআবরনে বেঁধে পরকালের কার্য সমাধা করে। ইসলামে অবরোধ নেই,আছে ইসলামী শরীয়তের ‘ হেজাব ও তদনুমোদিত’ , ‘হারেম’ অর্থাৎ নারীর আবরণ ও অন্তপুর।[৭০] ডাক্তার শামস উদ্দীন আহমদ সাহেবের কথাটিকে বিশ্লেষণ করলে ঠিক এই বিষয়টি বুঝা যায় যে, ইসলামে অবরোদ নেই কিন্তু পর্দা আছে। অর্থাৎ , চার দেয়াল থেকে নারী তুমি বের হও তবে সত্বর ঢেকে বের হও, কেউ যেন তোমাকে দেখতে না পায়, তোমাকে দেখতে পেলে অনাচার হতে পারে; দেখা যায় পর্দাপ্রথা এখানে বিবেচ্য এবং চলমান থাকবে এটাই লেখকের প্রত্যাশা। পর্দা প্রথায় ঘেরা বাঙালি মুসলিম সমাজ এ অন্তর্ভুক্ত নারীর চরিত্র চিত্রনে বাঙালি মুসলিম কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর বিচার দেখতে পাওয়া যায় তাদের রচনা-শৈলিতে।

ডঃ মোহাম্মাদ লুৎফর রহমানের বিখ্যাত উপন্যাস ‘রায়হান (১৯১৯), এতে তৎসময়ের নারীর স্বাধীনতার আবশ্যকতার সাথে তার উপর অর্পিত অবরোধ ও পর্দাপ্রথার প্রতিক্রিয়া পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেমনঃ করিমা চরিত্রধারীনি সেই রমনির মুখ নিঃসৃত যে ভাষণটি লুৎফর রহমান একেছেন তা অতীব ক্ষুরধার অথচ পর্দা মেনে গ্রাম্য এক সভায় করিমার বক্তব্যটি ছিল নারী জাগরণের উপর। বিদ্রোহ বাণী নিয়ে নিম্নোক্ত ভাবে বাণীটিবের হয়ে আসে- “বঙ্গের নারীর অপরিসীম দুঃখের একমাত্র কারণ অবরোধ প্রথা (পর্দা নহে)। মুর্খতা ও মিথ্যা লজ্জার প্রশংসা। .... নারী নিরাপদ ওয়েটিং রুমে দাঁড়াইয়া বা অন্ধকারে ছুরি দিয়া সতীত্ব রক্ষা করিবে না সে পুরুষের মত আলোকে দাঁড়াইয়া সকলের সম্মুখে নীরব ভাষায় বলিবে-আমাদের ব্যক্তিত্বের মর্যাদা আছে। আমরা মাথা, হাত ও পায়ের সম্পূর্ণ ব্যবহার চাই।[৭১] লুৎফর রহমান কারিমাকে তার বক্তবব্যের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে– নারীর দুর্দশার জন্য অবরোধ প্রথা দায়ী; পর্দা প্রথা নয়। লুৎফর রহমান তাইপর্দার মর্যাদাকে সমুন্নত রেখে নারীর অবরোধমুক্তির কামনা করেছেন। আবুল হুসেন (বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লেখক) ইসলাম ধর্মের কোন কোন আদেশকে সামাজিক নিগ্রহের কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। নারীর পর্দা ও বোরকা পরার আদেশ তার অন্তর্ভুক্ত। পর্দা ও বোরকা সম্পর্কে তার বক্তব্য অনেকের চেয়ে ভিন্ন। তাঁর মতে, পর্দার মূল উদ্দেশ্য নারীর সতীত্ব রক্ষা করা। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেছেন, পর্দা মুসলমান নারীর সতীত্ব রক্ষার পরিবর্তে সতীত্ব নষ্ট করছে বেশী। “আদেশের নিগ্রহ” (বাংলা ১৩৩৬) প্রবন্ধে এ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ “পর্দা আজ মুসলমান নরনারীর পাশবিক প্রবৃত্তি প্রখর করে তুলবার জন্য একটি বক্ষাস্ত্র হয়ে উঠেছে। ...নারীকে পর্দায় রাখা হয় এই উদ্দেশ্যে যে তার প্রতি পুরুষের দৃষ্টি না পড়ে এবং তার সতীত্ব নষ্ট না হয়...। কিন্তু বর্তমান মুসলমান সমাজে ...পর্দার অন্তরালে মুসলমান নারীর দুর্বলতা এরুপে লালিত হতে থাকে যে, তার ব্যক্তিত্ব একেবারেই পুষ্টিলাভ করতে পারে না, ফলে সামান্য ইঙ্গিতে বা প্রলোভনেই সে পাশবিক লালসার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয় কারণ পর্দা তাকে অতি শৈশব হতেই ঐ একটি মাত্র বস্তু অর্থাৎ সতীত্বের কথা ভাবতে অভ্যস্ত করতে গিয়েই ঐ লালসাকে পুষ্ট করে তোলে।[৭২] লেখক এখানে কি বুঝাতে চেয়েছেন? তিনি সমাজের চোখে

আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে– মুসলমান নারীর স্বাস্থ্যহীনতা ও কর্মে উদাসীনতা এবং তাদের সংসারে নিরানন্দ ও কলহের জন্য আবুল হোসেন পর্দাকেই দায়ী করেছেন, বোরকা নারীর জন্য অপমানজনক ও লজ্জাকর বলেই তিনি মন্তব্য করেছেন। অপরদিকে আবার নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হুসাইন; যিনি নারীর পর্দার ব্যাপারে কোন আপত্তি করেননি বরং তাঁর আপত্তির কেন্দ্র ছিল 'অন্তঃপুর,। তাঁর বিখ্যাত "অবরোধ-বাসিনী' (১৯৩১) তে লেখিকা অবরোধ প্রথার মূলোচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নারীরা পর্দা তথা সুরুচি ও শালিনতা বিসর্জন দিক এটা তিনি কখনও কাম্য মনে করেন নি। তবে সমাজে যাদের বিরুদ্ধে নারীজাতিকে তিনি সজাগ করেছেন, কোন দুর্বলতাকে পুঁজি করে পুরুষ সমাজ-এর কর্নধারেরা নারীকে পর্দার ঠিক ওপারে আবদ্ধ করে রেখে দিয়েছে সেই দুর্বলতাকে চিনতে। তাহলে প্রশ্ন আসে নারীর দুর্বলতা কি? তাকে নিজের চোখে তার খোঁজ করতে হবে। আমাদের বিংশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় এখনও এত এত যুগের পরও সেই দুর্বলতম অবস্থার প্রেক্ষিতে চলে পর্দার অবিরাম অবগাহন। দুর্বলতা আসলে কোনটি? সেটিই হল সতীত্ব, যার জন্য স্বত্বর ঢাক, পর্দা কর। কিন্তু যদি আপন শক্তিতে এই দুর্বলতাকে উপেক্ষা করা যায় তাহলে সতীত্ব রক্ষার্থে অস্ত্র হবে মনের শক্তি, অস্ত্র হবে মুষ্টিবদ্ধ হাতের পাঁচ আংগুল কিংবা পিস্তল; পর্দা নয়। শালীনতা এবং সুরুচি সুস্থ সভ্যতার পরিচায়ক। সেক্ষেত্রে নারীর পর্দাপ্রথা শালীনতার ব্যাপারে ঠিক আছে তবে পর্দাকে উপজীব্য করে নারীকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়া সুধী মুসলিম সমাজের এক ধরনের অপরাধ বটে।

কাজী নজরুল ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করতেন না। তাঁর 'সাম্যবাদী' (১৯২৫) কাব্যের "নারী" কবিতায় তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন: "যে-ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ। ...দূর করে দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ। ...সেদিন সুদূর নয়- যেদিন ধরনী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়।[৭৩] বাংলার এবং বাংলার বাইরে কদম রসুলের পাথরের প্রতিকৃতি সবসময়ই মুসলমানদের শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। মধ্যএশিয়ায় এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হচ্ছে দামেস্কের মসজিদ-ই-আকদম। এসব পদচিহ্ন সম্পর্কে ইবনে বতুতার বিবরণ এ রকম: "দামেস্কের বিখ্যাত পবিত্র স্থান গুলির মধ্যে একটি হচ্ছে কদম রসুল মসজিদ (আল-আকদম)। এটা শহরের দু'মাইল দক্ষিণে হিজাজ, জেরুজালেম এবং মিশরে যাবার প্রধান সড়কের পাশে অবস্থিত। পদচিহ্নগুলি হতে এর নামকরণ করা হয়েছে এবং এগুলি সেখানকার একটি পাথরে চাপ প্রয়োগ পূর্বক দেয়া হয়েছে। কথিত আছে যে, এগুলি মুসার পদচিহ্ন । এ মসজিদে ছোট একটি কক্ষে একটি পাথর আছে যাতে উৎকীর্ণ আছে, "জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি স্বপ্নে মনোনীত ব্যক্তিকে (মুহাম্মদ) দেখতে পেয়েছিলেন, যিনি তাকে বলেছিলেন, "এখানে আমার ভাই মুসার সমাধি।"[৭৪] গৌড়ের কদম রসুল অট্টালিকা, চট্টগ্রামের কদম মোবারকের (আদিতে রসুল নগর নামে পরিচিত) কদম মোবারক মসজিদ এবং চট্টগ্রামের দোহাজারির কাছে বাগিচাহাট মসজিদের মতো বাংলার বহু জায়গায় রসুল (দঃ)-এর পদচিহ্নের পাথরের প্রতিকৃতি রক্ষিত আছে। এগুলোর মধ্যে গৌড়ের কদম রসুল অট্টালিকাটিই সবচেয়ে পুরাতন। সুলতান নাসির উদ্দিন নসরত শাহ ৯৩৭ হিঃ (১৫৩০-১৫৩১ খ্রি.)-এ অট্টালিকাটি নির্মাণ করেছিলেন। অট্টালিকা নির্মাণের স্মারক শিলা লিপিতে লেখা আছে, " এ পবিত্র মঞ্চ ও রসুলের" তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক পায়ের ছাপযুক্ত পাথর মহান দয়ালু সুলতান স্থাপন করেছিলেন...।

চট্টগ্রামের বাঁশখালি উপজেলায় কদমরসুলের নামে একটি গ্রামও আছে। সীতাকুন্ড থানায়ও ঐ নামের একটি গ্রাম আছে। গ্রাম দুটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত; সেখানে কোন পদচিহ্ন নেই। কিন্তু এ নাম সম্ভবত সেখানে ইতিহাসের কোন এক কালে সংরক্ষিত পদচিহ্নের স্মারক। একথা সর্বজন স্মীকৃত যে, ইসলামী বিশ্বে রসুল (দঃ)-এর পদচিহ্নের প্রস্তর-প্রতিকৃতির দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এ-প্রথা নিশ্চিতভাবেই মুসলমান অভিবাসীরা বাহির থেকে বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন। রসুল (দঃ) এর পদচিহ্নকে বাঙালি তথা সারাবিশ্বের মুসলমানরাই সবসময় পবিত্র বলেই বিবেচনা করে। এর প্রমাণ আমরা সমসাময়িক মুসলিম শিলালিপি ও মুদ্রায় সুলতান ও অভিজাতবর্গের দীপ্তমান কন্ঠের সূরে, বক্তব্যে দেখতে পাই। তারা একথা গর্ব করে বলতেন যে, রাসুল (দঃ) এর পদচিহ্ন পরিদর্শন করে এসেছি।

বাংলার মুসলিম সমাজে পরবর্তীতে ‘রাসূল (দঃ) এর পদচিহ্ন প্রথা ধর্মপ্রান বাঙালি মুসলমানদের এক মনঃস্তাত্ত্বিক সাধনার মূর্ত প্রতীক হয়ে চলমান রয়েছে।

এইসব সামাজিক প্রথা কখনও সমাজে বিদ্যমান বাংলার মানুষদের জন্য হিতকর হয়েছে; আবার কখনও এর বিপরীতটাও লক্ষ্য করা যায়। এই ভৈপরিত্যের কারণে প্রথাগুলি সমাজের ভিতকে কাঁপিয়ে তুলতে পেরেছিল। সমাজের মানুষজনও প্রথাগুলির প্রতি ছিল কখনও সংবেদনশীল আবার কখনও অসংবেদনশীল। তবে সংবেদনশীলতার প্রভাব যত জোড়ালো হয় প্রথা ততবেশি পরিমানে সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে প্রতিপাদ হয়ে থাকে এবং তা হয় চলমান। সমাজ পরিবর্তনে (রক্ষণশীল) কতিপয় বাংলার বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিশেষ ভাবে প্রথা নিয়ে ভেবেছিল। ফলে প্রথা হয়েছে কখনও আলোচিত আবার কখনও সমালোচিত।

১৮৫৭-১৯৪৭ সালের মধ্যে মুসলমান সমাজের অবস্থা নিয়ে তৎসময়ের প্রায় অধিকাংশ পত্রপত্রিকা বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করে ঠিক এভাবে– ছোটবড় সবরকম চাকুরি ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য সম্প্রদায় বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের হচ্ছে। সরকার সবশ্রেণির প্রজাকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য। কিন্তু জমানা এমনই হয়েছে যে, প্রকাশ্যে মুসলমানদের বাদ দিয়ে গেজেটে চাকরির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সম্প্রতি সুন্দরবন কমিশনারের অফিসে কয়েকটি চাকুরী খালি হলে সরকারি গেজেটে সে সম্পর্কে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়, পদগুলি কেবলমাত্র হিন্দুদেরই দেওয়া হবে। সংক্ষেপে বলা যায়, মুসলমানরা এখন এমন নিম্নস্তরে নেমে গেছে যে, উপযুক্ততা থাকলেও সরকারি বিজ্ঞপ্তির বলে তাদের অবস্থাটা বিবেচনা করে দেখে না; এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও তাদের অস্তিত্বই স্বীকার করতে চান না।[৭৫] এরকম অবস্থা চলতে চলতে প্রায় প্রতিটিক্ষেত্র, যেসব ক্ষেত্রকে সিঁড়ি ধরে মানবের উন্নতি হয় সর্ববিষয় হতেই বঞ্চিত ছিল মুসলমান সমাজ। ফলে যখন শক্তিশালী শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণি মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে ঠিক সেই সময় মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণি (শিক্ষিত) গঠন করতে হলে শিক্ষাকে তথা চাকুরি উপযোগী পাশ্চাত্য শিক্ষাকে কিভাবে আকড়ে ধরতে হয় বরং তাও বুঝে উঠতে পারে নি।

এখন কথা হচ্ছে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি তৈরী না হওয়ার পিছনে কেবল ইংরেজরাই দায়ী ছিল (উপরোক্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে) নাকী এই দূরাবস্থার জন্য তারা নিজেরাই নিজেদের কর্মফল ভোগ করছে। ইংরেজরা মূলত মুসলমানদেরকে কখনও বিশ্বাস

করে নি; এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্যা নিয়ে পাছে বহির্বিশ্বের কোন দেশ মাথা ঘামায়, এজন্য ইংরেজ এদেশটিকে নিজের ঘরোয়া ব্যাপার হিসাবে সবাইকে সতর্ক করে দূরে রাখত। মুসলমানদের জীবন-যাপনের উদাসীনতা তথাপি ইংরেজদের তাদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি সবকিছু নিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয়পাদ ছিল ভারতীয় তথা বাংলার মুসলিম সমাজের চরম দুর্দিন।

বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থার বোধগম্য আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক অবস্থাটিকে আলাদা করে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। উল্লিখিত সময়ের গণ্ডির ভেতর থেকে যেমন (১৮৫৭-১৯৪৭) প্রায় এক থেকে দেড়শত বছর পূর্বের কিছু আলোচনাও এখানে ধারাবাহিকভাবে যুক্ত হয়েছে নিতান্তই বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিরিক্ষে সত্যতা প্রকাশের জন্য। বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপট ও চলমান গতিধারার সমন্বয়বাদিতাই মূলত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির আর্থিক অবস্থার স্বররূপ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে।

প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষ একটি কৃষি প্রধানদেশ। প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় এবং ধন সম্পদের মোহে প্রাচীন ও মধ্যযুগে অনেক বিদেশী শক্তি এদেশে এসেছে। তাদের অনেকে ফিরে গিয়েছে, আবার অনেকে এদেশের সংস্কৃতির সাথে নিজেদেরকে বিলীন করে দিয়েছে। কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে এদেশে ইংরেজশক্তির আগমন ও ক্ষমতা গ্রহণ ছিল পূর্বের যেকোন অবস্থার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।[৭৬]এ বণিক রাজ ছিল সম্পূর্ণ ভাবে পুঁজিবাদী ভাবধারায় প্রভাবিত। বাণিজ্য পুঁজির বিকাশ ও সম্প্রসারণ ছিল মূলত তাদের অন্যতম লক্ষ্য।[৭৭]নবাবী ও কোম্পানি যুগের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকে মানুষের জীবনযাত্রার মান অবনতির দিকে মোড় নেয়। প্রাক ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ভিত্তি ছিল বস্ত্রশিল্প, হস্তশিল্প, আফিম ও শর্করা। কোম্পানি শাসনের শেষ নাগাদ এ সব উপাদান গুরুত্ব হারায় এবং প্রাচীন অর্থব্যবস্থার ধ্বংসস্তুপের উপর আর্বিভাব ঘটে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির, যাতে যুক্ত হয় নতুন উপাদান, যেমন: নীল, পাট, চা ও আধুনিক শিল্প। তবে সাধারন অর্থনীতি তখনও ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। উনিশ শতকের গোড়া থেকে জনসংখ্যাবৃদ্ধি একদিকে যেমন কৃষি সম্প্রসারণে সহায়ক হয়, অপরদিকে তা জমির উপর চাপ সৃষ্টি করে। পতিত জমি আবাদের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রাথমিক চাপ ছিল অর্থনীতির অনুকূলে। কিন্তু অনাবাদী জমি ক্রমশ কমে আসার পর অতিরিক্ত জনসংখ্যা সাধারণ অর্থনীতির নিরিখে এক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৭৯-৮০, সাল থেকে পাটশিল্পের প্রসার অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং ১৯০৯-১০ সালে এই প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ পর্যায় পৌছায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পাটশিল্পের উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি পেলেও সহসা এই খাতে মন্দা দেখা যায়। তবে এই মন্দা দ্রুত কেটে যায় এবং পাট শিল্পের হারানো চাহিদা ফিরে আসে।[৭৮] বিশ শতকের শুরুতে পাটের বিকল্প না থাকায় পাটজাত দ্রব্যাদির চাহিদা ছিল সারা বিশ্বে। এই চাহিদার ৯০ ভাগ পাট উৎপাদিত হত বাংলায়। এর দুই তৃতীয়াংশ উৎপাদন আসত পূর্ব বঙ্গ থেকে। আবার পূর্ববঙ্গের শুধু পাঁচটি জেলাতে ৭০ ভাগ পাট উৎপাদিত হতো।[৭৯] পূর্ববঙ্গ এবং আসাম প্রদেশে পাট উৎপাদনে ব্যবহৃত জমির পরিমান নিম্মোক্ত সারনিতে লক্ষণীয়।[৮০]

বছর	ব্যবহৃত জমি
১৯০১-১৯০২	২২,৭৮,২০৫ একর
১৯০২-১৯০৩	২১,৪৫,৫৯৯ একর
১৯০৩-১৯০৪	২৫,০৩,৯৬৮ একর
১৯০৪-১৯০৫	২৯,৪১,১৪৪ একর
১৯০৫-১৯০৬	৩১,৩৯,৭৩০ একর
১৯০৬-১৯০৭	৩৩,৩৬,৪০০ একর

উক্ত সাত বছরে পাটচাষে ব্যবহৃত জমির আয়তন ক্রমশ বেড়েছে। এই সময় নিম্নোক্ত পরিমানে পাট উৎপাদিত হয়েছে।[৮১]

বছর	উৎপাদন (মণে)	মূল্য (টাকায়)
১৯০৪-১৯০৫	৩,৬৫,৫৭,৫০০	৫,৪৯৫ লক্ষ
১৯০৫-১৯০৬	৪,০০,০০,৪৬৫	৬,৬৪৭ লক্ষ
১৯০৬-১৯০৭	৪,৩৫,৮১,১০০	৯,৯৫৮ লক্ষ

উল্লিখিত সময়ে দেখা যায় যে, পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে কৃষকদের হাতে নগদ অর্থের সমাগম হয়েছে এবং পাটচাষে এদের উৎসাহ বেড়েছে। এই পাটের একটি বিপরীত দিকও সেই সময়ে পরিলক্ষিত হয় যা মুসলিম বাঙালি যে মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি গড়ে উঠবে তাদের জন্য এক ছোট-খাট অভিশাপও কুড়িয়ে এনেছিল। আলোচ্য সময়ে বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালীন পাটের মাধ্যমে বাংলার কৃষি অর্থনীতি সরাসরি সম্পৃক্ত হয় বিশ্ব বাজারের সঙ্গে। পাটচাষের সঙ্গে জড়িত ছিল ঋণ। কেননা পাটচাষ করতে নগদ অর্থের প্রয়োজন হত। এই ঋণের প্রধান যোগানদার ছিল স্থানীয় জোতদার ও মহাজন। বিশ্ববাজারের প্রবনতার প্রভাব হতে এ সময়ে মুক্ত ছিল না বাংলার সাধারণ অর্থনীতি। এ পর্যায়ে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দ্বিতীয় দশক-এর বাংলার প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক অবকাঠামোর আলোচনা করলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে। ১৮৫০-এর দশক হতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত সময়কাল বৃটিশ শিল্পজাত পন্যের সঙ্গে ভারতীয় কৃষিপন্যের বিনিময়ের এক অসম বাণিজ্য সম্পর্ক তৈরী হয়। এসময়ে বস্ত্রশিল্পের মাধ্যমে এবং পৃথিবীর অপরাপর দেশে কাঁচামাল বিক্রির দ্বারা রপ্তানিউদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে একটি জটিল পরিশোধ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্রিটেনের ঘাটতিপূরনের ব্যবস্থা করা হয়।[৮২]ভারতের রপ্তানি তালিকায় কাঁচা তুলা, কাঁচা পাট, চা, কফি, গম, তৈলবীজ ও চামড়া ছিল উল্লেখযোগ্য। পাট ও চা ছিল বাংলার প্রাথমিক উৎপাদকের বড় অবদান। প্রাচীন ঔপনিবেশিক সংকট, যুদ্ধ কালীন রাজনৈতিক আলোড়ন এবং ১৯১৪ সাল হতে ১৯৪০ এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিদ্যমান মন্দার ফলে রপ্তানী বাজারে ধ্বস নামে। অনিয়ন্ত্রণযোগ্য বাজার উঠানামার পরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক অর্থনীতি ব্রিটেন ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাথে সক্রিয় হওয়ায় যারা জীবিকা নিশ্চয়তা

বিধানের উদ্দেশ্য বাণিজ্যায়নের উপায় করেছে তাদের নাজুক অবস্থাটি প্রকট হয়ে উঠে। এ সময়ে অর্থকারী ফসলের একত্রিত বিন্যাস প্রণালি ও বাজারের সাধারন ঝোঁককে জীবন ধারনের জন্য প্রধান শস্য চাউলের কিয়দংশী খাদ্য বহির্ভূত বাণিজ্যিক শস্যের সাথে বাজারে যোগান দেওয়া হয়নি, এর সাথে উদ্বৃত জমি, আপেক্ষিক ব্যয় ও মূল্য এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ও নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, জীবিকা ও বাজার সংক্রান্ত বিষয়াদি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ ও পন্য উৎপাদন পদ্ধতির ধারাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৮৫০-এর দশক থেকে ১৯৪০-এর দশকের মধ্যে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো ও প্রবনতাকে কেবল পুঁজিবাদী বিশ্বঅর্থনীতির দৃষ্টিকোন থেকেই অর্থপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ১৮৫৪ সালে রেলপথে ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগ শুরু হওয়ায় ভারতে দ্রব্যমূল্য ও মজুরির বৃদ্ধিজনিত চাপ পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব ভারতের কৃষি অর্থনীতির একটি ক্ষুদ্র অংশ মজুরি শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। এর ফলে মূল্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, যার প্রবল চাপ অধিকাংশ ক্ষুদ্র ভূমিচাষিদের উপর পড়ে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৪-৫৬) শুরু হওয়ার পর রাশিয়া থেকে ফ্লাক্স ও হেসের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নতুন করে বাংলায় পাটের চাহিদা সৃষ্টি হয়। বাংলার পাট রপ্তানির পরিমান ও মূল্যের তফাৎটা নিম্নোক্ত সারণির মাধ্যমে দেখা যেতে পারে–[৮৩]

সাল	মূল্য	রপ্তানির পরিমান
১৮৩৯-৪০	১,৫২,৯২৪ টাকা	১১১২১৮ মণ
১৮৫৫-৫৬	৩২,৭৪,৭৬৮ টাকা	১১৯৪৪৭০মণ

ইউরোপ ও চীনের বাজারে চাউলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং পাট ও তৈলবীজের জমি ধানের জমি হিসাবে ব্যবহারের ফলে ১৮৫৫ সালের প্রথমদিকে চাউলের মূল্য মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব অনুভূত হয়। ১৮৫৫ ও ১৮৬০ সালের মধ্যে বাংলার জেলাগুলিতে চাউলের মূল্য স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পায়। নিম্নোক্ত সারণি থেকে সে সম্পর্কে ধারণা করা যাবে।[৮৪]

বাংলার জেলাগুলিতে প্রতি মণ ধানের মূল্য

জেলা	**১৮৫৫**	**১৮৬০**
যশোহর	১০ আনা	১ টাকা ৪ পয়সা
বর্ধমান	১০ আনা	১ টাকা ৭ আনা ৬ পয়সা
নদীয়া (শান্তিপুর)	১০ আনা	১ টাকা ৬ আনা
নদীয়া (কৃষ্নগর)	১০ আনা ৬ পয়সা	১ টাকা ৪ আনা ৬ পয়সা
২৪ পরগনা (বারাসত)	১২ আনা	১ টাকা ১০ আনা
হুগলী	২ টাকা	২ টাকা ২ আনা

(উৎস: নীল কমিশন রিপোর্ট, পরিশিষ্ট-৩)

যখন বিদেশী মূলধনের অন্তঃপ্রবাহ এবং বিদেশের বাজারে চাহিদার ফলে ১৮৫৭ সালের মধ্যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে, তখন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ শুরুর পর মুদ্রাস্ফীতি প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান হিসাবে দেশে বিচ্ছিন ও দুষ্প্রপ্যতা জেঁকে বসে। পন্যদ্রব্য ও খাদ্যশস্যের স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ অলাভজনক নীলজাতীয় শস্যের বাধ্যতামূলক চাষের বিরুদ্ধে কৃষকদের পক্ষ হতে আগের চাইতে প্রবল বাঁধা আসে। কৃষকরা স্থানীয় ঋণদাতা জমিদারদের কাছ থেকে মূল সমর্থন লাভ করে এবং ধান চাষের ক্ষেত্রে আরও বেশী লাভের সম্ভাবনা দেখতে পায়। কৃষকদের কাছে ইউরোপীয় নীলচাষীরা অনেকদিন ধরেই ঘৃণার পাত্র ছিল। তাই তৎকালীন গ্রাম্য লোকগীতিতে বলা হতো, ওরা (ইউরোপীয় নীলচাষীরা) সুঁইয়ের মতো প্রবেশ করে, কিন্তু লাঙ্গলের ফলা হয়ে বেরিয়ে যায়।[৮৫]

ইউরোপীয় নীলচাষীরা বাংলায় পেরে উঠতে না পেরে পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী বিহারে তৎপরতা চালাবার জন্য পুনরায় দলবদ্ধ হয়। বাজারের জন্য শোষণমূলক উৎপাদন প্রক্রিয়াকে অকেজো করে দেওয়ার পদক্ষেপ কৃষকদের জীবিকার সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। বাজার এবং জীবিকার মধ্যকার তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগে যে বিষয়টি নিশ্চিত হয় তা হলো– ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক অর্থনীতির নতুন কাঠামোতে ঋণদাতা জমিদার ও ব্যবসায়ীদেরকে উনিশ শতকের শেষ পর্ব হতে নতুন বাণিজ্যায়নের পর্যায়ে কৃষককে উদ্বৃত সৃষ্টির প্রধান দাবিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হয়। পাট ছিল তখন একটি প্রধান পন্য। এক সময় ইউরোপীয় বাজারে বিক্রিত আঁশ 'ভারতীয় পাট থেকে পাওয়া যেত। যদিও ১৮৩৮ সালে কফির বস্তা তৈরীতে পাট ব্যবহারের জন্য নেদারল্যান্ড সরকারের সিদ্ধান্তে এ পন্যটিকে উচ্চমর্যাদা প্রদান করা হয়; প্রকৃত পক্ষে ক্রিমিয়ার যুদ্ধকালে পাট সম্পর্কে পূর্বেকার সংস্কার ও ধারনা অগ্রহনযোগ্য হয়ে উঠে। অতি নিম্নপর্যায় থেকে পাট রপ্তানির পরিমান ১৮৩৮-৪৩ ও১৮৬৮-৭৩ সালের মধ্যে চল্লিশগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৮৬০-এর দশকে কাঁচাপাটের রপ্তানিমূল্য ৪.১ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ২০.৫ মিলিয়নে। এ বৃদ্ধি অবশ্য ১৮৭২-৭৩ সালের অর্থনৈতিক মন্দা চলাকালে বিশ্ববাজারে প্রথমবারের মতো কাঁচা পাঁটের মূল্যের ব্যাপক পৌনঃপুনিক নিম্নমুখী উঠা নামার পূর্বে সংঘটিত হয়। মন্দার সময়ে কাঁচা পাটের মূল্য কোন কোন জায়গায় প্রায় অর্ধেক কমিয়ে আনা হয়।[৮৬]

পাটশিল্পের হাত ধরে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসে (শিক্ষা গ্রহণে)। ফলে তাদের উন্নত জীবনযাত্রা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতেও সেই অনুযায়ী সমাজ ও রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। পাট শিল্পের ইতিহাস এবং এই শিল্পের অর্থনৈতিক ভূমিকা মুসলমান সমাজের আর্থিক উন্নতির সহায়ক ছিল। এই উন্নতির কথা সাহিত্যকর্মেও পাওয়া যায়। যেমন তদানীন্তন মুসলিম বুদ্ধিজীবী মুনশী মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ[৮৭] নিজ গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> পূর্বে যে মুসলমানের চালে খড় ছিল না, এক্ষণে সেই শ্রেণির অনেকের টিনের ঘর তৈয়ার হইয়া গিয়াছে, বাতি ঘরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখিয়ে আনন্দে বিহ্বল হইতে হয়।[৮৮] কলিকাতায় স্থায়ী বসবাসের কালে মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন।

১৯১১ সালের আদমশুমারিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে তথ্য দেওয়া হয় meterial prosperity-এর বিষয় হিসাবে সেখান থেকে বাঙালি মুসলমানের আর্থিক উন্নতির যে ধারাটি ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছিল তা মূলত উনিশ শতকের শেষার্ধ ও বিশ শতকের শুরু দিকে হয়েছিল বলে ধারণা নেওয়া যুক্তিযুক্ত।[৮৯] সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে, পাট উৎপাদন এবং পাটশিল্পের বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায় ছিল সেই সময়। বাংলার একমাত্র অর্থকরী ফসল হিসাবে পাট কৃষকদের অর্থনৈতিক জীবনে এনেছিল সমৃদ্ধি। এর ফলে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণে সমর্থ হয়ে মুসলমান তরুনেরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তি পেয়েছিল। যারা ছিল মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির মেরুদণ্ডস্বরূপ। বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশ ছিল কৃষি নির্ভর, কৃষিজীবী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ১৮৮১ সালের আদম শুমারীর রিপোর্টে বলা হয় যে–য

While the husbandmen among the Hindus are only 49.28 percent the ratio anong the Muslims is 62.81 Percent.[৯০]পরবর্তীতে ১৯০১ সালের আদমশুমারীতেও এই সংখ্যা দেখানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, বাংলার অধিকাংশ মুসলমান ছিল কৃষিজীবী। ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। প্রতি দশহাজার মুসলমানদের মধ্যে ৭,৩১৬ জন ছিল কৃষিজীবী। অন্যদিকে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই সংখ্যা ছিল ৫,৫৫৫ জন। আবার প্রতি দশ হাজারে মুসলমান জমিদারের সংখ্যা ছিল ২১৭ জন।[৯১]সুতরাং এটা ধারণা করা যায় যে, বাংলার অধিকাংশ মুসলমান ছিল সাধারণ কৃষিজীবী। মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ এই কৃষিনির্ভর পরিবার থেকেই ঘটেছিল। বাংলার রপ্তানিযোগ্য আরেকটি পন্যের মধ্যে রয়েছে 'চা'। চায়ের ক্ষেত্রে শ্রমমজুরির ভিত্তিতে উদ্ভূত উৎপাদন এবং ব্যবসায়ের মধ্যকার সম্পর্ক গুণগতভাবে পৃথক ছিল।

এক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রাধান্যের বিষয়টি কোন অবস্থাতেই একটি বিশদ বাজার কাঠামোর ঝঞ্ঝাটিপূর্ণ অভ্যুদয়ে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে নি। ব্রিটিশ নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত চা-বাগানগুলি জাহাজে করে লন্ডনে পাঠানোর জন্য কলকাতা চট্টগ্রামে চা প্রেরণ করে এবং লন্ডনে নিলাম চা-বিক্রির বন্দোবস্ত করে। অন্য সব চা-বাগান কলকাতাভিত্তিক চারটি ইউরোপীয় দালান প্রতিষ্ঠানের একটিকে নিয়োগ করে এবং এ প্রতিষ্ঠান চা-বাগানগুলির পক্ষে নিলামকারী হিসাবে কাজ করে। খিদিরপুর ডাকগুলির কাছে অবস্থিত গুদামে সীসার পাত দিয়ে তৈরী কাঠের চা-বাক্সগুলি রাখা হতো এবং এগুলি সপ্তাহে একবার এবং মাঝে মাঝে সপ্তাহে দু'বার বিক্রি করা হতো। তখন চা বাগান মালিক ও চারটি ইউরোপীয় দালাল প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্ততাকারী কারোরই অস্তিত্ব ছিল না।[৯২]বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি তথা মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির আর্থিক সচ্চলতা যে চা-শিল্পের সাথেও বিশেষ ভাবে জড়িত ছিল তার বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। ১৮৬০ সালে নীল কমিশনের পর থেকে কোম্পানি দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যের উন্নতির মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভাগ্য পরিবর্তনে বেশ সাহায্য করেছে। এক্ষেত্রে শিল্পাশ্রিত মুসলিম মধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থাটি সহজে বোঝা যায়। বিশ শতকের প্রথমার্ধের দিকে জনশক্তি নামক একটি পত্রিকায় বাংলার চা-শিল্প নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশিত হত, যেখানে দেখা যায় কর্মসংস্থান হিসেবে চা-শিল্পে শনিকদের নিয়োগ, বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সচেতনতা এবং আর্থিক চিত্রের সংখ্যা। 'জনশক্তি' পত্রিকা চা-শ্রমিক ইউনিয়নের দাবিসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপন

করত।[৯৩] সাপ্তাহিক জনশক্তি পত্রিকার নবপর্যায় প্রকশিত হয় ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২১ শে আগস্ট। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী (১৯১৩-১৯৯৩)।

পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা সমূহে এই সকল দাবিসমূহের কিছু বাস্তবায়নের আশ্বাসসম্বলিত সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই ধরনের একটি সংবাদে দেখা যায়– 'পূর্ববাংলার চা-শ্রমিকদের অন্যতম প্রধান দাবিসমূহের মধ্যে ছিল মজুরী বৃদ্ধি, ঘরবাড়ি, ঔষধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান, পুষ্টিকর খাদ্য ও উন্নতমানের কাপড়-চোপড় প্রদান ইত্যাদি। ১৯২১ সালে আসাম সরকার চা-শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারন করলেও তা বাস্তবায়িত হয় নি– সে সংবাদটিও মূলত *জনশক্তি* পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষ জানতে পারে। ১৯৩৯ সালে (২য় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়) ভারত মহাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য যখন বেড়ে যায় তখন চা-শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত করার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয় এবং সেই কমিটি সকল রিপোর্ট *জনশক্তি* পত্রিকায় পাঠাত। জনশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরীর তালিকা থেকে মধ্যবিত্তশ্রেণির পেশাগত দিকটি উন্মোচিত হয়। পিতা-মাতা শ্রম হতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে নিজেদের সন্তানদের পড়াশুনা করিয়ে চাকুরী প্রাপ্তির পথটি সুনিশ্চিত করতে পারত।[৯৪]

ভারতবর্ষ	পুরুষ	স্ত্রী	ছেলেমেয়ে
কামরুপ, নওয়াগাং,দরঙ্গ উলক্ষীপুর জিলা	১। $\sqrt{\cdot}$ আনা	১। $\sqrt{\cdot}$ আনা	$\sqrt{\cdot}$ আনা
কাছাড় জিলা	১। $\sqrt{\cdot}$ আনা	১।।. আনা	$\sqrt{\cdot}$ আনা
সিংহল	২ ।। ৫ পয়সা	১″/১৫ পয়সা	১/১৫ পয়সা
পাকিস্তান	১ $\sqrt{\cdot}$	১।।.	।। $\sqrt{\cdot}$
			।। ১০ পয়সা

বাংলার কৃষকদের জীবন ধারনের প্রধান ফসল হিসেবে চাউল যথেষ্ট বাণিজ্যিক গুরুত্ব অর্জন করে। ১৯৩০-এর দশকে অনুসন্ধান করে দেখা যায়, বার্ষিক উৎপাদনের পর্যায়ে অপেক্ষকৃত অল্প পরিমান চাউল আমদানি করার ফলে এ মূল্যের উপর একটি অনানুপাতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।[৯৫] ১৯৪১ সালে উৎপাদনের ৪৪ শতাংশ ছিল আন্তঃজেলাভিত্তিক। বাহ্যত এর বাজার কাঠামো ছিল পাটের বাজার কাঠামোর সাথে কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ; যদিও ইউরোপীয়রা এতে প্রাধান্য বিস্তার করতো না। বিশ-এর দশকে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণিটি ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির। তখন দাদনের ব্যবহার খুব একটা ব্যাপক ছিল না। বাংলার একজন লোককবি আবেদ আলী মিয়া হতাশার সুরে বলেছিলেন, কৃষকেরা চাউল ত্যাগ করে লাভের আশায় পাঁটের ঝুকি নিয়েছিল, তাদের এমন একদিন আসবে যখন তাদের সেই পাটগাছের কাঠি খেতে হবে।[৯৬] ১৮৯০-১৯১২ সালের মধ্যে দত্ত কমিটির মূল সংক্রান্ত বিস্তৃত অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির তুলনায় কৃষিভিত্তিক আয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল মন্থর। যেখানে জনগনের মাথাপিছু কৃষি ব্যয়-বৃদ্ধির তুলনায় কৃষিভিত্তিক আয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল মন্থর। ১৯০৯-১৩ সালে যেখানে

জনগণের মাথা পিছু কৃষি-উৎপাদন বা আয় ছিল ১৮৯০-৯৪ সালের চেয়ে ১৯০৯-১৩ সালে ১৭ শতাংশের বেশি, সেখানে একজন কৃষকের স্বাভাবিক ক্রয়ের গড় খুচরা মূল্য ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। যাহোক, পূর্ব ও উত্তর বাংলায় যেসকল কৃষক শুধু পাট চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেছিল তারা লাভবান হয়েছিল এবং আগের চেয়ে অনেক সচ্ছল হয়ে উঠেছিল।[৯৭] ১৯০১-১৯১৮ সময় কালে বাংলার গ্রামীণ শ্রমিকগণ দৈনিক কতপরিমাণ চাল মজুরী হিসেবে পেত তার একটি তালিকা থেকে চাউলের সাথে নিয়োজিত মধ্যবিত্তশ্রেণির একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেরিয়ে আসে–[৯৮]

গ্রামীন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি: চাউলের নিরিখে

অঞ্চল	চাউলের পরিমাণ
পশ্চিম বঙ্গীয় জেলা	২.৫ সের
মধ্য বঙ্গীয় জেলা	"২.৫ সের"
উত্তর বঙ্গীয় জেলা	"৪.০"
পূর্ব বঙ্গীয় জেলা	"৬.০"

সারণিটির মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতা সবচেয়ে হ্রাস পেয়েছে পশ্চিম, মধ্য ও উত্তরবঙ্গেরজেলা সমূহে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে ভাল। বস্তুত পূর্ববঙ্গে শ্রমিকের মজুরি প্রদান করা হতো দু'রকমভাবে– নগদ অর্থে ও ফসলের মাধ্যমে। ঐতিহ্যগতভাবে কৃষি শ্রমিক নিয়োগ করা হতো ফসলেই। উনিশ শতকের প্রথম সিকিতে ঢাকা জেলার ফসল ভাগের রীতি ছিল সংগৃহীত ফসলের এক-পঞ্চামাংশ।[৯৯]মজুরি হিসেবে ফসলের ভাগ দেওয়ার রেওয়াজ ছিল শুধু খাদ্যশস্যের বেলায়। শ্রমিকগণকে মালিকের বাড়িতে মজুরির অংশ হিসাবে খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল। নগদ অর্থে মজুরী হত শুধু অর্থকরী ফসলের ক্ষেত্রে (পাট ও অন্যান্য), নগদ মজুরগণ মজুরির অংশ হিসেবে মালিকের বাড়িতে সকাল ও দুপুরের খাবার খেতো। ঢাকা জেলার কেওয়াটখালী (১৯১৭) মৌজার মজুরী কাঠামো সম্পর্কে সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অফিসার নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন:

"সাধারণত হালচাষের সময় শ্রমিক নিয়োগ করা হয় না। যাদের নিজেদের লাঙ্গল-গরু নেই বা অপর্যাপ্ত আছে তারা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিনে নেয়। এক পাখি জমি (একরের এক তৃতীয়াংশ) চাষ করতে মজুরীর হার হচ্ছে আট আনা এবং দু'বেলা মালিকের বাড়িতে খাবার। পাট শ্রমিকেরা প্রায় দৈনিক আট আনা থেকে বারো আনা এবং দু'বেলা মালিকের বাড়িতে খাবার। ধান কাটার মজুর এবং দাওয়ালের পারিশ্রমিক হচ্ছে শুধু কর্তিত ধানের এক-পঞ্চমাংশ।[১০০] তিরিশের মহামন্দার পর কৃষিশ্রমিকের দরকষাকষিক্ষমতা বিপুলভাবে হ্রাস পায়। প্রাক-মন্দা যুগের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা, ওঠতিমূল্য ও ঋণিতা– এসব কারণ এবং পরিশেষে মহাদুর্ভিক্ষ শ্রমিকশ্রেণির ক্রয়ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। যুদ্ধোত্তর এবং বিভাগোত্তর কালে অর্থনীতি এমন মোড় নেয় যে, এর অধীনে শ্রমিকের

ক্রয়ক্ষমতা গতি লাভ করে। সুতরাং অতি আস্থার সাথেই মন্তব্য করা যায় যে, পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর থেকে শ্রমিক শ্রেণির প্রকৃত মজুরী বা ক্রয়ক্ষমতা নিম্নগামী ছিল এবং এই ক্ষমতা আরও গুরুতর হয়ে ওঠে মহানন্দার পর থেকে। যুদ্ধোত্তর ও বিভাগোত্তর কালেও মজুরের ক্রয়ক্ষমতার কোন উন্নতি ঘটেনি এই বাংলায়। তাহলে এখন প্রশ্ন আসে এই যে বিষয়টি এতক্ষণ আলোচনা হল তা থেকে কি স্পষ্ট হয়? এটাই স্পষ্ট হয় যে কৃষির_উপর নির্ভর এই বাংলায় ভূমিভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে অবস্থানটি সেটি মূলত হয়ে ওঠেছিল শ্রমিকদেরকে একটি পাশে অসহায় অবস্থানে ফেলে রেখে আর তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণির আর্থিক অবস্থান এই বাংলায় সুদৃঢ় হয়েছে বটে তবে যে ভাবে মধ্যবিত্তের স্বল্প পরিসরে হলেও তৎসময়ে অগ্রগতি হয়েছে তার চেয়ে আরও উচ্চগতিতে শ্রমিক ও সাধারণ কৃষকের জীবন যাত্রার মান নিচু স্তরে নেমেছে। বাংলার তাঁতশিল্প, অর্থনীতি, মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি বিষয়গুলি প্রায় একই সারিতে ফেলার মত হলেও কোম্পানীর দৌরাত্মে এবং বৃটিশ রাজ্যের বানিজ্যিক ক্রিয়া কৌশলে তা একই সারিতে বিবেচ্য নয়। এভাবেই বাংলার তাঁতশিল্প ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান নিয়ে আলোচনাটি এগিয়ে যাবে। বাংলার তাঁতশিল্পের উপর গবেষণা হয়েছে অঢেল। কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো এই যে, বাংলার অন্যান্য শিল্পের উপর অনুসন্ধান হয়েছে খুবই কম। যেমন : মুর্শিদাবাদের পিত্তল, কৃষ্ণনগরের মৃন্ময়, ঢাকার বশিদা শাখা, স্বর্ণ-রৌপ্য গহনা, সিলেটের শীতল পাটি ইত্যাদি চারু ও কারু শিল্পের বিকাশ। পাটের কোন উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধান না থাকায় তাঁতশিল্পের আলোচনাটিই এখানে বিশেষ গুরুত্ব পাবে।

বাংলার তাঁতশিল্প ও মহাজনদের দৌরাত্ম ছিল ন্যাক্কারজনক। তথাপি আড়ৎ-এর মালিক ঐ মহাজনেরাই যাদের কেন্দ্র হতে ক্রেতারা পন্য কিনত। আর এই সুযোগে মহাজনেরা ব্যাপকভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করত। সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকে পন্য কিনতে পারলে এদিকে যেমন ক্রেতাগণ অনেক কম মূল্যে পন্য কিনতে পারত, অন্যদিকে খুচরা বিক্রেতারাও লাভ করতে পারত সুবিধাজনক মূল্যে। প্রতিযোগিতার বদলে বাজার মালিকগণ পন্যের মূল্য তাদের খেয়ালখুশিমত নির্ধারণ করুক ইংরেজগণ সেটা পছন্দ করত না। বাজারে মহাজনদের দৌরাত্ম থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ঢাকার কালেক্টর (১৭৮৫) একবার সরকারকে পরামর্শ দিয়ে ছিলেন আঞ্চলিক বাজারগুলির উপর সরকারি মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার জন্য।[১০১]সরকারি মালিকানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের পূর্বে ঐ কালেক্টর নিশ্চয়ই এটা ভেবে দেখেননি, আঞ্চলিক বিকাশ, বাজার মালিক (মহাজন), দেশি-বিদেশী ক্রেতার সাথে মহাজনের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং এর বাংলার আর্থ সামাজিক অবস্থায় বিশেষ এক ধরনের প্রভাব রয়েছে। তার তাই বাজার মালিক মহাজনের জীবন জীবীকার ক্রমশ উন্নতি ও অবনতির সাথে সমাজে বসবাসরত আঞ্চলিক তাঁতশিল্পের কারিগরের জীবনজীবীকার ক্রমবর্ধমান ধারাটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখলে পুরো সমাজ চালনার অর্থনৈতিক অবকাঠামোটি স্পষ্টতর হবে। খুব সূক্ষ্মভাবে যদি বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থানটির দিকে তাকানো যায় তাহলে দেখা যায় যে ইংরেজ বানিয়ানদের মতো করে বাংলার পুঁজিবাদী শ্রেণি সংগঠনের কারিগরেরা যদি সঠিক মূল্য পেত এবং তাহলে তারা সঞ্চয় সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু মধ্যস্থতাভোগী মহাজনদের ২০ ধারীতা পুঁজিবাদের অভিঘাতে তৎসময়ে উৎপাদন পদ্ধতি, প্রযুক্তি ও বিপনন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে পারেনি। যার পরিপ্রেক্ষিতে শহরভিত্তিক মধ্যবিত্তশ্রেণি বাংলায় গড়ে উঠলেও ইউরোপীয় পুঁজিবাদী শ্রেণির শাসন ব্যবস্থায় ইউরোপের মত বর্জোয়া শ্রেণির অভ্যুদয়

বাংলায় গড়ে উঠে নি। আর তাই বাংলায় পলাশীর আগেত নয়ই বরং পরেই বনিক ইউরোপীয় বানিয়ানদের মত করে বাংলার সৎবুদ্ধি শ্রেণি তেমনটি ঘটাতে পারেনি। এর অবশ্য একটি কারণও খুঁজে পাওয়া গিয়াছে যে, বাংলার বনিকশ্রেণি তথা মুৎসুদ্দি শ্রেণিটি বানিয়া পুঁজি বিকাশের রাস্তায় যখনই প্রবেশ করতে গিয়েছে তখনই ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার হস্তক্ষেপ ঘটে এবং সেই পুঁজি তার রুপ বিকৃত করে সোজা সাপ্টা বাংলার সামন্ত রুপের রুপেই চলতে শুরু করে। বানিয়া পুঁজি (ইউরোপীয়) বিকাশের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৮১৩ সালে। যখন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বানিজ্যধিকার বিলুপ্ত হয়ে তৎস্থলে অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তিত হয়। অবাধ-বাণিজ্য বনাম বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন শুরু ঠিক তখন শুরু হয় বিপুলভাবে। ফলে বানিয়ানগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি পায় সেই সাথে তাদের বাণিজ্যে মধ্যসত্বভোগী বাংলার বানিয়া রামদুলালদের মত মুসলিম সমাজ থেকেও হঠাৎ রাতারাতি কোটিপতি হয়ে ওঠে মুসলিম ব্যবসায়ীর উদাসীনতার পরিবেশে হিন্দু ব্যবসায়ী ও মাড়োয়ারীরা।[১০২] মনে রাখা দরকার যে, রামদুলালদে' মার্কিনিদের সঙ্গে যখন বাণিজ্য শুরু করেন তখন তিনি একজন ছা-পোষা সরকার (কেরানি) মাত্র। উনিশ শতাকের প্রথমার্ধের পত্র পত্রিকায় দেখা যায় যে, নানা ধর্মীয়-সামাজিক উৎসব, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে বাংলার বানিয়ানরা যে অর্থ খরচ করছেন একে অপর এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঠিক সে রকমটিই পরবর্তীতে মুসলিমরা শুরু করেছিল এবং দেওলিয়ায় পতিত হয়। যারা তখন সামাজিক স্মীকৃতি লাভের প্রয়াস পেত অনুৎপাদনশীল খাতে অর্থ ব্যয় করে, তখন যদি সম্পদের সঠিক সুষম বন্টন থাকত তাহলে হয়ত বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণি বিশেষ করে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির মানুষদের জীবন বোধ আরেকটু রঙিন হত।

রায়তশ্রেণির মতো তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শিল্পোদ্যোক্তা ও শিল্পশ্রমিকরা কোম্পানি এবং কোম্পানি-কর্মচারীদের লাগামহীন শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হয়। সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ রপ্তানিপন্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষে সরকার শাস্তিমূলক আইন জারি করে। চুক্তি মোতাবেক সরবরাহ না করতে পারা চরম শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। এসব নির্বতণমূলক আইনের অধীণে তাঁতীরা বস্তুত মোচলেকা-মজুরে (bounded labour)এ পরিণত হয়। মুচলেকা-তাঁতীরা খোলা বাজারে প্রতিযাগিতামূলক মূল্যে পন্য বিক্রয় করার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। যদিও তখন উৎপাদনের সকল উপকরণের মূল্য বেড়ে গিয়েছিল এবং খোলা বাজারে পন্য মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল, তবুও কোম্পানির তাঁতীরা চুক্তি মোতাবেক পূর্বেকার মূল্যে পন্য সরবরাহ করতে বাধ্য হতো।[১০৩] ১৭৯০ এর দশক হতে ইউরোপে বিদ্যমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের দরুন বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তৎসময়ে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি গঠিত না হলেও প্রেক্ষাপট কিন্তু মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের ফলে সামুদ্রিক যোগাযোগ ভীষণ ঝুকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে ইউরোপের যোগদান নিম্নতম পর্যায়ে নেমে আসে। তাছাড়া ব্রিটিশ শিল্পজাত পন্যের বাজার সৃষ্টি করার জন্য বৃটেনে বাংলার রপ্তানিপন্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপ করা হয়। ফলে ইউরোপীয় বাজারে বাংলার রপ্তানিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এসব কারণে ইউরোপের ন্যায় বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে বাংলার রপ্তানিপণ্যের বাজার ক্রমশ সংকীর্ণ হতে থাকে। আঠারো শতকের শেষে এসে আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলার অবস্থান তার পূর্বেকার সকল গৌরব ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ১৮১৩ সালে অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রবর্তিত হলে বাংলার বস্ত্র

রপ্তানি মারখেতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, কিছুকাল আগেও যেখানে বাংলার তাঁতবস্ত্র বিশ্ববাজারে সমাদৃত ছিল, সেখানে ১৮২০-এর দশকে বাংলা ইউরোপ থেকে বস্ত্র আমদানি করতে থাকে। অল্পসময়ের মধ্যে এধরনের পরিবর্তন বাংলার তাঁতশিল্পের সঙ্গে জড়িত তাঁতীশ্রেণি ছাড়াও অসংখ্য বানিয়া, আড়তদার, পাইকার, বেপারি, যাচনদার, বয়াল, গোমস্তা সরকার। অবশেষে তারা ভূমি-নিয়ন্ত্রণে নেমে পড়ে এবং ইংরেজী শিক্ষাকে পুঁজি করে চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে কেউ কেউ আবার জমিদারি তথা ভূমি ক্রেতা জমিদারদের মধ্যস্বত্ব ভোগী শ্রেণিতে পরিণত হয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হতে উদ্ভব বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি আর্থিক সংকট ও উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ঠিক এমনি একটি সময় যখন বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণি নিজেদেরকে সচ্ছল অবস্থানে রেখে আকাশ ছুঁতে চলেছে, আদায় করে নিচ্ছে রাজসরকার থেকে সকল অধিকার, ক্ষমতা কি বুঝতে চলে যাচ্ছে আলোকোজ্জল সভ্যতায় আবার বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে স্বগৌরবে জ্ঞান বর্তিকা অন্তরে ও মনে প্রবেশ করিয়ে নিচ্ছে ঠিক তখন মুসলমান সমাজ চিন্তায় মগ্ন, তাদেরকে জাগতে হবে ? শুরু হল প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতা আর এখান থেকেই শুরু হয় যাবতীয় সংকট,যার মধ্যে আর্থিক সংকট অন্যতম। মুসলমান সমাজ এজন্য ভুগেছে অনেক।

অর্থশাস্ত্রে একটি কথা আছে 'Exports pay for the imports'অর্থাৎ আমরা বিদেশ হতে যত টাকার মাল আমদানী করি ঠিক ততটাকার মালআমাদেরকেও বিদেশ রপ্তাণি করতে হয়। কোম্পানীর আগমণের পূর্বে বাংলাদেশ হতে যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হত তার অধিকাংশই ছিল শিল্প দ্রব্য। তৎসময়ে আর্থিক ও নানাবিধ ঐতিহাসিক কারণে ঐসকল শিল্প নষ্ট হওয়ায় বাঙালি শিল্পীগণ কৃষিক্ষেত্রে বিতাড়িত হয়ে বিদেশী শিল্প-যন্ত্রের খাদ্য সরবরাহ করা শুরু করে। পূর্বে যে সকল পন্যদ্রব্য দেশে উৎপন্ন হত, তারমধ্যে মসলিন, সিল্ক, তসর, পাটবস্ত্র, কাগজ, চিনি, লৌহ, লবণ, নীল,চা, সোরা, বাঁশের জিনিস, শাঁখা, মাটির বাসন এবং নানা প্রকার রং বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুসলিম সম্রাটদের পৃষ্টপোষকতায় ঢাকার মসলিন নিয়ে ডা.ইউরি তার *Cotton Manufacture of Great Britain*গ্রন্থে লিখেছেনঃ Muslin of Dacca Constituted the seriac vests which were so highly prized by the ladies of Imperial Rome in the days of its luxury and refinement."[১০৪]

বাংলার বিশেষ করে পূর্ববাংলার মুসলমান কারিগরেরা এমন কাপড় বুনতে পারে যা অন্য কেউ পারে না। বাংলার মতো সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা ভূমিতে বসবাস করে বাঙালি মুসলমানগণ আর্থিক দৈন্যতায় জীবন কাটায় এর চেয়ে বড় সংকট আর কি হতে পারে। বাংলার মাটি এত দামি হওয়ার পরও মাটিতে যে খেটে চলে সে দু'বেলা ভাত খেতে পারে না। তাদের ছেলে-মেয়েরা লেখা-পড়া করে না; অথচ তাদের সেবা নিয়ে রক্ত ঝরা পরিশ্রম গায়ে মেখে যারা জমিদার, মহাজন হয়ে বসে আছে তারা ঠিকই উন্নত খাবার খায়, ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া শেখায়। ফ্রান্স, ডেনমার্ক ও আয়ারল্যান্ডের মত দেশসমূহে কৃষির তথা সার্বিক মানব পরিবেশ নির্ভর করে সেই দেশের ভূ-স্বামী ও প্রজার মধ্যে যে সম্পর্ক বর্তমান তার উপর। অথচ বাংলায় কখনো ভূ-স্বামী ও কৃষক অথবা রায়ান ও রায়তের মধ্যে সেই ধরনের সম্পর্ক দেখা যায়নি। কর্নওয়ালিসী-এর দোহাই দিয়ে উক্ত ভূ-স্বামীরা Middle men(সরকার ও কৃষকের মধ্যে) ও মধ্যসত্ত্বভোগীরা (আরেক রূপ জমিদার ও

কৃষকের মধ্যে, যেমনঃ মহাজন) অটল হয়ে পড়ে অচলাবস্থার তৈরী করত।[১০৫] মুসলমানরা অমিতব্যয়ী তার প্রমাণ পাওয়া যায় স্যার P.C.Royতাঁর ১৯২৩ সালে দিনাজপুর জিলা কনফারেন্সে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন,'ময়মনসিংহ ও রাজশাহী প্রভৃতি জায়গায় সমস্ত বড় বড় জমিদারী গুলি হিন্দুর হাতে চলে গেল কেন? মুসলমানেরা জমিদারী অচিরেই সবখেয়ে বসে থাকে। আমি কোলকাতায় দেখেছি, যে মুসলমান দিনে এক টাকা রোজগার করে সে পাঁচ সিকা খরচ করে। হিন্দু এক টাকা রোজগার করলে অন্তত চারি গন্ডা পয়সা জমাবে' যে সমস্ত অভিযোগ মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার এতটুকুও মিথ্যা নয়। সময়ে অসময়ে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারে অযথা খরচ করে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়া তা নিতান্তই মূর্খতা। তিনি আরও বলেছেন মুসলমানদের ব্যবসায়ী বুদ্ধি নেই। কেননা সততার বড়ই অভাব। পরস্পর বিশ্বাস, সরলতা, কর্মদক্ষতা ইত্যাদি গুণের অভাবে মুসলমান কোন কারবারেই শ্রী-বৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। তিনি সম্পদশালী মুসলমান উত্তরাধিকারীদের নিশ্চলভাবে বসে জীবন যাপনের কথাও বলেছেন। তারপর তিনি চলে গিয়েছেন সাংসারিক বুদ্ধিতে যথাযথ অপরিপক্ক মুসলমানদের দিকে। মুসলমানরা যে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নতুন আবহাওয়ার তালে গড়ে তুলতে পারছেনা তা সত্যিই দুঃখজনক। সামাজিক নানা কুসংস্কার ও অন্যায় প্রথা যেন সংসার-এ ঢুকে তার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডটিকে বাঁকিয়ে ফেলছে। Caste system- এর চাপে শ্বাসরুদ্ধ মুসলমান এতটুকু চিন্তা যেন করতে পারছেনা– দৈনন্দিন সংসারে সে কতটুকু বুদ্ধি কোন খাতে প্রয়োগ করছে।

কতিপয় মুসলিম বুদ্ধিজীবীর প্রতিভাধর লেখনিও নানান চিন্তা-ভাবনার মধ্য দিয়ে মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণির আর্থিক অবস্থানটিকে বিশ্লেষণ করা যায়। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন বাংলার মুসলমান সমাজের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করে কিছুটা মর্মাহত হয়েছেন। বাংলা ১৩২৮ সনে তাঁর প্রকাশিত 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে সেই রকমই অভিব্যক্তির প্রকাশ করেছেন। চাষীর দুক্ষু বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

এক একটা জুট মিলের কর্মচারীগণ মাসিক ৫০০-৭০০ (পাঁচ কিংবা সাতশত) টাকা বেতন পাইয়া নবাবী হালে থাকে, নবাবী চালে চলে, কিন্তু সেই জুট (পাট) যাহারা উৎপাদন করে, তাহাদের অবস্থা এই যে, "পাছায় জোটে না ত্যানা"। ... আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছেন, "ধান্য তার বসুন্ধরা যার"।[১০৬] লেখকের আসাম ও রংপুরের এন্ডি শিল্প নিয়ে আলোচিত প্রবন্ধ'এন্ডি শিল্প' বাংলা ১৩২৮-এ ব্যথিত চিত্তে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির একটি বিশেষ দিকটি তুলে ধরেছেন। লেখক উক্ত প্রবন্ধে বলেন–

> পূর্বে পল্লী গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা বধূগণ সখ করিয়া স্বহস্তে অতি সূক্ষ্ম সূতা কাটিতেন। সে এন্ডি সূতা, রেশমী সুতার সহিত প্রতিযোগিতা করিত। এখন আর সেইদিন নাই, সুতরাং এখন কুল-বালা দূরে থাকুক; মধ্যবিত্ত শ্রেণির বউ ঝিও আর ঠেকে হাতে লয় না। পূর্বে নিষ্ঠাবর্তী হিন্দু মহিলা পূঁজা করিবার সময় পট্ট বস্ত্র পরিধান করিতেন, এখন তাঁহাদের পুরোহিতের জন্য পৈতা আসে জার্মানী হইতে। অধঃপতনের চূড়ান্ত আর কাহাকে বলে?[১০৭]

কবি কাজী নজরুল ইসলাম সমাজের দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন তার 'সর্বহারা' (১৩৩৩ বাংলা) কাব্যের "ফরিয়াদ" কবিতায়। কবির ভাষায়–

জনগণে যারা জোঁকসম শোষে
তারে মহাজন কয়,
সন্তানসম পালে যারা জমি
তারা জমি-দার নয়।
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,
মাটির মালিক তাঁহারাই হন।[১০৮]

মূলত ইংরেজ বানিয়ানদের শাসন ব্যবস্থার বৈচিত্র্য দিক হল 'মহাজন' শ্রেণির সৃষ্টি। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন হলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেখল যে, স্থায়ীভাবে রাজস্ব আদায় করলেই শুধু তাদের মূল উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে না, আর তাই তাদের শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ়ভাবে নিজেদের আয়ত্তে আনার নিমিত্তে রাজস্ব প্রাপ্তির আশা নিশ্চিত করার সাথে সাথে এদেশ তথা বাংলার জনসাধারণের উপর প্রভাবশালী একটি শ্রেণি সৃষ্টির পরিকল্পনা চরিতার্থ করল। তাদের পরিকল্পনার ফলে পুরনো জমিদারশ্রেণির পতন ঘটে এবং সে স্থলে জন্ম নেয় নব ভাবধারায় প্রভাবিত এক নব্য জমিদারশ্রেণি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূর্যাস্ত আইন (১৭৯৩) অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দিতে না পারলে অপারগ জমিদারের জমি নিলাম হয়ে যাবে।এর কুফল হতে বাঁচতে গিয়ে অনেক অলস জমিদার তাদের জমিদারীর অংশ বিক্রয় করতে থাকে। এর সুফল নেয় তখন পুঁজিপতি শ্রেণি, মহাজনগণ এবং কোম্পানির বানিয়ানও মুৎসুদ্দিগণ।[১০৯] তারা বাজেয়াপ্ত ভূ-সম্পত্তি সরকারের নিকট হতে ক্রয় করে নিত। এছাড়া অনেক ঋণগ্রস্থ জমিদারের ভূ-সম্পত্তি মহাজনদের গ্রাসে পতিত হয়। এভাবে সমাজে পুরাতন অভিজাত জমিদারশ্রেণির পরিবর্তে একটি নতুন ব্যবসায়ী জমিদারশ্রেণি আবির্ভূত হয়। এই শ্রেণিটি ছিল ব্রিটিশ অনুগত।[১১০]এই নতুন ব্যবসায়ী জমিদারশ্রেণির অধিকাংশ ছিল শহরবাসী। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল শহরকেন্দ্রিক। পরবর্তীতে তারাই সরকারের নীতির প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে এবং নিজেরাই নিজেদের স্বার্থে 'পত্তানিদার' নামে একটি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত মধ্যবিত্তশ্রেণি সৃষ্টি করে নেয়। যারা মূলত বিলাসীতাপূর্ণ জীবন পছন্দ করত। গ্রামের জমিই ছিল তাদের আর্থিক সচ্ছলতার উৎস। ১৮৫৫ সালে বাংলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমি তালুকদারি বা মধ্যসত্বের অথিনস্থ হয়।[১১১]১৯২১ সালের আদমশুমারির তথ্যে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে কৃষি জমির খাজনার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩,১৯,৩০২ জন, যা মোট জনসংখ্যার ২.৭৭ ভাগ।[১১২]এর অধিকাংশ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত। হিন্দু অথবা মুসলমান জমিদার শ্রেণির অধিনস্ত কর্মচারীবৃন্দ বেশিরভাগ ছিল হিন্দু। হিন্দু সমাজের এই প্রাধান্য ব্রিটিশ পূর্বকাল হতেই ছিল। সুতরাং এটা বলা যায় যে, ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণি মুসলমান সমাজের চেয়ে হিন্দু সমাজেই অধিকহারে বিকাশ লাভ করেছিল। এই ধারা পরবর্তী দশকগুলিতেও অব্যাহত ছিল। যেমন : ১৯৪৬ সালে মুসলমান ও হিন্দু জমিদার এবং অবস্থাপন্ন কৃষকদের সংখ্যার শতকরা হার ছিল নিম্নরূপ :[১১৩]

বিভিন্ন শ্রেণি	মুসলমান	হিন্দু
ছোট জমিদার, জোতদার ও ধনী কৃষক	৩%	৫%
স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষক	৪৪%	৩৭%
বর্গাদার কৃষক ও কৃষি শ্রমিক	৫৩%	৫৮%

উক্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ছোট জমিদার ও ধনী কৃষকদের হার হিন্দু সমাজে বেশি হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষকদের হার মুসলমান সমাজে বেশি ছিল। ১৮৫৮ সালের 'বেঙ্গল-ডাইরেক্টরির' বানিজ্যিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, ইউরোপীয়দের তুলনায় বাঙালি হিন্দু বণিক ব্যবসায়ী এজেন্ট ও বনিয়াদের সংখ্যা খুব কম ছিল না। সে তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নগন্য।[১১৪] কোলকাতার বাণিজ্য নির্ভর শ্রেণির মধ্যে মুসলমান থাকলেও এরা অবাঙালি ছিল। বেঙ্গল ডাইরেক্টরিতে যে ১০টি মুসলিম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া যায় এদের সবাই বাংলার বাইরে থেকে আগত।[১১৫]

বাঙালি মুসলমানদের ব্যবসায়িক জ্ঞান-বুদ্ধি কম থাকা, তদুপরী আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে প্রায় অনেক অনেক আগ থেকেই তারা ব্যবসা বাণিজ্য থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে রেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ড. মল্লিক বলেন, Muslims had not taken to commerce or trade and failed to produce the much needed middle class.[১১৬]

বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হওয়ায় বিভিন্নভাবে তারা নিজেদের অবস্থা উন্নয়নের প্রয়াস চালায়। সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় মুসলমান সমাজের প্রতিকূল অবস্থা দূরীকরণে বিভিন্ন সুপারিশ লক্ষ্য করা যায়। মুসলমান সমাজ বাণিজ্যে অংশ নিয়ে সফল হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয় এবং আর্থিকভাবে সচল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান,জমিয়ত, আঞ্জুমান, লীগ, কনফারেন্স, সভা-সমিতি, এসেম্বলি, অ্যাসোসিয়েশন, মজলিস, বৈঠক প্রভৃতির যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে থাকে।[১১৭]

১৯১১ সালের এক আদমশুমারিতে দেখা যায় যে মুসলমানরা ব্যবসা সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে তদ্বিয় ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হতে শুরু করে। সারণিটি নিম্নরূপ:[১১৮]

পেশা	**হিন্দু**	**মুসলমান**
শিল্প ও পরিবহন বাণিজ্য	১১.০০	৪%
বাণিজ্য	১১.০০	৪%

১৮৮১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির আর্থিক অবস্থাটি জানার জন্য তখন কোন পেশায় কত হারে নিয়োজিত ছিল তা জানা প্রয়োজন। নিম্নে ১৮৮১-১৯২১ সালে গৃহীত চারটি আদমশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী পেশাজীবী ও অন্যান্যদের হার দেওয়া হল:[১১৯]

জীবিকা	১৮৮১	১৮০১	১৯১১	১৯২১
পেশাজীবী	৬.৩৪	৫.৬৫	৭.২৩	৯.১৫
অন্যান্য	৯৩.৬৬	৯৪.৩৫	৯২.৭৭	৯০.৮৫

তাছাড়া আদমশুমারী পেশাজীবী শ্রেণি বিনির্মাণে হিন্দু ও মুসলমানের তুলনামূলক একটি রিপোর্টও প্রকাশ করে।[১২০]

পেশা	সর্বমোট	হিন্দু	মুসলিম
ব্যবসা-বাণিজ্য	২৪,৩৯,৮৫৯	১৮,০৫,৭৩০	৫,৯৪,১৮২
শিল্প	৩৬,২১,৮৩১	২৫,৪৬,৬৩৪	১,০১,৫৪৪

মোটামুটিভাবে এটা ধারণা করা যায় যে মধ্যবিত্তশ্রেণি নিজেকে কোন না কোন পেশায় নিয়োজিত রেখে জীবনযাপন করে থাকে। পেশাভিত্তিক আলোচনার পরিধিটিকে আরেকটু ব্যাপকতর করলে মুসলিম মধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। উনিশ শতাকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির পুঁজি প্রধানত জমি ও অবানিজ্যিক খাতে বিনিয়োগ হত। বিনিয়োগ চরিত্রের এই পরিবর্তন শিল্প-বানিজ্যে-উদ্যোগের বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। ১৮৫০-এর পরবর্তী তিন দশকে বাংলায় একদিকে ছোট ছোট জমিদার এবং অন্যদিকে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু 'মধ্যবিত্ত শ্রেণির' উদ্ভব ছিল লক্ষণীয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতেই সরকারকে দেয় রাজস্ব (১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তানুযায়ী) ও প্রকৃত কৃষকদের কাছ থেকে আদায়কৃত খাজনার মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়।[১২১]

১৮৫৯ সালের খাজনা আইন 'দখলিসত্ত্বের' সঙ্গে প্রকৃত চাষাবাদকে যুক্ত করেনি। বিপরীতে ঐ আইনের ফলে এমন একটি রাজনৈতিক আইনগত কাঠামো গড়ে ওঠেছিল যার ফলশ্রুতিতে'দখলি রায়তে'র মধ্যে অকৃষক লিজপ্রাপ্তদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে 'বিরাট এক খাজনাভোগী স্বার্থের কাঠামো' গড়ে উঠতে দেখা যায়।[১২২] এভাবে ছোট আকারের ভূ- সম্পত্তির মালিক খাজনাভোগী একটি শ্রেণির ব্যাপক প্রসারের পাশাপাশি ক্রমে গড়ে উঠে ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালি (হিন্দু) 'মধ্যবিত্ত শ্রেণি', যারা অবানিজ্যিক পেশাগুলিতে নিয়োজিত হয়। কোম্পানি শাসনের শেষদিকে ঔপনিবেশিক প্রশাসনযন্ত্রের আরো বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কারণে এ ধরনের পেশায় পদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। এই নতুন অবানিজ্যিক পেশার সুযোগ বৃদ্ধির ফলে ছোট তালুকের মালিক খাজনাভোগী শ্রেণিই (ক্ষুদে ভূ-স্বামী ও জমিদার) সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়। চাকুরীতে প্রবেশের একমাত্র উপায় ইংরেজী শিক্ষা ঐ একই গোষ্ঠীর করায়ত্ত থাকে, যারা ক্রমে বাঙালি ভদ্রলোক বলে পরিচিত একটি মর্যাদাবান গোষ্ঠীতে আত্মপ্রকাশ করে। একদিকে অকৃষক মধ্যবিত্তশ্রেণির হাতে ভূ-সম্পত্তির মালিকানা চলে আসা এবং অন্যদিকে তাদেরই চাকুরীপেশায় প্রবেশ বাঙালি পুঁজির স্থানান্তরে বিরাট ভূমিকা রাখে। একই ব্যক্তির সে খাজনাভোগী জমিদার ও চাকুরিজীবী হরেও আয় বেশি বা কম হওয়া নির্ভর করে ব্যক্তি বা পরিবারটির নগরকেন্দ্র ও মফস্বলের, এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উচ্চস্তর ও

নিম্নস্তরের তার উপর। মধ্যবিত্তশ্রেণির একটি বড় অংশের, বিশেষত মফস্বলের চাকুরিজীবীদের আয়ের প্রধানতম উৎস ছিল খাজনা। পক্ষান্তরে বেশ কিছু ছোট পরিবার খাজনার অর্থ দিয়ে সংসারও ভালভাবে চালাতে পারতনা। এমতবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য যেন মধ্যবিত্তের জীবন জীবিকায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন পরিস্থিতি মধ্যবিত্তের জমি এবং চাকরি– এই সংযোগটিকে আরো বাড়িয়ে দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত বাংলাপ্রদেশ শিল্পোন্নয়নের অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের পরিসরে এ দূরে থাকার নীতিটির চমৎকার সমর্থন পাওয়া যায়। গর্ভনর জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য সি.ই. ট্রেভেলিয়ানের ভাষায়:

"শিল্পের এ শাখায় ইংল্যান্ডের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়াটাছিল ভারতের সম্পদরাজিকে ভুল পথে চালিত করার শামিল। অন্যদিকে, ভারতের উর্বর ভূমি ও আবহাওয়ায় উৎপন্ন মূল্যবান কৃষিপন্য তৈরী করছে নিজস্ব সম্পদ এবং সম্পদের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না প্রয়োজনীয় শ্রম ও মূলধনের অভাবের দরুন। লাভজনক প্রয়াস হতে অলাভজনক প্রয়াসে উৎপাদনের এই সকল উপাদানকে নিয়ে আসা নিশ্চয়ই একটি ভূল পদক্ষেপ। আমাদের সঠিক কর্মপন্থা হলো– বনভিত্তিক শ্রমবিভাগকে অটুট রাখা... বুরওয়াই অথবা অন্য কোন লৌহকারখানা যদি ভারতে লাভজনকভাবে পরিচালিত হতে থাকে, তবে এজন্য বেসরকারি শিল্পের উদ্যোগ এবং নিয়োজিত মূলধনের অভাবে হওয়ার কথা নয়।[১২৩] তৎসময়ে পুঁজিমালিকেরা মূলত তাদের অর্থ নিরাপত্তা বিধানকৃত ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করাকে অগ্রাধিকার দিত এবং যেসকল নতুন শিল্পোদ্যোগের প্রতি সরকার প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সাহায্য প্রদান করত সেসকল শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে দারুণভাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করত।[১২৪]

এসব পরিস্থিতিতে দেশের শিল্পোন্নয়ন ছিল সামান্য এবং যে কয়টি শিল্প স্থাপিত হয়েছিল সেগুলি বিদেশি সরবরাহের উপর নির্ভরশীল থেকে যায়। তৎকালীন সাময়িক ভাণ্ডার নিয়ন্ত্রক জে.সি.কে পটোরসন বিদেশি আমদানির উপর এ নির্ভরশীলতার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি *দি ইংলিশম্যান* পত্রিকায় লেখেন:

বাংলার প্রধানশিল্প দুটি– পাট ও চা। দুই শিল্প প্রায় সম্পূর্ণরুপে ইউরোপের সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধ আরম্ভ হলে ইংল্যান্ডের কাঁচা চামড়া উৎপাদনকারীদের সরবরাহ যদি বন্ধ হয়ে যেত, তবে হুগলীর তীরস্থ অধিকাংশ কল কারখানাও বন্ধ করে দিতে হতো। কলকারখানায় ব্যবহৃত অন্য অধিকাংশ চামড়ার বস্তা, যেমন পিকারবেন, বেল আকারে পাকানো চামড়া, চামড়ার কটিবন্ধের উপাদান ইত্যাদি এবং সকল যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতি পর্যায়ের দ্রব্যও ইউরোপ থেকে আসত। অনেক ভারতীয় চা-পন্য বিদেশ থেকে বাক্সে প্যাক করা হতো এবং এখনও তাই করা হয়। রাশিয়া, কানাডা বা জাপান থেকে খোলা বাক্স আমদানী করা হতো, ইংল্যান্ডে বা আমেরিকা থেকে ধাতু নির্মিত সাজসরঞ্জাম প্রয়োজনমত আনা হতো। খোলা বাক্স ভালোভাবে সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় লৌহনির্মিত আংটা, পেরেক ও ক্লিপও বিদেশ হতে আনা হতো। এসব সরবরাহ ছাড়া চা প্যাকিং করা সম্ভব হতো না। বাগানের জন্য ব্যবহৃত গাছের ডালপালা কাটার কাঁচি, নিড়ানি, কাঁটাওয়ালা কুড়াল ও কোদালিসহ চা উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতিও আমদানি করা হতো।[১২৫]

ব্রিটিশ আমলে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার সুবিধার্থে অর্থ ও সমাজ সংক্রান্ত বিষয় টিকে দুটি সত্তার ভাগ করে দেখানো হল। সেসময়ে মুসলমানদের (বাঙালি) আর্থিক অবস্থা যে নাজুক ছিল তা আর

বলার অপেক্ষা রাখে না। তবু মুসলমানরা জীবন ধারনের উপায় হিসাবে অর্থের মূল্য বুঝতে শিখেছে, শিক্ষায় সচেতন হয়ে নিজেদেরকে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের কোটারিপনা জীবন যাপন থেকে ভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মধ্যবিত্ত পেশাভিত্তিক শ্রেণি তৈরী করতে শিখেছে। এই পেশাভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি সকল ধরনের বিলাসীতা পরিহার করে চলত। খুব নামীদামী বাসস্থান তাদের ছিল না, বিলেতি সুখাবার ও উপভোগ্য সামগ্রী ছিল তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, আলাদা করে কাছারীখানা তাদের ছিল, তবে সেটা আত্মসচেতন মধ্যবিত্তশ্রেণির সন্তানদের গৃহশিক্ষকদের জন্য। দেশের খবরাখবর জানার জন্য প্রাতঃরাশে চায়ের পেয়ালার সাথে সমসাময়িক পত্রিকা যেন মধ্যবিত্তের চলার এক অমোঘ সঙ্গী হিসাবেই প্রতিপাদ ছিল– যা শুধু ব্রিটিশ আমল নয় বর্তমানেও মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলিম পরিবারে প্রায় একই চিত্র প্রতিবাদ করে জাতির মধ্যে স্বকীয় পরিচয়কে এক নান্দনিক আঙ্গিকে নিজেদের শ্রেণিকরণকে প্রকাশ করে থাকে। জীবন ধারনের এই বাঁকে মধ্যবিত্তশ্রেণি (বাংলার) তাদের সন্তানদেরকে ভাল করে সার্বিক বিষয়ে চৌকস জ্ঞান সহকারে বিদ্যার্জন করাতে গেলে নানাবিধ ত্যাগ স্বীকার করে। যেমন: কেউ ধার নেয়, কেউ ঋণ নেয় (সুদ কারবারীর কাছ থেকে), কেউ জমি বিক্রি করে। কেউবা তার গহনা- ঘাটিও বিক্রি করে থাকে। এক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থান যেন বলে দিচ্ছে কাকে ঠিক কিরকম জীবন যাপন করতে হবে। অর্থের অসম বণ্টন মধ্যবিত্তশ্রেণিকে মাঝে-মধ্যে বড়ই কোনঠাসা করে তোলে। তবে যে বিত্তের মাপকাঠিতে মধ্যবিত্তের ছক তারজন্য মধ্যবিত্ত কিন্তু নিজেই নিজের নির্মাতা। বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রতিষ্ঠার অনেক অনেক পরে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি গঠিত হয়। আর পাশাপাশি থাকা একই গোষ্ঠীভূত দুটি ভিন্ন জাতির দৌড়ের এই পার্থক্য কিন্তু তৈরী হয়েছিল বিত্ত তথা অর্থের অভাবে। অথচ একসময় বাংলার সমস্ত অর্থদন্ড ছিল মুসলিম জাতির শাসকদের হাতে। সেসমস্ত শাষক যদি এতটুকু বুঝতে শিখতেন তখন বিশেষ করে সুলতানি, মুঘল, নবাবী আমলে রাজকোষে ধনের ভান্ডার পুঞ্জীভূত না করে আপামর প্রজা নির্বিশেষে সকলের একই সাম্য জীবন বাহিত হোক তাহলে হয়ত সমতার খাতিরে অসম্ভব ক্ষমতাবান কেউ ক্ষমতা কুক্ষীগত করলে ১৭৫৭-এর পর হতে মুসলিম জাতির যে অনিমেষ ধ্বংস সাধন হয়েছে তা হতো না, হিন্দুদের মতো করে বাংলায় নতুন ক্ষমতার সাথে আত্মচেতনায় বলিয়ান হয়ে প্রতি পদক্ষেপে স্বচরণ সাজিয়ে চলতে পারত। আফসোস মুসলিম জাতির সময়কে ধরার পরে সময় পার করে আরেক সময় গেলে বুঝতে পারে না যে তারা সফল হল নাকি ব্যর্থ হল।

জীবন যুদ্ধের নানাবিধ পর্যায় অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে তাই ১৯০৫ সালের পর হতে দেশ বিভাগ (১৯৪৭ সাল) পর্যন্ত দেখা যায় অগ্রে চলার মনোভাব নিয়ে বিভিন্ন পেশার সাথে সাথে ভিন্ন মাত্রার প্রয়োগায়িত ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প অর্থনীতির উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানে নিজেদের সগৌরব উপস্থিতি। J.H Broomfiled-এর দেওয়া একটি তথ্য অনুযায়ী বিংশ শতকে হিন্দু শ্রেণি সমূহ ও মুসলমানদের মধ্যেকার মধ্যবিত্তশ্রেণির সরকারী চকুরীতে পেশাগত অবস্থানটির একটি হিসাব তালিকা উপস্থাপন করা যেতে পারে। তালিকাটি প্রকাশের সময়টি নিয়ে মতান্তর রয়েছে। আর তাই আনুমানিক ১৯০৬-১৯৪৬ পর্যন্ত সময়টির মাত্রা দর্শনীয় ভাবে বিবেচনায় রাখা গেল। সময় সীমাটি ধরা হয়েছে ১৯২২-১৯৩৮ পর্যন্ত।[১২৬]

	Appointments in Convened and Statutory and services	High Government appointments Number % 1104 total 80.2		% of total Population 5.2
Brahman				
Baidya				
Kayastha				
Lower Caste				
Hindus	> 0	1B1	9.5	41.8
Muslims	3	141	10.3	51.2

উক্ত তথ্যের আলোকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে বাংলায় সর্বমোট জনসংখ্যার সংখ্যাগারিষ্ঠতার ভিত্তিতে মুসলিমরা হিন্দুদের চেয়ে এগিয়ে আছে। ১৯০০ সাল হতে ১৯৫০ সালের বাংলায় শিল্প ও বাণিজ্যের সময়ের সাথে আনুপাতিক উন্নতি ও অবনতির একটি গ্রাফের ভিত্তিতে মধ্যবিত্তশ্রেণির জীবনজীবিকার আর্থিক অবস্থান সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া হলো–

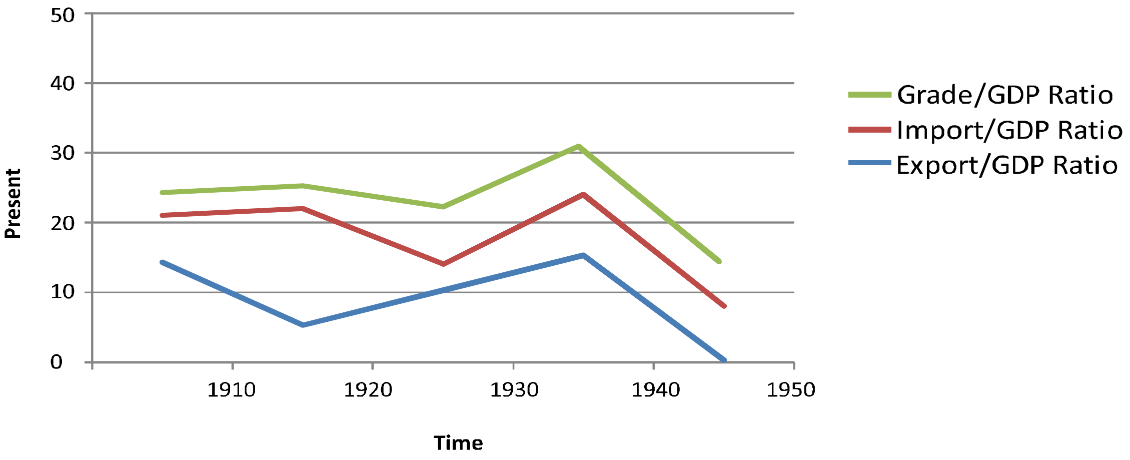

Source: Indian Industrial Commission Summary of Recommendations, P. 229-42.

যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় ও জনগণের প্রবল দাবিতে ১৯১৮ সালে ভারতে অধিক শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য একটি শিল্প কমিশন নিয়োগ করা হয়। কমিশনের ১৯১৮ সালে পেশকৃত রিপোর্ট পূর্বেকার অবাধ নীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মৌলিক প্রস্তাব ব্যক্ত করে।[১২৭] এসব প্রস্তাবের মধ্যে ছিল প্রদেশ সমূহের স্থায়ী শিল্পবিভাগ গঠন, শিল্পে প্রদেশের প্রত্যক্ষ সাহায্য, পথিকৃত এবং প্রদর্শক কারখানা প্রতিষ্ঠা, প্রত্যেক প্রদেশে রাজকীয় শিল্প বিভাগের অধীনে মাল ক্রয়ের জন্য

একটি কেন্দ্রিয় সংস্থা সৃষ্টি ইত্যাদি।[১২৮]তবে দুভার্গ্যের বিষয় হল ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসনসংস্কারের অধীনে প্রদেশগুলিতে শিল্পোন্নয়নের বিষয়টি হস্তান্তরের সাথে সাথে তা ব্যার্থতায় পর্যবসিত হয়। যাহোক, ভারতীয় শিল্প কমিশনের একটি ইতিবাচক ফল হলো ১৯২০ সালে বাংলায় একটি স্থায়ী শিল্পবিভাগ প্রতিষ্ঠা।[১২৯]

কিন্তু অপর্যাপ্ত সম্পদ বণ্টনের দরুন প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এর কর্মকাণ্ড সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে।[১৩০] ১৯২৫ সালে চামড়াশিল্প বিশেষত ট্যানারি বাংলা চামড়া ট্যানিং ইন্সটিটিউটে রুপান্তরিত হওয়ায় পেশা তথা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। তাছাড়াও এই ইন্সটিটিউট মফস্বলের চর্মকার এবং ভদ্র পরিবারের যুবকদের জন্য শিক্ষানবিস ক্লাসের ব্যবস্থা ও কর্মের জন্য দক্ষ মানবশক্তি তৈরী করে। তবে এখানেও আর্থিক দিকটি মানবেতর অবস্থাতেই থেকে যায়।[১৩১]১৯৩২-৩৩ সালে যে বেকারত্রাণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়, তার অধীনে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অতি-প্রসারিত পদর্শনীসমূহ পরিচালিত হয়। এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে পেশা কার্যকর করার জন্য বেকার ভদ্রলোকদের নতুন ও উন্নত পদ্ধতির প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া। তবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাসবাদী কাজ প্রতিহত করা।[১৩২]

এ কর্মসূচীর অধীনে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় ও দেশীয় শিল্পে আটাশটি প্রদর্শনী দল সৃষ্টি করা হয়েছিল। নির্বাচিত শিল্পগুলির মধ্যে ছিল পাট ও ড়ালের বস্ত্র উপাদান, বুট ও জুতা তৈরী এবং কাঁসার ধাতু-দ্রব্য নির্মান; সাবান তৈরী, ছুরি-কাঁচি তৈরী ও মৃৎশিল্প। ১৯৩৫-৩৬ সালের মধ্যে এখান থেকে এক হাজারের অধিক ছাত্র প্রশিক্ষণ গ্রহন করে। এদের মধ্যে ২৪১ জন ছাত্র স্বাধীনভাবে কারখানা খোলে এবং ১৬৬ জন ছাত্র চাকুরী লাভ করে।[১৩৩]

এই কর্মসূচী বেকারত্ব গুটিয়ে মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়ানোর যে উদ্যোগ নেয় অর্থের অপর্যাপ্ততার কারণে তা পুরোপুরি সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি। এই কর্মসূচীর জন্য তৎকালীন বাংলা সরকার যে অর্থের বিনিয়োগ করেছিল তা অতি সামান্য; টাকার অংকটি হল ১০০,০০০।[১৩৪]

১৯৩০-১৯৪০-এর দশককে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে মুসলমান যুগ, বলে চিহ্নিত করা হয়।[১৩৫]মুসলমান যুগ মানেই মুসলিমরা সকলদিকে শ্রেষ্ঠ হয়ে মহিয়ান হয়েছে তা কিন্তু না বরং কিছু অন্ধকার যুগও বলা যেতে পারে ঠিক এইভাবে হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায় তখন ক্ষমতাকে কেন্দ্রিভূত করার জন্য ব্রিটিশদের প্রশাসনিক রীতিনীতি গুলি থেকে নিজেদের কে পাল্টা-পাল্টি অবস্থানে নিচ্ছিল ‘বাংলায় কে হবে রাজা কারা হবে প্রজা ঠিক এরকম দ্বন্দ। ওদিক দিয়ে আবার মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে বাঙালি অবাঙালি দ্বন্দ এমত পরিস্থিতিতে উদীয়মান মুসলিম হিন্দু জাতীয়তাবাদকে অনবরত চ্যালেঞ্জ করতে থাকে। পূর্ববাঙালায়াত নিত্যনৈমোত্তিক মুসলিম প্রভাব তদুপরী পশ্চিম বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাষিত প্রতিষ্ঠানে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রভাব ছিল বেশী। মুসলমানদের এই প্রভাববৃদ্ধির কারণ হল একশ্রেণির মুসলমান কৃষকের সম্পদ বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র হলেও মুসলমান মধ্যবিত্তের সরব উপস্থিতি ও বিকাশ। ভালো অবস্থায় থাকার জন্য মুসলমান প্রজারা ভূমির উপর তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করে। আর খাজনা আদায়কারী হিন্দুদের অবস্থান শিথিল হয়ে পড়ে। এভাবে মফস্বল তথা স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে কেন্দ্র পর্যন্ত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি আর্থিক সচ্ছলতার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিধ্বনিকে জাগরুক করতে থাকে। তবে ভেবে দেখা দরকার ১৯৩০-১৯৪০ পর্যন্ত মুসলিম অন্ধকার যুগ সেটা কিভাবে– সেসময়ের উত্তপ্ত রাজনীতি

ভিষণভাবে বাঙালি মুসলিমদের অর্থনীতির উপরও প্রভাব ফেলেছিল ঠিক এই কারণে নাকি বাঙালি মুসলিমরা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে অবাঙালি মুসলিমদের সাথে আপোষ করে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার হিন্দুদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়ানোর কারণে ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ প্রজাসমিতি মুসলিম সম্প্রদায়ের সংগঠনের কাজ আরম্ভ করল। এই সমিতি ১৯৩৫ সালে গিয়ে তৎকালীন নানাবিধ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে এবং কতিপয় বামপন্থী আন্দোলনকারীদের দাবির মুখে সমিতিটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হল ' কৃষক প্রজা পার্টি, তাদের স্লোগান ছিল–

"জমি কার?

যে চাষ করে তার"

যার উত্তাপে জমিদার ও তালুকদারেরা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানটি ত্যাগ করে, তবে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক তালুকদার হওয়া সত্ত্বেও কৃষক প্রজা পার্টিতেই থাকলেন। এখানে তাঁর আদর্শ বা নীতি ছিল– দু'বেলা দু'মুঠো ডাল-ভাতের যোগাড়; তাই তাঁর আশা আকাঙ্খা প্রজা সাধারণের ডাল ভাতের যোগাড় করনে নিবদ্ধ ছিল এ কথা স্বীকার্য। কৃষক শ্রেণির সমর্থন ব্যতিরেকে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়– একথা উপলব্ধি করে তিনি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির চেয়ে কৃষকদের উপর বেশি নির্ভর করলেন। এদিক দিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির আর্থিক অবস্থাও দিন দিন খারাপ হচ্ছে, যার পিছনে দায়ী ছিল মূলত অবাঙালি মুসলিম বনিক সম্প্রদায়।[১৩৬]

বিশ শতকের '৪০-এর দশকের কথা। বাংলার প্রজা, চাষী আর ভূমিহীন শ্রমিকেরা কোলকাতা ও অন্যান্য শহরবাসী জমিদারদের দ্বারা তখনও অত্যাচারিত হত। এসব জমিদারদেও হৃদয়ে প্রজাদের জন্য কোনো মায়াদয়া ছিল না। প্রজাদের থেকে সাধ্যতিরিক্ত খাজনা আদায় করে তারা কলকাতায় নারী, সুরী আর রেসের ঘোড়ার পিছনে ব্যয় করত। জমিদারদের দাবি মেটাবার জন্য প্রজারা মহাজনদের কাছে গহনা বাসনপত্র বন্ধক রাখত। প্রায়ই তারা নাম মাত্র দামে জমির ফসল মহাজনদের নিকট বিক্রি করত। তাদের সুদের হার কখনও কখনও শতকরা একশত টাকা ছিল। স্বভাবতই সেই ঋণ চাষীদের পক্ষে শোধ করা তাদের গোটা জীবনেও সম্ভব হত না। পরিশেষে তারা বাধ্য হত জমিজমা বিক্রি করতে। এভাবে বাংলায় ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছিল। এদের মধ্য কিছু লোক মাছ ধরে জীবীকা নির্বাহের চেষ্টা করলু তবে বেশিরভাগ লোকের দিনমজুরির উপর জীবিকানির্বাহ করতে হত। এভাবে ঋণগ্রস্থ চাষীদের জমি ক্রমে মহাজনদের হাতে চলে গেল।

বাংলার দুর্ভাগ্য যে শতকরা নব্বইজন জমিদার আর নিরানব্বই জন মহাজন ছিল বর্ণ-হিন্দু। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই অর্থনৈতিক স্বার্থের খাতিরে নিজ নিজ ধর্মের আড়ালে আশ্রয় নিতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল এক শ্রেণিসংগ্রাম। কিন্তু কোলকাতার অবাঙালী হিন্দু ও উত্তর ভারতের অবাঙালি মুসলমানদের মিথ্যাচারিতায় শেষ পর্যন্ত তা সাম্প্রদায়িক বিরোধে রূপ নিল। যাহোক পরিশেষে মহাজনদের শোষণ থেকে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের বাঁচানোর জন্য প্রথমে বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন এবং পরে মহাজনী আইন পাশ হল। এদিক দিয়ে আবার শ্রমিক সংস্থার নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শ্রমিক মঙ্গল আইন বা মাতৃমঙ্গল আইন পাশ করালেন। বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের আর্থিক উন্নতির লক্ষে

মুসলিম লীগ (১৯০৬) যুবসম্প্রদায়ের জন্য চাকুরির পথ উন্মুক্ত করল। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মুসলিমরা যেখানে সীমিত আকারে সরকারি চাকুরি পেত সেখানে ১৯৪০ ও তার পরে মুসলমান চাকুরি জীবিদের সংখ্যা বাড়তেই লাগল।

মূলত গোটা ভারতের মুসলমান একই ধর্মের কিন্তু উত্তর ভারতের মুসলমানরা তথা অবাঙালি মুসলিমরা যতটুকু সুচুতুর ছিলেন তার খুব কাছা কাছি ছিলেন না বাঙালি মুসলিমরা। আলীগড় আন্দোলনই তার বড় প্রমান। অপরদিকে পশ্চিম বাঙলা ও পূর্ববাঙালার মুসলিম লীগের দুই জন বৃটিশ সরকার তেমন সমর্থন লাভের পৃথক চেষ্টা করেননি তারা চেয়েছিলেন অবাঙালি 'জিন্নাহ্' মুসলমানদের প্রতিনিধি হয়ে কী করে। তাই তৃনমূল হতে বঙ্গীয় মুসলীম রেনেসাতে তাঁরা অতটা মন দিতে পারেন নি। যে বাংলা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, যেখানে রাত-দিন চলে কৃষক-প্রজা-মহাজন-জমিদার-বৃটিশশাসন এভাবে পঞ্চভূত্র দ্বন্ধ সেই দেশের নেতারা মানবিকতার স্বার্থে অর্ন্তদ্বন্ধ নিরসে ব্যস্ত থাকার কথা নয়; তবে সময়টাত ছিল চৌকাসতার সাথে নিজেদের স্বস্ত সামগ্রিক অধিকার কেন্দ্র হতে কেড়ে নেওয়া। আর বোধ হয় '৪৭, -এর দেশভাগের পূর্বে তাই শোনা যায় না সোহরাওয়াদী কিংবা ফজলুল হক+ ক্রিপস কিংবা মাউন্টব্যাটেন আলোচনা, শোনা যায় নেহেরু, প্যাটেল+ ক্রিপস, মাউন্টব্যাটেন আলোচনা; আলোচনা আবার জিন্নাহ+গাঁন্ধীজি; জিন্নাহ+ মাউন্টব্যাটেন+ গান্ধী। যাহোক পরিশেষে মুসলিম মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে বাংলার আপামর মুসলমানদের অর্থনৈতিক মুক্তিই ছিল বাঙালি মুসলিম নেতাদের তখন একমাত্র লক্ষ ও উদ্দেশ্য আর সেভাবেই চলেছিল বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তের আর্থিক পরিস্থিতি উন্নয়নের পাশাপাশি আপামর মুসলমানের অর্থনৈতিক মুক্তির দাবিটি উত্তপ্ত সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মধ্যদিয়ে ভীষণ ভাবে সর্ব ভারতীয় করনের লড়াইয়ের চৌকাঠ ঘেষে। অর্থনৈতিক মুক্তি, অর্থনৈতিক সচ্চলতা মানেই সায়ত্ত্বশাসন আর সায়ত্ত্ব শাসন মানে স্বাধীনতা। মুক্তি আসলে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের আসে নি, আসে নি প্রগতিবাদী চেতনাবোধ আর তাইত '১৯৪৭, -এর পরে নতুন করে আরো কঠিনভাবে বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি আর্থিক দূর্দশার শিকার হতে থাকল।

সোন সবে দিনদার...আসরাফের
ফকর বিচার।
আশরাফের বলায় জারা বেদাতের জড় তারা।...
কৈলে কহে খেগোট্টা যত।
হাম দুব আসরফ জাত।
মেরা দুবকা নাহি এয়ছা চাল
কমজাত কামিরী হোগা।
বেত্তাজানকা নেকা দেগা।
আসরাফোঁকা নাহি এয়ছা কাল।[১৩৭]

হিন্দু ধর্ম জাতিভেদ প্রথা, বর্ণপ্রথা, শ্রেণিবৈষম্য প্রভৃতিতে জর্জরিত। মুসলমান কর্তৃক বাংলা বিজয়ের আগেও হিন্দুদের ঠিক এমন অবস্থা। সমস্যা মুসলমানের যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বাংলা বিজয়ের পর শাসকশ্রেণিইবা কেন এই সব

নিয়মিত প্রথাগুলি ভিন্ন নামে ভিন্ন আঙিকে সমাজে প্রবাহমান রাখল। মুসলিম শাসকগণ চলবে সাম্যের নীতিতে, চর্চা করবে সমতা, রক্ষা করবে সাম্য, বিধিত করবে সমতা। তাহলেই কায়েম হত উন্নত সরোবর, উন্নত সমাজ। যাহোক ইসলামের সেই ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের আদর্শকে গ্রাস করে হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা। সৈয়দ, পাঠান, মোঘলরা নিজেদেরকে ভাবতে শুরু করে তারা অন্যান্য মুসলমান থেকেও শ্রেষ্ঠতর। নিজেদেরকে তাঁরা দাবি করে, প্রতিষ্ঠিত করে আশরাফ বলে। তারা এমন আশরাফ আতরাফের দুর হতে আসা নিঃশাস ও প্রঃশ্বাসের শব্দকেও রোধ করতে পারে। এখানেই তৈরী হয় সামাজিক সংকট। বাণিজ্য নির্ভর, ভূমি নির্ভর, শিল্প নির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণি (মুসলিম) সামাজিক সংকট কখনও নিরসন করার চেষ্টা করেনি; বরং পারেও নি। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বলতে গেলে আনুমানিক ১৮৭০-এর পর হতে শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির উত্থান ও বিশ শতকের ১৯১৪-১৯৫০ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিকাশ পর্বের মানুষগুলি সামাজিক সংকট নিরসনে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। উইলিয়াম হান্টার ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তার অধুনা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ *Indian Mussainans*এ অকুণ্ঠিত একটি মত প্রদান করেন–

"১৭০ বৎসর পূর্বে বাংলাদেশে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া প্রায় অসম্ভব; আজ ধনী থাকাই তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব।"[১৩৮]

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি ধনাতান্ত্রিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্র ছাড়া যদি ব্যক্তির উপর শিল্প-বাণিজ্যের জন্য নির্ভর করতে হয়, তাহলে যেকোন দেশের শিল্পোন্নতির মূলে যে শিল্পোদ্যযোগী পুরুষের দুরদর্শী অভিযানের প্রয়োজন আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না, অথবা অর্থতত্ত্বের সূত্র ধরে বিচার করার প্রয়োজন হয় না। অর্থনীতিবিদরা অনেকে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যমের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন এবং শুম্পিটারের মতো কয়েকজন শিল্পোন্নতির মূলে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যমের ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[১৩৯]

শুম্পিটার বলেছেন যে, কোন দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ প্রাকৃতিক নিয়মে সচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে হয় না, হঠাৎ এক একটা ঝাঁকুনি ও উল্লম্ফের ভিতর দিয়ে হয়। এই ঝাঁকুনি ও উল্লম্ফের শক্তি যোগান দেন প্রত্যেকদেশের শিল্পোদযোগী পুরুষরা, যারা বলিষ্ট কল্পনা ও একাগ্রতা নিয়ে স্বাধীন শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রগতির নতুন পথের সন্ধান দেয়। ইংল্যান্ড, আমেরিকা এমনকি জাপানের মত শিল্পোন্নত দেশের ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যায় যে শিল্পোন্নতির মূলে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যমের ভূমিকা (role)বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু প্রথমেই আমরা যে প্রশ্ন উত্থাপন করে তুলতে চাই বা তোলার চেষ্টা করি তা হল গিয়ে বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণিটি এতটা সংকটের মধ্যে উত্থিত হল এবং এতটা প্রতিযোগীতা মূলক পরিবেশের সাথে প্রতিযোগীতার কাল ক্ষেপনকে সামাল দিয়ে বিকশিত হল যে, বংশানুক্রমে বাণিজ্য বৃত্তিজীবী হয়ে উঠে জীবনমানকে চ্যালেঞ্জ কারী এবং সেই সাথে সাথে শিল্পোদ্যমের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে কেন সক্ষম হল না? বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিকূল ছিল নাকি স্বজাতীয় জাগরনের অভাব ছিল? ইতিহাসের পাতাগুলি আরো অনুসন্ধান করার সময় বোধ হয় এসেছে। তবে এত আলোচনার পরে এই কথাটি অন্তত পক্ষে স্বীকারযোগ্য যে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি আপস করেছে অর্থের সাথে, সমাজের সাথে, ক্ষমতার সাথে।

তথ্যসূত্র:

১ কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, স্টুডেন্টস পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৩৭৬, পৃ, ৮।

২ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০০-১৯৭১)*,২য় খন্ড, *অর্থনৈতিক*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ, ২।

৩ *ঐ*।

৪ এ মতবাদের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ইমানুয়েল ওয়ালেস্টেইন (Immanual Wallerstein). *The Modern World–system*, Mcgrow-Hill, New York, 1974, 1980, 1989)শিরোনামের গ্রন্থ সিরিজে তিনি অতি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন কিভাবে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা আঠারো, উনিশ শতকে পুঁজিবাদী কিন্তু অর্থনীতির মাধ্যাকর্ষণে বিলীণ হয়ে পুঁজিবাদী শিল্পায়িত দেশ সমূহের বাজারে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে তাঁর গবেষণার মূল্য অনেক। কিন্তু আঞ্চলিক পর্যায়ে তাঁর তত্ত্ব সবসময় পূর্ণভাবে খাটেনা। বাংলার অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে বিশ্লেষণ রয়েছে তাঁর সিরিজের তৃতীয় অংশ (১৯৮৯); পৃ, ১৩৯-৪০, ১৫৮-৫৯, ১৬৭-৮৭।

৫ T. Steuant, *Principles of Money Applied to the present state of the Coin in Bengal*, Verlag nicht ermittelbar, Columbia University, 2009, P, 63.

৬ সমসাময়িক শাসকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভংগি সম্পর্কে ধারনা লাভের জন্য এ ফরমান একটি কৌতূহল্লোদ্দীপক দলিল। Sukumar Bhattacharya, *The East India Company and the Economy of Bengal*, (1704-1740) Book World, Calcutta-1969, P, 71.

৭ Abdul Karim, *Murshid Quli khan and His Times*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1963, P, 166-173.

৮ Om Prakash, *Duch East India Company*. p:- 8.] (New) Tirthankar Roy, *The East India Company The World's Most Powerfl corporation*, Ananda Publishers Private Limited, 45, Beniatola Lane, Calcutta 700009, Calcutta-2012, p. 8

৯ Abul Fazl, Ain-i-Akbari, Vol. 1, Text (ed) Blochmam, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1949, Vol.11, P,122-23; Al Biruni, *Muntakhab-ut- tawarikh*, Text (ed). Mailabi Ali, Vol 1, P, 349, Trans Ranking, Vol. 1, P, 458 .

১০ S.C. Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol.3, London, 1905, p 160; আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃ, ৩২।

১১ Ghulam Husain Salim Zaidpuri, *Riyaz-us-Salatin, Text (ed) Maulavi Abdus Salam, Asiatic Society of Bengal,* Calcutta, 1904, P, 4.

১২ N.K. Sinha,'Parliamantary Papers House of commons', Vol. V111, *The Economic History of Bengal*, Vol. 11 Calcutta University, Calcutta-1965, (calcutta 1968), P, 23.

১৩ তীর্থংকার রায়, *ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা ২০১২, পৃ, ১৪-১৫।

১৪ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ, ৩০।

১৫ বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ, ২৪।

১৬ দীনবন্ধু মিত্র রচিত নীলদর্পন নাটকে নীলকরদের অত্যাচার চিত্রিত হয়। পাদ্রি জেমস লং ইংরেজীতে অনুবাদ করে নাটকটি মঞ্চস্থ করার কারণে কারাদন্ড ভোগ করেছিলেন।

১৭ পাদ্রি জেমস লং এই আন্দোলনের জন্য স্মরনীয় হয়ে আছেন।

১৮ বাণিজ্য নীতি- উৎপাদিত শিল্পপন্যের চেয়ে কাঁচামাল উৎপাদন এবং যোগান দেবার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান; অর্থাৎ ভারত থেকে কাঁচামাল আমদানী করে ইংল্যান্ড নিয়ে; ভারতে শিল্প পন্যের বাজার সৃষ্টি করা।

১৯ Lovat Fraser, *Iron and steel in India*, Macmillan & Co, Bombay, 1919, P, 6.

২০ Ibid, p, 11-12.

২১ Douglas Hall, *Idcas and Illustrations in Economic History,* New York U.S.A., 1964, P, 15.

২২ সুশীল চৌধুরী, 'আঠার শতকে ইউরোপীয় কোম্পানি ও রপ্তানি বাণিজ্য', সিরাজুল ইসলাম, (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), ২য় খণ্ড, (অর্থনৈতিক), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ, ৩৭৬।

২৩ *ঐ।*

২৪ বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্রঃ* ৪র্থ খন্ড, পাঠ ভবন, কোলকাতা, ১৯৬০, পৃ, ১৩০-৩৪।

২৫ David C. Mcclelland: *The Achieving society (Princetion 1961)*, chapter 6, p, 205.

২৬ আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬ পৃ, ২৮।

২৭ ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি*, এ্যাডন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ, ৫১।

২৮ *বিব্লিওগ্রাফি অব দি মুসলিম ইনস্ক্রিপশন অব বেঙ্গল অ্যাপেনডিক্স টু জে.এস.পি. ২য় খন্ড*, ১৯৫৭, পৃ, ৯৪-১০২।

২৯ দ্যা অ্যানালস পত্রিকা, ১৯২৯, পৃ, ১১৭।

৩০ জে. এন.দাশগুপ্ত: *বেঙ্গল ইন দি- সিক্সটিনথ সেঞ্চুরি*, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১৯১৪, পৃঃ ১০৬। বারবোসা এবং ভারতেমা সাতগাঁও বা চট্টগ্রামের উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তারা বেঙ্গালা শহরের উল্লেখ করেছেন সেটাকে সাধারনত চট্টগ্রাম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

৩১ B.B. Misra, *The Indian, Middle classes, Their growth in Modern Times*, Oxford University Press, London, 1961, P, 4.

৩২ K.M. Ashraf, *Life and Conditions of The People of Hindustan, Munshiram* , New Delhi. 1970, P, 59.

৩৩ খন্দকার ফজলে রাব্বী, *বাংলার মুসলমান*, আবদুর রাজ্জাক অনূদিত, চিরায়ত প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ, ৯১।

৩৪ আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০১২, পৃ, ২২।

৩৫ ড. নোমান আহমদ সিদ্দিকী, *মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা (১৭০০-১৭৫০)*, পলি পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৯৯৪, পৃ, ৮৮।

৩৬ ড. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ৩য় খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ, ৫৩।

৩৭ গোলাম রব্বানী, *ঔপনিবেশপূর্ব বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, ঐতিহ্য*, ঢাকা, ২০০১, পৃ, ২১।

৩৮ ম.ইসলাম, *হায়াৎ মাহমুদ*, আই. বি.এস., রাজশাহী, ১৯৬১, পৃ, ১৩৬।

৩৯ কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা*, ১ম খন্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ, ৭০।

৪০ B.H. Baden powell,*The origin and growth of village communities in gndra*, Swan Sonnenschein, London, 1899, P, 60.

৪১ আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ২৩-২৪।

৪২ A.Y.Shamsul Alam, *'Khilafat Movwment and the Muslims Bangal,'* Unpublished Thesis dissertation, P, 2.

৪৩ Ibid, P, 2.

৪৪ Rafi uddin Ahmed, *The Bangal Muslims, A guest for Identity*, Oxford University Press, Delhi, 1981, 1871-1906, P, 1 2.

৪৫ *Census of Bengal*, 1872 General statement, IB, PP. XXXII-XXXIII

৪৬ Gautam Chatto Padhyay, *Bengal: Early Nineteenth Century*, Thacker Spink and Co, London, 1978, P, 3.

৪৭ A.K.Nazmul Karim, *Changing Society, Dynamics of Bangladesh society,* Nawroze Kitabistan, Banglabazar, Dhaka-1956, p, 67, p, 98.

৪৮ পার্সি ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার (ইসলামিক পিরিয়ড)*, দি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি বোম্বে শাখা, বোম্বে, ১৯৪২, পৃ, ১।

৪৯ এ. এইচ.দানী, *ইভলিউশন অব দি বেঙ্গলী মুসলিম সোসাইটি*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ঢাকা, ১৯৫৭, পৃ, ১২৫-১২৭।

৫০ আর.সি.মজুমদার (সম্পাদিত), *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, প্রথম খন্ড, বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত পরিচ্ছদ*, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা, ১৯৯৬, পৃ, ৬৫।

৫১ চৈতন্য ভগবত, আদি, চর্তুদশ। বাত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন তবে কেন হিন্দুর আঁচারে দেহ মন।। আমর ! হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত। তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশজাত।। জাতি ধর্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার। পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার।। না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার। সে পাপ ঘুচাই করি কলিমা উচ্চার।

৫২ বি.কে, ভট্রাচার্য (সম্পাদিত),বিজয়গুপ্ত *পদ্মপুরান*, বাণী নিকেতন, বরিশাল, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ, ৫৭।

৫৩ কবি কঙ্কনচন্ডি, *মুকুন্দরাম*, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা, ১৯২৪, ১৯২৬, পৃ, ৮৫-৮৬।

৫৪ এ.এফ.ইমাম আলী, *দি কনসেপ্ট অব কাস্ট: এ নিউ পারসপেক্টিভ*, ভল্যুম ৮, নং ১, চিটাগাং ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, চিটাগাং, ১৯৮৫, পৃ, ৪৭।

৫৫ ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা- চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩, পৃ, ১৫।

৫৬ শ্রী নিবাস, *জাস্ট ইন মডার্ন ইন্ডিয়া অ্যান্ড আদার এসজ*, সাউথ এশিয়া বুকস, কলম্বিয়া, ১৯৭৮, পৃ, ৪৭।

৫৭ গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *বাংলাদেশ ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতি*, (*মুসলমান সমাজে বর্ণ-প্রথার প্রভাব ও প্রকৃতি*), অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা-২০১০, পৃ, ৮১।

৫৮ এম.কে.এ.সিদ্দিকী, *কাস্ট এমাং দি মুসলিমস অব ক্যালকাটা*, প্রবন্ধ,ইমতিয়াজ আহম্মদ (সম্পাদিত), *কাস্ট অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্রাটিফিকেশন এবং মুসলিমস ইন ইন্ডিয়া*, সাউথ এশিয়া বুকস, কলাম্বিয়া, ১৯৭৮, পৃ, ২৪৩।

৫৯ গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুপ্ত*, পৃ, ৮২

৬০ খন্দকার ফজলে রাব্বি, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ১৩৪-৩৫।

৬১ সেন্স্যাস অব ইন্ডিয়া, ১৯০১, ং, ১, পার্ট, ১, পৃ, ৫৪৩।

৬২ আবদুল কাদির, (সম্পাদিত) *কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী*, ঢাকা কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ, ১।

৬৩ সেন্সাস অব ইন্ডিয়া, ১৯০১, ঙ, ১, পৃ, ৪৩৯-৫১।

৬৪ কাজী আবদুল ওদুদ, *শ্রেষ্টপ্রবন্ধ*, (আবদুল্লাহ প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা-২০১৬, পৃ, ২৯১।

৬৫ *এনসাইক্লোপিডিয়া অব রেলিজিয়ন অ্যান্ড এথিকস্*, ৩০ খন্ড, পৃ, ৪০।

৬৬ পার্সি ব্রাউন, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ১।

৬৭ বিজয়গুপ্ত, *পদ্ম পুরান*, বি.কে. ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, বাণী নিকেতন, বরিশাল, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ, ৬১।

৬৮ Ahmad Hasan Dani, *Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal*, Vol, ii, Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Dhaka, 1957, P, 120.

৬৯ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী অনু. ১৫৪০-১৬০০, কলকাতা ১৯২৪, ১৯২৬, ১৯৮৬।

৭০ মুস্তফা নূরউল ইসলাম সংকলিত ও সম্পাদিত *শিখা সমগ্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০০৩, পৃ, ৬১৩।

৭১ শাহজাহান মনির, *বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা ধারা* (১৯১৯-১৯৪০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ, ২২০।

৭২ আবুল হোসেন, *আদেশের নিগ্রহ,আবুল হোসেনের রচনাবলী*, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী-১৯৮৮, পৃ, ১২৫।

৭৩ আব্দুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল রচনাবলী*, দ্বিতীয় খন্ড, কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা-১৯৬৭, পৃ, ১৫-১৭।

৭৪ এইচ.এ.আর.গিব: ইবনে বতুতা, *ট্রাভেলস ইন এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকা*, এশিয়া পাবলিশিং হাউজ, লন্ডন, ১৯২৯, পৃ, ৬৮-৬৯।

৭৫ দূরবীন.. সাপ্তাহিক ফারসি পত্রিকা ১৮৫৩ ।

৭৬ Karl Marks, *Selected words*, Progress publishers, Moscow, 1973, p, 131.

৭৭ আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক ও মধ্যবিত্তশ্রেণি*,বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃ, ৬৮।

৭৮ Vera Anstey, *The Economic Development of India*, Longmons Green and Co, London-1952, P, 279.

৭৯ Raqib Uddin Ahmed, *The Progress of the Jute Industry and Trade (*1855-1966)*,* Pakistan Central Jute Committee, Dacca, 1966, P, 3.

৮০ 1.75th Anniversary Supplement, The Calcutta Gezzette, January 2, 1958, P, 172.

৮১ 175th Anniversary Supplement, The Calcutta Gezzettee, January 2, 1958, P, 72.

৮২ S.B.Saul. *Studies in British Overseas Trade,* London University Press, 1970, P, 55-63.

৮৩ Hindu Patriot, a weekly newspaper, Calcutta, 1853.

৮৪ উৎস: নীল কমিশন রিপোর্ট, পরিশিষ্ট ৩।

৮৫ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১), ২য় খন্ড, অর্থনৈতিক ইতিহাস; সুগত বসু, *প্রবন্ধ* 'বাংলার সাধারন অর্থনৈতিক অবস্থা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ, ৮২।

৮৬ Hem chandra kar, *Report on the Cultivation of and Trade in Jute* (Calcutta 1877); Binay Bhushan chaudhuri, *Agriculture in Bengal*: 1859-1885; *Indian Economic and social History Review hercafter IESHR)*, Vol. VII, No -2,240-1; Chaudhuri, *Foreogm Trsds*. kumar (ed.),*Cambridge Economic History*, Vol. II Cambridge University Press, Cambridge, 1970, P, 851 2.

৮৭ মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ (মৃ. ১৯৩৩) বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় স্থায়ী বসবাসের কালে মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও বিভিন্ন সংগঠনের সালে জড়িত ছিলেন। ৮৫- উদ্বৃত, মাহমুদ শাহ কোরেশী, '*বঙ্গীয় রেনেসঁসে মুসলমানদের ভূমিকা*' ইদুল ফিতর বিশেষ সংখ্যা, দৈনিক বাংলা, ১৯৯০।

৮৮ উদ্বৃত, মাহমুদ শাহ্ কোরেশী, 'বঙ্গীয় রেনেসঁসে মুসলমানদের ভূমিকা', ঈদুল ফিতর, বিশেষ সংখ্যা, দৈনিক বাংলা, ১৯৯০, পৃ, ৮।

৮৯ J.A.Vas, *Preface to the Census Report*, 1911, Calcutta, P, 3.

৯০ Report of the census of Bengal, 1881, Vol. 1, P, 179.

৯১ Report of the Census of India 1901, Vol. VI, P, 484.

৯২ Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30, vol. 1. 104.

৯৩ ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় 'জনশক্তি' পত্রিকা প্রথম চালিকা শক্তি হিসাবে প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক জনশক্তি পত্রিকার নবপর্যায় প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২ শে আগস্ট। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী (১৯১৩-১৯৯৩)।

৯৪ গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতিও সংস্কৃতি, প্রবন্ধ, জনশক্তি পত্রিকা ও চা শ্রমিক শ্রেণি*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ, ১০৩-১০৪।

৯৫ Sugata Bose, *Agrarian Bengal: Economy, social Structure and Politics 1919-1947,* Cambridge University Press, London, 2007, P, 220.

৯৬ বুজলি না তুই বুড়ার বেটা, আবেদের কথা নয়কো ঝুটা খেতে হবে পাটের গোড়া টিক জানিস মোর ভাষা মরে করেছো বিন টাকা সে আশা তোর যাবে ফাঁকা পঁচিশের পয়া হবে তোর, ঋণে পড়বি ঠাসা নিবি বটে টাকা ঘরে পেটের দায়ে যাবে ফুরে হিসেব করে দেখিস খাতা, যতো খরচের পাশা। "আবেদ আলী মিয়া, দেশ শান্তি (গনতিপাড়া, রংপুর ১৯২৫) ।

৯৭ Binay Bhushan Chowdhury, *Agrarian relations of India,* Cambridge University Press, London, 1982, P, 86, -177.

৯৮ Willem Van Schendel and Aminul Haque Faraizi, *Rural Labourers in Bengal 1880 to 1980*, Rotterdom, London, 1984, P, 83-84.

৯৯ Sirajul Islam, *Rent and Raiyat Society an Economy of Eastern Bengal 1859-1928*, Dacca University Doc. No. 138, Dhaka, 1989, P, 54.

১০০ *Ibid*, P, 54.

১০১ M Day, *Collection of Dhaka, to Board of Revenue, 1785,* Sirajul Islam, *(ed),* Bangladesh District Records, Vol. 1, Dacca District, Dacca 1787, P, 136-37.

১০২ Susan S. Bean, *'Calcutta Banians for the American Trade,' Pratap Pal (ed), Changing Vission, lookings, Images: Calcutta through 300 Years*, Popular Prakashan, Bombay 1990, P, 71-73.

১০৩ Debendra Bijoy Mitra, *The Cotton Weavers of Bengal 1757-1833*, Research India Publication, (Calcutta 1978), P, 62.

১০৪ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *শিখাসমগ্র*,রকীব উদ্দিন আহমদ, *বাংলার লুপ্ত শিল্প*, পৃ, ২০০-২০১।

১০৫ আনোয়ার হোসেন, *মুসলমানের আর্থিক সমস্যা, শিখাসমগ্র, মোস্তফা নূরুল ইসলাম*, বাংলা একাডেমী, ২০০৩, পৃ, ১২২।

১০৬ শাহজাহান মনির, *বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাধারা* (১৯১৯-১৯৪০), রোকেয়া শাখাওয়াৎ হোসেন, *চাষার দুক্ষু*, *রোকেয়া রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ, ২৬৩।

১০৭ রোকেয়া শাখাওয়াৎ হোসেন, এর অনুকরণ *"এন্ডি শিল্প"* "রোকেয়া রচনাবলী" পৃ, ২১৭।

১০৮ আব্দুল কাদির (সম্পাদিত), *'নজরুল-রচনাবলী'*, পঞ্চম খন্ড, ঢাকা কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা-১৯৬৮, পৃ, ৭-৯।

১০৯ আবদুল বাছির,*বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃ, ২০০।

১১০ মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত), *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি সমাজ*, মাওলাব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ, ৭৫।

১১১ B.B.Misra, *The Indian Middle class. Growth in Moderndimes*. Oxford University Press, London, 1961, P, 134.

১১২ Nazmul karim, *Dynamics of Bangladesh society*, Nawroze Kitabistan, 5 Banglabazar, Dhaka-1956, P, 240.

১১৩ Rangslal Sen, *Political Elites in Bangladesh*, Barkely, P, 19.

১১৪ গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ, ১০৪।

১১৫ Topomohan Chatterjee, *Rood to plassey*, Sterling Publications (P) Ltd, New Delhi 1972, P, 98.

১১৬ A.R.Malick, *British policy and the Muslims in Bengal* (1757-1856, Bangla Academy, Dhaka, 1977, P, 75.

১১৭ রওশন হেদায়েৎ, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩২।

১১৮ Census of India, 1911, Vol, V, Part -1, P, 450.

১১৯ 1. Census of Bengal, 1881, Vol. 1. P, 178.

2. Census of India,1901, Vol. V1, part -1, PP, 449-447.

3. Census of India,1911,Vol.1, Part-1 PP, 550.

4. Census of India, 1921,Vol, V. Bengal, part-11, P, 362-368.

১২০ Census of India, 1921, Vol,V. Bengal, part-11, P, 365.

১২১ Sirajulj Islam, *Rent and Raiyat, Society and Economy Eastern Bengal* 1859-1928, Dacca University Doc. No. 138, (Dhaka 1987), P, 230.

১২২ Sirajul Islam, *Bengal land Tenure: The Origin and growth of Intermediate Interest*, Calcutta 1986, Royal Asiatic Society, chapters 2 and 3.

১২৩ IOR: MSS Eur F. 78, File No. 59/8B, Sir Charles Wood Collection,দেখুন;Minute by Hon'ble Sir C.E., Travellyan*, On the Burwai Iron works*, Calcutta, 1863.

১২৪ Sir E. C. Buck, *Report on practical and Teenical Education*, Calcutta 1901, 37-38.

১২৫ J.C.K Peterson, *Industrial Development in Bengal. The English man*' Annual Financial Review, 4 March 1918, Calcutta, P, 11.

১২৬ T.H Broomfield, *Elite Conflict on a plural society: Twenty Century Bangla, (ef)*, Berkerly, London, 1968, PP, 5-12.

১২৭ Clive Deway, *The Governnemt of India's New Industrial policy*, 1905-25; A study in Failure' a paper presented at the Institute of commonwealth studies (Post-graduate seminer) on 10th July 1975.

১২৮ Indian Industrial Commission, Summary of Recommendations, P, 227-42.

১২৯ With the estblishment if a temporary Department of Industries in 1971 a temporary Director was also appointed. But till the end of 1919, the post of the Director of Industries was held by the controller of Munitions and the combined offieer was called combined controller of Munitions and the Director of Industries. †`Lyb, Annual Administration Report of the department of Industries, Bengal, October 1917 to December 1919, 1

১৩০ Awwal, *Industrial Development*, Appendix 1, P,239.

১৩১ Awwal, *Administration Report of the Department of Industries, Bengal*, 1931-32, 20

১৩২ Iftikhar-ul-Awwal, *The problem of Middle class Educated Unemployment in Bengal, 1912-1942, in Indian Economic and social History Review*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2017, xix, 1, P, 41-42.

১৩৩ IOR: Vol. 12075, *Bengal Revenue Proceddings* (Industries), December 1936, Nos. P, 13,14,22.

১৩৪ IOR: Vol. 12075, *Bengal Revenue Proceddings* (Industries), December 1936, Nos. P, 13-14, 22.

১৩৫ Subhas Chandra Bose, *An Indian Pilgrim*, Jayasree, Calcutta, 1948, P, 15.

১৩৬ কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা: স্টুডেন্টস পাবলিকেশন, ১৩৭৬, পৃ, ৩৫-৩৭।

১৩৭ Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslims 1871-1909, A Quest for Identity*, Oxford University Press, Delhi, 1981, P, 23.

১৩৮ Willam Wilson hunter, *The Indian Musalmans,* Trubner and Company, Oxford University, London, 1872, P,155.

১৩৯ T.A.Schumpeter, *The theory of Economic Development*, Harvard University Press, Harvard, 1934, P, 54.

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা এবং বাঙালি মুসলমান

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘ভারতবর্ষ’ কবিতায় লিখেছেন—

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোত এল কোথা হতে,
সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য,
হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক-হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।[১]

মুসলমানরা ভারতবর্ষের কতটুকু আপন, কতটুকু পর আলোচনার মুখ্য বিষয় সেটি না হলেও আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে হিন্দু মুসলিম যে প্রতিযোগিতা তার উৎস কিন্তু হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের জাতিগত উৎসের সাথে সখ্যতা বজায় রেখেই বিতর্কিত হয়। মুসলমানরা ভারতে বিদেশী ছিল আর তাই হিন্দুগণ তাদের অধীনে থেকে শাসিত হতে কখনও চান নি একথা অগ্রাহ্য করার শক্তি কোন হিন্দু নেতারই থাকা শোভা পাবে না। উপরন্তু হিন্দুদেরকে শাসন করতে গিয়ে কুটনৈতিক বহিঃপ্রকাশও মুসলিম শাসকরা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে শাসন ব্যবস্থা থেকে দূরে গিয়েও ভারতবর্ষের মুসলমানগণ একেবারেই যেন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিমজ্জিত ছিলেন। মুসলিমরা ভারতে এসে হিন্দুদেরকে মুসলিম বানাতে তথা ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিল। শান্তি প্রক্রিয়ায় ও ভালবাসার স্রোতে ধর্মান্তরিতকরণের চেয়েও পৌত্তলিকতার বিনাশ ঘটিয়ে ধর্মান্তরিতকরণ হিন্দুদের মনে বিশেষ দাগ কেটেছিল। আর তখন থেকে সংকট (হিন্দু-মুসলিম), এই সংকট এত প্রকট যে তা দুরীভূত করার জন্য কদাচিৎ কিছু হিন্দুবাদী, কিছু মুসলিমবাদী রাজনৈতিক নেতা চেষ্টা করলেও তা শেষ পর্যন্ত জাগরণের অভাবে ব্যর্থ হয়, তদুপরী রাজনৈতিক নেতাগণ ছিলেন সাধারণ মানুষদের কাছে বিতর্কিত। ভারতীয় উপমহাদেশ যেন তখন একটি বৃত্তে থেকে ঘুরপাক খাচ্ছিল, যে বৃত্তে লুক্কায়িত ছিল সাম্প্রদায়িকতার বীজ। ১৭৫৭ সালে ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধের পর উভয় সম্প্রদায়ের ঘাঁড়ে চেপে বসে ইংরেজ বেনিয়ারা।ত্রিমাত্রিক সাংঘর্ষিক এই অবস্থানে মুসলমানই সবচাইতে বেশি বিপর্যস্ত। নিম্নোক্ত ছকটির মাধ্যমে তা পরিষ্কার হয়-

আওরঙ্গজেবের হিন্দু বিদ্বেষ নীতির ফলে হিন্দুদের মনে মুসলিমদের জন্য খারাপ ধারণা তৈরি হয়। ঠিক তেমনি পরবর্তীতে রানা প্রতাপের মুসলিম নিধন প্রক্রিয়ার ফলে মুসলমানদের মধ্যেও হিন্দুদের জন্য বৈরিতা তৈরি হতে থাকে। সম্পর্কের এই টানাপোড়েন কখনও ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে সাংগঠিকভাবে চলতে দেয় নি। নবাব সিরাজউদ্দৌলার আমলে ইংরেজদের প্রতি তাঁর ক্ষোভের বহি:প্রকাশ ঘটে অন্ধকুপ হত্যার মাধ্যমে। ফলে মুসলমান পতিত হয় ত্রিমুখী সংঘর্ষে মধ্যে। যা সৃষ্টি করে ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং সংন্দেহের ইতিহাস। এই ইতিহাস রচনা করে জিতে যাওয়ার প্রতিযোগিতাকে। প্রতিযোগিতার এই পালাবদলে মুসলিমরা পিছিয়ে পড়ে, এগিয়ে থাকে হিন্দুরা। ইংরেজরা যখন ক্ষমতায় আসে, তাদেরকে প্রভু হিসেবে মানতে হিন্দুদের কোন বাঁধা ছিল না। বরং তারা মনে করত আগে আমরা মুসলমানদেরকে শাসন শ্রেণিতে দেখেছি এখন দেখছি ইংরেজদেরকে। অপরদিকে মুসলমানদের মনে যে ধারণার জন্ম হয়েছিল সেটা ছিল তাদের কাছ থেকে এতদিনের লালন-পালন করা ভারতবর্ষকে ইংরেজরা কেড়ে নিয়েছে। আর মুসলমানদের এই মনোভাবকে ইংরেজরা ঘৃণার চোখে দেখতো এবং তারা সর্বদা ভাবতো ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করতে যদি কেউ তাদেরকে বাঁধা দেয় তাহলে তারা হবে মুসলিমগণ। ফলে শাসন ব্যবস্থার প্রথম থেকেই হিন্দু-মুসলিম দুই জাতিকে ইংরেজগণ দুই নীতিতে চালানোর চেষ্টা করেছিল। হিন্দুরা ইংরেজদের সুনজরে থেকে সামাজিক নানা সুযোগ-সুবিধা লাভ হেতু শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নানা ক্ষেত্রে তুলনামূলক পূর্বের থেকে আরো বেশি পরিমানে উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়। মূলত ইংরেজ প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে হিন্দু নিয়োগ-নীতি তারই প্রকৃত উদাহরণ। ইংরেজদের এই সমস্ত কার্যাবলি এবং ক্ষমতাহরণ ইত্যাদি কারণে বিদ্রোহ মনোভাপন্ন কতিপয় মুসলিম নেতাগণ ধর্মীয় আন্দোলন সংঘটিত করে। যদিও পরবর্তীতে ধর্মীয় আন্দোলনসমূহ সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নেয়। যেমন : ফারায়েজী এবং তীতুমীরের আন্দোলন, আলীগড়ের আন্দোলন (অবাঙালি মুসলিম) এতকিছুর পরে ইংরেজরা ভাবল ভারতবর্ষে রাজত্ব কায়েম করার পূর্বশর্তই হল মুসলিম প্রতিরোধ। তাহলে দাঁড়াল মুসলমানরা দুই ধর্মাবলম্বীদের কাছেই ঘৃণ্য। ঘৃণার এই দেয়াল থেকে পুরো উনিশ শতক মুসলমানগণ বের হতে পারে নি, শুধু আস্ফালন করছিল। বিশ শতকের প্রথম প্রহরে সুপ্ত মুসলমান একবার সেই প্রতিযোগী জাতির দিকে তাকাল, আর দেখল তারা কোথায়? অবশেষে তাদেরকে মুসলিমরা আবিষ্কার করল একশত বৎসর এগিয়ে যাওয়া উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে। যেখানে মুসলমানদের পক্ষে একদৌড়ে হিন্দুদেরকে ধরা বাস্তাবিক পক্ষে অসম্ভব ছিল। এরপর থেকে মুসলমানগণ চেষ্টা করেছে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গিয়ে তারা প্রয়োজন বোধ করল ইংরেজী শিক্ষার। মুসলমানগণ ভাবল ইংরেজী শিক্ষা রপ্ত করার ফলেই বোধ হয় হিন্দুদের এই উন্নতি ও আধিপত্যতা। বিষয়টি ঠিক সেই রকমই পার্থক্য হল, তবে মুসলমানগণ বিষয়টি বুঝতে বড্ড দেরী করে ফেলেছিল।

হঠাৎ একটি ধমকা হাওয়া যেন ঘুমন্ত মুসলিমদেরকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। অজস্র স্বপ্ন নিয়ে ঘুমাল মুসলমানরা যে-সবইত আমার কিন্তু ঘুম ভেংগে দেখল অচেনা সেই গ্রাম, অচেনা সেই শহর, অচেনা সেই শাসক, অচেনা সেই প্রতিবেশী। মুসলমানরা নিজেদের দোষে যদিও সেদিনকার সময়গুলিতে কষ্ট পেয়েছিল কিন্তু তারা তাদের অস্তিত্বকে কিন্তু বিলীন হতে দেয়নি। এই অস্তিত্বের জীবাশ্ম থেকে থেকে পরে ১৯৪৭-এর ‘দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত

‘পাকিস্তান’ নামক অদ্ভুত রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল।[২] ১৯৪৭-এ বৃটিশ তত্ত্বাবধানে দুই সম্প্রদায় যখন আলাদা হয় তখন ধর্মকে পুঁজি করে দুই সম্প্রদায়ই সুখ খোঁজার চেষ্টায় বিভোর ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মুসলিমরা আর এক থাকতে পারলেন না, Caste Systemএখানে তখন মুখ্য বিষয় হয়ে দাড়াল। চলমান Caste System-ই যেন বলে দিল পূর্ব পাকিস্তানকে হীন করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের পক্ষ হতে ‘আমরাই সেরা’। মুসলমান সমাজে বর্ণপ্রথার এর চেয়ে বড় খারাপ ফলাফল আর কি হতে পারে। হিন্দু কি মুসলমান, বাঙালি মুসলমান কি অবাঙালি মুসলমান ইংরেজী শিক্ষা থেকে যে আধুনিকতাকে ছুঁতে পেরেছিল তা কিন্তু অস্বীকার করার উপায় কারোরই নেই।

প্রাক ব্রিটিশ যুগে এদেশে টোল-পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হত সংস্কৃত ভাষায় এবং মাদ্রাসা ও মক্তবে আরবী ও ফার্সী ভাষায়। উর্দু ও বাংলাভাষা শেখানোরও ব্যবস্থা ছিল। এসব শিক্ষায়তের পাঠ্যসূচী ছিল যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় ইতিহাস, ধর্মীয় বিধিবিধান, উত্তরাধিকার নীতি, ভাষাতত্ত্ব, ব্যকরণ ও সাহিত্য। পশ্চাত্যানুসারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল না। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিৎ, এসব শিক্ষায়তনে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিতের দলই তৎকালীন বৃহৎ বাদশাহী চালাত, দপ্তর চালাত, বিদেশি কুটনৈতিক সম্ভাব্য ও বৈদেশিক নীতি চালাত, দেশের স্থাপত্য বিষয়ক ও কারিগরি বিষয়ক সকল কর্মই নির্বাহ করত; শিক্ষা-সংস্কৃতির বিষয়ে কোন বিদেশী বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হতে হতো না। ইংরেজরা এদেশ অধিকার করে প্রথম পঞ্চাশ-ষাট বছর শিক্ষা বিষয়ে মোটেই মাথা ঘামায়নি। কেবল শাসন চালানোর জন্যে কর্মচারীর চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে ১৭৮১ সালে কলিকতা মাদ্রাসা, ১৭৯২ সালে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় ইংরেজ সরকারের মৌলবি ও পণ্ডিতের চাহিদা পূরণের জন্যে। অবশ্য বিলেতি হৌসের ভাঙ্গাবুলিসর্বস্ব ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা যেখানে চালু করে। যেমন : দ্বারকানাথ-এর সেরবোর্ন স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন।[৩] এই সেই ইংরেজী শিক্ষা যাকে ইংরেজগণ একরকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারত তথা বাংলায় প্রবর্তন করেন অপর পক্ষে ভারতবাসী তথা বাঙালিরা কিন্তু আরেক উদ্দেশ্য নিয়ে এই ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ বা রপ্ত করেন। এখন দেখা যাক ইংরেজী শিক্ষা চালু করার পিছনে ইংরেজ বা বৃটিশদের কি উদ্দেশ্য ছিল সেই সাথে ভারতবাসী বা বাঙালিরাই বা কোন উদ্দেশ্যকে জ্ঞান করে ইংরেজীকে সর্বোচ্চ আসনে স্থান দিতে চেয়েছিল। প্রথমে ব্রিটিশদের উদ্দেশ্যটুকু দেখা যাক।

... তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সরকারী কর্মচারী উৎপাদন, আইনজীবী, ডাক্তার ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির কেরানি সৃষ্টি করা। এই সংকীর্ণ অর্থে তাদের প্রচেষ্টা আশ্চর্যভাবে ফলবতী হয়েছে। কিন্তু তাদের পূর্ণ ব্যর্থতা হয়েছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে।[৪]

অপরদিকে ভারতবাসী তথা বাঙালিদের উদ্দেশ্য ছিল যেন এক বাক্যের পরিসমাপ্তি—

... ইংরেজীতে শিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের উচ্চ আয়ের পেশা গ্রহণ ও সেই অনুযায়ী জীবিকা নির্বাহ।[৫] এই হল ইংরেজী শিক্ষা; যা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য অপরপক্ষে যারা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেছে তাদের উদ্দেশ্য। একটি মানব সমাজে বিপ্লব, বিবর্তন, পুনর্জাগরণ, অভিব্যক্তির শুভ উম্মোচন আসে কোন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহামানবের চিন্তাশক্তির প্রভাব, প্রয়োগ, তদুপরি সফল কর্মপ্রয়াসের ফলে, যেমন হযরত মোহাম্মদ (স:), যীশুখ্রিষ্ট, বুদ্ধদেব, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। আর না হয় প্রবল শক্তিধর কোন সংগঠন। যখন তাদের চিহ্নিত আরেকটি সংগঠনকে উপনিবেশ আকারে তৈরী করে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনে অর্থনৈতিক ভারসাম্য একশ্রেণির হাত থেকে অন্য শ্রেণির হাতে চলে গেলে, যেমন পশ্চিম ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের

ফলে সামন্ততন্ত্রের আবসানে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেই মধ্যযুগে ভারতবর্ষে সম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে ছোট ছোট সামন্ততন্ত্র ছিল। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে ভারতে ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, ফারসি, ইংরেজ প্রভৃতি জাতির বাণিজ্যের প্রভাব পড়তে থাকে। ঐ শতকের মধ্যেভাগে ব্রিটিশ রাজশক্তির অভ্যুত্থান হয়। ইংরেজগণ এদেশের মাটিতে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলে এবং বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে ইউরোপের মতো অর্থনৈতিক বিপ্লব আনতে পারতেন, কিন্তু বণিক সরকার ভারতবর্ষকে কাঁচামাল সরবরাহকারী ও শিল্পপণ্যের আমদানীকারী উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পুঁজিবাদী এই ইংরেজরা বাংলার তথা ভারতবর্ষের সমাজে কোন পরিবর্তন আনতে পারে নি। তবে কিছু রীতি-নীতি হয়ত দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের তৎপরতায় পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন, তথাপি তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতি ও ঔপনিবেশিক শোষণনীতি টিকিয়ে রাখার জন্য এদেশের সামন্তশ্রেণিকে লুপ্ত হতে দেয়নি। উদ্দেশ্য ছিল পুরাতন সামন্ত্রতন্ত্রকে ধ্বংস করে যেন তার কায়েমী স্বার্থ জলাঞ্জলীতে না যায়। কেননা ব্রিটিশরা পুরাতন সমাজতন্ত্রকে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবত।[৬] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে বাংলার মুসলমান সমাজ পরিবর্তনের সুরে তাল মিলাতে শুরু করল। জাগরণে হাঁটতে শুরু করল। আকারে ক্ষুদ্র হলেও ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা গ্রহণ করে আধুনিক সভ্যতায় এগিয়ে যেতে শুরু করল, আর তার কাণ্ডারী হলেন নব্য ইংরেজী শিক্ষিত পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তারাই ক্রমশ স্বাধিকার প্রশ্নে সচেতন হয়ে সমাজের অন্যান্য সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার নিমিত্তে ব্রত হয়। একই শাসকের অধীনে থেকে, একই প্রশাসন, অর্থনীতি, রাজস্বনীতিতে বিরাজ করে হিন্দুদের থেকে মুসলিমরা প্রায় একশত বছর পিছিয়ে পড়েছিল। প্রশ্ন আসতে পারে পিছিয়ে যাওয়া মানে কি? সেটা কী হতে পারে খাদ্যে, ব্যবহৃত পোশাকে, কিংবা চালচলনে, কিংবা ইবাদত বন্দেগীতে? না। এসব কিছুতে নয়। এমন একটি বিষয়ে পিছিয়ে পড়েছিল, যে বিষয়টিতে পিছিয়ে পড়লে দুই- থেকে তিনযুগ পরে তার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়, আর সে বিষয়টি হলো আধুনিক শিক্ষা। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই কিন্তু নবজাগরণ ঘটানো একার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অষ্টাদশ শতকের শেষ প্রহর থেকে বিশ শতকের প্রথম প্রহর, তারপর আর কয়েক যুগ যেন ছিল গন্তব্যহীন, গতিহীন পথিকের জীবন-যাপন। স্বদেশ কিন্তু স্বাধীনভাবে কণ্ঠ উচু করে বলার জোঁ নেই তোমরা বিদেশী, ভিনদেশের আলোকোজ্জল পথিক রাস্তা চেন তবে যাচ্ছ না কেন! মুক্তি দিচ্ছ না কেন আমাদেরকে? কি হিন্দু কি মুসলিম, কি বৌদ্ধ সবাই বড় দাসত্ব নিয়ে আছে। আর খুঁজে বেড়ানোর সেই দিন মুক্তি কবে? ঠিক এমন অবস্থায় ইংরেজী শিখে চিত্তের বিকাশ ও সার্টিফিকেট অর্জন করে যে কৃতিত্ব সেটাও যেন আশ-ফাঁস করত, আর হিন্দু-মুসলিম ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কৃতিত্ব ঠিক এখানেই নিহীত। বিষয়টিকে অল্পভাষায় বিশ্লেষণ করলে দাড়ায়— আত্মচেতনা বিকাশিত মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা যত বাড়ছিল মুক্তির নেশা ততই তার প্রবল হচ্ছিল। আর মুক্তির এই নেশাই গিয়ে মিলিত হয় স্বাধীনতা অর্জনের কাছে। স্বাধীনতা অর্জনের এই পথটিও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সংগ্রাম চলছিল রীতিমত বাইরের বৈরি শক্তি ও ভেতরের বিরোধী শক্তির সাথে পাল্লা দিয়ে থেমে থেমে। তবে এক্ষেত্রে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের সাথে হিন্দুরা তাল মিলিয়ে চলতে পারলেও মুসলমানরা সেটা পারত না। এক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ বিরাট একটি নিয়ামক রূপে কাজ করে। প্রথমে হিন্দু জাতীয়তা জ্ঞানের স্বরূপটিকে একটু বিশ্লেষণ করা যাক—

বর্ণভিত্তিক সমাজে রক্তের বন্ধন প্রবল থাকায় হিন্দুরা নিজেদের মধ্যেই সংঘবদ্ধ থাকে, আত্মকেন্দ্রিক হওয়ায় তারা বাইরের স্পর্শ একেবারে বর্জন করে। আল-বেরুনী তার *তাহকীক-ই-হিন্দু* গ্রন্থে (১০০০-১০২৭) এই রূপটিকেই পরিচ্ছন্ন করে বলেছেন, ধর্মতাত্ত্বিকতায় মূলত তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ বিষয়ে তারা বাকযুদ্ধেই অধিক পটু; ধর্মীয় প্রশ্নে হিন্দু কখনও প্রাণ, দেহ বা সম্পত্তি বিপন্ন করতে প্রস্তুত নয়। অন্যদিকে— বিদেশির প্রতি তাদের বিদ্বেষও সীমাহীন বিদেশিকে তারা 'ম্লেচ্ছ' অর্থাৎ অপবিত্র জ্ঞানে সর্বতোভাবে পরিহার করে, কিছুতেই তার সংস্পর্শে আসে না।[৭] আলোচ্য এই মতবাদই মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদকে আরও সুদৃঢ় করেছে। ফলে নিজ কূল রেখেই পরের শাসন মেনে নিয়ে সময়ের অপেক্ষায় থাকত। অপরদিকে মুসলিম জাতীয়তাবাদ যেখানেই শুরু সেখানেই নিজেদের মধ্যেকার অন্তর্দন্ধতার তিক্ততায় নিঃশেষ হয়ে যায়। এতবড় ভারতীয় উপমহাদেশে দলীয় স্বার্থে যখনই হিন্দু মুসলিম রাজনীতি চলেছে তখন সেখানে মুসলিম জাতীয়তাবাদ অতটা প্রকট হতে দেখা যায় নি; দেখা গেছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ। ১৯২৪ সলে চিত্তরঞ্জন দাস যখন বেঙ্গল প্যাক্ট-এর মধ্যদিয়ে হিন্দু-মুসলিমকে এক করতে চাইলেন তখন হিন্দুদের সমর্থনের অভাবে তার আকাঙ্খা ব্যর্থ হয়। হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে ঐক্য রক্ষা করে ৬০ ভাগ (মুসলিম), ৪০ ভাগ (হিন্দু)পূর্ব বাংলায় এবং পশ্চিম বাংলায় ৬০ ভাগ (হিন্দু), ৪০ ভাগ মুসলিম এরকম আসন সংরক্ষন মেনে নেন নি। অপরপক্ষে মুসলিমগণ বাঙালিও অবাঙালি দ্বন্দ্বে জড়িয়ে হিন্দুরা সি আর দাসের বেঙ্গল প্যাক্টের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব থাকার পরও সি. আর. দাসের ঐক্যবদ্ধতা নীতির হাতকে বলিষ্ট করতে পারেন নি। এই আলোচনাটি মুখ্য নয়, তবে হিন্দু-মুসলিম দুই ভিন্ন সম্পদায়ের চলমান প্রতিযোগিতাই পরিবর্তীতে মুসলমানদিগকে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে ও এর থেকে লাভবান হতে সাহায্য করে। 'আধুনিক শিক্ষা ও বাঙালি মুসলমান' বিষয়টিতে বোঝা যায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হবে গৌরবান্বিত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেই। সেই কারণে বিষয়টি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া এখানে প্রয়োজনীয় তথ্য গবেষণার সময় পরিধির ভিতরে প্রাপ্য হিন্দুদের সাথে তুলনামূলক ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানের অগ্রগতির প্রমাণ সাপেক্ষ ডাটা-সন্নিবেশন ও রক্ষনশীলতার সাথে সাথে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিবাদীদের প্রতিনিয়ত সংগ্রামের কথা বর্ণনা পাবে, বর্ণিত হবে বৃটিশরা বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা পথকে কখনও সুগম করেছেন আবার কখনও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছেন– এ বিষয়টিও। তাছাড়াও বর্ণনায় থাকবে মুসলিম নারীশিক্ষা, যার ফলে নারীরা চেতনাবোধকে জাগ্রত করতে পেরেছে এবং সেই সাথে আর্থিক সচ্ছল মুসলিম পরিবার ও তাদের পেশার ধরন। আলোচ্য বিষয়টির তাৎপর্যকে বিশেষায়িত করার জন্য ইতিহাসের অনেকটা পিছনে হাঁটতে হবে, যেমন মুসলমান কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর থেকে ঠিক কী রকম পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলায় চালু ছিল। মুসলমানগণ যখন বাংলা জয় করেছিলেন তখন সেটা ছিল তাদের ভারত জয়ের অংশ এবং মাঝে মাঝে বাংলার মুসলমান রাজ্য দিল্লী সালতানাতের অংশে পরিণত হতো। ফলে তৎসময়ের শিক্ষা ব্যবস্থার সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও আলোচিত সুফি সাধকের জীবনী, তাদের নির্মিত মসজিদ, খানকাহ, মাদ্রাসা, মাজার, মুসাফিরখানা, দরবেশখানা ও তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রক্রিয়া, জ্ঞান আহরণ করে মোটামুটি তথ্যবহুল একটি ইতিহাস রচনা করা সম্ভব।

সুফীরা তাঁদের খানকাহ্‌গুলোতে শিক্ষাদান করতেন। খানকাহ্ জীবন ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, যেখানে মুরীদ বা শিষ্যরা তাঁদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করত। কিন্তু খানকাহ্‌গুলি সবশ্রেণির মানুষের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। সৌভাগ্যবশত চিশতিয়াযুগী শেখ নূর আলমের জীবনীতে খানকাগুলির সাংগঠনিক বিবরণ পাওয়া গিয়েছে, এছাড়াও দিল্লীর চিশতি খানকাহ্‌র সংশোধন সম্পর্কে তথ্য রয়েছে যথেষ্ট। সর্বত্রই এই চিশতি সুফীরা তরিকতের শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় দিল্লীতে প্রাপ্ত তথ্যাদির সাথে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। সাধারণভাবে বলতে গেলে চিশতি খানকাহ্‌র গঠন ছিল নিম্নরূপ:

চিশতি খানকাহ্ হতো সাধারণত একটি বড় কক্ষে যাকে চিশতিয়ারা বলতেন জামাতখানা। বাসিন্দারা খানকায় বারোয়ারী জীবন যাপন করতেন, খানকাহ্‌র ছাদ থাকত অনেকগুলি থামের উপর এবং এ থামগুলির প্রত্যেকটির গোড়ায় একজন সুফি তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র-বিছানা, বইপত্র এবং তসবিহ নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করতেন। সুফিরা সবাই মেঝেতে ঘুমাতেন, নামায পড়তেন এবং পড়াশোনা করতেন। জ্যেষ্ঠত্ব বা আল্লাহর ভক্তির ভিত্তিতে কোন বৈষম্য করা হতো না। চিশতিয়া সুফীরা শাসক বা সুলতানদের কাছ থেকে কোন অনুদান গ্রহণ না করলেও ফুতুহ্ বা অযাচিত দান গ্রহণ করতেন। ফুতুহ্ হিসেবে খাদ্য পাওয়া গেলে তা সবাই মিলে ভাগ করে খেতেন। আবার কোন খাবার পাওয়া না গেলে সবাই মিলে ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করতেন। খানকাহ্‌র বাসিন্দারা খানকাহ্‌র জন্য জ্বালানি কাঠ, পানি সংগ্রহ করত। খানকাহ্‌র বাসিন্দারা শেখের ব্যক্তিগত খেদমত ও খানকাহ্‌র যৌথ পরিচালনা– এই দুই ধরনের কাজ করে থাকতেন। তাছাড়া সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকতেন প্রবীণ সদস্য। শেখের ব্যক্তিগত খেদমতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ক) তাঁর ব্যক্তিগত পরিচর্যা, খ) তাঁর অজুর ব্যবস্থা করা, গ) তাঁর ব্যক্তিগত ও গোপন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা, ঘ) তাঁর খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং শেখ রোজা রাখলে (যা প্রায় হত) তাঁর ইফতার ও সাহ্‌রির ব্যবস্থা করা এবং ঙ) শেখের জায়নামাযের ব্যবস্থা করা। অপরদিকে খানাকাহ্‌র ব্যবস্থাপনার মধ্যে ছিল ক) জ্বালানি সরবরাহ, খ) রান্নাঘর পরিষ্কার, পরিচালনা, গ) খিলাফাতনামার খসড়া প্রণয়ন, ঘ) তাবিজ লেখা এবং ঙ) মেহমানদের যত্ন নেওয়া।[৮] শেখ আব্দুল হক দেহলভী তাঁর *আখবার উল-আখিয়ারে* পিতার খানকায় নূর কুতুব আলমের কর্তব্যের বিবরণ দিয়েছেন। শেখ নূর কুতব আলম ছিলেন আব্দারখানার দায়িত্বে এবং সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য প্রয়োজনীয় সব পানির ব্যবস্থা তিনি করতেন। বিবাহ ও উরস অনুষ্ঠানের সময়ও তিনি পানির ব্যবস্থা করতেন। এ দায়িত্ব থাকায় খানকাহ্‌র বাসিন্দাদের জন্য প্রয়োজনীয় সব পানির ব্যবস্থাও তিনি করতেন। এ দায়িত্বে থাকায় খানকাহ্‌র বাসিন্দাদের কাপড়ও কাঁচতেন। আট বছর ধরে তিনি কাঠ-কাঠী এবং খানকাহ্‌র জ্বালানি সরবরাহ করার দায়িত্বেও তিনি ছিলেন। শেখ হুসামউদ্দীন মানিকপুরীও শেখ নূর কুতুব আলমের খানকাহ্‌তে কায়িক শ্রম করেছেন। শেখ হুসামউদ্দিন বলেছেন যে, তাঁর সতীর্থ মাওলানা ফরিদ উদ্দিন এবং মাওলানা সালামের সঙ্গে তাকে একদিন সূর্যের প্রখর তাপে মাথায় করে কাঠ আনার জন্য ৫ ক্রোস দূরে যেতে হয়েছিল।[৯] শেখ নূর কুতুব আলমের খানকাহ্‌তে বহু বিখ্যাত সুফী যোগ দিয়েছিলেন। শেখ হুসামউদ্দিন মানিকপুরী এ খানকায় ১৪ মাস অবস্থানের পর তার মুর্শিদের খিলাফত লাভ করেছিলেন। এ সময়কালে উত্তীর্ণ হওয়ার পর হযরত নূর কুতুব আলম নিজের পোশাক খুলে তা নতুন মুরিদের (শেখ হুসামউদ্দিন মানিক পুরী) গায়ে পরিয়ে দেন এবং তাকে লাঠি ও জায়নামাজ দান করেন। এ দিনটি ছিল ১৮ রবি-উস-সানি, ৮০৪ হিঃ/১৪০১ খ্রিষ্টাব্দ। তাছাড়া শেখ

হুসামউদ্দিনকে তার গুরু সেদিন খিলাফতনামা (উত্তরাধিকার সনদ) ও হীজাজতনামা (কর্তৃত্বের সনদ) প্রদান করে।[১০] এমন দিনে সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত সাধক, সুফীও জ্ঞানী-গুণীজন। যেমন : শেখ মাহমুদ আদানী, শেখ আলী ইয়ামনী প্রমুখ। তারা দেশ ও দেশের বাইরের সাধক বলে জানত। এর দ্বারা তাহলে দেখা যায় যে, পান্ডুয়ার এ চিশতি খানকাহ্ দূরদূরান্ত হতে বিখ্যাত পন্ডিত ও সুফীদের আকর্ষণ করত। এখানে শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও গুরুত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। সন্ধান পাওয়া যায় শেখ শরফউদ্দিন ইয়াহিয়া মনেরীর গুরু সোনারগাঁওয়ে শেখ শরফউদ্দীন আবু তাওয়ামার কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তার সম্পর্কে। এভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে বাংলায় সুফীরা এত জনপ্রিয় ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন যে- দলে দলে মানুষ সুফী ধর্মে দীক্ষা লাভ করে নতুন নতুন সম্প্রদায় বা সিলসিলার উদ্ভব হয়েছিল। সুফীরা অতি মানবীয় শক্তিতে শক্তিমান– এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে বাঙালি জনসাধারণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।[১১] এই সুফীরা তাদের জীবনে অর্জিত জ্ঞান দিয়ে বাংলাকে লালনভূমি বানিয়েছিল। তারা ইসলামধর্ম প্রচারে তাদের শিষ্যসহ সাধারণ জনসাধারনকে নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক শিক্ষা বিতরণ করত। পরবর্তীতে তাদের নিকট থেকে অর্জিত জ্ঞান নিয়ে বাঙালি জ্ঞানীজনেরা নিম্মোক্তভাবে জীবনযাপন করত–

সহজ-সরল, চারিত্রিক দৃঢ়তা, শক্তিতে, ধর্মানুরাগে, শান্তিপূর্ণকর্মের মধ্যে বিবেচনাবোধ শক্তি নিয়ে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না আশ্রমগুলি ছিল পথ হারা পথিকের স্থান, গতিহীনের গতি, অনাথের নাথ, অবলার আবরন ইত্যাদি মরমীবাদের মারফতী প্রাণ। যে শিক্ষা সুফীরা সাধকদের জন্য বরাদ্দ রাখত কিংবা যে শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাইত এবং করত তা নিম্নরূপ– 'পার্থিব বস্তু বর্জন নয় বরং তাকে অন্তরে গেঁথে আল্লাহর উপর বিশ্বাস আনয়ন, তদুপরী সন্তোষ, সংযম জীবন যাপনই মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্ম।'

'এই জগতে এক ঘণ্টা বেঁচে থাকা পরকালে একহাজার ঘণ্টা বেঁচে থাকার চেয়ে শ্রেয়। একজন মানুষের খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, সমকক্ষ সঙ্গীদের সম্পর্ক রাখা, উপযুক্ত ও সম্মানজনক বৃত্তি ও জীবিকা অর্জনের অন্যান্য বৈধ পেশা গ্রহণ করা উচিত। শ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে অক্ষম হলে তিন বেলা উপবাসের পর ভিক্ষাবৃত্তির দ্বার তাঁর জন্য উপযুক্ত। কিন্তু কোন কারণেই তার সুলতান বা অভিজাতদের কাছে খাদ্য ভিক্ষা চাওয়া উচিত নয়, কারণ এতে ক্ষতি হতে পারে। প্রতিশোধের স্পৃহায় অনুপ্রাণিত হওয়ার চেয়ে কষ্ট সহ্য করাই উচিত হবে...। দৈনন্দিন নিজেই নিজের আত্মপরীক্ষা করা উচিৎ এবং সেই সাথে কাজের হিসেব নিতে হবে। অন্যের অসুবিধাগুলি বোঝা ও বিবেচনা করা উচিৎ...। নিজের সম্পর্কে কারও খুববেশি ভাবা উচিৎ নয় এবং বিনয় অনুশীলন করা উচিৎ। কিন্তু নিজেকে এত ছোট কিংবা বিনয়ের মিষ্টি বানানো যাবে না যাতে কিনা মাছি বসতে পারে। সকলের সঙ্গেই মিশতে হবে। কিন্তু কারও উপর নির্ভরশীলতা নয়। শিশুদের প্রতি বিশেষ স্নেহ এবং বৃদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা উচিৎ। তদুপরী নিজের প্রাপ্যের জন্য নিজের লড়াই করা উচিৎ।[১২]

"সুফীদের শিক্ষা পদ্ধতির সবচাইতে গাম্ভীর্যপূর্ণ যে উপদেশগুলি ছিল তা হল- "দয়ায় হও সূর্যের মত, বিনয়ে হও পানির মত এবং ধৈর্যে হও মাটির মত।"[১৩] মোটামুটিভাবে এই ছিল ইসলাম-এর প্রাথমিক যুগ তথা বাংলায় ধর্মান্তরকরণের সময় সুফী কর্তৃক ইসলাম উপজীব্য জ্ঞান গরিমার প্রতিচিত্র। রূপান্তরকরণ প্রক্রিয়ায় ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলায় এই শিক্ষা সেই

সময় কার্যকর ছিল। বলা যায় মানুষের ভিতর থেকে পশুবৃত্তিকে সরিয়ে ফেলা সম্ভব করতে সক্ষম হয়েছিল আলোচ্য শিক্ষা, তবে প্রশ্ন থাকছে মানুষকে এই শিক্ষা কতটুকু কর্মময় করতে পেরেছিল। খ্রিষ্টীয় এয়োদশ শতকের গোড়ায় বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনার পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক সমতা লাভ পর্যন্ত (১৭৫৭) প্রায় ১০২ জন মুসলিম শাসক বাংলা শাসন করেন।[১৪] এরা কেউবা আফগান, কেউবা তুর্কি, মুঘল, পারসিক বা আরব বংশোদ্ভূত। তারা সকলেই তাদের রাজনৈতিক পরিচয়ের সাথে এদেশে এনেছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য। এসকল মুসলিম শাসকগণ সর্ব উপায়ে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। তার মধ্যে সুলতানী আমলের (১২০৪-১৫৭৫) প্রথম শাসক বখতিয়ার খলজিসহ আলীমর্দান খলজী, সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজী, শামসুদ্দীন ফিরোজশাহ, জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ, ইলিয়াস শাহ, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, রুকনউদ্দিন বারবক শাহ প্রমুখ সুলতানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য চিরস্মরনীয় হয়ে আছেন।[১৫] বাংলার মুঘল শাসনামাল ছিল (১৫৭৬-১৭৫০) শিক্ষা ও সংস্কৃতির গৌরবোজ্জল যুগ। মুঘল সম্রাটগণ, যুবরাজ ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এবং রাজকর্মচারীবৃন্দ উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন। তাদের দরবার সমূহ জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের কেন্দ্রস্থল ছিল। রাজদরবারে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের আলোকে ভারতের মুঘল সাম্র্যজ্যের প্রদেশগুলিওআলোকিত ছিল।

এ ক্ষেত্রে বাংলায় যে সকল সুবাদার, দেওয়ান, বখশি, কাজি, ফৌজদার ও অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ আগমন করেন তাঁরা সকলেই শিক্ষা ও সুরুচির ক্ষেত্রে তাঁদের বিশিষ্টতা এবং পন্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি তাঁদের পৃষ্টপোষকতা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। খান খানান মুনিম খান, খান জাহান, রাজা মানসিংহ, ইসলাম খান, কাসিম খান, ইব্রাহিম খান, ফাতেহজ, শাহজাদা সুজা, মিরজুমলা, শায়েস্তা খান, যুবরাজ মুহাম্মদ আজম, আজিম উশ্‌শান ও অন্যান্য সুবাদারগণ তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য সুপারিচিত ছিলেন। মুঘল সুবাদারগণের আমলে বিকশিত শিক্ষার ঐতিহ্য নবাবদের সময়েও অব্যাহত থাকে। বাংলার নবাবগণ তাদের দরবার ও প্রশাসন বিভাগের বিদ্বান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রয়োজন অনুভব করেন। এ সময়ে সম্রাটদের দরবারে ও উত্তর ভারতে রাজনৈতিক দুর্যোগের কারণে বহু পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তি নিরাপত্তা হীনতায় বিরক্ত হয়ে মুর্শিদাবাদের নবাবদের অধীনে আশ্রয় ও সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেন।[১৬] নবাব মুর্শিদকুলি খান ২৫০০ বিদ্বান ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।[১৭]নবাবদের আমলেও শিক্ষা ছিল মূলত মসজিদ কেন্দ্রিক। সেই মসজিদে সকাল বেলা, রোজার দিন দুপুরবেলা আরবী শিক্ষা প্রদান করা হত। যেমনঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায কী করে পড়তে হয়, কোরআন শরীফের ১১৪ টি সূরা কী করে মুখস্থ করতে হয়, ওজীফা, আমপারা, কায়দা তারপর আসে পবিত্র কোরআন শরীফ খতম করণ এবং সেই সাথে মসজিদের ইমামের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান। নবাব আলীবর্দী খান ও মুর্শিদাবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যুগের একটি পর্বের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নবাব আলীবর্দীখান তাঁর দরাবারে বিপুল সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তির সমাগমের ব্যবস্থা রাখতেন ও তাদেরকে যথাযোগ্য পৃষ্টপোষকতা দান করতেন। যার ফলে বাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জীবন চিত্রনের এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে পরিনত হয়েছিল মুর্শিদাবাদ। আলীবর্দী খানের দরবার উজ্জ্বল রাখতেন যে সব মনীষীগণ তাদের মধ্যে ছিলেন যায়ির হোসেন খান, তকী কুলি খান, ইব্রাহিম খান, হাজি মুহাম্মদ খান, মির মুহাম্মদ আলী ফাজিল প্রমুখের নাম ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মধ্যে আলী ফাজিল তাঁর ইসলামি জ্ঞান, দর্শন, আইন বিষয়ে প্রগাঢ় বুৎপত্তির

জন্য সবচেয়ে খ্যতিমান ছিলেন। *সিয়ারুল ইবালিক ফরহম মুতাখ্খেরীনের* অনুবাদক হাজি মুস্তফার মতে, মুহাম্মদ আলী ফাজিলের নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল এবং এতে প্রায় দু' হাজার গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল।[১৮] অতএব দেখা যায়, মধ্যযুগের বাংলার মুসলিম শাসক, উলেমা, সুফী, আমির ওমরাহ্ ও জমিদারগণ নিজেরা যেমন বিদ্যানুরাগী কিংবা শিক্ষিত ছিলেন, তেমনি তারা মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মসজিদ মাদ্রাসায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা, প্রভৃতি মুসলিমরা যেন নিজেদেরকে আরও আরও জানতে চাইত, ইসলাম সম্পর্কে আরও আরও বিশ্লেষণ শুনত তথা জানতে চাইত, তারা প্রতিনিয়ত যেন দোজখ থেকে বাঁচার শিক্ষালাভ করে জগতময় মহিমান্বিত হতে চাইত। যেমনঃ বেহেশতে যাওয়ার অদম্য আগ্রহ মুসলমানদের, আর সেজন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায, কালিমা, রোজা, সবই ঠিক থাকতে হবে। তবে দান খয়রাতের ক্ষেত্রে উচ্চবিত্তরা সমাজের নাম কামানোর জন্য দান করলেও মধ্যবিত্তরা অতটা দান খয়রাত করত না। 'জীবে প্রেম করে যেজন, সেজন সেবিছে ইশ্বর' সুফী ও জ্ঞানী জনেরা সে কথা শিক্ষা দিলেও মুসলিমগণ (প্রায় সবাই) সেটা বেশি করতে চাইত না বরং বেহেশতে কিভাবে গিয়ে অমৃত খাওয়া যাবে, কিভাবে স্বামীর সাফায়েত পাওয়া যাবে, কিভাবে 'হুরদের সাথে সাক্ষাত করা যাবে, অনন্ত জীবন পরকালে আহ কী সুখ! সেটাই যেন ছিল মুখ্য।অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মসজিদ মাদ্রাসাকেন্দ্রিক জ্ঞানে মানুষের পশুত্ব দূর হয়েছে তবে এই শিক্ষা যেহেতু সকল শ্রেণির মানুষদের আলোড়িত করতে পারে নি, তাই এই শিক্ষা পুরো পৃথিবীর জ্ঞানকোষ ধারন করতে মোটামুটি ব্যর্থ ছিল। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ পরবর্তীতে মুসলমানগণের ইংরেজী সাধক হওয়া এবং সেই অনুযায়ী কর্মে অনুপ্রবেশ।

সে যুগে শিক্ষার মাধ্যম কি ছিল সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করলে লক্ষ্য করা যায় যে, শিক্ষার মাধ্যম ছিল সেসময়ের রাজ ভাষা ফারসি। তবে উচ্চশিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে আরবী ভাষা ফারসির চেয়ে সমাধিক মর্যাদার স্থানে ছিল। ইসলামী বিষয়ে শিক্ষার নিমিত্তে ফারসি ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তকের বদলে আরবিতে লেখা গ্রন্থসমূহ পাঠ্যসূচী হিসাবে অনুমোদন লাভ করেছিল। এছাড়া, সতেরো শতকের দিকে এদেশে উর্দু ভাষার উৎপত্তি ঘটে। মুসলমানরা তখন উর্দুকে আরবি-ফারসির প্রসূতি হিসাবে গণ্য করত। এখনও করে, তবে খুবই নগণ্য। তৎসময়ে অভিজাত মুসলিম শাসক শ্রেণির মৌখিক ভাষা হিসাবেও উর্দু আরবি-ফারসির পাশে স্থান করে নেয়।[১৯] ফারসির প্রতি বাঙালি মুসলমানরা মারাত্মক অনুরক্ত ছিল এবং বাংলা ভাষাকে ভুলে অবহেলা করে বাঙালি মুসলিমরা যখন উর্দু ভাষাভাষী অবাঙালিদের সাথে এক হয়ে ইসলামকে লালন করে পাকিস্তানকে নির্মাণ করে ফেলেছিল সেটাই বড় প্রমাণ বাঙালিরা উর্দুর প্রতিও দূর্বল ছিল, না হয় মেঘে মেঘে এতো বেলা হত না। যাই হোক বাঙালি মুসলমানরা প্রচলিত ধারায় তাদের সন্তান সন্ততিকেও ফারসি ভাষা শিখাতেন ও চর্চায় উৎসাহ দিতেন। কেননা অফিস আদালতের ভাষা ফারসি, তাই তখন জীবিকা অর্জনের উপায় ছিল ফারসি জানা ও শিখা। মুসলিম আমলে বাংলায় তিন স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। যেমনঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চস্তর। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হত মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, মন্দিরে, অভিভাবক বা শিক্ষকের গৃহে, পথিকের বিশ্রামগৃহে, দোকানের কোনে অথবা গাছের নিচে, বালুর মাঠে অথবা টোলে– এভাবেই বাঙালি মুসলিম (কিছু স্থানে হিন্দু মুসলিম সব বাঙালিই

পড়ত) ভালই চলছিল। মুসলিম সমাজে প্রতিটি শিশু চার বছর চারমাস, চারদিন বয়সে উপনীত হলে তাঁকে সর্বোত্তম পোশাকে সজ্জিত করে পরিবারের সকল সদস্য ও অন্যান্য স্বজনদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদানের সূচনা করা হত। এই দিনে শিশুকে পবিত্র কোরআনের কিছু অংশ পাঠ করানোর চেষ্টা করা হত। 'বিসমিল্লাহ' উচ্চারণ ধরিয়ে শিশুকে জ্ঞান জগতে প্রবেশের রাস্তা তৈরী করে দেওয়া হত। প্রাথমিক অবস্থায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং পরবর্তীতে পান্দানামা, আমদানামাহ, গুলিস্তান, বোস্তান, ইত্যাদি ফারসি শিক্ষার গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের পড়ানো হত। তাছাড়া ফারসি ভাষাকে গলধঃকরণ করিয়ে প্রত্যহিক জীবনের কর্মাবলীও শিখানো হত, নাম দস্তখতও ফারসি ভাষায় শেখানো হত।[২০] একথাও অ্যাডাম বলেছেন যে, তৎসময়ে বাঙালি মুসলমানগণ স্ব-উদ্যোগে বাংলা ভাষার মাধ্যমে কোন কিছু শিখার বিক্ষিপ্ত চেষ্টা করত। বাংলার শিক্ষার্থীগণ বালির উপর লিখত, খড়িমাটি দিয়ে মেঝেতে লিখত, পরবর্তীতে লিখত কলা পাতায়, তাল-পাতায়। তারা লিখত নলখাগড়ার টুকরো, বাশের কঞ্চি, পাখি, মুরগী, ময়ুরের পালক দিয়ে।[২১] পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় চীনা রাষ্ট্রদূত ও লেখক মা-হুয়ান বাঙালিদের কাগজ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই সময় কাগজ সর্ববিষয়ের জন্য ব্যবহার করা হতো না;ব্যবহৃত হতো বই পুস্তক ও দলিল-পত্রাদি। মাধ্যমিক ও উচ্চস্তর বিদ্যা সমাপ্ত হতো মাদ্রাসায়। মাদ্রাসাগুলি আরবিও ফারসি এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। ভারত উপমহাদেশের মুসলমানেরা তাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পদ্ধতিতে বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন অর্থাৎ (৭৫০-১২৫৮) সময়ে আব্বাসীয় খলিফারা নিজেদের সম্যক জ্ঞান গরিমা নিয়ে ভারতবাসীর কাছে হাজির হয়েছিলেন ও বিশিষ্ট শৌর্যবীর্যতায় সমতা প্রয়োগ করে নিজেদের শিক্ষা পদ্ধতিও চালু রাখতে পেরেছিলেন। সেই শিক্ষা পদ্ধতির একটি বিশেষ নাম ছিল 'দরসে নিয়ামিয়া'[২২] মুসলিম আমলে উপমহাদেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে সবচাইতে বেশি প্রভাব পড়ে বাগদাদের আব্বাসীয় যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা 'দরসে নিজামিয়ার' নু'মানী, শিবলী, মাকালাতে শিবলী, খণ্ড ৩, আসমগড়, ১৯৩২, পৃঃ-৪৩। সেলজুকি সুলতান আলাপ্ আরসালান ও মালিক শাহের সনামধন্য মন্ত্রী নিজাম-উল-মুলক তুসী ১০৬৭ সালে দু' লক্ষ দিনার ব্যয়ে বাগদাদের 'ত্রিসামিয়া মাদ্রাসা, নামে একটি উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারে সুদূর প্রসারি ভূমিকা পালন করে। এতে যে শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং যে পাঠ্যসূচী অনুসৃত হয়, সেটিই বাগদাদের দরসে নিসামিয়া নামে পরিচিত। তৎসময়ে দেখা গিয়েছে নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে বোর্ড পারদর্শিতা অর্জন করেছেন তা কিন্তু না; বরং যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিদ্যায় পারদর্শী তিনিই আবার লৌকিক বিজ্ঞানেরও তথা পার্থিব বিজ্ঞানে পারদর্শী– যেমনঃ পদার্থ, রসায়ন, গণিত, জ্যোর্তিবিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি। এই রকম প্রসিদ্ধ সোনারগাঁয়ের গুরু 'গুরু শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা। তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্ররা এতই আলোড়িত হত যে, দূরদূরান্ত থেকে তার শিষ্যত্ব লাভের তৃষ্ণায় থাকত।[২৩] মুঘলসম্রাটগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতিভূ ছিলেন। যদিও তারা দিল্লী বা ফাতেহপুর সিক্রিকে কেন্দ্র করে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চাকে চালিয়ে নিতেন, তথাপি এর গুরুত্ব বাংলাও বহন করেছিল। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আমলে প্রসিদ্ধ একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, তার নাম আবদুল হামীদ লাহোরী; যিনি একাধারে ধর্মতত্ত্ব, গণিত, দর্শন, আইন শাস্ত্রে, রসায়ন ও জোর্তিবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন যার প্রমাণ পাওয়া যায় ইতিহাসের আকর গ্রন্থ *সিয়ারুল মুতাখ্খেরীন* নামক গ্রন্থে।

মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরে বাঙালি মুসলমানরা মূলত কোরআন, হাদিস, ধর্মতত্ত্ব, আইন শাস্ত্র, অংক, জ্যামিতি, বীজগণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করত।[২৪] সম্রাট আকবরের শিক্ষাসংক্রান্ত রেগুলেশনের বর্ণনা দিয়েছেন বিখ্যাত আবুল ফজল। আবুল ফজল আকবরের সময়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্যসূচী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন, সম্রাট আকবর তার শিক্ষাসংক্রান্ত রেগুলেশন-কে এমনভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তা মানতে বাধ্য থাকত। রেগুলেশনটি নিম্নরূপ :

"প্রত্যেকটি বালকের পক্ষে নীতিশাস্ত্র, অংকশাস্ত্র, অংকশাস্ত্রের জন্য নতুন পদ্ধতি বা চিহ্ন, কৃষিবিদ্যা, জ্যামিতি, ক্ষেত্রবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, প্রশাসনবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, কারিগরি শিক্ষা, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস ইত্যাদি শেখা আবশ্যক। এর সবগুলি বিষয়েই পর্যায়ক্রমে আয়ত্ত করা যেতে পারে। সংস্কৃতি শিখতে গিয়ে ছাত্রদের বৈয়াকরণ (ব্যাকরণ), নৈয়াই (ন্যায়শাস্ত্র), বেদান্ত, পতঞ্জলী ইত্যাদি অধ্যয়ন আবশ্যক। বর্তমান কালের প্রয়োজন এরূপ কোন বিষয়ই কাউকে অবহেলা করতে দেয়া উচিৎ হবে না। এসমস্ত বিষয়গুলি বিদ্যালয়সমূহে নতুন আলোকের সঞ্চার এবং মাদ্রাসাগুলির দীপ্তি বৃদ্ধিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।"[২৫] শিক্ষার মানকে উল্লেখযোগ্য করতে এটা নিশ্চয়ই এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এভাবে মুঘল আমল মুসলিম শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ভাবগাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ ছিল। ইংরেজ পণ্ডিত জেনারেল স্লিম্যান বলেছেন- যে ব্যক্তি মাসে বিশ টাকা বেতনের চাকরি করেন, তিনিও তাঁর সন্তানকে প্রধানমন্ত্রীর সন্তানের সমতুল্য শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তাঁরা আরবি ও ফারসি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করেন, যা আমাদের কলেজ যুবকেরা গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে ব্যকরণ, অলংকারশাস্ত্র, তর্ক শাস্ত্র শিক্ষা পেয়ে থাকে। সাত বছর অধ্যায়নের পর একজন মুসলমান যুবক মাথায় পাগড়ি পরিধান করে এবং অক্সফোর্ড থেকে পাশ করা নব্য যুবকের মতোই- জ্ঞানের সেই সমস্ত সংশ্লিষ্ট শাখায় পূর্ণতা লাভ করে থাকে। সে সক্রেটিস, এরিস্টটল, প্লেটো, হিপোক্রেটিস, গ্যালন ও ইবনে সিনা সম্পর্কে অনর্গল আলোচনা করতে পারে।[২৬] কবি মুকুন্দরামের 'চন্ডিমঙ্গল' কাব্য থেকে মুসলমানদের ক্ষমতার সর্বোচ্চ অবস্থায় বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। ঐ কাব্যে তিনি বলেন যে, মুসলিম মহল্লায় মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে সমস্ত মুসলমান ছেলেমেয়েকে ধর্মপ্রাণ মৌলাবিগণ শিক্ষা দিতেন।[২৭] ষোঢ়শ শতকের একজন মুসলিম কবি বাহরম বাংলার পাঠশালা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। যার থেকে এই ধারার উদ্ভুত হয়েছিল যে বাংলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পাঠশালা নামে পরিচিত পেয়েছিল। তিনি বলেছেন বালক-বালিকারা উভয়ই একই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যভ্যাস করত।[২৮] সে সময়ে শিক্ষকগণের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। শিক্ষকদের একটি দিক ছিল ইতিবাচক এবং আকেটি দিক ছিল নেতিবাচক।

সে সময়ের শিক্ষকগণ ছিলেন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। উচ্চশিক্ষার পণ্ডিতগণ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রভাব বিস্তার করতেন। মৌলানা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, এহিয়া মনোরী, শেখ আলাউল হক, নূর কুতুব আলম রাষ্ট্র ও সমাজে যাতে কোরআন ও সুন্নাহর বিধি-নিষেধগুলি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় সেদিকে তাঁদের লক্ষ্য ছিল।[২৯] বিদ্যাচর্চার ভিত গড়ে উন্নত মানের ছাত্র তৈরী করাই তখন তাঁদের জ্ঞান প্রদানের মন্ত্র ছিল।[৩০] বিনাবেতনে শিক্ষকরা পড়াতেন, তবে 'মদদ-ই-মাশ'

হিসাবে সুলতান, শাসক, সম্রাট কিংবা জমিদারদের নিকট হতে ভূ-সম্পত্তি লাভ করতেন।[৩১] মূলত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকই ছিলেন প্রধান অভিভবক, বিচারক, সর্বোপরী জ্ঞানদাতা। তখন কোন রাষ্ট্র বা কেন্দ্র কর্তৃক যেহেতু সার্টিফিকেট প্রদান বা পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা ছিল, সেহেতু শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টিতে শিক্ষককই ছিল একমাত্র মূল্য যাচাইকারী বার্তা। এরকম একচেটিয়া ক্ষমতাধর শিক্ষার ভুয়ূসী প্রশংসা করেছেন। এ.এম. ই.সি বেইলি বলেছেন- "They, Prosessed a system of education which, we have abolished, was capable of affording a high degree of intellectual training and polish, was founded on principle not wholly unsound, though presented is an antiquated form; which was infinitely superior to any other system of education than existing in india— a system which secured to them an intellectual as wel as a materal supermacy."[৩২] আলোচ্য উক্তিটির মধ্যদিয়ে এটিই প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষকদের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, শিক্ষা-চিন্তার যে বহিঃপ্রকাশ বাঙালি মুসসমানের ছিল তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে ভাবনার বিষয় হল এই যে, এই প্রশংসা কি তার সীমানা অতিক্রম করতে পেরেছিল? না কিছু ব্যাপ্ত সময়কে চিত্ত দিয়ে ধরে রেখে হঠাৎ একদিন ছেড়ে দিল? ইংরেজ শাসনামলের পূর্বে মুসলিমদের ইসলামী কায়দার শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা গিয়ে পড়ে শিক্ষক, তৎকালীন সমাজ, শিক্ষার্থীও অভিভাবকদের ঘাড়ে। আলোচনাটি সুবিস্তৃত নয় অথচ গাম্ভীর্য দিয়ে নিম্নরূপে তুলে ধরা যায়। শিক্ষকগণ উচ্চমর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তারা সমাজে নিজেদের যোগ্যতাকে জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছিলেন। তারা উদাসীন ছিলেন এই ভেবে যে, ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলায় ইসলামের জয় হয়েছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে। এত জনপ্রিয়তা হঠাৎ করে উড়ে যাবে না। দুই-তিন জেনারেশন পর্যন্ত গড়িয়ে তা স্থিরতায় যাবে তথা আপেক্ষিকত্ব বলতে আর কিছু থাকবে না, সব হবে সময়ের আপেক্ষিকত্ব। সময়ের আপেক্ষিকত্ব বিষয়টি সীমাহীন কিন্তু ক্ষমতা, সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষায় সীমাহীন কেন্দ্রায়ন বলতে কিছু নেই। শিক্ষা হচ্ছে সব ধরনের কিছুকে আনয়ন, আর আনয়নের এই বার্তা হবে সীমাহীন। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা গুরুদের শিক্ষা পদ্ধতির চিন্তা হবে সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল। মূলত মুসলিম শিক্ষকেরা তখন সময়ের সাথে সাথে নিজেদের ঐতিহ্য ও ইসলামীকরণকে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে বিশ্বায়ন যে ঘুর্ণায়মান সেটা ভুলে গিয়েছিলেন।

আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের পূর্বে বাংলায় শিক্ষার মান নিয়ে শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টটি তৈরি করেন অ্যাডাম। অ্যাডাম তার শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টে শিক্ষাজগতের যে ছবি এঁকেছেন তা অন্তত গর্ব করার মতো নয়। তখনকার গুরুমশাইরা ছিলেন দরিদ্র এবং অজ্ঞতা প্রবাদতুল্য (সবাই নয়। অবশ্য যথার্থ জ্ঞান সাধক ছিলেন কেউ কেউ, কিন্তু তাদের জ্ঞান যুগের সঙ্গে তাল মিলেয়ে চলতে পারেনি)। অ্যাডাম তার শিক্ষা বিষয় রিপোর্টে ১৪ রকমের শাস্তিদানের উল্লেখ করেছেন। তদানীন্তন গুরুমশাইয়ের যেরূপ বিগর্হিত আচরন এবং শিক্ষা দেবার যেরূপ জঘন্য নিয়ম ছিল, তা আজকের আধুনিক যুগে বড্ড বেমানান বলে মনে হয়। কোন কোন ছাত্র পাঠশালা কিংবা মক্তব থেকে পলায়ন করত এবং পলায়ন কালে ব্যাঘ্র, সর্প, ভুত প্রেত কিছুরই ভয় করত না তারা।[৩৩] এরকম একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে'একবার গুরুমশাইয়ের ভয়ে একটি ছেলে খেজুর গাছে উঠে পড়েছিল। তাকে নামাবার জন্য অন্য বিদ্যার্থীরা ইট মারতে লাগল, তখন সেই ছেলে নিরূপায় হয়ে কাতর কাতর গলায়

ইশ্বরকে ডাকল এবং বলল যে, হে ইশ্বর! যদি তুমি খেজুর কাটায় আমার চক্ষু দুটি অন্ধ করে দাও তবে তাই ভাল আমাকে আর যেন পাঠশালায় যেতে না হয়। গ্রামাঞ্চল ছিল তার চেয়ে জগন্যতম। স্কুল সোসাইটির প্রথম যে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় কোলকাতার ১৯০টি বাংলা পাঠশালার ৪,১৮০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান অতি শোচনীয়। মুসলিম আমলে বাংলায় শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার সত্ত্বেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী বা তেমন প্রসংসনীয় আবিষ্কার সংগঠিত হয় নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– জ্ঞান-বিজ্ঞানে আব্বাসীয় খিলাফতের সময় কিংবা সমসাময়িককালের ইউরোপীয় দেশসমূহে রেঁনেসার পরে বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হয়েছিল সেরূপ কোন প্রশংসনীয় অগ্রগতি বাংলায় হয় নি।[৩৪] আরব ও মধ্য এশিয়া থেকে উত্তরাধিকার যুগে বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানই এই উপমহাদেশে শিক্ষার মান হিসাবে চালু ছিল। মুসলিম আমলে মুসলমানরা জ্ঞান-গরিমার কোন কোন শাখায় সবচাইতে বেশি অবদান রেখে ছিল এবং তার ভিতর অর্থাৎ তাদের শিক্ষা-চিন্তার ঠিক কোন সীমাদ্ধতার ফাঁকে ইংরেজী শিক্ষার জন্য বাংলার মুসলমানদের মন উদ্ধেগ হয়ে উঠল সেই বিষয়টি সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলা তথা উপমহাদেশের শিক্ষা ও জ্ঞান গরিমার ক্ষেত্রে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল ইতিহাস লিখন রীতির প্রবর্তন। সমসাময়িক বহু আরবি ফারসি ভাষায় ঐতিহাসিক গ্রন্থ মুসলমানদের ইতিহাস চর্চার প্রমান বহন করে। বাঙালি হিন্দুগণ ইতিহাস লিখনের কৌশল জানতেন না। ফলে প্রাক-মসলমান যুগের বাংলার কোন ইতিহাস ছিল না, বরং হিন্দুদের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনুশীলনের জন্য কোন আগ্রহও পরিলক্ষিত হয়নি। তারপরও পরবর্তীতে তারাই ছিলেন মুসলমানদের চেয়ে এগিয়ে। মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন হিন্দুদের জন্য ছিল আশীর্বাদ। মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে ইতিহাস লিখন ও অনুশীলন শুরু হয় এবং কালক্রমে তা হিন্দুদেরকে প্রভাবিত করে।[৩৫] স্যার যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮) মুসলমানদের জ্ঞান-গরিমার প্রশংসা করে বলেন যে, ‘পুস্তক বিতরন এবং নকল করণের দ্বারা জ্ঞান-বিস্তার রীতির জন্য আমরা মুসলমানদের নিকট ঋনী। অথচ সাধারন রীতি হিসাবে প্রাথমিক যুগের হিন্দু লেখকগণ তাদের রচনাবলী গোপন রাখতে ভালবাসতেন।[৩৬] মুসলমানগণ তাদের পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যদিয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ভীষণ উন্নতি সাধন করেছিল আরবি ও ফারসি সাহিত্যের বিপুল জ্ঞান সম্পদ থেকে। এটা স্বীকার্য যে, ফারসি ভাষা মুসলিম সংস্কৃতিসম্পন্ন বাঙালি জনগনকে বিপুলভাবে আকৃষ্ট করেছিল যার প্রমান হল মুঘল সম্রাটগণ। বিশেষত মুঘল আমলে ফারসি শিক্ষার প্রভাবে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু মুসলমানের ভাষা, সংস্কৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদ ও শিষ্টাচার পারস্যমুখী হয়ে পড়েছিল। আর এই পারস্যমুখীতাই মুসলিমযুগের মুসলমানদের সবচাইতে বড় সীমাবদ্ধতা। নিম্নে এর সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হল: পারস্যমুখী শিক্ষা বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্ট করতে পারেনি। তাছাড়াও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী সমাজ বিকাশ পর্ব তখন ছিল তুঙ্গে। পৃথিবী প্রতিনিয়ত ঘুরছে এই পৃথিবী যে কেন্দ্র থেকে ঘুরা শুরু করেছে সেই কেন্দ্রে এক সময় গিয়ে মিলবে। সুতরাং মানবধর্ম হচ্ছে যে, এর জায়গায় স্থির নয় যে প্রতিনিয়ত এক স্থান থেকে আরেক স্থানে আর এভাবেই রুপান্তর ঘটে। তৎসময়ে অর্থাৎ ইউরোপীয় রেঁনেসার পর ইউরোপীয় পুজিবাদীরা দেখল কাঁচামালের জন্য বাংলা হচ্ছে স্বর্গ। মুসলিমরা বঙ্গ বিজয়ের পর এটাই ভেবে বসেছিল যে এই বাংলায় আর কেউ তাদের চেয়ে ওস্তাদ হানা দিতে পারবে না, আর দিলেও প্রতিহত করবে। তাই সে সময়ের অভিভাবকগণ শিক্ষা সম্পর্কে অসচেতন থেকে সন্তানদেরকে সম্পূর্ণরূপে রাজার পৃষ্ঠপোষক

শিক্ষকদের উপর ছেড়ে দিতেন। আর শিক্ষকরাও নিজেরা ভাল মানুষ গড়ার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক রাজনীতি কিংবা আন্তর্জাতিক সমাজনীতি, আন্তর্জাতিক ধর্ম নীতি শিক্ষা দিতে একেবারেই ভুলে গিয়ে ফার্সি-আরবী ঐতিহ্য, উর্দু ঐতিহ্য নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে অবগাহনে মগ্ন থাকতেন। তবে মুসলিম এই শিক্ষা যদি কোনভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরী করতে পারত তাহলে হয়ত মুসলমান সমাজ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এতটা খারাপ অবস্থায় পতিত হতে হত না। আর তাছাড়াও, যদি সরকারী অফিস আদালত ও শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজী বাধ্যতামূলক নাও হত তখন মুসলিম জাতি চরম ব্যর্থতায় পর্যবর্ষিত হত না।

আধুনিক শিক্ষাকে কেবল বাঙালি মুসলিমরাই যে ঘৃণার চোখে দেখেছেন তা নয়; বরং হিন্দু গোঁড়া শ্রেণির লোকেরাও নিজের জাত যাবার ভয়ে ইংরেজী শিক্ষাকে শুরুতে নয় বরং শেষের দিকেও অস্বীকার করেছিলেন। তবে এটা সত্য যে, ইংরেজী শিক্ষার ফলে এবং তারও আগে কর্ম ধর্ম মনে করে তাদের যে সচেতনতা এবং সেই হিসেবে যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণি গঠিত ছিল তারা স্বজাতির মুক্তির নিমিত্তে প্রচুর লড়াই করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন তবে জাতীয় মুক্তি না এনে দমে যাননি বলে তাদেরই উন্নতি হয়েছে।

স্কুল সোসাইটির প্রথম রিপোর্টে বাংলার পাঠশালার শিক্ষা ব্যবস্থা যখন নাজুক ঠিক সেই মুহূর্তে কিছু সংখ্যক বাঙালির কাছে ইংরেজি শিক্ষা নতুন অর্থ বহন করে আনল। ইংরেজী শিক্ষা লাভের জন্য দেখা দিল এক অভূতপূর্ব উম্মাদনা। হেয়ার সাহেবের পালকির সঙ্গে ঐ শিক্ষা লাভের সুযোগের আশায় ছেলেরা দৌড়াতে আরম্ভ করল। হেয়ারের পক্ষে বালক ও বয়োবৃদ্ধ লোকদের অনুরোধের ঠেলায় বাড়ির বাহীর হওয়াই কঠিন হয়ে উঠেছিল। ডাফের পালকির দরজা খুলে কাতরকণ্ঠে ছেলেরা ইংরেজী শিক্ষালাভের প্রার্থনা জানাতে লাগল। ডাফের স্কুলের প্রথম ছাত্র জোগাড় রামমোহনের আনুকুল্যে হলেও অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে স্কুলে ভর্তির ভিড় ঠেকানোর জন্য দ্বারে দুজন দারোয়ান বসাতে হয়েছিল।[৩৭] ডাফ অবশ্য একে নিছক জ্ঞানতৃজ্ঞা বলেননি। তাঁর মতে নতুন বই এর লোভে (যা বিনামূল্যে দেওয়া হত) অলস কৌতূহলে ও নতুনত্বের মোহে ছেলেরা প্রায়ই স্কুল বদল করত- এসবের জন্যই ভর্তির এত চাহিদা।[৩৮] তাছাড়া ইংরেজী শিখলে সরকারি চাকুরী পাবার সম্ভাবনা থাকে বলে অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের ইংরেজী শিক্ষা দিতেই ছিলেন আগ্রহী।[৩৯] এই যে, এতসব কথা, এত সব মনোবাসনা এই সব কথা স্বীকার করে নিয়েও এই সময় বাঙালিদের মধ্যে যে জ্ঞানতৃষ্ণা জেগেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজী আবশ্যিক শিক্ষা বিষয় না হওয়া সত্ত্বেও, সংস্কৃত কলেজের ৯১ জন ছাত্রের মধ্যে ৪০ জন ইংরেজী শিখত। অর্থাৎ প্রাচ্য ধারার শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্ররা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে ছিল আগ্রহী। পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের চেয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা জনিত সামাজিক সম্ভ্রম ও বিত্ত অর্জনের প্রত্যক্ষ ফলের দিকেই তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করে বিত্ত ও খ্যাতি অর্জন এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় আদর্শের প্রতি অন্তত মৌখিক নিষ্ঠা বজায় রাখা– এই ছিল তাদের ভবিষ্যত স্বপ্ন। এই স্বপ্নের প্রতিফলন কলকাতার পাশ্চাত্য শিক্ষার কেন্দ্রস্থলের 'হিন্দু কলেজ' নামকরনে কলেজ ছাত্ররা পাশ্চাত্য শিক্ষিত 'হিন্দু' হবেন এই ছিল তাঁদের কামনা। তবে তাদের এই ধারনা ভেঙ্গে দিয়েছিল ১৮২৬ সালে ১৮ বছরের তরুন ডিরোজিও(হিন্দু কলেজের শিক্ষক)। দেখা গেল একের পর এক আঘাত আসতে লাগল হিন্দুধর্মের উপর। ইংরেজীর স্পর্শে

এই ধর্ম সনাতন-এর রূপ থেকে বেরিয়ে সংস্কার চায়। শুরু হল সংস্কারবাদী হিন্দুদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক সংস্কার ইত্যাদির প্রতি তাদের আক্রমন ও প্রতি আক্রমনের পালা। সমকালীন সমাজপতিরা একে চিহ্নিত করেছিলেন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং আনাচার বলে। এরপরই মুলত বাঙালি হিন্দুরা ইংরেজী শিখেছেন সম্পূর্ণভাবে গাঁ ভাঁসিয়ে দিয়ে নয় বরং স্বজাতও স্বধর্মকে রক্ষা করে, এমনকি যতবারই ইংরেজী শিক্ষা তাদের ধর্ম ও জাতে আঘাত করেছে ততবারই তারা তা প্রতিহত করেছেন, তবে ইংরেজী শিক্ষাকে তারা ছাড়েন নি। ইংরেজী শিক্ষার চর্চা তাদের অব্যাহত ছিল।

১৭৫৭ সালে পালাশী যুদ্ধে মুসলমানদের পতন আসলে কথাটি ঠিক নয়। পলাশী যুদ্ধে পতন হয়েছে সমগ্র বাঙালি জাতি তথা বাংলার। হিন্দুরা ভেবেছে শাসক পরিবর্তন, তবে ইংরেজ অধীনে তারা যদি পরাধীন মনে না করত তাহলে হয়ত স্বাধীকার আন্দোলন হত না কিংবা স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু মুসলিম এক প্লাটফরমে দাঁড়াত না। এই বাংলা মুসলিমদের, এই বাংলা হিন্দুদের; এই বাংলা ইংরেজদের নয়। মুসলিমরা বঙ্গ জয় করেছে কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর চিন্তা তাদের ছিল না। হিন্দুস্থানে তারা বেশ জনপ্রিয় ছিল। মুসলিম শাসক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি যখন হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা জয় করে তখন হিন্দুরা মুসলিম শাসকদের করায়ত্ত হয়। তারপর দীর্ঘ ৫০০ বছর মুসলিম শাসনের আধিনে থেকে তখনও স্বরাজ প্রাপ্তির নেশা হিন্দুদের মধ্যে ছিল না বা আসে নি। বরং মুসলমান মুসলমানের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেবার চেষ্টা হয়েছে বার বার তা ইতিহাস সাক্ষী, যেমন: সম্রাট বাবর ও সম্রাট আকবরের বঙ্গ বিজয় অভিযান। যদি মাঝখানে সুলতানী শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে রাজাগণ অনেক মুসলিম সুফি ও সাধারণ মানুষ হত্যা করে ক্ষমতায় ছিলেন তথাপি হিন্দুরাই তাদেরকে ঘৃণা করত। তাই এদেশে হিন্দু-মুসলিম ছিল পরস্পর ভাই সমেত। বৃটিশ খেদাও আন্দোলন হিন্দু মুসলিম মিলিত আন্দোলন প্রায় বার বারই সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ তারই প্রমাণ বহন করে। উনিশ শতকের ঠিক মধ্যভাগ ধরে কোন জিয়ন কাঠির স্পর্শে বাঙালি গর্জে উঠেছিল যা পূর্বে দেখা যায় নি। নিঃসন্দেহে বলা যায় আধুনিক শিক্ষাই এই জিয়ন কাঠি। হিন্দু বনাম মুসলিম দ্বন্দ্ব কিংবা মাঝখানে ইংরেজ তা আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু নয় ব্রিটিশ শিক্ষানীত। তাই আজকের আলোচনায় বাঙালি মুসলিমগনই অগ্রগণ্য, শিক্ষা-আলোচনায় হিন্দু বাঙালি থাকবে সহ আলোচনার রুপায়ক হিসাবে। আর ইংরেজগণ ইংরেজী শিক্ষা চালুর কর্ণধার হিসাবে। বাঙালি জাতিকে অন্তত একটি ব্যাপার ভাবতে হবে যে, যদি ইংরেজী শিক্ষা চালু না হত অথবা পাশ্চাত্যের কিছু ধ্যানজ্ঞান আমাদের জাতে এসে না মিশত তখন কি হত? এই বিষয়টি যদি সচেতন বাঙালিগণ ভাবে এবং ইতিহাসচর্চা করে তাহলে আশা করি এতটুকু আফসোস অন্তত আর বাঙালির দেহমনে নাড়া খাবে না যে, ইংরেজী আমাদের দেশের ঐতিহ্যকে নষ্ট করেছে, আর বাঙালি মুসলমান ক্ষমতার ধ্বংস ইংরেজী শিক্ষা। ব্রিটিশ শিক্ষানীতির প্রথম প্রহরে এবং পরবর্তীতে পাড়ি দিয়ে দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর কিভাবে বিকাশ সাধন হয়েছে, উপর্যুপরী বৃটিশ কর্তৃক বৃটিশ শিক্ষানীতির প্রয়োগ ও এর পক্ষে বিপক্ষে বাঙালি মুসলমানের অবস্থান, তারপর যাত্র শুরু নতুনের পথে। যে পথে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা পার হয়ে ইংরেজী শিক্ষা বনাম বাঙালি মুসলিম নারীর ব্যক্তিগত জ্ঞান এবং সেই সাথে সমাজ ব্যবস্থা। বাঙালির ইতিহাসে আধুনিক যুগ অর্থাৎ স্বভাবতই বাংলা এত বছর যে যুগ পার করে এসেছে তা ছিল সময়ের ১ম পর্ব ও ২য় পর্ব পার

করে ৩য় পর্বে প্রবেশ এবং এর পরে সর্বোচ্চ আধুনিক যুগ বলে কিছু যদি থেকে থাকে তারও প্রতিক্ষা বাংলাকে করতে হবে। ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতির মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য নিয়ে বাঙালি হিন্দু মুসলমান ব্রিটিশ আমলে প্রবেশ করেছে; আর বাঙালির ইতিহাসে এটাই আধুনিক যুগ। আরবদের মত ইংরেজদেরও প্রথমে বানিজ্যতরী বাংলার মাটিতে নোঙর করেছিল। ১৬৯০ সালে জব চার্নক সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ক্রয় করে বানিজ্যকুটি নির্মাণ করেন। ১৬৯৬ সালে নিরাপত্তার কারণে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মিত হয়। ১৭১৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাট ফররুখ শিয়ারের কাছ থেকে এক ফরমান লাভ করে বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার সুবিধা পায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রহসনমূলক যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতন হলে কোম্পানি সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। ১৭৬৫ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসেমকে পরাভূত করে এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের ফরমানের বলে দেওয়ানী লাভ করে কোম্পানি বাংলার রাজস্ব আদায়ের মালিক হয়। ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে এবং মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত করে কোম্পানি বাংলার সর্বময় প্রভৃত্বে লাভ করে। ১৭৮৯ সালে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে নতুন নতুন যন্ত্রের আবিস্কার ও কালকারখানা স্থাপিত হয়। একই দরজা দিয়ে সামন্ততন্ত্রের বিদায় হয়ে ধনতন্ত্রের প্রবেশ ঘটে। পুঁজিবাদের বড় কথা হল ব্যক্তির মালিকানা ও ভোগাধিকার। ব্যক্তিত্ববোধ ও ব্যক্তি-সতন্ত্র চেতনা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই ফল। সামন্ততন্ত্রের ব্যক্তি ছিল অবহেলিত, ব্যক্তি সমষ্টির অধীন ছিল। ব্যক্তিত্ববোধে উজ্জীবিত মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার দ্বারা মানসিক আকর্ষণ লাভ করে এবং মনুষত্বের নতুন মূল্যবোধ রচনা করে।[৪০] ইউরোপের রেনেসাঁসের এটি ছিল প্রধান লক্ষণ। ইংরেজগণ যখন বাংলাদেশে প্রভূত্ব বিস্তার করে, তখন তারা এই রেনেসাঁসের মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। যন্ত্র চালাবার জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ এবং শিল্পোৎপাদিত পন্য বিক্রয়ের জন্য বাজার সৃষ্টি অত্যাবশ্যক, তাই ভারতের মত বিরাট উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। পরস্পর বিবাদমান ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজগণ ছলে বলে কৌশলে ভারতে উপনিবেশ স্থাপনে সফল হয়। ইংরেজগণ এদেশের কুটিরশিল্প ধ্বংস করে নিজদেশের পন্য আমদানির জন্য। তাঁরাই রাজ্যের মালিক, রাজস্বের মালিক, বাণিজ্যের মালিক। ভারতবর্ষের সমস্ত পুঁজি কোম্পানির জাহাজে করে ইংল্যান্ডে গিয়ে সেখানকার পুঁজিপতির উদর স্ফীত করে। কোম্পানির শাসনে বাংলা তথা ভারতের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে, জনগণের দুর্দশা চরমে ওঠে। ভারতবাসীর বস্তুগত লাভের চেয়ে ক্ষতি হয়েছে বেশি। যা লাভ হয়েছে সেটি তাদের মন ও মননের জগৎ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগৎ। কোম্পানির বাণিজ্যতরীতে পণ্যের সাথে ইউরোপের রেনেসাঁসের ফসলও এসেছে। পাশ্চাত্য বিদ্যালাভ তখন গতিশীল ও বিচিত্রমুখী ছিল। গতানুগতিক আবর্তন সঙ্কুল আবহমান ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর প্রাণচঞ্চল ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী ফল বহন করে আনে। এই প্রথম ভারতীয় চিত্ত জেগে ওঠে, তার অন্তর্জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে। জীবনের পুরাতন মূল্যবোধ ধ্বসে পড়ে, নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। যার মধ্য দিয়ে নবজাগরণের লক্ষন বিকাশিত হয়। বাঙালি আধুনিক হচ্ছে এটাই নবজাগরণ বহন করছে। তবে মানতে হবে এই চিহ্ন ভারতীয় উপমাহাদেশে বহনকারী পাশা-পাশি বসবাসরত দুই ভিন্ন হিন্দু-মুসলমান জাতির মধ্যে হিন্দুর আগে, মুসলমানের পরে ঘটে। পলাশীর যুদ্ধে ১৭৫৭ সালের পরাজয় মানে দীর্ঘকালের আধিপত্যতার অবসান, ক্ষমতার এক কঠিন রদ বদল

মুসলমানদের জন্য। সেই সাথে দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আসে পরিবর্তন, পরিবর্তন আসতে থাকে সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে। বাংলায় ফার্সরি পরিবর্তে ইংরেজীমাধ্যম ইউরোপীয় শিক্ষা ও বাংলা ভাষার তথা আঞ্চলিক ভাষার স্থান লাভ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইংরেজ প্রধান ক্লাইভ ও তাঁর সহচরগণ যুদ্ধে জয়লাভ করেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্যকে সুদৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত করে তোলার জন্য একের পর এক পদক্ষেপও গ্রহণ করে, যার ফলে তার সাথে সাথে উঁচু থেকে শুরু করে নিচু শ্রেণি পর্যন্ত পরিবর্তন হতে শুরু করে। ইংরেজ কোম্পানির নেওয়া এক একটি পদক্ষেপ ছিল তখন এই বাঙলার আপামর জনসাধারণের এক একটি চ্যালেঞ্জ।

বাংলার শাসনক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকাকালীন সময়ে তাঁরা সামরিক বাহিনীতে, রাজস্ব সংগ্রহের কাজে, বিচার ও শাসন বিভাগের কাজে বিপুল প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। বস্তুত এই পেশাগুলিই ছিল বাংলার উচ্চ মধ্যবিত্ত মুসলমানদের প্রধান অবলম্বন এবং মুসলিম শিক্ষা তাদেরকে ঘিরেই আবর্তিত হতো। তাই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনকে এখানে দেখতে হবে মুসলমানদের সার্বিক অবস্থার অবনতি স্বরূপ।[৪১] মুসলিম শাসকদের ক্ষমতারপ্রধান উৎস ছিল তাদের সামরিক বাহিনী। কিন্তু কোম্পানি শাসনের সূচনায় বাংলার মুসলমানগণ সামরিক বাহিনীতে তাদের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। পলাশী যুদ্ধোত্তর নবাব ও ইংরেজ ক্রীড়নক মীর জাফর যে ৮০ হাজার সৌনিক বরখাস্ত করেন তার অধিকাংশই ছিল মুসলমান। বক্সারের যুদ্ধের (১৭৬৪) পর নবাব নাজিমুদ্দৌলা ইংরেজদের নির্দেশে সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে অল্প সংখ্যক সৈন্য ব্যবহারের অনুমতি পান। ফলে শত শত মুসলিম চাকুরি হারান।[৪২] যে সমস্ত সেনাপতির ভুমি-মঞ্জুরী ছিল তাঁরা তাদের অনুসারীদের নিয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করে জমিদার হিসাবে বহাল থাকেন। আর যারা ভুমি মঞ্জুর পাননি তাঁরা মুর্শিদাবাদ থেকে পূর্ব বাংলার দুর্গম এলকার দিকে ধাবিত হন এবং সেখানে সামরিক উপনিবেশ স্থাপন করে অনাবাদী জমি ভোগ দখল করতে শুরু করেন। এই ব্যবস্থা ভূমি নির্ভরশীল মুসলিম জনসংখ্যার উপর কার্যকর হয়েছিল। বাংলার মুসলিম শাসকগণ রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারনে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলার হিন্দুদের উপর ন্যস্ত করেছিল, হিন্দুরাও আবার সে রকম দায়-দায়িত্ব পালনে তেমন ত্রুটি রাখতেন না।[৪৩] তবে অর্থ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি মুসলিমরা কুক্ষিগত করে রাখত।[৪৪] কোম্পানি বানিয়াদের বাঙলার ক্ষমতা গ্রহণ ছিল মূলত রাজস্বদণ্ডের ক্ষমতা প্রাপ্তিকরণ। আর তাই ১৭৫৭ সালে কোম্পানি দেওয়ানি লাভের পর বাংলার রাজস্বের ব্যাপারে একক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছিল। ইংরেজগণ দেশীয়দেরকে নায়েব-দেওয়ান বানিয়েছে ঠিকই কিন্তু এজেন্ট নিয়োগ দিয়েছিল কোম্পানি নিজেদের লোকদের।[৪৫] হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব ছিল ভয়াবহ। প্রতিযোগিতার হাত ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদ এর আগে বাংলায় যেন কখনও হতে দেখা যায়নি। যেমনটি তৈরী করেছিল কোম্পানি বেনিয়ারা এদেশীয় হিন্দু বানিয়া তৈরী করে। যে হিন্দু বানিয়াদের নিজেদের মধ্যে নিজেদের প্রতিযোগিতা চলত। দেশীয় ইজারাদারদের মধ্যে নিয়োগ ও অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চলত। আর এই প্রতিযোগিতা পরিতৃপ্ত হয় প্রজাদের উপর খাজনা বাড়িয়ে বাড়িয়ে। এই খাজনা বাড়ানোর ফলে প্রথম বৎসরেই কোম্পানি বাঙলা থেকে ১৬৮১৪২৭ পাউন্ড রাজস্ব আদায় করে।[৪৬] এ নিয়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদয়ের রায়ত বা প্রজাগণ শোষণ, নির্যাতন ও নিষ্পেষণের শিকার হন। শোষণের চূড়ান্ত ফল গিয়ে দাঁড়ায় ১৭৭০-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে।[৪৭] কঠিন ভয়াবহ দূর্ভিক্ষের মধ্যেও রাজস্ব আদায়ে কোন

সহানুভূতি দেখানো হয়নি; বরং যারা দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিল ও পালিয়ে গিয়েছিল তারাই খাজনা প্রদান থেকে বাঁচল। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার চিত্র উলট-পালট হয়ে যায়। দুর্ভিক্ষের ফলে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা জঙ্গলে পরিণত হয়।[৪৮] ফলে দেশের ভূমি রাজস্ব তথা অর্থনৈতিক অবস্থায় অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এই অরাজকতা অর্থের জন্য, খাবার কিনে খাওয়ার জন্য, বাসস্থান গোছানোর জন্য, বস্ত্র পরিধানের জন্য, সর্বোপরী বিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য (নতুন শিক্ষাব্যবস্থায়)। তারপর ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ কর্তৃক 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তনের ফলে বাংলার ঐতিহ্যবাহী হিন্দু ও মুসলমান পুরাতন জমিদাররা তাদের জমিদারী হারিয়ে ছিলেন। বাংলায় উত্থিত নতুন বিত্তশালী হিন্দু ব্যক্তিবর্গের কয়েকজন নিলামে সেই জমিদারী ক্রয় করে ফেলে। এসময় দেখা গেছে হিন্দুরা হয়ে যাচ্ছে ধনী আর মুসলিমরা অধিকাংশই ছিল কৃষক। একদিকে মুসলিম জমিদারদের পতন; অন্যদিকে যত দিন যাচ্ছে প্রজা-কৃষকরা গরীব থেকে গরীবতর হচ্ছে। এমতাবস্থায় বাঙালি মুসলমানদের স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার অগ্রযাত্রা যে পুরোপুরিভাবে ব্যাহত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মুসলিম শাসক ও জমিদারদের অধীনে চলত বলে এই বিধি ব্যবস্থার ফলে অনেক দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ১৭৭২-১৭৯০ সাল পর্যন্ত দেওয়ানি, ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গনের উচ্চপদ হতে মুসলমানরা আস্তে আস্তে অপসারিত হতে থাকল। এছাড়াও ১৭৯৩-এ রেজা খানের মৃত্যুর সাথে সাথে মুসলমানদের জন্য যে নায়েব-নাজিমের পদটি ছিল সেটিরও বিলুপ্তি সাধিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে চারদিক হতে মুসলমানরা ক্রমশ অন্ধকার জগতে অতি দ্রুত বেগে প্রবেশ করছে।

মুসলমান আমলে লাখেরাজ বা নিষ্কর রায়তিস্বত্ত্বের অধিকারী এক শ্রেণির ভূমি মালিক ছিলেন। সামাজের উচ্চ বংশীয় ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক নেতা, গুণী-জ্ঞানী পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ মূলত এসব লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ করতেন। উক্ত লাখেরাজ ভোগকারী পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ সমাজের শিক্ষা-ক্ষেত্রটির পৃষ্টপোষকতা দান করতেন। তবে কোম্পানি শাসকগণ কর্তৃক নিষ্কর এসমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করার ফলে উক্ত শ্রেণির পণ্ডিতগণের জীবন-জীবিকা বিপর্যস্ত হয় এবং এর ফলে বাংলার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে হিন্দুরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তবে এই ক্ষতি চোখে না পড়ার কারণ হল সে সময়ের সমাজ ব্যবস্থায় এক শ্রেণির হিন্দু মানসের পতন হলে অতিদ্রুত তার স্থানটুকু আরেক শ্রেণির হিন্দু মানস এসে সেই স্থানটুকু পূরণ করে ফেলতে পারত (আধুনিক শিক্ষা ও বিত্তের জোরে)। তবে মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভবপর হয়নি। এরাঁ শধু হারিয়েছেন, এমনকি যখন পতন শূন্য অবস্থা তৈরী হত সেই শূন্যতা পূরণ করার মত কোন শ্রেণিই মুসলিমদের মধ্যে ছিল না। তাই ব্রিটিশ শাসনাধীনে অধঃপতনের প্রশ্নটি শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৪৯] কোম্পানি শাসন অবতরনের ফলে বড় বড় মুসলিম জমিদার ও অভিজাত শ্রেণির অবস্থার বিপর্যয়ের ফলে বাংলার অনেক জেলায় বিশেষত মুসলিম উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হ্রাস পেয়ে প্রায় শূন্যের কোটায় গিয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সিভিলিয়ন উইলিয়াম হান্টারের (১৮৪০-১৯০০) মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন,'Hundreds of ancient families were ruined, and the educational system of the Musalmans, which was almost entirely maintained by rent-fee grants, received its death-blow.'[৫০] মুসলিম আলোকোজ্জ্বল জাতি আস্তে আস্তে ধ্বংস হচ্ছে, অন্ধকারের অতলে প্রবেশ করছে। কোন মিথ্যা

কিংবা কোন সত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাদেরকে অতল গহ্বর হতে উঠাতে পারছে না। তাহলে কি প্রয়োজন? জাদুর কাঠি নাকি দোয়া! সবচেয়ে বড় কথা ইংরেজ খেদাও আন্দোলন জোড়দার করা, নাকি হিন্দুদের উত্থানকে প্রতিহত করা, কোনটি করবে মুসলিমগণ তথা Community of Muslim.সেই সময় মুসলমানদের নিকট যে রাস্তাটি সহজ বলে মনে হয়েছিল তা হল ইংরেজদের প্রতি বিদ্রোহ ও তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া। তাড়িয়ে দেওয়ার এই মোহ তাদেরকে আরও অতলে টেনেছিল। আগেকার আব্বাসীয় খিলাফতের কেউ এসে তাদেরকে সাহায্য করছে না। না জাগছে তুর্কি, না মোঘল, না সুলতান, না পাঠান। তবে কি গোটা বাংলায় মুসলমানদের আপন গৌরব ফিরে পাওয়ার আর কোন উপায় থাকবে না। এই ভাবনার দোলাচলে চলতে থাকল বাঙালি মুসলমানরা, ঠিক তখন আবার তাদেরকে প্রভাবিত করা শুরু করল ওহাবী মুসলিমগণ। তাদের প্ররোচনায় বাঙালি মুসলিমরাও একের পর এক দাঙ্গা ঘটাতে শুরু করে। অথচ যখন প্রতি কারওর কোন চেতনাবোধ ছিল না। ইসলামের ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় হলো পুনরায় আপন ক্ষমতায় ফেরত আসা যায় কিনা সেই ভয়, বেদ্বীন হয়ে যাওয়ার ভয়, ইংরেজীর ভাষার কাছে ফারসী ও আরবী ভাষার হেরে যাওয়ার ভয়। ইংরেজী শিক্ষা ও মুসলমানদের মধ্যে এই ভয়ের সমারোহই মূলত দূরত্ব সৃষ্টি করে। ফলে ধর্মের প্রতি যুক্তিহীন মোহ যত বাড়ছে ততই মুসলমান নিজে নিজের মহা সর্বনাশ ডেকে আনছে। ভয়ের প্রাচীরটিকে যুক্তি দিয়ে ভাঙার মত কোন আলোকিত, বুদ্ধিদীপ্ত সুশীল সমাজ তখন হিন্দুদের মধ্যে সগৌরবে বিচরণ করলেও মুসলিমদের মধ্যে এই বুদ্ধিদীপ্তের পর্বটি ছিল সুপ্ত।

শিক্ষা সীমাহীন। এই শিক্ষা কোন নিদির্ষ্ট ধর্মের, নির্দিষ্ট মানবশ্রেণির জন্য উদ্ভব নয়; বরং গোটা পৃথিবী, গোটা অম্বরকে ছেয়ে আছে এই শিক্ষা। তাই যে বা যারা তার নিজ ধর্মীয় ভাবকে প্রস্ফুটত করার জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণ করবে, সেখানেই তার উন্নতি ব্যহত হবে। আলোচ্য ধর্ম ও বর্ণবাদের মোহ সমাজে আমন্ত্রিত করবে হাজারটি কুসংস্কার ও পাপকে। এই কুসংস্কার ও পাপের ক্ষত-বিক্ষত রূপটি ধর্মের মোহে মানুষ তখন দেখতেও পায়না। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়ের ফলে বাংলার প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে শুরু করে। প্রচলিত সাধারণ মানের আরবি, ফারসি, মক্তব-মাদ্রাসা এবং সংস্কৃত টোল পাঠাশায় দেওয়া শিক্ষার মৌখিক নিয়ম-কানুনের মধ্যে প্রবেশ করে চকচকে মুদ্রিত বই।[৫১] খ্রিস্টান মিশনারিগন এই মুদ্রিত বইয়ের মাধ্যমে সূচনা করে তাদের ব্রিটিশ শিক্ষানীতির প্রথম পর্যায়। মিশনারিদের অন্যতম প্রধান অবদান ছিল বাংলায় স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং ছাপাখানা স্থাপন।[৫২] ১৭১৯ সালে The Society for Promoting Chirstian Knowledgeনামের সমিতি কলিকাতায় আসে এবং ১৭৩১ সালে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের আহার ও পরিধেয় বস্ত্র বিনামূল্যে দেওয়া হতো। বাংলায় এটিই হলো পাশ্চত্য ধরনের প্রথম স্কুল।[৫৩] তারপর থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মিশনারিরা স্কুল স্থাপন করতে থাকে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ও তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য স্কুল স্থাপনে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এর ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সাথে মুসলমানদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসনক্ষমতায় আসার পর ১৮১৩ সাল পর্যন্ত দেশবাসীর শিক্ষার নিমিত্তে তেমন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে পারেনি। ইংরেজী শিক্ষায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ না নেওয়ার পিছনে দুই-একটি কারণকে দায়ী করা যায়। তার মধ্যে প্রথম কারণ হলো– মূলত কোম্পানি ছিল একটি বানিজ্যিক

প্রতিষ্ঠান, যার ফলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু মুনাফার দিকে। দ্বিতীয় যে কারণটিকে অতি মাত্রায় চিহ্নিত করা যায় তা হলো– কোম্পানি জানত যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে বাঙালী তথা ভারতবাসীর শৃঙ্খলে মুক্তির নেশা ধরবে। এই নেশা এমন হতে পারে যে, ব্রিটিশরা হয়ত ভারত ছাড়তে হবে। বস্তুত এটাই ছিল কোম্পানির রাজনৈতিক কুটকৌশল। ১৭৯২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য উইলিয়াম উইলবারফোর্স ভারতে শিক্ষা ও খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তখন এ সম্পর্কে কোর্ট অব ডিরেক্টরস এর জনৈক সদস্য বলেন যে, ইংল্যান্ডের ভুল ছিল সেখানে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। ভারত প্রসঙ্গেও যেন সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।[৫৪] এক্ষেত্রে তারা ছিল দ্বিধাগ্রস্থ, তবে পরবর্তী খ্রিষ্টান মিশনারিদের বাংলায় ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্কুল স্থাপন এবং সেই সাথে শিশু-কিশোরদের আধুনিক শিক্ষায় আলোড়ন জাগানো ইংরেজদের motive দেখলে কিন্তু সৈয়দ মাহমুদের কথাটি পুরোপুরি সত্য বলে বিবেচনায় আসে না। তবে কোম্পানির প্রশাসনে এমন কয়েকজন প্রশাসক, যারা ছিলেন পরমত সহিষ্ণুধর্মী; যারা কিনা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং দেশীয় সংস্কৃতি চর্চায় আগ্রহী ছিলেন। এই রকমই একজন শাসক হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস, যিনি ১৭৮১ সালে কলিকাতার বিশিষ্ট মুসলমানদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। পরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মাদ্রাসার সংস্থাপন ব্যয় হেস্টিংসকে পুনরভরন করে।[৫৫] ১৭৮২ সালে মাদ্রাসাটিকে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে উন্নীত করা হয়। কলকাতা মাদ্রাসা ছিল এদেশে ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে এই মাদ্রাসার উদ্দেশ্য ছিল আরবি ফারসি শিক্ষা তথা মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসার ঘটানো এবং মুসলমানদের সরকারি কাজের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা। ১৭৯১ সালের দিকে এই মাদ্রাসার কারিকুলামে প্রাকৃতিক দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, আইন, জ্যোর্তিবিদ্যা, জ্যামিতি, গনিত, যুক্তিবিদ্যা, Rhetoricএবং ব্যাকরণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৫৬] কোলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রায় একযুগ পর ১৭৯২ সালে কাশীর প্রাশসক জুনাথন ডানকান (১৭৫৬-১৮১১) সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতির জন্য ‘বানারসী সংস্কৃত কলেজ’ স্থাপন করেন। উক্ত সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে সরকারের যুক্তি ছিল– স্থানীয় হিন্দুগণ যেন মুসলিম বিদ্বেষী না হয়; যদিও মাদ্রাসা এবং সংস্কৃত কলেজ উভয় প্রতিষ্ঠানেরই শিক্ষাদানে চরিত্র ছিল প্রধানত ধর্মীয়, তা সত্ত্বেও এ দুটি প্রতিষ্ঠান জাগতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। রাজস্ব সম্পর্কিত এবং বিচার প্রশাসন বিষয়ক কাজকর্ম তখনও পরিচালিত হত ফার্সি ভাষায়। বিচার সম্পর্কিত প্রশাসনের ক্ষেত্রে হিন্দু এবং মুসলিম আইন পদ্ধতি সমূহ সাধারণভাবে অনুসরণ করা হত। এজন্য প্রশাসনের নিম্নপর্যায়ের পদসমূহ পূরণের জন্য সরকারের প্রয়োজন হয়েছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হিন্দু ও মুসলমান যুবকের।[৫৭] ইংরেজ সরকার ভারতবাসীদের ইংরেজী শিক্ষার দিকেও তার রাস্তা প্রশস্ত করছে কিন্তু নানাবিধ চিন্তার ফাঁকে মূল চিন্তা যখন ঘুরপাক খাচ্ছে ঠিক সেই সময় ইংরেজ পক্ষ হতে শক্তিশালী ইভানজেলিস্ট প্রেরণের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর চাপ প্রদান করছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পরবর্তীকালে ‘কোর্ট অব ডিরেকটরস’ এবং পার্লামেন্টের সদস্য চালর্স গ্রান্ট (Charles Grant)ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা। এই আন্দোলন পরিচিত হয়েছিল ক্লাপহেম সংগঠন নামে (Clpham sect)।[৫৮] ১৭৯২ সালে গ্রান্ট‘Observations on the state of society among the Asiatic Subsects of Great Britain, Particularly with respect to words; and the

means of improving it' নামে একটি নিবন্ধ্য লিখেছিলেন, যা তিনি ১৭৯৭ সালে পেশ করেছিলেন কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ এবং পার্লামেন্টের নিকট।[৫৯] নিবন্ধে গ্রান্ট কিছুটা মোটা দাগে ভারতীয়দের নৈতিক অবক্ষয়কে অতিরঞ্জিত করেন এবং তাদের শিক্ষাদানের প্রয়োজনের প্রতি ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালান। অবশ্য খ্রিস্টান ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ভারতীয়দের শিক্ষিত করা হলে তাদেরকে তা গ্রহণের জন্য তৈরী করা হবে।[৬০] কিন্তু ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার ঘোষিত নীতি অনুযায়ী কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ এবং পার্লামেন্ট কোনটিই এ বিষয়ে কোন দায়িত্ব নিতে রাজী ছিল না।[৬১] তবে গ্রান্টের চেষ্টা এক্ষেত্রে চলমান ছিল। তিনি দমে যান নি। তিনি কোর্ট অব ডিরেক্টসকে এ মর্মেও অবহিত করেছিলেন যে, মুসলিম আমলের রাজনীতি দেশে অরজকতার সৃষ্টি এবং নৈতিক, সামাজিক ও মননের অবনতি ঘটিয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। সুতরাং ভারতীয়দের সামাজিক-নৈতিক অবনতি রোধ করতে তিনি দুটি প্রস্তাব করেন– ১. ভারতে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের অবাধ প্রবেশাধিকার এবং ২. ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন দ্বারা দেশবাসীর হৃদয়ে আলো, ও জ্ঞান বিকিরণের সুযোগ দেওয়া।[৬২] গ্রান্টের অদম্য প্রচেষ্টায় অবশেষে উইলিয়াম কেরি, জন ক্লার্ক মার্শম্যান (১৭৯৪-১৮৭৭), উইলিয়াম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩) প্রমুখ মিশনারিগন ১৭৯৯ সালে এক আমেরিকান জাহাজে চড়ে বাংলায় আসেন। অতঃপর ১৮০০ সালে তারা শ্রীরামপুরে 'শ্রীরামপুর মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন।[৬৩] এই মিশন বাংলার সাধারণ মানুষের দুরাবস্থা দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। কেরি এ সময়ে শ্রীরামপুরে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং 'সমাচার দর্পন' নামে বাংলা ভাষার একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। শ্রীরমপুর তখন ডেনমার্কের অধীনে ছিল বিধায় মিশনারিগণ স্বাধীন ভাবে শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারকর্ম পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাছাড়াও একই সময় তিনি মালদা জেলার মদনাবতীতে একটি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৬৪] এছাড়াও উইলিয়াম কেরির নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশন বাইবেলসহ ইউরোপীয় পুস্তকের বঙ্গানুবাদ, বাংলা গদ্য পুস্তক প্রণয়ন, বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার স্থাপনের মধ্যদিয়ে এদেশীয়দের শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্যা ভূমিকা পালন করে। আধুনিক রীতি অনুযায়ী পরিচালিত এটিই ছিল এদেশের প্রথম বাংলা বিদ্যালয়।[৬৫] অন্যদিকে গভর্নর জেনারেল ওয়েলসলিও তাদেরকে বিনা দ্বিধায় পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। তিনিই মূলত উইলিয়াম কেরিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।[৬৬] ওয়েলসলির পরবর্তী গভর্নর লর্ড মিন্টুও ভারতীয়দের শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার পক্ষে ছিলেন। তবে তিনি বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা স্থাপনের ব্যাপারে হেস্টিংসের নীতিই অনুসরণ করেছিলেন, আর সেটা হল প্রাচ্য শিক্ষায় উদারনীতির প্রয়োগ। লর্ড মিন্টো ধর্মীয় চিন্তায় জর্জরিত সকল চিন্তার মিলনময়ী ভারতবাসীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় পরিত্যাজ্য জ্ঞান করে মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার গুনগঠন ও বিজিত অঞ্চলসমূহে কলেজ প্রতিষ্ঠার উপর জোড় দিয়েছিলেন। মিন্টোর এই চেষ্টার মধ্যেই ভারতে শিক্ষা বিস্তার ও মিশনারিদের কার্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে এক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস, চালর্স গ্রান্ট, স্যার থমাস মনরো, স্যার জন ম্যালকম ও ভারতের অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা। সদস্যদের অধিকাংশ ভারতে শিক্ষা প্রচার এবং মিশনারি কর্মপন্থার বিরোধিতা করেন ও রাষ্ট্রের পক্ষে এর তত্ত্বাবধান কিংবা দায়িত্ব নেয়া উচিত নয় বলে মত পোষণ করেন।[৬৭] চালর্স গ্রান্ট ও উইলবারফোর্সের মত শিক্ষাবিদ মিশনারিদের দাবির মুখে শেষ পর্যন্ত ১৮১৩ সালের চার্টারে ভারতীয় শিক্ষাখাতে বার্ষিক ১

লক্ষ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ইংল্যান্ড কর্তৃপক্ষ কোম্পানিকে মিশনারিদের কার্যক্রমে উৎসাহিত করার নির্দেশ দেন। ২১ জুলাই ১৮১৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইনগতভাবে ঐ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর ঘোষণা দেয়া হয় যে, গভর্নর জেনারেল পরিষদকে এই মর্মে নির্দেশ দেবেন যে, সামরিক এবং বেসামরিক ব্যয় বহন করার পর যে অর্থ উদ্বৃত থাকবে সেখান হতে প্রতিবছর এক লক্ষ টাকা ভারতীয় সাহিত্য শিল্পের পুনর্জাগরণের জন্য প্রদান করা হবে, যাতে এখানকার অধিবাসী তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে পারে।[৬৮] অতঃপর ১৮১৪ সালের ৩ জুন কোম্পানির ফোর্ট অব ডিরেক্টরস প্রথম বারের মত এক লক্ষ টাকা শিক্ষাখাতে বন্টনের ব্যবস্থা করে।[৬৯] কোম্পানির এই সিদ্ধান্ত বাংলা তথা ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তাই দেখা যায় খ্রিষ্টান মিশনারিগনই এদেশবাসীর আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

১৮১৪ সালের জুলাই মাসে খ্রিস্টান মিশনারি রবার্ট মে (Robert May)ইংরেজ শিক্ষাবিদ জোসেফ ল্যাংকাস্টার (Josef Lancaster, 1778-1838)কর্তৃক উদ্ভাবিত মনিটরিয়াল (monitorial)পদ্ধতির ভিত্তিতে চুঁচুড়ায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ পদ্ধতিতে উপরের ক্লাসের ছাত্ররা নীচের ক্লাসের ছাত্রদের শিক্ষাদান করত। সে সময় পদ্ধতিটি ইংল্যান্ডে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মে'র বিদ্যালয়টি বেশ সাফল্য অর্জন এবং তিনি শীঘ্রই চুঁচুড়ার আশেপাশের গ্রামগুলিতে কয়েকটি অধিভুক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। জানা গিয়েছে ১৮১৫ সালের মধ্যে এসব বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ৮০০ ছড়িয়ে যায়। বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা ভাষায় পড়তে, লিখতে ও পাটীগণিত শেখানো হত।[৭০] ১৮১৫ সালে মে কর্তৃক প্রবর্তিত পরিকল্পনানুযায়ী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সরকার মাসিক ছয়শত টাকা অনুমোদন করে। মে তখন এ প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এভাবে পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে মে-এর তত্ত্বাবধানে আরও কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় যে বিদ্যালয়গুলি "কোম্পানির স্কুল নামে পরিচিত ছিল এবং ১৮১৫ এর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় এক হাজার দুশো ছিয়ানব্বই জন।[৭১] ১৮১৬ সালে মে শিক্ষকদের জন্য পৃথক একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আরও পরামর্শ দেন যে, প্রতিটি গ্রামেই যাতে নিজস্ব একটা বিদ্যালয় থাকে সেজন্য চেষ্টা করা উচিত।[৭২] মে-এর বিদ্যালয়ের জন্য সরকারি মুঞ্জুরি মালিক দুশো টাকা থেকে আটশো টাকায় উন্নীত করা হয়। ১৮১৮ সালের আগস্ট মাসে তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত মে ছত্রিশটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এসব স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা ছিল হিন্দু-মুসলমান মিলে মোট তিন হাজার। শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে দুশো ছাব্বিশজনের বেশি পণ্ডিত ব্যক্তি তখন লেখাপড়া করতেন।[৭৩] চুঁচূড়ার বিদ্যালয়গুলির সাফল্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এমনকি কলকাতার বাইরেও উন্নতমানের শিক্ষার চাহিদা ক্রমশ বাড়ছিল। বিভিন্ন জাত ও সম্প্রদায়ের ছাত্র যেহেতু এসব বিদ্যালয়ে ছিল, অতএব এও স্পষ্ট যে, সেখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে জাত বা সম্প্রদায় তেমন কোন বড় বাঁধা ছিল না। কলিকাতা হিন্দু কলেজ (১৮১৬), ক্যালকাটা স্কুল-বুক সোসাইটি (১৮১৭) এবং ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাও এ কথাই প্রমাণ করে যে, বাংলায় প্রতিনিধিত্বকারী নেতাগণও সরকার শিক্ষার বিস্তারে কি করছে সে ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে নিজেরাই শিক্ষা বিস্তারে তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছিলেন। লর্ড হেস্টিংস-এর সরকার যদিও নিজে থেকে শিক্ষার বিস্তারের জন্য বাস্তব কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তবুও তারা ভারতীয় হিন্দু-

মুসলমান, ইউরোপীয় খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান ও সমর্থন করেছে। ১৮১৬ সালে কলিকাতা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৮১৭ সালে গিয়ে কার্যকর হয়।[৭৪] ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া স্কটল্যান্ডের অধিবাসী ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২) নামে একজন ইউরোপীয় উদার চেতার উদ্যোগে ও বিচারপতি এডওয়ার্ড হাইডইস্ট-এর প্রচেষ্টায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যয়ের পরিশ্রম ও এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করে।[৭৫] রাজা রামমোহন রায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা থাকলে যেহেতু তিনি ছিলেন রক্ষনশীলদের কাছে বিতর্কিত, পরে এই রক্ষনশীল হিন্দুরা তাকে অপবাদ দিয়ে মিথ্যা অভিযোগ সহকারে বের হয়ে যেতে বাধ্য করে।[৭৬] এই প্রতিষ্ঠানটিতে উচুঁমানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে এদেশে হিন্দু কলেজের মাধ্যমেই ইংরেজী শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। সর্বোপরি এই কলেজ প্রতিষ্ঠা ছিল আধুনিক বাঙলার মানস সংগঠন ও সংস্কৃতি চর্চা এবং বিশ্ব চিন্তা ও চৈতন্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হিন্দু কলেজের সাথে সাথে চলছিল 'স্কুল বুক সোসাইটি। এই সোসাইটি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী এবং স্থানীয় ভাষায় বই রচনা এবং বিক্রি করা।[৭৭] প্রতিষ্ঠা লাভের পরপরই সরকার এটিকে মাসিক পাঁচশত টাকা মঞ্জুরি দান করে, যা পরবর্তী ষাট বছর অব্যাহত ছিল। সোসাইটির কার্য পরিচালনা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়। এতে ইংরেজ এবং বাঙালি হিন্দু ছাড়াও কয়েকজন মুসলমান যেমন– দরবেশ আলী, মৌলবি কাজেম আলী, মৌলবি বিলায়েত আলী এবং মৌলবি নুরুন্নবী প্রমুখ সদস্য ছিলেন।[৭৮] ১৮২১ সালে সরকার এই সোসাইটিকে এককালীন ৭০০০ টাকা অনুদান প্রদান করেন এবং মাসিক ৫০০ টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করে। এই সময় পর্যন্ত স্কুল বুক সোসাইটি প্রধানত প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে ১২৬,৪৪৬ কপি গ্রন্থ প্রকাশ করে। এসব গ্রন্থ বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, ফারসী ভাষায় প্রকাশিত হয়।[৭৯] কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির উন্নতির জন্য ১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর Calcutta School Societyনামে আরেকটি সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অ্যাডামের মতে এই প্রতিষ্ঠানটি ইউরোপীয়, ভারতীয় ও স্থানীয় জ্ঞানের সংমিশ্রিত আদর্শে গড়ে উঠেছিল। ১৮২১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী স্কুল সোসাইটির অধীনে ১১৫ টি বিদ্যালয় ছিল। যেগুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৮২৮। এছাড়াও সোসাইটির পক্ষ হতে ৫টি বিদ্যালয় পরিচালিত হত। যে ৫টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩টি স্কুল চার্চ মিশনারিদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, ১টি বিদ্যালয় হিন্দুস্থানী নামে, আর এটি বিদ্যালয় যেখানে বাংলা, ফারসি, নাগরি (Nagree)পড়ানো হত যার প্রায় অধিকাংশ ছাত্রই ছিল মুসলিম।[৮০]

অপর ১টি বিদ্যালয় ছিল; যেখানে শুধু ইংরেজীই পড়ানো হত এবং সেটি চালু ছিল ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত। মূলত স্কুল সোসাইটির অর্থ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এটি আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখে। ১৮২১ সালের মধ্যে সরকার সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কলকাতায় বড় ধরনের একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে, যা এই ভেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় যে এটি হবে মাদ্রাসার একটি হিন্দু প্রতিরূপ।[৮১] কলেজটির রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সরকার বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকার অনুদানও মঞ্জুর করে। সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত প্রখ্যাত এইচ.এইচ. উইলসনকে অন্তর্ভুক্ত করে কলেজটির জন্য একটি তত্ত্বাবধায়ক

কমিটিও গঠিত হয়। একজন ইউরোপীয় এর সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় চৌদ্দ জন পণ্ডিত, একজন লাইব্রেরিয়ান, কিছু সংখ্যক কর্মচারী এবং একশ' জন বিদ্যার্থী নিয়ে।[৮২] রেল কমিটি অব পাবলিক ইস্ট্রাকশন গঠিত হয়। এর লক্ষ ছিল মূলত জনগনের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রমকে সাংগঠনিক রূপ দেয়া। এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন যথাক্রমে জন হার্বাট হ্যারিংটন এবং সংস্কৃত পন্ডিত হোরেস হেম্যান ইউলসন।[৮৩] জনশিক্ষা কমিটির প্রধান দায়িত্ব ছিল সকল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ কর্ম তদারকী করা। তাছাড়াও উপযুক্ততা ও মান অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা বিদ্যালয়গুলিকেও সহায়তা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার জনশিক্ষা কমিটিকে নির্দেশ প্রদান করে।

বাংলার শিক্ষানীতি সম্পর্কে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ ১৮৩০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর আরেকটি বার্তা(Despatch)প্রেরণ করে। এই বার্তাকে ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয় শিক্ষায় ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চত্য শিক্ষা প্রবর্তনে প্রথম ইঙ্গিত বা নির্দেশ বলা যায়। এখানে ইংরেজীর মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচলন এবং ইংরেজী শিক্ষার পৃথক কলেজ স্থাপনের উপর গুরুত্ব স্পষ্টভাবেই প্রদান করা হয়।[৮৪] এই নির্দেশ ছিল বাংলায় আরবি, ফারসি শিক্ষার অবসানের সূচনা বিন্দু। স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক (১৮৯২-১৯৪৭) এ প্রসঙ্গে বলেন, "মুসলমানদেন জন্য এ নির্দেশ ছিল তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রতি মৃত্যুশেলে আঘাতস্বরূপ।"[৮৫] ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচলন এবং ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপন যদি মুসলমানের নিজস্ব সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রতি আঘাত সরূপ হয় তাহলে এই বিষয়টিও ভেবে দেখা দরকার মুসলিম সংস্কৃতি ও শিক্ষাইবা বাঙালিকে কতটুকু যুগোপযোগী করেছিল? সেই প্রেক্ষিতে ১৮২৫ সালের কলিকাতা মাদ্রাসার একটি চিত্র তুলে ধরা যায়। কলিকাতা মাদ্রাসার দু'জন পরীক্ষক ড. মিল এবং ড. থমসন এখানে পাঠ্যসূচী ও দুরাবস্থার চিত্রণে হতাশ হন। এই হতাশা তখনই কেটে যাবে বলে তারা মনে করেন যখন মাদ্রাসায় পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ছড়ানোর সাথে সাথে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হবে। এ সময়ে মাদ্রাসার দ্বিতীয় সেক্রেটারি ড. লামস্‌ডেনও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষারক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা প্রচলনের দাবি জানান। ড. লামসডেন যখন দেখলেন ইংরেজী ভাষা প্রচলনে দেরী হচ্ছে তখন তিনি নিজেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছাত্রদেরকে ইংরেজী পড়ানো শুর করেন। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবশ্য ততক্ষণে ইংরেজী শিক্ষার বীজ ছাত্রদের অন্তরে রোপিত হয়ে যায়।[৮৬] ১৮২৮ সালে কলিকাতা মাদ্রাসার চিত্র একই রকম ছিল। সেসময় হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ পাশ্চত্য শিক্ষা নিয়ে উন্নত হচ্ছে যেখানে কোলকাতা মাদ্রাসা প্রাচ্য শিক্ষা নিয়ে অবনতির দিকে যাচ্ছে। অবশেষে ১৮২৮ সালের ১১ই অক্টোবর সরকার জনশিক্ষা কমিটিকে কলিকাতা মাদ্রাসায় মুসলিম ছাত্রদের জন্য ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের নির্দেশ দেন।[৮৭]

এই সময়ের কিছু পূর্বে ১৮২৪ সালে মুর্শিদাবাদ হাউসে এবং সে অঞ্চলের ছেলে- মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মুসলিম স্কুল ও কলেজ স্থাপনের জন্য স্থানীয় ইংরেজী গভর্নর উইলিয়াম লকের নিকট প্রস্তাব করা হয়। ১৮২৪ সালের ২৭মে লকের প্রস্তাব অনুমোদন করে মুর্শিদাবাদ নিজামত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে ইংরেজী শিক্ষা চালু করা হয়।[৮৮] ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে পরবর্তী প্রধান পদক্ষেপ ছিল ১৮৩৩ সালের অ্যাক্ট। এই অ্যাক্ট-এ বলা হয়-No native of India, nor any

natural born subject of His Majesty, should be disabled from holding any place or employment by reason of his religion, place of birth, discent or colour.

উক্ত নীতির ফলে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার দ্রুততর হয়, কারণ এতে করে কোম্পানির অধীনে ভারতীয়দের জন্য চাকরির সুবিধা প্রসারিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার[৮৯] রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে গেলেও উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক পর্যন্ত ফার্সিকে এখানকার সরকারি কাজকর্মের ভাষাররূপে বহাল রাখা হয়। কিন্তু ইংরেজ শাসনের অধীনে ফাসিকে সরকারি ভাষা হিসাবে না রাখাই ছিল স্বাভাবিক। তাই ইংরেজীকে সরকারী ভাষা হিসাবে প্রচলন করার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। ইংরেজদের মধ্যে অনেকেই যাঁরা প্রাচ্যবিদ হিসাবে খ্যাত ছিলেন তাঁরা এখানকার শাসনকার্যের সুবিধার্থে ফার্সিকে চালু রাখার পক্ষে জোর মত প্রকাশ করেন। কিন্তু গভর্নর জেনারেল'স কাউন্সিল সদস্য টি.বি. ম্যাকলে প্রাচ্যভাষা বহাল রাখার বিরুদ্ধে এবং ইংরেজীর পক্ষে জোরালো বক্তব্য তাঁর বিখ্যাত 'মিনিট'-এ লিপিবদ্ধ করেন এবং সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন করেন।[৯০] এই সিদ্ধান্ত ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে। বেন্টিং এবং তার উত্তরসূরীগণ ইংরেজী প্রচলনের প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে কলেজ এবং স্কুল স্থাপনে ব্রতী হন। ম্যাকলে যখন ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনে চূড়ান্ত মতে অধিষ্ঠিত ছিলেন ঠিক সেইসময় তিনি জনপ্রিয় মত প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন-

"একটি ভাল ইউরোপীয় লাইব্রেরির এক সেলফ বইয়ের মূল্য ভারতীয় ও আরবী সাহিত্যের সমস্ত গ্রন্থের মূল্যের সমান। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষা উপর থেকে নিচে চুইয়ে পড়বে এবং ক্রমে ক্রমে চারদিকে বিস্তার লাভ করবে। ইতিহাসে তার শিক্ষা নিয়ে এই চুইয়ে পড়ে চারদিক আলোকিত হয়ে জ্ঞানের ঝর্ণা-ধারার এই তত্ত্ব 'Filtration Theory'নামে অভিহিত।[৯১] মিশনারি উইলিয়াম এডাম ১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত সরকারের পক্ষে তদন্ত কার্য সম্পর্কে যে তিনটি প্রতিবেদন পেশ করেন তার পূর্ণ চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।[৯২] দেশের বিভিন্ন এলাকার যে অসংখ্য আরবি-ফার্সি, মক্তব, মাদ্রাসা, সংস্কৃত টোল এবং বাংলা পাঠশালা ছিল তা ভেঙ্গে পড়ার কারণ ও মর্মান্তিক চিত্র এ রিপোর্টের মধ্যে পাওয়া যায়। রিপোর্টে অবশ্য এটাও জানা যায় যে, নিজেদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষার প্রতি আগ্রহের কিছু সংখ্যক শিক্ষায়তন চালু রাখার চেষ্টা করেছিল। এডাম প্রস্তাবিত জনশিক্ষা পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল (১) গ্রামকে মূল শিক্ষা ইউনিট ধরা অর্থাৎ গ্রামের পাঠশালা জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি হবে। (২) প্রথমত পাঠশালায় মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হবে। পাঠশালায় চারটি শ্রেণি থাকবে এবং চার রকমের পাঠ্যপুস্তক থাকবে। (৩) কোন বিশেষ ধর্মের আচার-আচরণ সম্পর্কে শিক্ষাদানের পরিবর্তে ধর্মের মূল সত্য– যার সাথে সকল ধর্মেরই মিল রয়েছে, তাকেই ধর্ম শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। (৪) যাতে শিক্ষকেরা নির্বিঘ্নে শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত হতে পারেন সেজন্য এডাম সর্বাগ্রে শিক্ষকদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা বলেন। (৫) এডাম বলেন, জনশিক্ষার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। যদি কোন কোন সূত্র থেকে অর্থ সংগৃহীত না হয়, তাহলে সরকারকেই তা দিতে হবে।[৯৩] বলা বাহুল্য যে, এডামের রিপোর্ট পেশের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইংরেজীকে অফিসিয়াল ভাষারুপে ঘোষণা করা হয়েছিল। সুতরাং এই রিপোর্ট যতই বাস্তবভিত্তিক হোক না কেন সরকার তা কার্যকর

করে নি। এর প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক। জনশিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করা কোন ঔপনিবেশিক শক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। যাহোক ১৮৩৫ সালের এডামের রিপোর্টের পর যে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হলো তাতে বলা হল যে, প্রাচ্যের বদলে পাশ্চাত্যের জ্ঞান প্রদান করা হবে এবং ভারতীয় কোন ভাষার পরিবর্তে ইংরেজীতে এই জ্ঞান দেওয়া হবে।[৯৪] ব্রিটিশ শাসকদের এই সিদ্ধান্ত দু'টি বৃহত্তর সম্প্রদায় হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে একেবারে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা, নতুন একটি ভাষার প্রচলন এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন প্রভৃতি হিন্দুদের কাছে ছিল কেবলই প্রভূ পরিবর্তন। ফলে এই পরিবর্তিত ব্যবস্থাটি মেনে নিতে তাদের মনে কোন সংকোচ কাজ করল না। অপরদিকে মুসলমানরা এই অঞ্চলের প্রাক্তন শাসক থাকায় গৌরববোধের ফলে পরিবর্তিত পরিস্তিতি তাৎক্ষণিকভাবে মেনে নিতে পারছিল না। বস্তুত মুসলমানদের কাছ থেকে ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের ফলে পূর্বোক্ত শাসকদের ব্যাপক অবনতি ঘটে এবং সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সাথে সাথে সমস্ত মুসলমান সমাজও তলিয়ে যায়।[৯৫] নিজেদের মহিমান্বিত স্মৃতি রোমন্থন করে বসে বসে দিন গুণে ফেরত দিনের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে মুসলমানরা বহু বৎসর যাবৎ বিজেতাদের নব- প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো সুযোগ গ্রহণ করতে পারে নি। ইংরেজদের চাকুরির জন্য এই পরিবর্তনকে গ্রহণ হিন্দুদের কাছে ছিল শুধু ফার্সির বদলে ইংরেজী শেখা; দু'টোই তাদের জন্য ছিল বিদেশী ভাষা এবং এতে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির কোনো ক্ষতি হয় নি।[৯৬] অথচ মুসলমানদের চিন্তা ছিল ঠিক এই রকম– মুসলমান মানে ধর্মীয় ভাষা আরবি অথবা উচ্চসমাজের ফারসী, এই চিন্তা তাদের অদূরপ্রসারী মনোভাব ছাড়া যে আর কিছুই নয় এটা তারা ভাবতে বা মনোদগম করতে পারে নি। ফলে পরিবর্তনের চিহ্ন হিসেবে ইংরেজীকে তারা দেখলো নিজস্ব সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হারানো সম। মুসলমানগণ ইংরেজিকে গ্রহণ না করার পিছনে ফিলিপ হারটগ এই কারণ ছাড়াও আরেকটি কারণকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন-'a real though unfounded fear that it would lead to christian proselytization on a large scalc.'[৯৭] সেসময় রাজদরবার ও শাসনকার্যে ব্যবহৃত ফার্সীর স্থানে চলে এল ইংরেজী ও মাতৃভাষাসমূহ চালু করার নিয়ম। এর আগে ১৮২৬[৯৮] সালে আদালতে নিম্নপর্যায়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ ইংরেজী সার্টিফিকেটধারী ভারতীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি চালু হয়।[৯৯] মুসলিম জাতির জন্য এ আইন ছিল শেষ অবলম্বনটুকুও চলে গেলে যেরকম দিশেহারা বোধ হয় তার মতো। মজার ব্যাপার হল- ইংরেজ সরকার উইলসন এবং প্রাচ্যবাদীদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে, যা চেয়েছিল অবশেষে সে ধরনের গণসচেতনতা বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে জাগ্রত করা সম্ভব হয়েছিল। ১৮৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে "কলিকাতা এবং বাংলার জেলাসমূহের অধিবাসী প্রায় ১০,০০০ হিন্দু" কর্তৃক সাক্ষরিত সংস্কৃত ভাষাই রচিত একটি স্মারক লিপি কোর্ট অব ডিরেক্টরস এর নিকট প্রেরিত হয়। এই স্মারকলিপিতে-[১০০] বেন্টিঙ্ক এর ৭ই মার্চ ১৮৩৫ তারিখের সিদ্ধান্ত এই বলে প্রত্যাখান করা হয় যে– এটি "অত্যন্ত ক্ষতিকর, বিদ্বেষপূর্ণ, আমাদের পেশা ও ধর্মের প্রতি নাশকতামূলক এবং সরকারের জন্য কুখ্যাতি মূলক।"[১০১] হিন্দুদের মানসিকতার প্রকৃত চরিত্র বুঝতে হলে, এ বিষয়টি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সম্পূর্ণ স্মারকলিপিটির মধ্যে সরকারের নীতির প্রতি অসন্তোষের ভার সম্পৃক্ত থাকলেও রক্ষণশীল হিন্দু নেতারা এ সময়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে পূর্বাপর সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে আসছিল। হিন্দুদেরএই যে দ্বি-মুখী আচরণ তার মধ্যেও ছিল একধরনের জটিল বিচক্ষণতা

অথচ শান্ত-ধীর, আর তা কিন্তু এক-দুই দিনে গড়ে ওঠেনি; আস্তে আস্তে করে জ্ঞানচর্চা ও সাধনায় যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি গঠিত হয়েছিল এটা ছিল তারই যুগান্তকারী ফল। ১৮৪২ সালে 'কাউন্সিল অব এডুকেশন' গঠিত হয়। এই কাউন্সিলের লক্ষ্য ছিল প্রতিটি জেলায় একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করা।[১০২] প্রতিটি জেলায় একটি করে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করা অতটা সম্ভব ছিল না ঔপনিবেশিক শক্তির পক্ষে–এর কারণ 'অর্থ'। ১৮৪৪ সালের পর থেকে ইংরেজী ধীরে ধীরে সকল কাজকর্মে ব্যবহৃত হতে থাকে।[১০৩] ১৮৪৪ এর ১০ই অক্টোবর লর্ড হার্ডিঞ্জ এদেশে ইংরেজী প্রচলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। হার্ডিঞ্জের ঘোষণায় বলা হয় যে–Preference shall be given in the selection of candidates for public employment to those who have been educated in the institutions thus established and especially to those who have distinguished themselves theirin by more than ordinary degree of merit and attachment.[১০৪] অতএব হার্ডিঞ্জের প্রস্তাবনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, সকল সরকারি নিয়োগে ইংরেজী জ্ঞানসম্পন্নদের অগ্রাধীকার দানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুদের কাছে সরকারি ভাষার এই পরিবর্তন ছিল সুবিধাজনক। মুসলমানদের জন্য কলকাতা মাদ্রাসা ছাড়া আর কোথাও ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ ছিল না। ১৯২৯ এর আগে কলকাতা মাদ্রাসায়ও ইংরেজী পড়ানো হত না। অন্যদিকে মূর্তি-পূজারীদের ভাষা বিবেচনা করে বাংলাকে মুসলমানগণ তাচ্ছিল্য করেছে। একজন মুসলমান[১০৫] পণ্ডিতের ভাষায় :

WhenPersian was first ostracised from our public school and replaced by Bengali, the Mussalmans, fond as they were of their own national languages, such as Arabic, Persian and Urdu, could hardly bring themselves to swallow Bengali which they considered a Hindu language, and which in fact they looked down on for ages as a tounge of a subject race.

ফলে ক্রমন্বয়ে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক অবস্থানের পরিবর্তন হতে শুরু করল। ব্রিটিশদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় হিন্দুরা জ্ঞান সঞ্চয় করল, আর মুসলমানরা জীবনের সর্বস্তরে পিছিয়ে পড়ল।[১০৬] নতুন শাসকের প্রতি বিঝপ মুসলমানরা তাদের সন্তানদের মিশনারি বা সরকারি, কোন স্কুলেই পাঠাল না; তাদের শিক্ষা অব্যাহত থাকল দেশজ প্রতিষ্ঠান-মকতব ও মাদ্রাসায়। ফলে ১৮৫৪ পর্যন্ত সরকারি স্কুলে মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা ছিল নগণ্য।[১০৭] স্যার চার্লস ওডের ১৮৫৪ সালের 'শিক্ষা ডেসপ্যাচ'-এ শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুতর সংস্কারনীতি সূচিত হয়। যে সংস্কারনীতি সূচনা করে ভারতীয় তথা বাংলায় আধুনিকতার প্রান্তর। যা দ্বারা পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার নীতি পূর্ণভাবে সংস্কার প্রাপ্ত হয়। এই শিক্ষায় প্রশমিত করে জনশিক্ষা, উচ্চতর শিক্ষা। দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের নীতি সূচিত করা হয়, স্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ এবং এই নীতি বাস্তবায়িত হয় ১৮৫৭ সালে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মধ্যদিয়ে।[১০৮] উল্লেখ্য, ১৮৫৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম বি.এ.পাস করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এবং ১৮৬১ সালে দেলওয়ার হোসেন নামক

মুসলমান প্রথম বি.এ.পাস করেন হুগলি কলেজ থেকে।[১০৯] উচ্চবর্ণ এবং শিক্ষিত বর্ণহিন্দুরাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রথম সুযোগ-সুবিধা পূর্ণভাবে লাভ করে এবং তারা নতুন সরকারি নীতির বিরোধীতা করে এই অজুহাতে যে, ভারতে নানা বর্ণ, জাতি ও ভাষার কোটি কোটি মানুষ বাস করে; অতএব এরুপ ব্যাপক শিক্ষার প্রসারণ বাস্তবতার দিক দিয়ে অসম্ভব এবং প্রয়োজনীয় প্রভূত ব্যয় সংকুলানও অসম্ভব। দ্বিতীয়ত; এর ফলে পল্লী সমাজজীবন ভেঙ্গে পড়বে, গ্রাম্য অর্থনীতিতে বিপ্লব দেখা দিবে এবং দৈনিক পরিশ্রমকারীর সংখ্যাও কমে যাবে। উচ্চ ও মধ্যবিত্তরাই এ পর্যন্ত শিক্ষা পেয়ে আসছে এবং একমাত্র তাদেরই শিক্ষার ব্যবস্থা উন্নত করলে যথেষ্ট হবে। কিন্তু সরকার এই নীতি গ্রহণ করল না। এর একটি রাজনৈতিক কারণও ছিল। আই.সি.এস পদগুলি ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল এবং ১৮৬৯ সালেই ৪ জন উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। উচ্চ শিক্ষার প্রসার অর্থে উচ্চতম পদসমূহে আরও ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ। অন্তত এরূপ একটি কারণ সেকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকদের দ্বারা দেখানো হয়েছিল। তাছাড়া ইতোমধ্যেই বাঙালি শিক্ষিতবাবুর সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যে, তাদেরও চাকরি সংস্থান অত্যন্ত কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।[১১০] এসব ব্যতিত আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল; যার জন্য বর্ণ হিন্দুরা জনশিক্ষার প্রসার রোধ করতে অগ্রনী হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের পর গোটা মুসলমান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। তারা অসি ছেড়ে সরকারের সংগে সহযোগিতা করতে থাকে, পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণেও আগ্রহী হয়। মুসলমানরাও উচ্চশিক্ষা নিয়ে চাকরিক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয়। এতদিন এক্ষেত্রটি ছিল বর্ণহিন্দুদেরই একমাত্র একাধিপত্যের ক্ষেত্র। হতে পারে মুসলমানকে এককাতারে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেখতে ভাল লাগছিল না বলে জনশিক্ষার বিরুদ্ধতা আরম্ভ হয়। বাংলার গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল (১৮৭১-৭৪) উচ্চশিক্ষার জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ থেকে জনশিক্ষার অজুহাতে বৃহদংশ ছেঁটে দিলেন। তার আদেশে সংস্কৃত কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ ও বহরামপুর কলেজ দ্বিতীয় শেণিতে অবনমিত হয়।[১১১] আলোচ্য এই নতুন নীতি অনুসারে কতকগুলো সরকারি কলেজ ও স্কুল ‘দেশীয় ভদ্রলোকদের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেওয়া হয়। বলা হয় যে, তোমরা সরকারি সাহায্য নিয়ে নিজেদের দায়িত্বে এগুলি পরিচালনা করবে।[১১২] নিজেদের মত করে দেশীয়দের উপর পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে ইংরেজ সরকার বিতর্কিত হয়েছিল। তবে এক অর্থে তা হিন্দু দেশীয়দের এক ধরনের স্বাধীন চিত্তের ইঙ্গিতই বহন করে। এর ফলে হিন্দুদের সাথে সাথে মুসলিমরা ভাবতে শিখেছে যে, কিভাবে শিক্ষা অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হয়; কোন ধরনের শিক্ষা মনুষত্বের বিকাশের পাশাপাশি বিশ্বকোষ ধারণ করতে শিখায়। উচ্চতর শিক্ষা ছাড়া যে চাকুরি মেলে না, আর চাকুরি না হলে যে শুধু ধর্মের কথায় অন্ন জোটেনা মুসলমানরা তা অনুধাবন করতে শিখল। এই কথাটির অর্থ এই নয় যে, ধর্ম ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে। মুঘল সম্রাটগণ যদি একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে পারতেন কিংবা বাংলার নবাবগণ যদি করতে পারতেন তাহলে হয়ত বিশ্বকোষ বাংলায় এমন ভাবে রচিত হত যে আধুনিকতার জন্য বাংলার -জনগসাধারনকে ইংরেজদের পিছনে ছুটতে হত না।

১৮৩৩-১৮৫৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতে অনুসৃত শিক্ষা বিষয়ক ‘ব্রিটিশ নীতি, তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করে। এগুলি হলো– (ক) পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রসার (খ) প্রশাসনিক কাজে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্য প্রার্থী লাভে

নিশ্চয়তা বিধান এবং (গ) সরকারী কাজে ভারতীয়দের ব্যবহার করা।[১১৩] ১৮৫২ সালে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যানে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের অগ্রগতির চিত্র লক্ষণীয়–[১১৪]

শিক্ষার মাধ্যম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষকের সংখ্যা	শিক্ষার্থীদের সংখ্যা
ইংরেজী ও মিশ্রভাষা	৩১	২৮৩	৫,৪৬৫
স্থানীয় ভাষা	১০৪	১০৪	৪,৬৮৫

বৃত্তির সংখ্যা ছিল ২৯১ টি এবং এতে বাৎসরিক ব্যয় ছিল ৪৯,৫২৪ টাকা। সরকারি সাহায্যের পরিমান ছিল ৩,৮৭,১১০ টাকা।[১১৫] ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই বিখ্যাত শিক্ষা বিষয়ক উডর্স্ ডেসপ্যাচ ইংল্যান্ড থেকে এদেশে এসে পৌছায়। এই ডেসপ্যাচে ইংরেজ অধিকৃত "প্রদেশের উচ্চ, মধ্য, নিম্ন ব্যবহারিক, সাধারণ সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা ও নির্দেশ এবং সরকারি শিক্ষা বিভাগের পুনর্গঠনের প্রস্তাব ছিল।[১১৬] ১৮৫৪ সাল তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যায় যে, এই সময়ে সরকার শিক্ষার উন্নয়নে নানা কমিটি গঠন, আইন প্রবর্তন ও বিভিন্ন প্রস্তাব বাস্তবায়নের মাধ্যমে গতানুগতিক দেশীয় শিক্ষাকে অপসারন করে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আইনগত ও সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে দারুনভাবে সক্ষম হয়। তবে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নত অবস্থানে যাচ্ছে এমন অবস্থা মোটেও চোখে পড়েনি। মুসলমানদের একটি সাময়িকী Moslem Chronicle বঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষা প্রসংগে এক নিবন্ধে (১৮৯৯) বলে যে, ১৮৫৪ সালে সরকার এ বিষয়ে বিবৃতি দিলেও ১৮৭৩-৭৪ সালের আগে এক্ষেত্রে বিশেষ কিছুই করা হয় নি। Moslem Chronicleবাংলার মুসলমানদের শিক্ষার অতীত ইতিহাস আলোচনা করে ১৮৯৯ সালে একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করে যে, ১৮৫৪ সালে বাংলার সরকার সমগ্র শিক্ষানীতি সম্পর্কে বিবৃতি দিলেও পরবর্তী ২১ বছর পর্যন্ত মুলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ কোন উদ্যোগ বাংলা সরকারকে নিতে দেখা যায় নি। [১১৭]

১৮৫৬ সালে General Report on Public Instruction in Bengal-এ সরকারি কলেজ ও স্কুলে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:[১১৮]

প্রতিষ্ঠান	হিন্দু ছাত্র	মুসলমান ছাত্র
প্রেসিডেন্সি কলেজ	১২৭	০
হিন্দু স্কুল	৪৬২	০
বালুটোলাহ্ স্কুল	৫৬৭	০
মাদ্রাসা (আরবি)	০	৫৯
মাদ্রাসা (অ্যাংলো	০	১১১

পারসিয়ান)		
কলিংগ স্কুল	১২৪	১৫
সংস্কৃত কলেজ	৩৩৯	০
পাঠশালা	৩৩৯	০
মেডিকেল কলেজ	১৪৮	৯৬
হুগলি কলেজ	৪৫৫	৭
হুগলি মাদ্রাসা	৪	১৭৫
হুগলি ব্রান্ড স্কুল	১৬৯	৮
ঢাকা কলেজ	৩৯০	২৪
কৃষ্ণনগর কলেজ	২৪০	৭
বহরামপুর কলেজ	২২৭	১০
হাওড়া স্কুল	২২৯	৩
উত্তর পাড়া স্কুল	২০৩	০
মদিনাপুর স্কুল	১৪৫	১০
বীরভূম স্কুল	১০৪	১০
বাকুড়া স্কুল	১৪৬	১
বাউলিয়া স্কুল	১২৯	৫
রাসু পাগলা স্কুল	৪০	৬৩
বারাসত স্কুল	১৯২	৩
ব্যারাকপুর স্কুল	১১৬	২
যশোর স্কুল	১৩৪	৫
ফরিদপুর স্কুল	১০২	৪

বরিশাল স্কুল	২০৯	২২
কুমিল্লা স্কুল	৯৩	১৬
নোয়াখালি স্কুল	৬৬	১
চট্টগাম স্কুল	১৬৬	৪২
বগুড়া স্কুল	৮৫	৬
দিনাজপুর স্কুল	১১৪	৪
ময়মনসিংহ স্কুল	১৬৭	৯
সিলেট স্কুল	১৫৭	৫
সর্বমোট	৬,৩৩৮	৭৩১

উদ্ধৃত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, হিন্দু শিক্ষার্থীর সংখ্যা মুসলমান ছাত্রের তুলনায় মাদ্রাসা ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অনেক বেশি ছিল। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে হিন্দু সমাজের সচেতন অংশের আগ্রহ এবং তাদের অর্থনৈতিক সামর্থের পেছনে কাজ করেছে বলে মনে হয়। তাছাড়াও হিন্দু সমাজের সচেতন অংশ বুঝতে পেরেছিল যে ইংরেজ শাসনের অধীনে ইংরেজী শিক্ষা অচিরেই প্রাধান্য পাবে। তাই তারা মানসিকভাবে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে প্রস্তুত ছিল। অপরপক্ষে মুসলমান সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় অংশ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয় এবং অতীত গৌরব আঁকরে ভাবে 'আমরা রাজা ছিলাম, ফলে আধুনিক শিক্ষার পথ থেকে তারা ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। বরং আধুনিক শিক্ষা ও আধুনিকতা হতে নিজেদেরকে সরিয়ে রাখাও তাদের ছিল মনোবাসনের মতো। আলোচ্য অবস্থা বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। অভিযোগ করা হয় যে, "an institution almost exclusively frequented by Hindus was not he most suitable receipient of the income of a distinctively Muhammadan endowment."[১১৯] ভারতবর্ষে বিদ্যোন্নতি (তথা বাংলায় বিদ্যাশিক্ষার প্রসার) নামে সম্পাদকীয় কলামে (৪.১০.১২৬৬ বঙ্গাব্দ) লিখা ছিল- যে দিবসে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজপুরুষদের অধিকার হইবার সূত্রপাত হয়, সেই দিবসই ভারতবর্ষীয়দের মঙ্গল পরম্পরার প্রধান দিবস। সেই দিবস হইতেই ভারতবর্ষে নির্মল, সৌন্দর্য, সভ্যতার অঙ্গ সৌষ্টব এবং সুখ সাচ্ছন্দ্যের কারণ দিন দিনই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষে ইংরেজধিকারে বিদ্যাবুদ্ধিই প্রধান ফল। সেই বিদ্যা বৃদ্ধি ফলই আমাদের উদ্দেশ্য। রাজপুরুষদের দয়া গুনে এক্ষনে ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই বিদ্যার নির্মলজ্যোতি বিকীর্ন হইয়াছে। ঘরে বসিয়া মূর্খ্য ও অজ্ঞান হইব এরূপ প্রতিজ্ঞারুঢ় না হইলে অনেকেই কিছু না কিছু জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারে। দেশীয়দের গৃহের চতুর্দিকেই বৃহৎ বৃহৎ বিদ্যালয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠশালা সকল সংস্থাপিত রহিয়াছে।

কিছু কাল পূর্বে ইংরেজী ভাষার ছাত্ররা অ্যারেবিয়ান নাইট তুতিনামা প্রভৃতি কয়েকখানি সামান্য কাব্য পাঠ করিয়াই ইংরেজী ভাষায় পারদর্শিরূপে গণ্য হইতেন। এ নিমিত্তে কোন কোন অল্প বুদ্ধি অনীতজ্ঞ বাঙালিদেরকে অকর্মন্য ও অসার ভাবিয়া বিদ্রুপ করিতেন। তাহারা এক্ষনে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সমকক্ষ হইবার উপক্রম করিতেছেন। অষ্টাদশবর্ষীয় বালকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি.এ. উপাধি প্রাপ্ত হইবে। অতএব এক্ষণে দিন দিন বিদ্যাবুদ্ধি সহকারে দেশেরকিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে।[১২০] তাহলে দেখা যায় যে ইংরেজী শিক্ষা ভারতবাসী তথা বাংলাবাসীদেরকে উন্নতির দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় ইংল্যান্ডের লোকেরা দেখেছিল এত বড় ভারতবর্ষ যেখানে এত এত রকমের প্রদেশ, এত এত সীমানা অথচ একটি বিশ্ববিদ্যালয় কোথাও দেখা যায় না যখন কিনা ইংল্যান্ড বহন করছিল ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়। একটু একটু করে আলো জ্বলছে কিন্তু মুসলমান নীরব। এই নীরবতা ভেঙ্গেছিল তবে চড়াই-উৎড়াই পার করে। তেমনি এক চড়াই '১৮৫৭ সাল, যে সময় কোলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে মোট তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেই সময় ঘটে ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহ।

বাংলার নবাবের কাছ থেকে ক্ষমতা চলে গেল। মুসলমানরা ক্ষমতাহীন হয়ে নতুন শাসক ও শাসন ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারল না; উপরন্তু ইংরেজগণও মুসলমান দিগকে ভবিষ্যতে পথের কাটা ভেবে হিন্দুদের তোষামোদ করেছিল। চলছিল অষ্টাদশ শতক পুরোটা...তারই হাত ধরে উনিশ শতক ১৮৫৭-এর এক চরমক্রান্তি সময়। অষ্টাদশ হতে উনিশ শতকের পঞ্চাশের ঘরের আবর্তের ঘটনাটি ছিল ইংরেজ বিদ্বেষ ও বাঙালি মুসলমানের বিদ্রোহের ফল। তবে সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিম দুই জাতিরই সৈনিক ছিল। ব্যারাকপুরে শূকর ও গরুর চর্বি মিশ্রিত কার্তুজ ব্যবহার নিয়ে ২৯ মার্চ, ১৮৫৭ দেশীয় সিপাহীদের মাধ্যমে এই বিদ্রোহের সূচনা হলেও পূর্ব থেকেই এর পরিকল্পনার যোগসাজশ হয়েছিল এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতের হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত ভাবে এ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। তিতুমীর, শরীয়তউল্লাহ ও উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ বেরলভীর (১৭৮৬-১৮৩১) মৃত্যুর পরেও তাদের অনুসারীগণ সক্রিয় ভাবে এই সশস্ত্র রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল।[১২১]

সিপাহী বিদ্রোহে কতিপয় বঞ্চিত আরও ভারতীয় সামন্তপতি যোগ দিয়েছিলেন। ঠিক মদদকারী হিসাবে, সরাসরি নয়। তেমনই একজন হলেন মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর। তবে এক্ষেত্রে তার যুক্তি ছিল হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার।[১২২] ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবে না, এমনটি নয়। বিদ্রোহ হবে; তবে যে বিদ্রোহের জোরে একটি জাতির উত্থান বন্ধ হয়ে যেতে পারে সে বিদ্রোহ অতটা ফলপ্রসূ হয় না। ওহাবী, শরীয়তবাদী মুসলিমরা ছিল ইংরেজ এলার্জিতে আতংকগ্রস্ত। তারা এক পেশে ধর্মে এতটাই অন্ধ ছিল যে ইংরেজ বিধর্মীগণ (ওহাবী ভাষ্যে) যে ভারতবর্ষ এবং তার ভিতরে মাটির কন্যা বাংলাকে সহসা ক্রমান্বয়ে আপদমস্তক গ্রাস করে নিচ্ছে সেই দিকে তেমন নজর ও বিবেচনবোধ ছিল না। বিবেচনাবোধ থাকলে হয়ত বোঝতে পারত যে বৃহৎ সমুদ্রে যখন অজস্র জাহাজ একই লাইনে চলে তখন এক ধরণের একমুখী স্রোত সৃষ্টি হয় এবং সেটা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই সাম্যবস্থার দিক পরিবর্তন করা কিংবা সমুদ্র পথ থেকে সরিয়ে

দিতে হলে তৎসম শক্তি অপরিহার্য। কিন্তু দুভার্গ্যের বিষয় হল সেটা তখন মুসলিমদের ছিল না। তবে এই বিদ্রোহ, এই চেষ্টায় মুসলিমদের আত্মত্যাগের কাহিনী ইতিহাসকে করে ট্রাজেডিসম। যাইহোক, অবশেষে সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভূমিকা থাকলেও ইংরেজ সরকার এইজন্য প্রধানত মুসলমানদের বিক্ষোভকে দায়ী করে। তাঁদের ধারণা "সমগ্র বিদ্রোহটিই ছিল মুসলমানদের ক্ষমতা দখলের শেষ চেষ্টা"।[১২৩]

এরপর হতে শুরু হল মুসলিমদের অতলগ্রহে প্রবেশের আরেক অধ্যায়। সিপাহী যুদ্ধে শুধু বাংলার মুসলমনই ক্ষতিগ্রস্থ হন নি। সারা ভারতবাসী তাদের সর্বশেষ ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলে। এই পরাজয়ের পর আস্তে আস্তে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের মনোপরিবর্তনের সূচনাও তৈরি হয়। আর এই মনোপরিবর্তনই তাদেরকে আধুনিক করেছিল, পুরো বিশ্বকে শিরে তুলে নিতে রাস্তা দেখিয়েছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকার দমননীতি প্রয়োগ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। কিন্তু পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকার তাতে দ্বিমত পোষণ করে মুসলমানদের সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন।[১২৪] ফলে ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ সিভিলিয়ন উইলিয়াম উইলসন হান্টার মুসলমানদের সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান' গ্রন্থটি রচনা করেন।[১২৮] উক্ত গ্রন্থটিতে মুসলমান সমাজের সার্বিক চিত্র সঠিকভাবে তুলে ধরা না হলেও এটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছিল। হান্টার বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থাটিও তুলে ধরেন। যাহোক ১৮৫৭-এর পর ১৮৫৮ সালে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল প্রজা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নির্বিঘ্নে ধর্মকর্ম পালন, ন্যায় বিচার ও মানবিক অধিকার লাভের সুযোগ পাবে।[১২৫] মুসলমানগণ যে রাজ্য হারানোর ক্ষোভে সিপাহী বিদ্রোহ করেছিল সেটা ইংরেজরা মনে হয় বুঝতে পারলেন, আর উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে এই ক্ষোভ আরো প্রসারিত করতে পারে সেইজন্য সরকার মুসলিম শিক্ষার উপর বিশেষ মনোযোগ প্রদান করে। এর ফলে মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্রিটিশ সরকারের সাথে আপোষনীতিতে বাংলার পক্ষ হতে বুদ্ধিদীপ্ত কতিপয় আলোকিত ব্যক্তি তাদের আচরনের প্রকাশ ঘটায়। তাদের মধ্যে সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আব্দুল লতিফ, নওয়াব আলী চৌধুরী অগ্রগণ্য। এছাড়া উত্তর প্রদেশের সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮)ও যথেষ্ঠ তেজোদীপ্ত ছিলেন। ১৮৭৩-৭৪ থেকে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা আলোচনার বিষয়বস্তুতে গৃহীত হয় এবং তখন থেকে মোটামুটিভাবে বাংলার আধুনিক শিক্ষা সহকারে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উপজীব্য গাঢ় হয়।[১২৬] ১৮৭১ সালে গভর্নর জেনারেলের পরিষদ দুটি নির্দেশ জারি করে। প্রথমটি, সরকারি স্কুল ও কলেজে মুসলমানদের ধ্রুপদ ভাষা ও মাতৃভাষার স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এর পাঠ-কে সুবিন্যস্তভাবে উৎসাহিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মুসলমান এলাকায় স্থাপিত ইংরেজী স্কুলগুলিতে ইংরেজী শিক্ষায় পারদর্শী মুসলমান শিক্ষকদের ইংরেজী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ বাড়াতে হবে। এর মধ্যদিয়ে মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতিকে দুটি সমান্তরাল প্রক্রিয়ার প্রতি নির্দেশ করা হয়; প্রথাগত শিক্ষাকে উচ্চস্তরে নিয়ে আসা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাকে উৎসাহিত করা। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলমানদের নিজস্ব স্কুল গঠনে আর্থিক সহায়তার অঙ্গীকার এবং মুসলমানদের মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনাকে রাষ্ট্র কর্তৃক উৎসাহিত করা হয়।[১২৭] সময়টি তখন জর্জ ক্যাম্পবেলের।[১২৮] তিনি বাংলা সরকারের কাছে পৌঁছে

ক্যাম্পবেল সি. বারনার্ডের[১২৯] সহায়তায় ক্যাম্পবেল বাংলার জন্য নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। এই নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিলঃ সাধারণের জন্য সরলভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা এবং শিক্ষাকে আরও বাস্তবসম্মত করার জন্য সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার।[১৩০] ক্যাম্পবেল যখন বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন তখন তিনি বিস্ময়ের সাথে মুসলমানদের দূরাবস্থা প্রতক্ষ্য করেন এবং বলেন-The great Mahomedan population of Bengal, তখন পর্যন্ত ছিল 'especially without the means of instruction'[১৩১] হুগলির হাজী মোহাম্মদ মহসীন ১৮০৬ সালে বৃত্তিদানের জন্য যে বিরাট তহবিল রেখে গেছেন, তা বিতরণের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।[১৩২] ইংরেজী শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হুগলি কলেজ প্রথম থেকে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদেরকে বেশি আকৃষ্ট করে, যার নমুনা আমরা দেখতে পাই ১৮৫০ সালের এক পরিসংখ্যানে। যেখানে দেখা যায় ৪০৯ জন মোট ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্র ছিল মাত্র ৫ জন।[১৩৩] যাহোক, পরে ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দেশীয় বুদ্ধিজীবী নওয়াব আব্দুল লতিফের প্রচেষ্টায় হাজী মোহাম্মদ মোহসীন-এর ছাত্রদের জন্য বৃত্তি ও ফান্ডের অর্থ সঠিকভাবে কেবলমাত্র মুসলিম ছাত্রদের ব্যয়ের জন্য নিদের্শিত হয়। উক্ত সময়ে কলিকাতা মাদ্রাসার কার্যক্রমও পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। তখন কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসাবে একজন ইউরোপীয়কে নিয়োগ দেওয়া হয়। তার বেতন ছিল ১০০০ টাকা। কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তার উপর বর্তায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আর সেটা হল তিনি হবেন বঙ্গের সকল মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট।[১৩৪] এছাড়াও ১৮৭৪ এ গিয়ে বাংলা সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। তাছাড়াও সরকার যশোর, রংপুর, পাবনা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং সিলেট জেলা স্কুল বা জেলায় মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে যে অতিরিক্ত খরচ হবে সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখে। এ সম্পর্কে আব্দুল লতিফ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন, ...My representations, unceasingly made and pressed upon the government from 1861, for the proper administration of the princely endowment of the late Haji Mahomed Mohsin of Hooghly, attracted the notice of Sir George Campbell and Lord North. brook and his lordship had the kindness to make an additional grant of Rs.50,000 per annum to the cause of education in 1873 for purpose of liberating the funds of the Mohsin Endowment, which had up to that time been devoted to the support of the Hooghly College resorted to chiefly by Hindoo students.[১৩৫] বাংলার গভর্নর ক্যাম্পবেল বৈষয়িক চিন্তার সমন্বিত শিক্ষা প্রদানের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের সার্বিক উন্নতির চেষ্টাও করেন। তাছাড়াও তিনি (১৮৭০-৭৪) উচ্চ শিক্ষার জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ থেকে জনশিক্ষার অজুহাতে বৃহদংশ ছেঁটে দিলেন। তার আদেশে সংস্কৃত কলেজ, বহরমপুর কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ দ্বিতীয় শ্রেণিতে অবনমিত হয়।[১৩৬] দেশীয় ভদ্রলোকদের তত্ত্বাবধানে সরকারি কলেজ ও স্কুল ছেড়ে দিলেন, আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে করলেন শ্রেণিকরণ। তাছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থ ব্যয়ের সীমা-পরীসীমার গণ্ডিবদ্ধ করে দিলেন। সংক্ষেপে তাহলে মিলিয়ে দেখে নিতে হয় যে, সরকার বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল। বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ণ নীতি সমন্বিত নতুন শিক্ষানীতিতে অবশ্য উচ্চশিক্ষার প্রসার অবনমিত হয়নি বরং বাড়ছিল। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত খতিয়ান নিয়ে দেখা গেছে উচ্চশিক্ষার অবস্থা ছিল নিম্নরূপঃ[১৩৭]

বছর	কলেজ সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
১৮৭৩	৫৫	৪,৪৯৯
১৮৮১	৮৫	৭,৫৮২
১৮৮৬	১১০	১০,৫৩৮
১৮৯৩	১৫৬	১৮,৫৭১

লক্ষণীয় যে, কলেজের সংখ্যা বেড়েছে বিশ বছরে তিনগুন, ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে চারগুন। স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র এক চতুর্থাংশ, অবশ্য ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বেশি। সবচেয়ে পিছিয়ে পড়ে প্রাথমিক শিক্ষা। যার সঙ্গে বৃহৎ জনগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট। প্রাথমিক স্কুলের বৃদ্ধি নগণ্য এবং ছাত্রসংখ্যাও সেইরূপে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণি শহরের বাসিন্দা। তারা কায়িক পরিশ্রমে অন্ন সংগ্রহ অপমানবোধ করে। অতএব তাদের সন্তানরা যেমন সুযোগ পায়, তেমনি পিতামাতাও উচ্চশিক্ষা দান করে পেশাকরী বৃত্তি হিসাবে। এরকম অবস্থায় বাঙালি মুসলমান প্রাথমিক শিক্ষায় উনিশ শতকে কিছুটা অবহেলিত হয়। তবে উক্ত অবহেলাটুকু ইংরেজ সরকার আবার বেশিদিন জিয়িয়ে রাখেনি, তা বুঝা যায় লর্ড কার্জনের শিক্ষা সম্মেলনের বক্তৃতায়। যে বক্তৃতায় তিনি নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রদান করেন:

> ‘একটি শক্তিশালী দলের মতামতে এ ধারনাটি আর প্রচ্ছন্ন নয় যে, ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন এদেশে ভুল হয়েছিল এবং তার ফলাফলও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে’। ইরাসমাসকে যখন ভর্ৎসনা করা হয় এবং ডিম প্রসবের জন্য যার ফলে ইউরোপে ‘রিফরমেশন’ এসে যায়, তখন ইরাসমাস বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ’, আমি মুরগীর ডিম দিয়েছিলাম, কিন্তু লুথার সে তা দিয়ে মারমুখী বাচ্চা ফুটিয়ে দিল’। আমার বিশ্বাস অনেকেরই ইংরেজী ভাষা প্রচলন সম্পর্কে এই ধারণা। তাঁরা মনে করেন, তার দরুন এমন মনোবৃত্তি ও স্বভাব জন্মেছে যা উচ্ছৃঙ্খল, দুর্বিনীত, অসন্তুষ্ট এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাজদ্রোহী।[১৩৮]

এতে করে কার্জনের দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা ও তীক্ষ্নতা শিক্ষাক্ষেত্রটির গণ্ডি প্রসারিত করে দিলেন। ভাগ্যবান কয়েকজনের পরিবর্তে বিশাল জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির অধিকারীটিই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। একটি মুষ্টিমেয় শ্রেণির মধ্যে আধুনিক শিক্ষার আলোকে আবদ্ধ না করে বরং এই শিক্ষাকে তিনি করেছেন সর্বশ্রেণির সর্বজনের জন্য উন্মুক্ত। তার শিক্ষা উন্মুক্তকরণের উদ্দেশ্যটি জোড়ালো ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছিলেন–

"প্রাথমিক শিক্ষা বলতে আমি বুঝি দেশীয় ভাষার মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া, যার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে। আমি তাদের দলে যাঁদের বিশ্বাস, সরকার এ দায়িত্ব পালন করেন নি... আমার বিশ্বাস এ নীতিতে ভুল ছিল দুটি কারণে। প্রথমত, দেশি ভাষাগুলি এ উপমহাদেশের জীবন্তভাষা। ইংরেজী হয়েছে শিক্ষার ও প্রগতির বাহন অতি ক্ষুদ্র শ্রেণির জন্য, দেশের বৃহদাংশ লোকের নিকট তা বিদেশী ভাষা, যা তারা বোঝে নাও খুবই কম শোনে।...আমার দ্বিতীয় যুক্তি আরও ব্যাপক। ভারতের সবচেয়ে মহাবিপদ কী? এত সন্দেহ, কুসংস্কার, বিদ্রোহ, অপরাধ আর হ্যাঁ কৃষক অসন্তোষও জনগণের দুঃখভারের কারণ কী? শুধুমাত্র অশিক্ষা। আর এই অশিক্ষার ঔষধ কী? একমাত্র জ্ঞান। আমরা যে পরিমানে জনগণকে শিক্ষাদান করব আর তারা যত সুখী হবে, ততই তারা দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অঙ্গ হবে।"[১৩৯]

কার্জনের বাংলায় মুসলিম শিক্ষার উন্নতি আলোচনার পূর্বে ১৮৭১ সালে প্রাদেশিক সরকারী চাকুরিতে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা কী অনুপাতে ছিল তা থেকে বাঙালি মুসলিম আধুনিক শিক্ষার একটি অবয়ব দেখা যায়–

বিবরণ	ইউরোপীয়	হিন্দু	মুসলিম	মোট
অতিরিক্ত অ্যাসিট্যান্ট কনিশনার	২৬	৭	৩	৩৩
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	৫৩	১১৩	৩০	১৯৬
আয়কর অ্যাফেসর	১১	৪৩	৬	৬০
রেজিস্ট্রেশন বিভাগ	৩৩	২৫	২	৬৩
ছোট আদালতের জজ	১৪	২৫	৮	৪৭
সাব অর্ডিনেট জজ মুনসেফ	১	১৭৮	৩৭	২১৬
পুলিশ বিভাগ (ফেজেটেড)	১০৬	৩	০	১০৯
পূর্ত বিভাগ (ইঞ্জিনিয়ারিং	১৫৪	১৯	০	১৭৩
পূর্ত বিভাগ (সাব অর্ডিনেন্ট)	৭২	১২৫	৪	২০১
পূর্ত বিভাগ (অ্যাকউন্টস	২২	৫৪	০	৭৬
মেডিকেল বিভাগ	৮৯	৬৫	৪	১৫৮
ভি.আই.পি (শিক্ষা)	৩৮	১৪	১	৫৩

কাস্টমস সার্ভে ইত্যাদি	৪১২	১০	০	৪২২

সূত্র: বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০), বুক ক্লাব, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ.১৮১-১৮২

দেখা যাচ্ছে কভনন্টেড সিভিল সার্ভিস ও 'বিচার বিভাগে' (নেন রেগুলেশন জেলা) যথাক্রমে ২৬০ ও ৪৭ জন ইউরোপীয় অফিসার নিযুক্ত, যেখানে হিন্দু ও মুসলমান একজনও নেই। মোট ২১১১ জন কর্মচারীর মধ্যে ইউরোপীয় ১৩৩৮, হিন্দু ৬৮১ ও মুসলমান ৯২ জন। ইউরোপীয়-হিন্দু-মুসলমানের সরকারি চাকুরির আনুপাতিক হারের এই হিসেব দিয়ে উইলিয়াম হান্টার মন্তব্য করেছেন-

> "A hundred years ago, the musalmans monopolized all the important offices of state the Hindu accepted with thanks such crumbs as their former conquerors dropped from their table and English were represented by a few factors and clerks. The proportion of Muhammadans to Hindus, as shown above is now less than one-seventh. The proportion of Hindus to Europeans is more than one-half: the proportion of Musalmans to Europeans is less than one-fourteenth. The proportion of the race which a century ago had the monopoly of government, has now fallen to less than one twentythird of the whole administrative body... and infect, there is now scarcely a Government Office in Calcutta in which a Muhammadan can hope for any post above the rank of porter, Messenger, filler of inkpots and menders of pens."[১৪০]

উনিশ শতকের তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত বাংলার মুসলমানদের এই সামাজিক-অর্থনীতিক দূরাবস্থা এবং এর দরুন শিক্ষার অবধারিত ক্ষতির অন্যতম কারণ হিসাবে মুসলমানদের জাতিগত অভিমান, আধুনিকতা ও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের প্রতি ধর্মীয় গোঁড়ামিজনিত বিরূপ মনোভাব এবং হিন্দুদের তুলনায় নিজেদের পশ্চাদগতির ফলে নৈরাশ্য ও হীনমন্যতাবোধকে।

১৮৮২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতার ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন লর্ড রিপনের কাছে এক স্মারকলিপি প্রেরণ করে।[১৪১] এতে ভারতীয় মুসলমান, বিশেষত বাংলার মুসলমানদের অসন্তোষ ও প্রয়োজনসমূহের কথা প্রথম সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ হয়।[১৪২] সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে এই স্মারকলিপির অবদান ছিল ব্যাপক এবং ভারত সরকার কর্তৃক প্রাদেশিক সরকারসমূহের কাছে এর প্রচারের ফলে এই দৃষ্টি আকর্ষণের বিস্তৃতিও নিশ্চিত হয়। জনস্টোনের ভাষায় এই স্মারক লিপি assumed a kind of national significance এবং deeply pathetic as coming from the former conquerous and rulers of India.[১৪৬]মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য বৃটিশ সরকার স্থানীয় সরকারকে যে পরামর্শ প্রদান করে তা ১৮৮২ সালের ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন রিপোর্টে সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়েছে–[১৪৩]

১. সকল সরকারি কলেজ এবং স্কুলে মুসলমানদের ধর্মীয় এবং স্থানীয় ভাষা শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান।

২. প্রত্যেক মুসলিম প্রধান জেলাগুলিতে ইংরেজি স্কুল স্থাপন করা হবে। যোগ্য ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৩. ইংরেজি স্কুলের মত স্থানীয় ভাষায় স্কুলগুলিতে অর্থ সাহায্য দেওয়া। মুসলমানেরা 'গ্রান্ট ইন এইডস' এর সাহায্যে তাদের নিজস্ব স্কুল স্থাপন করতে অনুমতি প্রদান।

৪. স্থানীয় ভাষায় মুসলমানদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বিশেষ উৎসাহ দেবার ব্যবস্থা করা হবে। বাংলার সাধারণ স্কুলগুলিতে আরবী এবং ফারসীতে বিশেষ ক্লাস নেবার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই সুপারিশমালার ভিত্তিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মুসলমান শিক্ষার্থীদের সংখ্যা সন্তোষজনক না হলেও মোটামুটি বৃদ্ধি পায়।[১৪৪] ১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার ১৮৮৫ সালে কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই সব সিদ্ধান্তে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণের অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের প্রয়োজনে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান ছাড়াও তাদের ধর্মীয় শিক্ষাকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। মুসলমানদের জন্য ধর্মভিত্তিক শিক্ষানীতি গ্রহণের পিছনে মুসলমান নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৮৫ সালের ১৫ই জুলাই ভারত-সারকার জনস্টোনের মূল্যায়নের সাথে একমত হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয়, ...The very fact that a memorial like that under notice has been presented with the concurrence and approval of so many leading gentlemen in Bengal and elsewhere indicates that the Muhammadans have themselves come to oppriciate fully the necessity of moving with the times.[১৪৫] ১৮৮৫ সালের গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে মুসলমান সমাজে ধীরে ধীরে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে, নিম্নের পরিসংখ্যানে তা লক্ষ্যণীয়। ১৮৯০ সালে এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা:[১৪৬]

অনগ্রসর পূর্ববঙ্গ-১৮৯০

জেলা	সংখ্যা	জেলা	সংখ্যা
ঢাকা	১১	ময়মনসিংহ	৩
বরিশাল	২	ত্রিপুরা	৫
ফরিদপুর	০	নোয়াখালী	০
চট্টগ্রাম	৪	সিলেট	১
		সর্বমোট:	২৬ জন

১৮৯১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে বাংলার মুসলমান সমাজে ইংরেজী জানা লোকদের সংখ্যা নিম্নোক্তভাবে দেখানো হয়েছে। এখানে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের তুলনামুলক চিত্রও রয়েছে।[১৪৭]

	মুসলিম			হিন্দু		
	শিক্ষিত ও অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	ইংরেজী জানা	মোট শিক্ষিত সংখ্যার মধ্যে ইংরেজী জানার হার	শিক্ষিত ও অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	ইংরেজী জানা	মোট শিক্ষিত সংখ্যার মধ্যে ইংরেজী জানার হার
উত্তরবঙ্গ	১,৭২,৮৬৮	১,২০৯	০.৬৯	১,৩৬,৭৪৭	৪,৬৫০	৩.৪০
পূর্ববঙ্গ	৩,৫৯,৯৭৫	৩,৩১৩	০.৯২	৫,৬৫,৫০৬	১৭,৪৩৪	৩.০৮
পশ্চিমবঙ্গ	১,৪৬,৬৯৮	৫,৬৮৯	৩.৮৯	৮,৮৫,৭১১	৪৭,৯১২	৫.৪০
মোট	**৬,৭৮,৬৯৮**	**১০,২১১**	**১.৫০**	**১৫,৮৭,৯৬৪**	**৬৯,৯৯৬**	**৪.৪০**

সূত্রঃ General Report on Public Instruction in bengal, 1884-1885, Calcutta, 1885, P.118-123

উক্ত সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, মোট শিক্ষিত মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে ইংরেজী জানার হার ছিল ১.৫০ ভাগ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল ৪.৪০ ভাগ। যদিও মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজী জানা মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হার ছিল। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে এই হার ছিল ০.৯২ এবং উত্তরবঙ্গে ছিল ০.৬৯ ভাগ। যদিও উত্তরঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা হিন্দুদের থেকে অনেক বেশি ছিল। উনিশ শতকের শেষপাদে বাংলায় মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় মুসলমান শিক্ষার উন্নতি তেমন উল্লেখযোগ্য পরিমানে না হলেও কিছুটা হয়। ১৮৮৬ সালের জনশিক্ষা কমিটির বিশেষভাবে মুসলিম শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করার ফলে বার্ষিক প্রতিবেদনে মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কীয় বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বা সহকারে প্রকাশ করা শুরু হয়। যে গুরুত্ব একান্ত মুসলিম স্বতন্ত্রতাই ব্যাখ্যা করত।[১৪৮] এর ফলে শিক্ষিত জনমানসে মুসলিম শিক্ষার সমস্যা ও অগ্রগতির বিষয়টি আরও স্পষ্টতর হয় ১৮৭৪ সালে যখন আসামকে বাংলা প্রদেশ থেকে পৃথক করা হয়। যার ফলে বাংলার অর্থ সাহায্যের পরিমান বৃদ্ধি পায়। ঠিক সেই সময় বাংলায় যখন অর্থ উপার্জন ক্ষমতা মুসলিমদের সাধ্যের বাইরে চলে যায় তখন অর্থকরী ফসল পাট আসে বাঙালিদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে। ১৭৫৭ সালের পর রাজদরবারের নিমিত্তে অর্থ প্রাপ্তির রাস্তা বন্ধকরণ, ১৭৬৫ সালের পর বড় বড় পদস্থ নিয়োগে ও প্রাপ্ত নিয়োজিত কর্মচ্যুতি, ১৮০০-১৮১৩ এর মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ না করার ফলে ১৮৩৫ সালে সরকারি চাকুরি ও অফিস আদালত হতে বঞ্চিত হয়ে মুসলিম সমাজ হয়ে পড়েছিল আর্থিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত জাতিরূপে। এরপর হতে ইংরেজী শিক্ষা নেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও অর্থের অভাবে মুসলিম ছাত্ররা ইংরেজী পড়তে পারত না, এদিক দিয়ে বৃটিশবিরূপ মনোভাবের মধ্যে পতিত হয়ে বৃটিশবিরাগভাজন মুসলমান সম্পূর্ণ দিশেহারা এমতাবস্থায় পাট যেন শুধু শস্য ছিল না ছিল স্বর্ণ। ১৮৫৫ সালে শ্রীরমপুরের সন্নিকটে বিশরা নামক স্থানে এদেশের প্রথম পাটকল স্থাপনের[১৪৯] ফলে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে পাটের তৈরি হস্তশিল্প ধ্বংস হয়েছিল বটে। কিন্তু পরবর্তীকালে পাটকলের সংখ্যা বাড়তে থাকলে দেশে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে ১৮৭২-৭৩ সালের পর থেকে পাট উৎপাদন বেড়ে গেলে মুসলিম চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই সময় বাংলায়

প্রায় এক মিলিয়ন একর জমিতে পাটের চাষ হয়েছিল এবং পরবর্তী বছরগুলিতে পাটচাষের পরিমান এবং পাটের মূল্য ও বহুগুনে বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৪ সালের দিকে পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্তানিও ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। পাটের এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মূলত মুসলিম প্রধান উত্তর ও পূর্ববঙ্গের চাষীরাই মিটিয়ে ছিলেন।[১৫০]

অর্থকরী ফসল পাট চাষের মাধ্যমে এ অঞ্চলের চাষীগণ নগদ অর্থের মুখ দেখতে পায়। পাশাপাশি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে উনিশ শতকের শেষার্ধে গ্রামাঞ্চলে একটি মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণির সৃষ্টি হয় এবং এই মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণির অধিকাংশই ছিল মুসলমান।[১৫১] এভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব ও পাটের অর্থনীতির বিকাশ লাভে মধ্যসত্ত্বভোগী ও ধনী কৃষকদের সমন্বয়ে গ্রামীণ মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ঘটে। ফলে মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারে দীর্ঘদিনের প্রতিবন্ধক যে দারিদ্র্য ধীরে ধীরে অপসারিত হতে থাকে এবং গ্রামীণ মধ্যবিত্তগণ তাঁদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে শুরু করে। মুসলমান কতিপয় নেতার শিক্ষা প্রচারাভিযান, সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা তদুপরি সরকারের নীতির সাথে মুসলিমদের আপস, গ্রামাঞ্চলে মুসলমানদের আর্থিক উন্নতি প্রভৃতির কারণে বাংলার মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্বে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা ক্রমপ্রসারিত হতে থাকে এবং প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষার হার পরিমিত না হলেও তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। নিম্নের সারণি থেকে তা বুঝা যায়।[১৫২]

শিক্ষার স্তর	১৮৭৩-১৮৭৪		১৮৮৪-১৮৮৫		১৮৯৩	
	মুসলিম ছাত্রসংখ্যা	মোট ছাত্রসংখ্যায় শতকরা হার	মুসলিম ছাত্রসংখ্যা	মোট ছাত্রসংখ্যায় শতকরা হার	মুসলিম ছাত্রসংখ্যা	মোট ছাত্রসংখ্যায় শতকরা হার
আর্টস কলেজ	১৩৭	৯%	১২৯	৪.৬	২৮৬	৫.২
পেশাগত কলেজ	৮১		৩৫	৩.৭	২৭	২.৫
নর্মাল স্কুল	৩৬১		৭১	৬.০	২৪২	১০.১
মাদ্রাসা	৩১৪	১০০%	১৩৮৬	১০০.০০	২৮৩০	৯৮.৯
উচ্চ ইংরেজী স্কুল	১৯০৯	১০.০০%	৫০৯৫	৯.৪	৮৬৮৭	১০.৮
মধ্য ইংরেজী স্কুল	২২৭৬	১০.৬০%	৬২২৩	১২.০৯	৯২৫৯	১৪.৮
উচ্চ প্রাথমিক	৭০১৭৪	২৩.৫%	১৭৫৭৭	১৬.০১	৩১৬৪৪	২১.৪
নিম্ন প্রাথমিক			৩৬৯৬১৩	৩২.০৫	২৯৫৪৩৫	২৮.৪
কারিগরী বিদ্যালয়	*	*	১৮৯	১৪.১	৫০৭	১৬.২
মধ্যদেশীয় স্কুল	৫৮৭৩	১৩.০%	৮৮৯৩	১৩.২	১০৭২০	১৬.৮৬
মোট:	৮১১২৫	২০.৭৬%	৪০৯২১২	২৮.৩	৩৫৯৬৩৭	২৫.৬

সূত্রঃ General Report on Public Instruction in Bengal 1873-1874, Calcutta, 1875, P.63, General Report on Public Instruction in Bengal, 1884-85, Calcutta 1884-1885, P.118, General Report on Public Instruction in Bengal, Calcutta, 1893-94, P. 134.* তথ্য পাওয়া যায় নি।

উক্ত পরিসংখ্যানে সমগ্র বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মুসলিম শিক্ষার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ই.ডি. রস[১৫৩]-এর সভাপতিত্বে মুসলমানদের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বিশেষজ্ঞদের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এর সদস্যরা ছিলেন খান বাহাদুর মৌলভী সেরাজুল ইসলাম[১৫৪] খান বাহাদুর এ. এফ. এম আবদুর রহমান,[১৫৫] মৌলভী আবদুল করিম, মৌলভী ইব্রাহীম,[১৫৬] মৌলভী আবদুল লতিফ[১৫৭] এবং মৌলভী ইসহাক।[১৫৮] এই সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী পেডলার বাংলার সরকারের কাছে কিছু প্রস্তাব পেশ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল মক্তবগুলিকে ক্রমান্বয়ে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া। তবে এতে ইহজাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি মুসলমান শিশুদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষারও ব্যবস্থা রাখা হয়। ১৯০৪-এরউক্ত সম্মেলনে মফস্বল এলাকা ও কোলকাতা শহরের মক্তবগুলির জন্য পৃথক পৃথক পাঠক্রমের সুপারিশ করে। ১৯০৪ সালের সম্মেলনের সুপারিশমালা অনুযায়ী পেডলার বাংলার সরকারের কাছে যখন যেরকমই প্রস্তাব করুন না কেন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের কাছে নিজেকে জনপ্রিয় রাখা। ব্যাপারটি ঠিক এই রকম যে প্রচলিত মক্তবগুলিকে বিভাগীয় মান অনুযায়ী একটি উন্নততর আধুনিক মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা, যে স্তরে উর্দু-ফার্সি পুস্তকের ভিত্তিতে পাঠদান হবে এবং এর সমূহ তত্ত্বাবধানে থাকবে মৌলভী ও তার অধীনে পাঠদানে ব্যস্ত মিয়াজী। যে মুসলমানকে একসময় শূন্যের কোটায় নিয়ে আসল বৃটিশগণ, সেই মুসলমানকে আবার অসীমে নেওয়ার এই যে প্রচেষ্টা তা কিন্তু অততটা সুখের নয়; বরং তা ছিল এক ধরনের স্বার্থের খেলা। ইংরেজগণ যখন মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয় তখন তারা ভারতরাজ্যে, তদুপরী বাংলায় যত ধরনের নতুন নতুন নিয়ম চালু করত হিন্দুরা তা লুফে নিত। কিন্তু শিক্ষিত হতে হতে হিন্দুদের মধ্যে এমন একটি স্বতন্ত্রজাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হল যে তারা তখন সরকার বিরোধী হতে লাগল। ঠিক এমতাবস্থায় অতলের বাসী শূন্য থালা বিছানো মুসলমানদের এক-দুটি করে পয়সা নয় বরং এক সাথে একশ পয়সা ছিটানোর প্রয়োজন বুঝি বোধ করল ইংরেজরা।

বাঙালি হিন্দুদের তুলনায় বাঙালি মুসলিমরা অন্যান্য অনেক কিছুর মত শিক্ষা ক্ষেত্রেও ছিল পাশ্চাৎপদ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯০১ সালে কলিকাতাতেই শিক্ষার জন্য যা ব্যয় হতো তা ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলায় মোট শিক্ষা ব্যয়ের চেয়েও বেশি। অধিভুক্ত বাংলায় ১৯০৩-১৯০৪ সালে সাধারণ কলেজগুলিতে মোট ৮০০৯ জন ছাত্রের মধ্যে ৪৬৩ জন, বি.এ শ্রেণির ২৮৪ জন ছাত্রের মধ্যে ৭৩ জন এবং এম.এ শ্রেণির ৭৯ জন ছাত্রের মধ্যে ৫ জন ছিল মুসলিম।[১৫৯] ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে সরকার এবং তার মুসলিম মিত্রদের সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায়। সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে দূর্বল কিন্তু সংখ্যায় শক্তিশালী বাঙালি মুসলিমদের পক্ষে নতুন এ রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে গুরুত্ব উপলব্ধি করতে বেশি বেগ পোহাতে হয়নি। বস্তুত শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি বঙ্গবিভাগের উল্লেখযোগ্য স্থায়ী সুফলের একটি হিসেবে অবশ্যই গণ্য হতে

পারে। তাই বাংলা ভাগ করে এই নতুন প্রদেশ সৃষ্টির মাধ্যমে এখানে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল তা নিম্নের সারণি থেকে দেখা যোতে পারে–[১৬০]

বছর	সর্বমোট ছাত্র	হিন্দু	মুসলমান
১৯০৫	৩০৫	২২৩	৮২
১৯০৬	৩০৮	২১৩	৯৪
১৯০৭	৪২২	২৯৯	১২২
১৯০৮	৪১২	৩০১	১১১
১৯০৯	৩৯৮	২৮৭	১১১
১৯১০	৪১০	২৭৯	১৩১
১৯১১	৪৬৪	৩২১	১৪৩
১৯১২	৪৭২	৩৩৯	১৩২
১৯১৩	৪৫০	৩০৪	১৪৫
১৯১৪	৪৫৩	৩১০	১৪৩
১৯৫৪	৪৫৩	৩১৯	১৩৪

সূত্রঃ Z.H. Zaidi, The Partition of Bengal and its Annulments (1902-11), Adarsha Press, Calcutta, 1935, P.113-149

উক্ত পরিসংখ্যানে মুসলমান ছাত্রদের ক্রমশ বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়। তবে এই সংখ্যা হিন্দু সম্প্রদায়ের চেয়ে কম হলেও উৎসাহব্যঞ্জক ছিল বলা যায়। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলার জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক আর্চডেল আলের[১৬১] তত্ত্বাবধানে বাংলা এবং আসামের মুসলমি প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মক্তবের পাঠ্যসূচী উন্নয়ন ছাড়াও এই কমিটি মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার নানা বিষয়ে বিবেচনা করে। পরের বছর এ যাবৎ যত প্রস্তাব পেশ করা হয় তন্মধ্যে আর্চড্যাল আলের প্রস্তাব ছিল সুযোগ থেকে বৃহত্তর। তার প্রস্তাবটি ছিল এই রকম যে, সাহায্যপ্রাপ্ত মক্তবসমূহে শুধু সাহায্যের পরিমান বাড়ালেই চলবে না, বরং সকল মক্তবকেই সরকারের অর্থ সাহায্য দিতে হবে।[১৬২] মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষাকে জনপ্রিয়ও উৎসাহিত করতে সক্ষম বিশেষ পরিদর্শকদের সংখ্যা বাড়াতে হবে।[১৬৩] আদর্শ মক্তবের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং যেসব জেলায় মক্তবের সংখ্যা অনেক সেখানে একটি গুরু প্রশিক্ষণ স্কুলকে মুসলিম মিঞাজীদের শিক্ষার স্কুলে রূপান্তর করতে

হবে।[১৬৪] সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মক্তবসমূহে ব্যবহারের জন্য নতুন পাঠ্যসূচী উপস্থাপন করা হয়। মূলত এটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে মক্তব পাশ করা ছাত্ররা যে কোন উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে।[১৬৫] নতুন স্কুল এবং পাঠ্যসূচীর জন্য বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায় উল্লেখযোগ্য হারে। এই সংখ্যা ১৯০৬ সালে ছিল ৩,১৭,৬৯৯ জন এবং তা ১৯১২ সালে দাঁড়ায় ৪,৫১,১৫৭ জনে।[১৬৬] প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মান উন্নত হওয়ার ফলে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকে আর এরই ফলশ্রুতিতে কলেজ পর্যায় শিক্ষা ব্যবস্থার মানের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষকের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। যেখানে ১৯০৬ সালে ঢাকা কলেজে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১২ জন, সেখানে ১৯১১ সালে শিক্ষকদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৩০ জনে।[১৬৭] চট্টগ্রাম কলেজে ৫ থেকে ১৯১২-এ গিয়ে ১৪-তে রাজশাহী কলেজে ৮ জন শিক্ষক থেকে ১৯১১ সালে গিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২০ জনে। তাছাড়া বিভিন্ন কলেজে গ্রান্টস হিসাবে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থাও করা হয়। যেমন: ময়মনসিংহ কলেজকে ২৩,০০০ টাকা, জগন্নাথ কলেজকে ২৭,০০০ টাকা, কুমিল্লা কলেজকে ৩০,০০০ টাকা, পাবনা কলেজকে ২৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়।[১৬৮] পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের পূর্ববঙ্গে নেওয়া এসমস্ত নতুন নতুন স্কিমগুলি বাস্তবায়ন করার ফলে উক্ত প্রদেশভুক্ত কলেজগুলিতে ছাত্র সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ১৯০৬-১৯০৭ সালে আর্টস কলেজগুলিতে ছাত্র সংখ্যা যেখানে ছিল ১১৯৭ জন সেখানে ১৯১১-১২ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২,৯৮৯ জনে।[১৬৯] এভাবে উন্নয়নের ধারা চলছিল প্রবাহমান। যেতে যেতে বিশ শতকের শুরুর দিকে বাংলার বিভিন্ন বিভাগের মুসলমান জনসংখ্যার মধ্যে ইংরেজী শিক্ষিতের হার নিম্নরূপ:[১৭০]

বিভাগ	পুরুষ	মহিল
ঢাকা	৩.৭	.০৩
বর্ধমান	১২.৪	.০৪
পেসিডেন্সি	৭.৯	.০১
চট্টগ্রাম	৪.৬	.০৪
রাজশাহী	৩.৪	.০২

সূত্র: পূর্ব বাংলা ও আসাম শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট, ১৯০৭-০৮, ১৯১১-১২, প্রথম খন্ড, পৃ. ২

উক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, বর্ধমান এবং প্রেসিডেন্সিতে ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা তুলনামুলকভাবে বেশি। অন্যদিকে পূর্ববাংলার বিভাগগুলিতে অপেক্ষাকৃত কম। ১৯১১ সালে গিয়ে ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা কিরূপ ছিল তা দেখার জন্য নিম্নোক্ত সারণিটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন:[১৭১]

বিভাগ	পুরুষ	মহিলা
প্রেসিডেন্সি	৯৬.১ জন	৩.২ জন
বর্ধমান	১৫০.৪ জন	৭.০ জন
ঢাকা	৬০.১ জন	১.৫ জন
চট্টগ্রাম	৮০.৩ জন	২.২ জন
রাজশাহী	৭৬.৭ জন	১.৭ জন

সূত্রঃ Report on the Progress of Education, Eastern Bengal and Assam, 1906-1908, Vo.I, P.28

উক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বর্ধমান এবং প্রেসিডেন্সিতে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের সংখ্যা বেশি। অপরদিকে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী বিভাগে ঢাকার তুলনায় ইংরেজী শিক্ষিতের হার বেশি। ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গভঙ্গ রদ পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগের অধস্তন পর্যায়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে বিরাট অসমতা ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কর্মক্ষেত্রের অবস্থান মুসলমান বনাম হিন্দু ছিল একই রকম। প্রতি ৫ স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে ৩৩৭ জন হিন্দুর বিপরীতে মুসলমান ছিল মাত্র ১১২ জন।[১৭২] এভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের বিশেষ প্রয়োজন মিটাবার জন্য ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তাদের এই সাহায্য সহযোগিতার হাতকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল আমীর আলী, আবদুল লতিফ, ঢাকার নবাব আহসান উল্লাহ, আবদুল করিম, মুহাম্মদ ইব্রাহীম, সৈয়দ শামসুল হুদা, সেরাজুল ইসলাম, সৈয়দ আমীর হোসেন, দেলওয়ার হোসেন আহমদ, আবদুল হামীদ প্রমুখ যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটিতে কাজ করে সরকারকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন বা কলকাতার মুসলিম সাহিত্য সমিতির মতো মুসলমানদের সংগঠনগুলি একই ধরনের অবদান রাখে। অনেক সময় তাদের পরামর্শে নতুন পদক্ষেপেরও সূচনা হয়। নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র সংগঠনও স্বধর্মীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে অকৃত্রিমভাবে চেষ্টা করে। বাংলার প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার তার স্বল্পস্থায়ী কার্যকালে শিক্ষার উন্নয়নে খুব একটা কিছু করে উঠতে পারেন নি বটে, কিন্তু তার সূচিত সমুদয় নীতিমালা পরবর্তী ঘটনা প্রবাহেরও গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রথম জনশিক্ষা পরিচালক হিসাবে ফুলার বেছে নেয় আই.ই.এল (Indian Educational Service)-এর হেনরি শার্পকে। সুদক্ষ, দৃঢ়চিত্ত এবং অত্যুৎসাহী হেনরি শার্প শীঘ্রই বাঙালি সমাজে পরিচিত হয়ে উঠে তাঁর মুসলিমঘেষানীতি ও পূর্ববঙ্গনীতির কারণে। লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পূর্ণ সমর্থনের ভিত্তিতে হেনরি এ প্রদেশের স্কুল কলেজগুলিতে গুনগতমান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালান, তদুপরী মুসলমানদের চাহিদানুযায়ী তিনি তাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচী হাতে নেন। যেমন; প্রাথমিক পর্যায় থেকে স্নাতকোত্তর ও পেশাভিত্তিক শিক্ষাস্তরে (proffessional education) অধিকতর বৃত্তির ব্যবস্থাসহ সরকারিও অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে ৮ শতাংশ আসন মুসলিম ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ করেন। বৃহৎ মাদ্রাসাগুলির জন্য আরও বেশি

করে সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করেন, গোটা দুই মুসলিম উচ্চবিদ্যালয়কে সাহায্য প্রদান করেন এবং বেশি করে হোস্টেল নির্মাণের কাজ শুরু করেন।[১৭৩] মুসলিম শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকার এই সময়ে আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ঢাকায় একটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা, জনশিক্ষা ও পরিদর্শন দপ্তরের সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন, মাদ্রাসা পাঠ্যসূচীতে সেক্যুলার বিষয় অন্তর্ভুক্তকল্পে মাদ্রাসা কারিকুলামের সংস্কার।[১৭৪] সরকারের এইরকম নীতির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে যে বৃদ্ধি পেয়েছিল নিম্নোক্ত সারণির মাধ্যমে তা অবলোকন করা যায়:[১৭৫]

বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সকল ধর্মের মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুসলিম শিক্ষার্থীদের হার	
	১৯০৭	১৯১২
আর্টস কলেজ	৮.১	১০.৪
প্রফেশনাল কলেজ	৭.৫	১০.৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৪.০	১৯.০
মিডল ভার্নাক্যুলার স্কুল	১৬.৮	১৭.০
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০.০	২০.৫
স্পেশাল স্কুল	৪২.১	৬৬.২
মোট	১৯.৫	২১.৫

সূত্র: পূর্ব বাংলা ও আসাম শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট, ১৯০৭-০৮, ১৯১১-১২, প্রথম খন্ড, পৃ.১,৩৪

১৯০৫-১৯১১ এই স্বল্পস্থায়ী বাংলা ও আসাম কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থার শিক্ষানীতির উজ্জ্বলতম অর্জন ছিল ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সম্পর্কিত ঘোষণা। দুই বাংলার পূর্ণকেন্দ্রীকরণকে বঙ্গীয় মুসলিমদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ঢাকায় অদূর ভবিষ্যতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। বড় লার্ট লর্ড হার্জিঞ্জ ১৯১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় একটি মুসলিম প্রতিনিধি দলের কাছে সর্বপ্রথম এ পরিকল্পনার প্রকাশ্য ঘোষণা দেন। মূলত মুসলিম সমাজের আগ্রাসী আশংকা ও বৃটিশদের প্রতি ক্ষোভকে প্রশমিত করাই ছিল ইংরেজ সরকারের প্রথম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় যে উদ্দেশ্যটি তারা সামনে রেখে কাজ করেছিল সেটি ছিল উত্থিত হিন্দু জাতীয়তাবাদকে নিজেদের ক্ষমতার নিকট পৌছতে দিতে না পারার এক অসম ফাঁদ।

১৯১২ সালের পরবর্তী তিন দশক ছিল বাংলা তথা ভারতের রাজনীতির অঙ্গনে উত্তাল ঘটনা প্রবাহের যুগ। এই উত্তাল ঘটনা প্রবাহ মুসলিম শিক্ষার আধুনিকতার ধারাকে ব্যাহত করেছিল, তবে এর দায় কিন্তু মুসলিমদেরই । সে সময়ে সরকার এবং জনগণ উভয়েই রাজনৈতিক ইস্যু ও আন্দোলন নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকার দরুন শিক্ষা সম্পর্কে কিছু ভাবার অবকাশ তাদের ছিল না। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ভারতে নতুন রাজনৈতিক কাঠামো প্রবর্তিত হয়। একই সাথে বাংলার রাজনৈতিক বিধি ব্যবস্থায়ও বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। শাসন সংস্কারের ফলে দশ লক্ষ লোক নতুন করে ভোটাধিকার লাভ করে। এদের অনেকেই ছিল মুসলিম। এই ভোটাররা সর্ববৃহৎ আইন পরিষদে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচিত করত। এভাবে যেসব মুসলিম সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসতেন, তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল নতুন সংবিধানে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে নিজ সম্প্রদ্রায়ের মধ্যে ব্যাপক জনসমর্থন আদায়ের ভিত্তি তৈরি করা। মুসলিমগণ তখন যতবেশি করে শিক্ষা ও রাজনীতি সচেতন হচ্ছে ততই হিন্দু সম্প্রদ্রায়ের সাথে তিক্ততা বাড়ছে। সাম্প্রদায়িকতার এই তিক্ততা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদগণকে ঠিক বোঝা যেত না; কেননা তারা এই এক আবার এই আরেক। তাছাড়া উত্তর ভারতের মুসলিমরা ছিল একটু আগ্রাসী। এই রকম অস্থির সংকট অবস্থায় বাংলা ছিল বেশ বিপর্যস্ত। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাধ্য করেছিল ইংরেজ সরকারকে আর্থিক ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ এবং সেই সাপেক্ষে মেনে চলতে। শিক্ষাক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন ভারত সরকার স্যাডলার কমিশনের শুধু যেসব সুপারিশের জন্যই আইন প্রণয়নের প্রস্তুতি নিয়েছিল, যেগুলি বাস্তবায়নে কোন অর্থ ব্যয়ের দরকার হবে না। কমিশনের প্রস্তাবিত সংস্কারের আর্থিক দায়িত্ব এড়ানোর জন্য ভারত সরকার উল্লিখিত আইন পাসের পর পরই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তর করে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরকে দায়িত্ব এড়ানোর সহজ পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। আর প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে প্রাদেশিক সরকারের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র সংশোধনের গুটিকয়েক দায়সারা উদ্যোগ নিয়েছিল মাত্র। তারই ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত একটি সংস্থা সিনেটে সরকার মুসলিম প্রতিনিধিত্ব বাড়িয়ে দেয়। অনুরূপ ভঙ্গিতে ১৯৩০ সালে হোসেন সোহরাওয়ার্দীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করে সরকার মুসলিম ক্ষোভ প্রশমনের আরও একটি প্রয়াস চালায়। যাহোক অবশেষে ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ ভারতীয় আইন পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্ট (নং XIII), ১৯২০ পাস করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী অ্যাক্ট তৈরি করা হয়। ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে।[১৭৬] প্রতিষ্ঠাকালে কলা, বিজ্ঞান এবং আইন অনুষদে যথাক্রমে ১২টি বিভাগ ছিল। বিভাগগুলি ছিল- (১) ইংরেজী, (২) সংস্কৃত এবং বাংলা, (৩) আরবী এবং ইসলামিক স্টাডিজ, (৪) ফার্সী এবং উর্দু, (৫) ইতিহাস, (৬) অর্থনীতি এবং রাজনীতি, (৭) দর্শন, (৮) গনিত, (৯) পদার্থবিদ্যা (১০) রসায়ন (১১) আইন এবং (১২) শিক্ষা। শুরুতে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮৭৭ জন। এদের মধ্যে ১৭৮ জন মুসলিম।[১৭৭] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজের জন্যে উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির একটি বিজয় সুদৃঢ় হয়।

মধ্যবিত্তশ্রেণির এই বিজয় এরপর থেকে আর থামে নি। মুষ্টিবদ্ধ হাতে উচু কণ্ঠে সবসময় বলেছে নিষ্পেষিত হইওনা; রুখে দাঁড়াও। বাংলার মুসলিম গ্র্যাজুয়েটদের একটি তালিকা প্রদান করলে উচ্চ শিক্ষায় মুসলিমদের অগ্রসরতা সম্পর্কে একটি ধারনা পাওয়া যায়-

প্রতিষ্ঠান	**বাংলার মুসলিম গ্র্যাজুয়েট**	
	১৯২০-১৯২২	১৯২৬-২৭
কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়	২,১৭৫ জন	৩,৪১৯ জন
বৃত্তিমূলক কলেজ	৪৪০ জন	৮৮৬ জন

সূত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯২১

১৯২০-২৪ এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬ জন অধ্যাপক ও রিডারের মাত্র ৪ জন ছিলেন মুসলিম। সেহেতু কোর্টের ৪০ জন মুসলমানের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল চ্যান্সেলর মনোনীত। এই ৪০ জনের মধ্যে ৩১ জনই ছিলেন 'খান বাহাদুর' এবং 'খান সাহেব' খেতাব প্রাপ্ত। প্রথম নির্বাহী কাউন্সিলের মোট ১৬ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন এবং প্রথম অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের মোট ১৯ জনের মধ্যে ৫ জন ছিলেন মুসলিম।[১৭৮] ১৯২১ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম যখন শুরু হয় তখন মোট ৬০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৮ জন ছিল মুসলিম। আবার উক্ত ৮ জনের মধ্যে ৬ জনই ছিল আরবী ও ফারসীর শিক্ষক।[১৭৯] পঁচিশ বছর পরে ১৯৩৫-৩৬ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ১২৪ জনের মধ্যে ২৪ জনে। সুতরাং অবশ্যই এতে উন্নতি হয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও দেখা যায় গতানুগতিক সেই আরবী, ফার্সী ও উর্দু বিষয়ের শিক্ষক ১৪ জন আর বাকী ৪ জান আইন ও শিক্ষা বিষয়ের। এছাড়া ৪৫ জন বিজ্ঞান ও অর্থনীতির শিক্ষকের মধ্যে মুসলমান ছিল মাত্র ১ জন। ভারসাম্যহীনতা ছাত্রদেরকে যেন ছুঁয়েছিল। ১৯২০ সালে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল মুসলিম ছাত্র থেকে৫ গুন বেশি। ১৯৩৭ সালে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে মোট ১৭৬৪ জনের মধ্যে ৩৯৫ জনে।[১৮০] ১৯৩৭ সালের নির্বাচন আবারও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা যা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুসলিম শিক্ষায় জরুরী সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজকর্ম স্থগিত হয়ে পড়ে। বাংলা যেন তার অগ্রবর্তী পদক্ষেপকে গুটিয়ে নিতে চলেছে ঠিক তদ্রুপ সময় সচেতন বাংলার মুসলিম জাগরণের নায়কগণ আবারও আশার আলো ফুঁটাতে মরিয়া হয়ে উঠল। বাঙালি মুসলমানদের সার্বিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। বিশের দশকের শুরুতে মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের অধীনে শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব প্রাদেশিক আইন পরিষদের কাছে দায়ী একজন দেশীয় মন্ত্রীর হাতে অর্পন করা হয়। এ নতুন ব্যবস্তাপনায় প্রথমদিকে সচেতন জনসমাজে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল বটে; তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। নতুন প্রবর্তিত শাসন সংস্কারের আওতায় ভোটাধিকারের সীমানা বেশ খানিকটা বাড়নো হয়েছিল, তবে এটা সত্য যে এই ধরনের গণরাজনীতির (mass politics) অভ্যুদয় জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদ্রায়িক দ্বন্দ্ব সংঘাত বৃদ্ধিকে অনিবার্য করে তুলেছিল। বিশেষ করে তৎসময়ের বাংলায় বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি

ছিল এর প্রতিকূলে। মানুষের জীবনে শিক্ষা উন্নতি-অগ্রগতির হাতিয়ার। পছন্দসই কর্মসংস্থানেরও সদর রাস্তা। কাজেই নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থাধীনে শিক্ষাখাতের জন্য নির্ধারিত সীমিত সহায় সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার জন্য হিন্দু-মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্নিবার্যভাবেই তীব্রতর হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে ১৯৩৬-৩৭ সালে বাংলায় শিক্ষা খাতে ব্যয়কৃত অর্থের একটি সারণি লক্ষ্য করলে দেখা যায় এক সম্প্রদায়ের জন্য ব্যয় কিভাবে আরেক সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে। এতে করে উন্নত শিক্ষার সাথে সাথে মুসলমান কিভাবে কোনঠাসা পরিস্থিতির স্বীকার হয় তা স্পষ্টতর হয়।[১৮১]

ব্যয়ের খাত	টাকা	সরকারি	স্থানীয় সংস্থা	ফিস	অন্যান্য
নির্দেশনা ও পরিদর্শন	১৫,৫৭,৪৪৭	৯৩.৫%	৫.৪%	-	.১
বিশ্ববিদ্যালয়	২৯,৭৭,২২৩	৩০.৯%	-	৫৪.৬	১৪.৫
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা	৩৪,৩৬৬	-	-	১০০.০০	-
বিবিধ	৫৫,০৪১৬	৩৩.৩%	৫.৮%	২১.৩	৩৯.৬
	১,০০,৭৩,১৯২	৪১.৮	৪.২	২৮.১	২৫.৯

Source: Quenquennial report of the progress of Education in Bengal, 1932-1937, Part-I, 180, Bengal Administration Report 1525-1526.

পুরুষ

১. সাধারণ মহাবিদ্যালয়	৩৭,৩৩,৫৪৯	৩৩.৫	.১	৫৮.৭	৭.৭
২. পেশাশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়	১৭,২২,৪৬৪	৬৪.৪	-	৩৩.৪	২.২
৩. উচ্চ বিদ্যালয়	১,১৭,৮০,৪০৭	১৫.৫	.২	৭২.১	১২.২
৪. মধ্য বিদ্যালয়	৩০,১৮,৫০২	৭.৭	১২.৯	৬৩.৫	১৫.৯
৫. প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৭,৪৭,৬২৫	৩২.৮	২৫.২	৩০.৮	১১.২
৬. বিশেষ বিদ্যালয়	৪৩,২২,৮৫৩	৪৪.২	৯.৫	২৬.৩	২০.০
	৩,১৩,২৫,৪০০	২৭.৩	৮১	৫২.৩	১২.৩

মহিলা

১. সাধারণ মহাবিদ্যালয়	১,৫৮,৮০৫	৫৬.৮	-	৪৫.০	৮.২
২. পেশাশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়	২৭,৬২০	১০০.০০	-	-	-
৩. উচ্চ বিদ্যালয়	১৬,৩৮,২৯০	৩৫.৫	৪.৩	৪৭.৪	১২.৮
৪. মধ্য বিদ্যালয়	৩,৮০,১৩১	৩০.২	৮.৯	২৬.৮	৩৪.১
৫. প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬,২১,৫৬৫	২৭.৮	৩৯.৩	১২.১	২০.৮
৬. বিশেষ বিদ্যালয়	২,৮৩,৪৩৬	৪০.২	১০.৯	১৫.৭	৩৩.২
	৪১,০৯,৮৪৭	৩৩.২	১৮.৮	২৮.৯	১৯.১
	৪,৫৫,০৮,৪৩৯	৩১.০	৮.২	৪৪.৯	১৫.৯

Source: Quenquennial report of the progress of Education in Bengal, 1932-1937, Part-I, 180, Bengal Administration Report 1525-1526.

এখানে বলা প্রয়োজন বাঙালি মুসলিম ও অবাঙালি মুসলিম, যারা যথাক্রমে আজাদ পাস্তিান ও আজাদ হিন্দুস্থান স্বপ্নে বিভোর ঠিক সেই সময়ের এমনই পরিস্থিতি যার ফলে দীর্ঘকালের আলোচিত, পরিকল্পিত জরুরী সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য চাপা পড়তে থাকে। স্বাধীনতার চিন্তা মুসলমানদেরকে হিন্দুদের সাথে সাথে পাগল করে ফেলতে শুরু করে। যেখানে বৃটিশ সহায়তায় সবেমাত্র মুসলমানগণ আধুনিক শিক্ষা তথা ইংরেজী শিক্ষার ফলে উন্নতির সোপান বুনতে বুনতে প্রায় ৩০% অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। তবে এও ঠিক এই সময়টিতে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক সাফল্য অর্জন করেছিল। পরাধীন ঔপনিবেশিক বাংলায় শিক্ষা-ব্যবস্থা কেমন যেন এক পর্যবেক্ষণমূলক পরীক্ষা-নীরিক্ষার কারুকার্যতার মধ্যদিয়ে যাচ্ছিল। বাংলায় শিক্ষা ব্যবস্থার মান অতটা উন্নত না, এর পুরোদায় কিন্তু বৃটিশদের দিলেও চলে না। কেননা পুরোবিশ্ব তখন উত্তাল পুরনো ধ্যান-ধারনার পথকে সরিয়ে নতুন-এর পথে। তখন বাঙালি মুসলিমরা গৃহের এক কোনে বসে ভাবছে আবারও দিন পাল্টাবে, সময় আসবে। বিধর্মীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না; মুসলমানদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন, সমগ্র মানবজাতিরই নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে লড়াই এর ভাষা রয়েছে। লড়াইয়ে সম্প্রদায়গুলো জিতে যায় সাথে জিতিয়ে দেয় তার ধর্মকে। পরিশেষে গিয়ে ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হল। ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট দেশবিভাগ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটায়। অবিভক্ত বাংলার প্রায় তিন পশ্চমাংশ এলাকা নিয়ে পূর্ববাংলা (১৯৫৬ সালে নামবদল করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়) পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। কিন্তু এতকালের অবহেলিত, শোষিত, কর্দমাক্ত, ম্যালেরিয়ার জীবানু ভরা, শাহী মোঘল বাদশাহদের নাক ছিটকানো মাছির আবাস্থল, কলিকাতার পশ্চাতভূমি হিসেবে তৃতীয় বাংলা তথা পূর্ববাংলা, তদুপরী

পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের হাতের পুতুল পূর্ববাংলা ইত্যাদি কথাগুলি নিতান্ত কষ্টের তথাপি সত্য। যার দরুন দেশবিভাগ পূর্ববাংলার বাঙালি, পশ্চিম বাংলার বাঙালি মুসলিমদের (সংখ্যালঘু) চেয়েও ছিল বড় চ্যালেঞ্জিং গতিপরিবর্তন এর দিকদর্শন। ১৯৪০-৪৭ এর মধ্যে বাঙালি মুসলমানরা ইতিহাসের এক চরম অধ্যায় পার করে। কিন্তু দূভার্গ্যের বিষয় তারা যে কঠিন সময় পার করছে তা কতিপয় প্রগতিবাদী নেতা ও প্রভাবশালী মধ্যবিত্তশ্রেণি ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারেনি। বাঙালি মুসলমানগণ যদি আরও আগে আধুনিক শিক্ষার এক জেনারেশন পার করতেন তাহলে হয়ত অবাঙালি মুসলিমগদের সাথে বাঙালি মুসলমানদের কোনকালেই কোনরকম আঁতাত যেমন হতো না, তেমনি হত না একের পর এক সংঘাত। যে সংঘাতের ফলাফল নিদারুনভাবে ভোগ করেছিল বাঙালি মুসলিম শিশু, নারী, বুদ্ধিজীবী, কৃষক-শ্রমিক, কিশোর-কিশোরী, আবাল বৃদ্ধ-বনিতাগণ। এছাড়াও দেশভাগের পর পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার মানুষজনের গৃহহারা, স্বজনহারার কান্নারত ইতিহাসের এক সত্য অধ্যায়। যাইহোক মূল আলোচনায় যাওয়া যাক। দেশবিভাগের ফলে প্রশাসনিক সদর দপ্তর, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, সমুদ্রবন্দর, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কলকাতাকেন্দ্রিক আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারায় পরিবর্তনের ঢেউ এসে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানে। নিজের স্বল্প পুঁজি ও সম্পদ নিয়ে পূর্ববাংলাকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে হয়। পুঞ্জীভূত সমস্যার চাপ সরকারের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তখন তথা ১৯৪৭-এ গিয়ে সব চেয়ে বড় যে ঘাটতি হল তা ছিল বিপুল পরিমানে হিন্দু শিক্ষক ও শিক্ষাপেশায় জড়িত হিন্দু কর্মচারীর দেশত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূণ্যতা। দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত কেবল ঢাকা শহর ছাড়া সারা বাংলায় মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি শিক্ষা বিভাগের দ্বৈত নিয়ন্ত্রনাধীনে ছিল। দেশভাগের ফলে পূর্ববাংলার স্কুল কলেজের উপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখতিয়ার থাকল না, তদুপরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল আবাসিক শিক্ষামূলক বিশ্ববিদ্যালয় বিধায় তার অধিভুক্তকরণের কোন ক্ষমতা না থাকার ফলে ১৯৪৭ সালে সরকার 'পূর্ববঙ্গ শিক্ষা অধ্যাদেশ-১৯৪৭' জারি করে। আলোচ্য এই অধ্যাদেশ বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা স্তরের উর্ধ্বে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধিভুক্তকরণের ক্ষমতা লাভ করে। একই অধ্যাদেশের দ্বারা ঢাকা ইন্টারমিডিয়েড ও সেকেন্ডারি শিক্ষাবোর্ডের স্থলে পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠন করা হয়। এ বোর্ডকে মাধ্যমিক শিক্ষা তত্ত্বাবধান ও উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ অধ্যাদেশ জারির ফলে অর্ধশতেরও বেশি প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রেডের কলেজ এবং আরও বহু সংখ্যক টেকনিক্যাল ও পেশাশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখতিয়ারভুক্ত হয়। অনুরূপভাবে ১,৩০০টি বিদ্যালয়ও পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের আওতায় চলে আসে। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার পরিসর বাড়াতে থাকে। তাছাড়াও এই অধ্যাদেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট, নির্বাহী কাউন্সিল, একাডেমিক কাউন্সিল এবং বিভিন্ন অনুষদ পুনর্গঠন করে। সকল প্রথম গ্রেড কলেজের অধ্যক্ষদের এসব সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেশবিভাগের প্রাক্কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি অনুষদ ও সতেরোটি বিভাগ ছিল।[১৮২]

অথচ দেশভাগের পর গোটা প্রদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিরাট দায়িত্ব এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এসে বর্তায়। একদিকে দেশত্যাগের ফলে শিক্ষকের অভাব, অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে মুসলিম ছাত্রের আগমনের ফলে আবাসিক সংকট, আবাসিক ছাত্রের সংখ্যা ৯৯৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৬৪৮ জনে।[১৮৩] ফলে চালু করতে হয় নতুন বিভাগ, সেই

সাথে নতুন নতুন কোর্স। এ যেন সংকট থেকে বিদ্যার পরিসর বৃদ্ধি। ১৯৪৭ সালে পূর্ববাংলায় ৫৫টি কলেজ ছিল (দুটি মেয়েদের) এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৪.২৯১ জন। এ ৫৫টি কলেজের মধ্যে মাত্র ৮টি ছিল সরকার পরিচালিত। এগুলির জন্য সরকারের বছরে ব্যয় হতো ৫,৫৪,০৫১ টাকা। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য গড়ে বছরে খরচ হতো সরকারি কলেজে ৩৯০ টাকা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বছরে ৩২ টাকা।[১৮৪] তবে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের চেহারা একইভাবেই চলছিল, ঠিকঠাক আগেরই মত, মধ্য ইংরেজী, মধ্যবাংলা, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। এই মধ্য স্কুলগুলি ইংরেজী ও বাংলা উভয়ই পঞ্চম ও ষষ্ঠ– এ দুটি শ্রেণি নিয়ে গঠিত ছিল। তফাতের মধ্যে প্রথমটিতে ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক আর দ্বিতীয়টিতে ঐচ্ছিক ছিল। তুলনামূলকভাবে এগুলি গ্রামাঞ্চলের ছাত্রদের কাছাকাছি ছিল এবং এগুলিতে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের চেয়ে খরচ কম হত। এদিক থেকে এদের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ববাংলায় ২,১২৫টি বিদ্যালয় ছিল। প্রায় দু লাখ ছাত্র-ছাত্রী এগুলিতে অধ্যয়নরত ছিল। সেখানে দেখা যায় মধ্য বাংলা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০টি। ছাত্রছাত্রী ছিল ছয় হাজারের কিছু কম। ১৯৪৭-৪৮ সালের মধ্যে বালক বিদ্যালয়গুলিতে মোট বার্ষিক ব্যয়ের পরিমান ছিল ৩৪,৭৬,৪৮৬ টাকা। এই অর্থের এক-তৃতীয়াংশ আসত সরকারী কোষাগার থেকে, আর বাকীটা আসত ছাত্রবেতন ও অন্যান্য বেসরকারী উৎস থেকে।[১৮৫] মাধ্যমিক স্তরের শেষ চারটি শ্রেণি নিয়ে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় গঠিত ছিল। এর সমাপ্তি পর্বে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কারিগরি কিংবা পেশাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ছাড়পত্র মিলতো। মধ্যস্তরের প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষা বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করত আর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলি শিক্ষা বিভাগ এবং পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের দ্বৈত নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে ১৩০৬টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ৩,৩১,০৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছিল। এস্কুলগুলির মধ্যে মাত্র ৩৩টি ছিল সরকারি, ৭১৩টি অনুদানপ্রাপ্ত এবং অবশিষ্টগুলি ছিল সম্পূর্ণ অনুদান বহির্ভূত। নিম্নে ১৯৪৭-৪৮ সালের মধ্যে বাংলা তথা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলায় ইংরেজী বিদ্যালয়ে ব্যয়ের খাত ও উৎস দেয়া হল–[১৮৬]

	বালক	বালিকা
সরকারি	২৪,৩৬,৪৩৯	৪,১৮,৯৫৩
জেলাবোর্ড	৩২,৮৯২	৪,৪৪৭
মিউনিসিপ্যালিটি	২৫৫	১১,৭০৫
ছাত্রবেতন	৯৬,৩০,৩৫২	৩,৮৪,৮৬১
অন্যান্য	১৪,২৩,৮১৯	১,০৭,১৪৩
মোটঃ	১,৩৫,২৩,৭৫৭	৯২,৭৩,১৪৯

সূত্রঃ পূর্ববাংলা শিক্ষা রিপোর্ট, ১৯৪৭-১৯৪৮, পৃ. ৪৮

এখন দেখা যাক উপরের সারণিটি কি প্রমাণ করে। নিঃসন্দেহে একথাই প্রমাণ করে যে, দেশভাগের আগে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পূর্ববাংলার উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে উপরের স্তরবাদে প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল ছিল। দেখা যায় মোট ব্যয়ের সিংহভাগই এসেছে ছাত্রবেতন এবং অন্যান্য উৎস হতে।

তথ্যসূত্র:

১. বদর উদ্দিন উমর, (Supported to Nur Mohammad in a speech→written a book named by,*বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়কতা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ, ১৬।

২. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৯৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ, ১৫৭।

৩. আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ, ৮৪-৮৫।

৪. Arthur Mayhew, *Education of India*, Faber & Gwyer, Calcutta, 1926, P, 149.

৫. আবদুল মওদুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৯৩।

৬. B.B. Misra, The East India Company 1773-1834, Manchester University Press, London, 1959, P, 195.

৭. আবদুল মওদুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ,-২০৭।

৮. কে. এ. নিজামী, *সাম অ্যাসপেক্টস অব রেলিজিয়ওন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া ইন নাইন্টিনস সেঞ্চুরী*, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড়, ১৯২৭, পৃ, ২০৫-২১০।

৯. প্রসেডিংস অব দি পাকিস্তান হিস্ট্রি কনফারেন্স, ঢাকা, অধিবেশন, ১৯৫৩, পৃ, ৭।

১০. প্রসেডিংস অব দি পাকিস্তান হিস্ট্রি কনফারেন্স, ঢাকা, অধিবেশন, ১৯৫৩, পৃ,৭-৮।

১১. এ উক্তি প্রমানের জন্য শেখ শুভোদয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্যটি ঠিক এই রকম বহু লোক শেখ জালাল উদ্দিন তাব্রিজীর অনুরক্ত ছিলেন, মাধবী ও তার স্বামী নিয়ে যে কথাখানি প্রমাণ দিবে তাহলে- একদিন তিনি তার মৃত্যু পথযাত্রী স্বামীকে নিয়ে শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজীর কাছে আসলেন, শেখ মৃত্যুপথযাত্রী সাধবীর স্বামীকে সুস্থ করে পুনরুজ্জীবিত করলেন। এতে দম্পতি এতই খুশি হল যে তারা পরবর্তীতে ইসলামধর্মে দিক্ষিত হয়ে তাঁর কাছে থেকে গেলেন। আব্দুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ, ২৭৩।

১২. প্রসিডিংস অব দি পাকিস্তান হিস্ট্রি নফারেন্স, ঢাকা অধিবেশন, ১৯৫৩, পৃ, ৮-৯।

১৩. আব্দুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*; উর্দু অনুবাদ, খাজা-ই-চিশত, মুসলিম প্রেস, দিল্লী, ১৩৪৮, হি. পৃ, ২৭৩।

১৪. Stan. Goron and J.P. Goenka, The Coins of the Indian Sultanates, Covering the Area of Present day of India, Pakistan and Bangladesh, Munshiram Manohor, Lal, Delhi 2002, P, 139-140.

১৫. Law, N.N., Promotion of Learning in India, During the Mohammedan Rule by Mohammedans, Muktodhard, Jackson Hights, London, 1916, P, 106-113.

১৬. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী (১৭৫৭-১৮০০)*, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ, ৩-৪।

১৭. Abdul karim, *Murshid Quli khan and His Times*, Asitaic Society of Pakistan, Dacca, 1963, P, 238.

১৮. M.A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* Vo. 11, P-286, Karaci University Press, Karaci, 1963, P, 63.

১৯. Long, rev. James, Adam’s Reports, Calcutta, 1836, P, 210-211.

২০. *Ibid.*

২১. Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam, 1901-02, 1906-07, Shillong, 1908, P, 103.

২২. Report on the Progress of Education in Eastern Bengla and Assam, 1901-02-1906-07, Shillong, 1908, P, 103.

২৩. M.A. Rahim; *Social and Cultural History of Bengal,* Vol-1, Karaci University Press, Karaci, 1963, P, 154-155.

২৪. N.N. Low, *Promotion of Learning in India during the Mohammedan Rule by Mohammedan*, Longmans, Green and Co., London, 1916, P, 161-162.

২৫. Abul Fazl, *Ain-i-Akbari*, Vol. 1, Translated by I.H. Blockmann, Royal Asiatic Society Calcutta, Calcutta, 1877, P , 288.

২৬. W.H. Sleeman Rumbles and Recollection of an Indian official, Vol. II, Hatchar & Son, Landon, 1893, P, 523-524,

২৭. William Adam, Reports on the state of Education in Bengal 1835-1838 (ed) and Nath Basu, Kolkata: University of Calcutta, 1941, here after Adams Report.

২৮. Khondker Fuzli Rubee, Translated by A. Salam, *The Origin of the Musalmans of Bengal: Being a Translation of Haqiqote Musalman-1-Bengalah*, Thacker, Spink & Co. , Calcutta, 1895, P, 70.

২৯. *Ibid.*

৩০. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, চন্ডীকাব্য, কুমার বন্দোপাধ্যায়, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২, পৃ, ৩৪৪।

৩১. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৩৪৫।

৩২. W.W Hunter, *The Indian Mussalmans, Oxford*, The Clarendon Press, London, 1871, P, 133.

৩৩. কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, *আত্মজীবনী*, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ১৩৬৩, পৃ, ৬-৭।

৩৪. S.M. Jaffar, *Education in Muslim (1000-1800 A.D.)*, Idarahi Adabiyat, Delhi, 1973, P, 1-2.

৩৫. আরবি এবং ফারসি ভাষায় ইতিহাস প্রণয়ন ব্যতীত মুসলমান কবিগণ ইতিহাসভিত্তিক প্রথম বাংলা সাহিত্য রচনা করেন। নওয়াজিশ খানের 'পাঠান প্রশংসা' ও 'জোরওয়ার সিংহকীর্তি' এবং উজির আলীর।

৩৬. *Encyclopedia Britanica*, Vol. XXIII, P, 83.

৩৭. স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)*, পুস্তক বিপনী, কোলকাতা, ১৯৭৫, পৃ, ২৯।

৩৮. স্বপন বসু, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৩০।

৩৯. J.N Sarkar, *India Through the Ages*, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1979, P,52.

৪০. *Encyclopedia Britanica*, Vol. XXIII, P, 83.

৪১. N.K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, from Plassey to Permanet Settlement, Vol.II, Calcutta University, Calcutta, 1968, P, 230.

৪২. J.C. Sinha, *Economic Annals of Bengal*, Oxford Press, London, 1927, P, 95-96.

৪৩. Jemes Grant, *Historical and comparative Analysis of the Finance of Bengal*, Quoted in W.K. Firminger (ed) Fifth Report from the select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East Company, S. Book Depot, Calcutta, 1917, Vol. II, P, 194.

৪৪. A.R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856)*, Bangla Academy, Dhaka, 1977, P, 37.

৪৫. এম.এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, (১৭৫৭-১৯৪৭)*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ, ৪৬।

৪৬. R. C. Dutt, *The Economic History of India*, Low Price Pub., Calcutta, 1940, P, 23.

৪৭. রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মুসলমান ছাত্রের বাঙালা শিক্ষা*, রবিন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা, কার্তিক, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ, ৩২০।

৪৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস-২য় খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ, ২২৫।

৪৯. K.K. aziz (ed.), *Ameer Ali: His life and works*, Publishers United Ltd., Lahore, 1968, P, 47.

৫০. W.W Hunter, *Indian Mussalmans*, Smith Elder and Company, London, 1871, P, 139.

৫১. Progress of Education in Bengal (1917-78), to (1921-22), P. 65. Report of the Moslem Education Advisory Committee, 1934, P, 107.

৫২. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ (১৮৮৫-১৯২১)*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ, ৩৮।

৫৩. কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ, ৮।

৫৪. Syed Mahmood, *A History Of English Education in India (1781-1893)*, M.A.O. College, Aligarh, 1895, P, 11.

৫৫. C.L. Thorpe, and *Education and the Development of Muslim Nationalism in Pre-partition India.* Journal of Pakistan Historical society, Vol. XIII, Part-I, Lahore, 1965, P, 12.

৫৬. J.P. Naik, *Elementary Education in India* : *The Unfinished Business,* Asia Publishing House, Bombay, 1966, P,58.

৫৭. *Ibid*, P, 59.

৫৮. এই নাম দেওয়া হয়েছিল গ্রান্ট এবং তার বন্ধু লন্ডনের যে এলাকায় বাস করতেন সে এলাকার নামানুসারে।

৫৯. ১৭৯২ সালে লেখা হলেও এ রচনাটি ব্যক্তিগতভাবে বিতরনের জন্য মুদ্রিত হয়েছিল ১৭৯৭ সালে। পরবর্তীকালে ১৮১৩ এবং ১৮৩২ সালে পার্লামেন্টারি পেপার্স এ মুদ্রিত হয়। P.P.H.C., 1812-1813, X, 282 এবং P.P.H.C., 1831-32, Viii, P,734.

৬০. T.B Macauly, *English Education and the ogrigins of Indian Nationalism*, Oxford Univesity Press, London, 1922, P, 12.

৬১. ব্রিটিশ জনমতের উপর গ্রান্ট-এর Observations-এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় জন্য দেখা যায়, T. Embree, *Charles Grant and British Rule in India,* Dent, London, 1962, P, 155-57.

৬২. Grant, Porliamentary Papers relating of the Affairs of India, General Report from the Select of the House of Commons on the Affairs of the East India Company, 18th August, 1832, Vol. VIII (1724), Appendix 1, Dent, London, 1832, P, 3-49,

৬৩. D.P. Sinha, *The Educational Policy of the East India Company in Bengal to 1854*, Punthi Pustak, Calcutta, 1964, P, 9

৬৪. M.A. Larid, *Missionaries and Education in Bengal*, Clarendon Press, Oxford, 1972, P, 63-99.

৬৫. কেদারনাথ মজুমদার, বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, ১ম খণ্ড, বিকাশ মেসিন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ময়মনসিংহ, ১৯০৭, পৃ, ৫৮।

৬৬. M. Fazlur Rahman, *The Bangali Muslims and English Education (1765-1835)*, Dacca, 1973, Preface, P i. P i- ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর ১৮৮৬-৮৭ সালের অনুষ্ঠান পত্র, ঢাকা, ১৮৮৭, প, ৬।

৬৭. A, Howell, *Education in British India Priodr to 1854 and 1870-71*, Ashih Publishing House, Calcutta, 1862, P, 4.

৬৮. East India Company Act of 1813, Section 43, H. Sharp, Selecton from Educational Records (1781-1839), Part-1, Calcutta: The Superintendent of Government Printing, 1920.

৬৯. Extrat of letter, in the Pubic Department from the court of Derectors to the Governor General in Council of Bengal 3rd June, 1814.

৭০. টমাস ফিশারের স্মৃতিকথা, P.P.H.C. 1831-32, ix, 1751, P, 403.

৭১. টমাস ফিশারের (Thomas Fisher) স্মৃতিকথা থেকে উদ্ধৃত। P.P. H.C, 1831-32, ix. 7351, P, 403.

৭২. টমাস ফিশারের (Thomas Fisher) স্মৃতিকথা থেকে উদ্ধৃত। P.P. H.C, 1831-32, ix. 7351, P, 404.

৭৩. টমাস ফিশারের (Thomas Fisher) স্মৃতিকথা থেকে উদ্ধৃত। P.P. H.C, 1831-32, ix. 7351, P, 404.

৭৪. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন (১৮১৮-১৮৩৫)*, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, রুম, ১১০৭, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০০, পৃ, ১৩০।

৭৫. Surendra Nath Banerjee, *A Nation in Making, Oxford University Press, London, 1925, P, 9.*

৭৬. স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)*, পুস্তক বিপনী, কোলকাতা, ১৯৭৫, পৃ, ৫।

৭৭. Anstey Vera, *The Economic Development of India*,Longmans, Green & Co., London, 1952, P, 280.

৭৮. Raqib Uddin Ahmed, The Progress of the jute industry and Trade (1855-1966), Pakistan Central Jute Committee, Dacca, 1966, P, 3.

৭৯. Long, Rev.James, *Adam's Reprts, On vernacular Education in Bengal and Behar,* Submitted to the Government in 1835, 1836 and 1838 with a brief view of its Past and present conditions, Calcutta home secretariat press, Calcutta, 1868, p. 5-8 (Introduction), P, 22-23.

৮০. Long, Rev.James, *Op.cit*, P, 20.

৮১. টমাস ফিশারের স্মৃতিকথা, P.P.H.C. 1831-32, ix, 1751, P, 402.

৮২. S. E. R. i, P,79.

৮৩. জনশিক্ষা কমিটি মোট ১০ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। সভাপতি ও সেক্রেটারি ব্যতীত কমিটির অপর ৮ জন সদস্যবৃন্দ ছিল: J.P. Larkins, W.B. Martin, W.B. Bayley, H. Shakespeare, Holt Mackenzie, H.T. Prinsep, A, Sterling ও J.C.C. Sutherland তারা সকলেই ছিলেন ইউরোপীয় H Sharp, Educational Records, Supeintendent of Government printing, 1920, P, 54.

৮৪. Syed Mahmood, *Op.cit*. P, 32.

৮৫. M. Azizul Haque, *History and Problems of Moslem Education in Bengal,* Thacker Spink and Co., London, 1919, P, 93-94..

৮৬. Thomas Fisher, *'Memoir on Education of Indians: Bengal Past and Present'*, Vol. XVIII, Calcutta University Commission, Calcutta, 1919, P, 93-94.

৮৭. Long, Rev.James, Op.cit, P, 5-8 (Introduction), P, 195-196.

৮৮. Report of the General Committee of Public Instruction of Public of Fort william in Bengal, 1826, Calcutta, Gazette office, Calcutta, 1826, P, 8-9.

৮৯. S.N.Mukherjee, *History of Education in India (Modern Period),* Cambridge University Press, London, 1970, P, 52.

৯০. অমলেন্দু দে, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, রত্না প্রকাশন, কোলকাতা, ১৯৭৪, পৃ,১৯৫।

৯১. T.B. Macaulay, Essays on Lord Clive, A.B Keith (ed), Speeches and Documents on Indian Policy, 1750-1921, Vol, 1, Oxford University Press, London, 1973, P, 365-366.

৯২. ভারত সরকারের কাছে বাংলা সরকারের পত্র। ১৭ই আগষ্ট ১৮৭২ তৃতীয় অনুচ্ছেদ। দ্রঃ Bengal legislative Assembly Proceedings (1972), Vol, 52, Pt, 1.

৯৩. A.R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal, (1757-1856),* Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1961, P, 213-214.

৯৪. P. Hurtog, *Some Aspect of Indian Education Past and Present*, Oxford University Press, London, 1939, P, 188.

৯৫. *Ibid*, P,189.

৯৬. অ্যাক্ট ২৯, ১৮৩৭, আইনের ক্ষেত্রে ফারসির বদলে মাতৃভাষার প্রবর্তন। Boards Collection ৭৩৭৭০।

৯৭. India office Records, Revenue, Judicial and legislative Committee, Miscellanecus papers, Vol. 9, Superintendent of Government Printing Calcutta, 1914, P, 38.

৯৮. *Ibid*, P, 38

৯৯. Report of the Committee Appointed by the Bengal Government to Consider Questions Connected with Muhammadan Education, Calcutta, 1888, P, 35.

১০০. ভারত সরকারের প্রস্তাব ৭ই আগস্ট ১৮৭১, অনুচ্ছেদ-২, Indian Education Proceedings.

১০১. Johnston, J. *Abstract and Analysis of the Report of the Education Commission,* Oxford at the Clarendon Press, London, 1916, P, 88.

১০২. ভারত সরকারের প্রস্তাব, জুলাই ১৫, ১৮৮২, অনুচ্ছেদ ২৫। Indian Education Proceedings July, 1885.

১০৩. Report of the Indian Education Commission 1882, P. 489, Mahmood, Syed, *A History of English Education in India (1781-1803)*, MAO College, Aligarh, 1895, P, 159.

১০৪. Progress of Education in India 6th Quinquennial Review, 1907-1908 to 1911-1912, P, 246.

১০৫. General Report on Public Instruction in Bengal, 1884-1885, Culcutta 1885, P, 118-123.

১০৬. C.L.Thore, *'Education and the Development of Muslim Nationalism in Pre-partition India'*. Journal of Pakistan Historical Society,Karachi, 1935, P, 53.

১০৭. C.L.Thore, 'Education and the Development of Muslim Nationalism in Pre-partition India'. Journal of Pakistan Historical Society, Vol. XIII, part-1, Karachi, 1965, P, 202.

১০৮. আবদুল মওদুদ; *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রুপান্তর*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ, ১২৫।

১০৯. অরবিন্দ পোদ্দার, *বঙ্কিম মানস*, বসুমতি সংস্করন, কোলকাতা, ১৯৬০, পৃ, ১৭২।

১১০. সফীউদ্দিন জোয়ার্দার, বাংলার নবজাগৃতি পুনর্বিবেচনা, *সমাজ নিরীক্ষন*, ১৯ সংখ্যা পৃ, ৫।

১১১. Campbell George, Memoirs of Indian Carrer, Vol.II, Mac Millan & Co, London, 1893, P, 307.

১১২. Campbell George, Op.cit, P, 311.

১১৩. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ (১৮৮৫-১৯২১)*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ, ৪১।

১১৪. General Report on Public Instruction in Bengal, 1884-1885, Calcutta, 1885, P, 118-123.

১১৫. Calcutta University Commission Report 1885.

১১৬. সুফিয়া আহমেদ, *বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় (১৮৮৪-১৯১২)*, বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা, ২০০২ পৃ, ৬।

১১৭. *The Moslem Chronicle,* 11 Januray 1996.

১১৮. Report of the Muhammadan Educational Indowments Committee, 1888, P, 35.

১১৯. GRPI, 1855-56, Appendix-D and A.R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856),* Asiatic Society of Pakistan, 1961, P, 225.

১২০. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র,* ২য় খন্ড, সংবাদ প্রভাকর, কোলকাতা, ১৯৭৮, পৃ, ১১১-১১২.

১২১. K.M. Ashraf, *Muslim Revivalists and Revolt of 1857,* Renaissance Publishing House, Delhi, 1985, P, 52.

১২২. I. H. Qureshi, *A History of Freedom Movement, being the story of the Muslim Struggle for Freedom,* The board of Editors, Karachi, 1957, P, 258-260. .

১২৩. C.F. Andrews, & Mukherjee, Girija, *The Rise and growth of the Conress in India*, London, Oxford University Press, 1938, P, 49.

১২৪. P. Hardy, *The Muslims of British India,* Combridge University Press, London, 1972, P, 70-91.

১২৫. ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ, ৩৪।

১২৬. আহমেদ আনওয়ার, বাংলার মুসলমান ও প্রাথমিক শিক্ষা, মাসিক মোহাম্মদী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৪, পৃ, ৯৩।

১২৭. ভারত সরকারের প্রস্তাব, ৭ই আগস্ট ১৮৭১, অনুচ্ছেদ-২, Indian Education Proceedings.

১২৮. সময়টি তখন জর্জ ক্যাম্পবেলের (জর্জ ক্যাম্পবেল ১৮৭১-১৮৭৪ পর্যন্ত বঙ্গের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন)।

১২৯. তিনি সাধারণ শাখায় বাংলা সরকারের ভারপ্রাপ্ত সচিব ছিলেন।

১৩০. B.B. Misra, *The Indian Middle Classes: Their Growth in Modern Times*, Oxford University Press, London, 1961, P,6. 283:Ed.Com. 1882, Para-5.

১৩১. Campbell George, *Memoirs of Indian Carrer*, Vol.II, Mac Millan & Co, London, 1893, P, 311.

১৩২. Z. Ahmed Memorandum on the Mohsion Fund, অনুচ্ছেদ-৬, পরিশিষ্ট ৪, Calcutta University Commission Report ১৯১৭-১৯১৯, খন্ড-৬, পৃ, ৪৫।

১৩৩. মহসিন বৃত্তি তহবিলের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের জন্যে দ্রঃ Report of the Muhammedan Educational Endowments Committee 1888, The Calcutta Review, P, 32-35.

১৩৪. Z. Ahmed, Memorandum on the Mohsion Fund, অনুচ্ছেদ-৬, পরিশিষ্ট-৪, Calcutta University Commissin Report ১৯১৭-১৯, খন্ড-৬, পৃ, ৪৬।

১৩৫. Abdul Latif, *A Short Account of my Public Life*, Newman and Company, Calcutta, 1885, P, 14-15.

১৩৬. Gerge Campbell, *OP.Cit*, P, 311.

১৩৭. Source: Report of the Indian Education Commission, 1882, Calcutta 1883, Appendix, PP.xiii, xiv, xv.

১৩৮. Lord Curzon, *The Statesman and Friends of India*, D.K.P. House, Delhi, 1906, P, 315.

১৩৯. Lord Curzon, *Op.Cit*, P, 316.

১৪০. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*, দীপ প্রকাশন, কোলকাতা, ১৯৬৮, পৃ, ১৮১-১৮২।

১৪১. তিনি কলকাতার উডবার্ন মাধ্যমিক ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দ্র. কলকাতা মাদ্রাসায় ৮-১৩ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলার মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন। Bengal Education Proceedings, Sept. 1908.

১৪২. বাংলা সরকারের প্রস্তাব, ২২ জানুয়ারি, ১৯৮৪, অনুচ্ছেদ ৬, জি.আর.পি. আই ইন বেঙ্গল, ১৮৮২-১৮৮৩।

১৪৩. লর্ড রিপনের মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের স্মারকলিপি, ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২,Indian Education Proceedings, মার্চ ১৮৮২।

১৪৪. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৪৩-৪৪।

১৪৫. ভারত সরকারের প্রস্তাব, জুলাই ১৫, ১৮৮২, অনুচ্ছেদ-২৫। Indian Educaion Proceedings, জুলাই, ১৮৮৫।

১৪৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৯৯৭।

১৪৭. Census of India 1891, Vol.III, P, 227.

১৪৮. General Report on Public Instruction in Bengal, 1884-1885. Calcutta 1885, P, 118-123.

১৪৯. Lafifa Akanda, *Social History of Muslim Bengal (1854-1884)*, Islamic Fundation of Bangaldesh, Dacca, 1981, P, 98.

১৫০. RakibUddin Ahmed, The Progress of the Jute Industry and Trade (1855-1966), Pakistan Central Jute Committee, Dacca, 1966, P, 3.

১৫১. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ১ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ, ২২।

১৫২. General Report on Public Instruction in Bengal 1873-1874, Calcutta, 1875, P. 63. General Report on Public Instruction in Bengal, 1884-85, Calcutta 1884-1885, P. 118, General Report on Public Instruction in Bengal, Calcutta; 1893-94, P, 134. * তথ্য পাওয়া যায় নি।

১৫৩. ড. এডওয়ার্ড ডেনিসন রস, ১৯০১ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। বাংলার জি. আর. পি. আই. ১৯০৩-০৪, পৃ, ৮২।

১৫৪. তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী এবং কলিকাতা পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। ১৯১২ সালে সমাবর্তন তিনি নবাব উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৫৫. তিনি বার-এট-ল, মুসলিম সাহিত্য সমিতির সম্পাদক ছিলেন। তিনি নবাব আবদুল লতিফের পুত্র।

১৫৬. মৌলভী আবদুল করিম ও মৌলভী ইব্রাহিম মুসলমান শিক্ষার জন্য ১৮৯৯ সালে নিযুক্ত দুজন সহকারী পরিদর্শক।

১৫৭. তিনি শিক্ষা বিভাগে একজন সহকারী স্কুল পরিদর্শক ছিলেন।

১৫৮. M.K.U. Molla, The New Province of Eastern Bengal and Assam, Rajshahi University, 1981, P, 210-211.

১৫৯. Report on the Progress of Education Eastern Bengal and Assam, 1901-1902 to 1906-1907, Vol. I, P, 33.

১৬০. Z.H. Zaidi, *The Political Motive in the Partition of Bengal-1905*, Journal of the Pakistan Historical Society, Vol, 12, Issue-2, April, 1, Karachi, 1964, P, 113-149.

১৬১. তিনি কলকাতার উডবার্ন মাধ্যমিক ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দ্র. কলকাতা মাদ্রাসায় ৮-১৩ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলার মুসলামনদের প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন। Bengal Education Proceedings, সেপ্টেম্বর, ১৯০৪।

১৬২. বাংলার জি.আর.পি.আই, ১৮৯০-৯১, পৃ, ৩।

১৬৩. বাংলার জি.আর.পি.আই, ১৮৯০-৯১, পৃ,৩। এসব বিদ্যালয় বাংলা ও গণিতের প্রাথমিক মান সমান হতে হবে। উর্দু ও ফারসির মান হতে হবে নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক মানের সঙ্গতিপূর্ণ।

১৬৪. আহমেদ আনওয়ার, বাংলার মুসলামন ও প্রাথমিক শিক্ষা, মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৪, পৃ, ৯৩।

১৬৫. Progress of Education in India, 6th Quinquennial Review, 1907-1908, P, 246.

১৬৬. বাংলার জি.আর.পি.আই, ১৯৩০-০৪, পৃ,৪২।

১৬৭. পূর্ব বাংলা ও আসাম শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট, ১৯০৭-০৮, ১৯১১-১২, প্রথম খন্ড, পৃ, ৮১।

১৬৮. পূর্ব বাংলা ও আসাম শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট, ১৯০৭-০৮, ১৯১১-১২, প্রথম খন্ড, পৃ, ১-২, ২৬-৩৪।

১৬৯. Progress of Education in India, 6th Quinquennial Review, 1911-1912, P, 246.

১৭০. পূর্ব বাংলা ও আসাম শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট, ১৯০৭-০৮, ১৯১১-১২, প্রথম খন্ড, পৃ, ২।

১৭১. Report on the Progress of Education, Eastern Bengal and Assam, 1906-1908, Vo.I, P, 28.

১৭২. Report on the Progress of Education, Eastern Bengal and Assam, 1901-1902 to 1906-1907, Vo.I, P, 33.

১৭৩. Report on the Progress of Education, Eastern Bengal and Assam, 1906-1908, Vo.I, P, 28.

১৭৪. সুফিয়া আহমেদ, *বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় (১৮৮৪-১৯১২)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ, ৮৮।

১৭৫. পূর্ব বাংলা ও আসাম শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট, ১৯০৭-০৮, ১৯১১-১২, প্রথম খন্ড, পৃ, ১,৩৪।

১৭৬. M.A. Rahim, The History of the University of Dacca, Dacca University Press, Dacca, 1978, P, 185.

১৭৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডার ১৯২১-১৯২২, ১৯২৪-১৯২৫।

১৭৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৩৬-১৯৩৭।

১৭৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডার ১৯২১-১৯২২।

১৮০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯২১, দুইজন মুসলিম শিক্ষক হচ্ছেন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং অক্সফোর্ড স্নাতক এ.এফ. রহমান। এ.এফ. রহমান প্রথমে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার ছিলেন। তিনি পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ১৯৩৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি উপাচার্য হন। মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের শিক্ষক।

১৮১. Source: Quenquennial report of the progress of Education in Bengal, 1932-1937, Part-I, 180, Bengal Administration Report 1525-1526.

১৮২. পূর্ববাংলা শিক্ষা রিপোর্ট, ১৯৪৭-১৯৪৮, পৃ, ১৬।

১৮৩. পূর্ববাংলা জনশিক্ষা রিপোর্ট, ১৯৪৭-১৯৪৮, পৃ, ১৮।

১৮৪. পূর্ববাংলা জনশিক্ষা রিপোর্ট, ১৯৪৭-১৯৪৮, পৃ, ১৯।

১৮৫. পূর্ববাংলা জনশিক্ষা রিপোর্ট, ১৯৪৭-১৯৪৮, পৃ, ১৭।

১৮৬. পূর্ববাংলা শিক্ষা রিপোর্ট, ১৯৪৭-১৯৪৮, পৃ, ৪৮।

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজ-সংস্কার আন্দোলন এবং কয়েকজন মুসলিম ব্যক্তিত্ব

'সংস্কার' একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ যা পরিবর্তনের বার্তা বহন করে। এই পরিবর্তন কিন্তু ভাল পরিবর্তন। এই পরিবর্তন খারাপ প্রবাহকে দূরে সরিয়ে মঙ্গলজনক প্রবাহকে বেঁছে নেয় এবং মানবজাতি স্ব-কল্যান নিয়ে জীবন-যাপনে সমর্থ হয়। ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, রীতি-নীতি, বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয়ের উপর গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় একধরণের যোগ এসে বিস্তার লাভ করে। এই যোগ আস্তে আস্তে করে উপরোক্ত নিয়ামক-সমূহের অন্তঃরাত্মকে গ্রাস করে ফেলে। আত্মা তখন আলো বাঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। কখনও জেগে ওঠে দেখে চারদিকে কত আনন্দ, কত উচ্চশিরঃ; আবার এমনও হয় কখনও 'আত্মা খানি' জেগে উঠতে ব্যর্থ হয়। আত্মার এই ব্যর্থতা পরিশেষে গোটা একটি জাতির ব্যর্থতায় রূপ নেয়। তাহলে বুঝতে হয় কোন সমাজ তথা জাতির-জাগরণ বড় প্রয়োজন। তবে এই জাগরণের পথটি অত সহজ নয়। যে কেউ চাইলেই জাগরন-এর পথ প্রদর্শক হতে পারে না। ঠিক তেমনি জাগরুকের কাতারে সর্বসাধারণের উপস্থিতি কামনা করাও অযৌক্তিক। অর্থাৎ 'জাগরণ বিষয়টি পুরোপুরি মনঃস্তাত্ত্বিক। যে ব্যক্তির মধ্যে সংস্কারের চিন্তা আসে সেই জাগরণ ঘটাতে পারে। সমাজে বর্তমান বহুল প্রচলিত কুসংস্কার শব্দটি হতে 'কু' কে বাদ দিতে হলে প্রয়োজন পড়ে সংস্কারবাদী ব্যক্তিবর্গের সংস্কার আন্দোলন-এর। কতিপয় সংস্কার আন্দোলন যখন জিতে যায় তখনই একটি জাতিপুনগঠিত হয়, পবিত্রতর হয়, উজ্জ্বল হয় এবং এভাবে জাগরণের অসীম সম্ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। দিকভ্রষ্ট পথিকদল তখন প্রকাশিত উন্মুক্ত আলোকোজ্জ্বল পথটিকে অনুসরণ করে জাতির উন্নতি সাধন করে। 'কু,- কথাটি আর জাতির আত্মায় বাসা বাঁধতে পারে না। সংস্কারবাদী ব্যক্তিবর্গের স্বার্থকতা ঠিক এখানেই। মানুষ সমাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব নেই। যারা সন্ন্যাসী তাদের সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে না; কেননা বনে-বাদারে যে থাকে সে নিজেই নিজের অবলম্বন। তার দ্বারা পশু-পাখি বিরক্ত হতে পারে; কিন্তু মানুষ নয়। তবে জঙ্গলে গিয়ে ধ্যানকর্ম সাধন করে অনেক মহাপুরুষ যেমন সমাজে ফিরে এসেছেন তেমন পরিবর্তনের বারুতায় সমাজেও দোল দিয়েছেন। মুসলিম তথা ইসলাম ধর্মের অনুসারী মানুষদের মধ্যে থেকেই সমাজে বিদ্যমান নানাবিদ কুসংস্কার, প্রথা, প্রচলিত মানব অকল্যাণ ধারনাসমূহ অপসারনের ইচ্ছা জাগে। আর এই অপসারেণের নেতৃত্বে ছিলেন আল্লাহর প্রিয় নবী ও রাসুল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। পরবর্তীতে তাঁরই ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টায় নিয়োজিতছিলেন খলিফাগণ। যতদিন তারা বেঁচেছিলেন ততদিন সমাজ হতে সকল ধরনের কলুষতা দূর করার চেষ্টায় তারা সজাগ ছিলেন। পবরর্তীতে খলিফাগণের সহযোগিতায় ইসলামধর্মের পুরুষগণ যথাক্রমে তলোয়ারের জোরে ও মহান বাণী প্রচারের মধ্যে দিয়ে ইসলাম যে শান্তির ধর্ম তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। ভারতে ইসলামের প্রচার-প্রসারে সুফী সাধকদের ভূমিকাই ছিল প্রধান।[১] সারাদেশে মুসলমানদের ধর্মীয়জীবনে এদের প্রভাবও ছিল অতি ব্যাপক। গোঁড়া সুন্নীদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে এদের জনপ্রিয়তা গড়ে উঠেছিল। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে একই উস্তাদ বা পীরের অধীনে মুরিদ বা শিষ্যগণ একত্রে বসবাস করে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও নিয়ম-নীতি পালনের মধ্যে দিয়ে এক একটি তরীকা গড়ে তোলেন। প্রতিটি তরীকা তার প্রতিষ্ঠাতার নামে

পরিচিত হয়। ভারত উপমহাদেশে চারটি তরীকা প্রাধান্য বিস্তার করে। এগুলি হচ্ছেঃ কাদিরীয়া, সুহ্রাওয়ার্দীয়া, নবাশবন্দীয়া ও চিশ্তীয়া।[২] পরবর্তীকালে মুসলিম শক্তির করায়ত্ত হলে সূফী-প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করে। উত্তর-ভারতীয় সুফিরাই বাংলায় সুফী প্রভাবের মূল উৎস। বাংলায় শেষ পর্যন্ত সুফী প্রভাব আর বিশুদ্ধ থাকতে পারেনি, বরং বিকৃত হয়ে নতুন ও স্বাধীন মূর্তি ধারন করে। এর সঙ্গে ক্রমে এদেশের সংস্কার ও বিশ্বাস সম্মিলিত হতে থাকে এবং এক সময় সুফী মতবাদ ও সাধন পদ্ধতি, যোগ সাধন প্রভৃতি হিন্দু পদ্ধতির সঙ্গে আপোষ করে নিতে থাকে। হিন্দু পদ্ধতির প্রভাবে ইসলাম ধর্ম তার মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে এক নব মতাদর্শের দিকে ধাবিত হয়। এভাবে ক্রমে ভারতে পীরবাদ প্রসার লাভ করে। পীরবাদ হিন্দু গুরুবাদেরই নব্য সংস্করণ। পীরবাদের ফলে ভারতে মুসলমানদের জীবনে ইসলাম পরিপন্থী বিভিন্ন ভাবধারা ও আচার-অনুষ্ঠান অনুপ্রবেশ করে। পীরের আস্তানায় মানত, তাঁর মূর্তিধ্যান, জীবিত ও মৃত পীরের নিকট বিপদমুক্তির জন্য প্রার্থনা, পীরের কবরের উপর সৌধ নির্মাণ, কবরে আতর, গোলাপ পানি ও লোবান দেওয়া ফুল ও বাতি রাখা এবং পীরের নামে উৎসর্গীকৃত বস্তুকে তবরুক বা প্রসাদ বলে গ্রহণ করা ইত্যাদি আচারের প্রচলন পীরবাদেরই ফল।[৩] সুফী সাধনায় পৌত্তলিক প্রভাবের ফলে ইসলাম তার ভিত্তি থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয় এবং তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে এক সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের। ইসলামের সংস্কার সাধন ও পুনর্জাগরণের সূর তুলে সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন সৈয়দ আহমদ সরহিন্দী (১৫৬৩-১৬২৪), যিনি মুজাদ্দদ আলফ-ই-সানী নামে প্রসিদ্ধ। যিনি জোর দিয়ে বলেন যে, আল্লাহ স্বয়ং বিদ্যমান ও স্বয়ং-প্রতীয়মান এবং তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্য আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া অপেক্ষা শরীয়তের প্রতি আনুগত্যের উপরই অধিকার সাফল্য নির্ভর করে।[৪] পরবর্তীকালে ভারতীয় মুসলমানদেরকে ধর্মবহির্ভূত আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব থেকে মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আবির্ভূত হন দিল্লীর শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৭০৩-৬২) বাল্যকালে তিনি নক্শবন্দীয়া তরীকায় দীক্ষিত হয়েছিলেন।[৫] কিন্তু সুফী প্রভাব তাঁর জীবনে কার্যকরী হতে পারেনি– আরবে শিক্ষালাভ এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। আরবে তার শিক্ষা গ্রহণকালে সেখানে, বিশেষত চিন্তারক্ষেত্রে, একটি 'পিউরিট্যানিক, ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। মূলচ্যুত ইসলামকে আদি বিশুদ্ধতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিলো এই আন্দোলনের লক্ষ্য। এটাই আরবের 'ওহাবী আন্দোলন'– যার প্রভাব ভারতে, এবং সেই সূত্রে বাংলায়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ ওহাবী মতবাদের সাথে চরম একাত্মতা বোধে জড়িত ছিলেন না 'তিনি মনে করতেন, ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সুফী মতবাদের সাথে সংস্কার সাধন যোগ হয়ে শাস্ত্রীয় ইসলাম গঠনেই তিনি বেশী ব্যস্ত ছিলেন। গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় ওহাবীরা যেরকম সুফিমতবাদকে তাচ্ছিল্যের সাথে উচ্ছেদ করে, তিনি তা চান নি।[৬] ধর্ম সম্পর্কে ওয়ালীউল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার। তাঁর ধারনায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি বিধানের জন্যই ধর্ম পালনের আবশ্যকতা, ধর্মের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের স্থান তার পরে। ধর্মকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে তিনি ইসলামের আদি সারল্য ও বিশুদ্ধতায় প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিলেন। বিধবা বিবাহের অপ্রচলন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অমিতব্যয় ও অনাবশ্যক আড়ম্বরের তিনি বিরোধী ছিলেন এবং পীরপ্রথার বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন প্রতিবাদমুখর।[৭] শাহওয়ালীউল্লাহর মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র শাহ্ আবদুল আজিজ ও শাহ্ আবদুল কাদির পিতার ভাবধারা প্রচার অব্যহত রাখে। তাদেরই নামকরা শিষ্য ছিলেন সৈয়দ আহমদ বেরেলভী; যিনি আলোচ্য সংস্কার ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। যে প্রসিদ্ধি

ইংরেজদের চোখে মুসলমানদেরকে আরও ভয়াবহ সন্ত্রাসরূপে প্রতিপাদ করেছিল। সৈয়দ আহমদ ১৭৮৬ খ্রি. যুক্ত প্রদেশের রায়বেরিলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম হাসানের বংশের অধঃস্তন ৩৪তম পুরুষ। ১৮০৬ সালে দিল্লীতে কায়াত হওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতের ইসলামের পবিত্রতা রক্ষার আন্দোলনে নিজেকে আবির্ভুত করেন। ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন তাঁর মজ্জাগত হলেও পরবর্তীতে ভারতীয় মুসলমানদেরকে নানাবিধ অনৈসলামিক ভাবধারা লালন করে সমাজ কলুষিত হচ্ছে দেখে সমাজের এই অধঃপতিত (তাঁর দৃষ্টিতে) মানুষজনকে অনৈসলামিক ভাবধারা হতে মুক্ত করে ইসলামের আদি বিশুদ্ধতায় ফিরিয়ে নিতে তিনি তার আন্দোলন অব্যহত রাখেন। প্রশ্ন আসে ধর্মীয় আন্দোলন যারা শুরু করতেন তারা আস্তে আস্তে সেসব আন্দোলনের সূর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের দিকে নিয়ে যেতেন কেন? মানুষ সামাজিক জীব, চারটি প্রধান ধর্মের মনুষ্যজাত হিসেবে সমাজ তার পরিচয় নির্ণয় করে। সমাজে বসবাস করতে গেলে একধর্মের প্রভাব আরেক ধর্মের উপর পড়ে। সংখ্যাগরিষ্ঠ গোত্রীয় ভেদ হিসাবে তাই মানব গোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ কোন ধর্মের বেশি, কোন ধর্মের কম সে হিসাবে রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্রে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সমাজের রীতিনীতিগুলিও আলাদা। এই সমস্ত রীতিনীতিগুলিও কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে তৈরী হয়। যেমন: ইসলাম ধর্মের পর্দা প্রথা।

১৮৩১ সালে শিখদের হাতে সৈয়দ আহমদ-এর মৃত্যুর পরেও তার অনুসারীদের আন্দোলন চলমান থাকে। তরীকা-ই-মুহম্মদীয়ার নেতৃত্ব-ভার অবশেষে গৃহীত হয় বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলীর উপর। তবে তাদের আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল পাটনা। ১৮৪৭-১৮৫১ পর্যন্ত বাংলা হতে আরম্ভ করে পাঞ্জাব অবধি তাঁরা সরকার বিরোধী আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত থাকত।[৮] তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া মতবাদ আস্তে আস্তে জিহাদী মতবাদের রূপ পরিগ্রহ কওে এবং পরে এই মনোভাব সমাজকে সংস্কার না করে ইংরেজ বিরুদ্ধ মতবাদকে জোগান দিতে থাকে। আর তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়ার চূড়ান্ত পতনের সূচনা এই সময় থেকেই শুরু। অবশেষে ১৮৭০ সালে তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়ার পতন নিশ্চিত হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলায়ও তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের মতো দুটি সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে। পশ্চিম বাংলায় এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন মৌলভী নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। প্রথমদিকে তার আন্দোলন ছিল ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার আন্দোলন। পরবর্তীতে দরিদ্র রায়ত মুক্তি আন্দোলন হয়ে উঠেছিল তার আদর্শের মূল। তিতুমীর কর্তৃক পশ্চিম বাংলার এই আন্দোলনের ধারা ১৮৩১ সালে ইংরেজদের দৌরাত্মে ধূলিস্মাত হয়ে যায়। আলোচ্য সময়ে পূর্ব বাংলায় অনুরূপ একটি আন্দোলন চলতে থাকে, যে আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ, যিনি মক্কায় ওহাবী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।[৯] হাজী শরীয়তুল্লাহর সংস্কার মতবাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের আদি অবস্থার পুনঃস্থাপন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তবে তার মৃত্যুর পর তার পুত্র দুদু মিয়ার হাত ধরে শরীয়তুল্লাহর ধর্মীয় সংস্কারবাদী আন্দোলন অবশেষে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহণ করে। এরপর সংস্কার যুগে আবির্ভুত হন মৌলানা কেরামত আলী জৌনপুরি। তিনি মূলত ইংরেজ বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন না; বরং তাদের সাথে তিনি প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী ছিলেন। ১৮৭০ সালে দেওয়া তার একটি ফতোয়া এর প্রমাণ বহন করে। ঐ ফতোয়াটি এমন ছিল যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ কেবল অযৌক্তিক তা নয়, বরঞ্চ তেমন কোন সংগ্রাম দেখা দিলে মুসলমানের কর্তব্য হবে

তথাকথিত জিহাদীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করা।[১০] মৌলানা কেরামত আলী জৌনপুরির মূল মতবাদ বা আদর্শ ছিল ফরায়েজী আন্দোলনকে সমূলে উৎপাটিত করা। তার মতবাদের নাম ছিল 'তাইয়ুনী মতবাদ'।[১১] এভাবে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের প্রায় শোষার্ধ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মীয় কতিপয় প্রায় সকল সংস্কারবাদীদের মূল টার্গেট ছিল মূলত সমাজকে ধর্ম-বহির্ভূত আচার-অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত করা, তবে তাইয়ুনী ছিল এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। ইসলামের প্রতি চরম রক্ষণশীল ছিলেন তারিকায়-মুহাম্মদীয়া মতবাদের নেতাগন আর অপরপাক্ষে তাইয়ুনী মতবাদ ছিল উদারপন্থী মধ্যম পন্থা অবলম্বনে বিশ্বাসী। তাহলে এখন খুঁজতে হবে সেই রেডিকেলদেরকে যারা কিনা সংস্কারের এই অসীম পালাবদল প্রক্রিয়ায় প্রগতিবাদী ছিলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের নানাবিধ কারণ বিদ্যমান। দীর্ঘদিনের জমানো ক্ষোভ লালন করে মূলত সমাজে বিদ্যমান গোড়া ধর্মচেতন রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন মানুষগণ। ইংরেজদের মাধ্যমে তৎকালীন ভারতবর্ষে একটির পর একটি যে সংস্কার সাধন হচ্ছিল তা রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন সৈনিকগণ মেনে নিতে পারেনি। রাজা রামমোহন রায় যখন তার সতীদাহ প্রথা রোধ করার আইন পাস করাতে লর্ড ব্যন্টিংক-কে বলেছিলেন তখন লর্ড সাহেব রামমোহন রায়কে এই আশু বিপদের কথা স্পষ্ট ব্যক্ত করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাই হল। তাহলে বলতে হচ্ছে বাংলা তথা ভারতবর্ষে সংস্কার সাধন কঠিনযজ্ঞ। তারপরেও এই বাংলায় সংস্কার সাধিত হয়েছে এবং হতেই থাকবে। তবে সংস্কারসমূহ আপামর জনসাধারণের কল্যানে গিয়ে যেন নিপাতিত হয় সংস্কারবাদীদের সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া অতি প্রয়োজন। সমাজ সংস্কার নামে অরাজকতা সৃষ্টি হচ্ছে কিনা সে খেয়ালও রাখা প্রয়োজন। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে হিন্দুদের সে রকম অগ্রসরতা মুসলমানদের মধ্যে সেরূপ দেখা যায় না। মুসলমানগণের মধ্যে যারা উজ্জীবীত জ্ঞানী পুরষ তারা ইংরেজ শাসনের পূর্ব হতে ভারত ভাগ পর্যন্ত (বিশেষ করে) সমাজে বিদ্যমান নানাবিধ কুসংস্কার-কলুষতা ও নোংরামীকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করত এবং যে দৃষ্টিতে আবিষ্কার করে তার সমাধানের চেষ্টা করত সেটা অতি ফলপ্রসু হত না। অপরদিকে হিন্দু মহাপুরুষদের দেখার দৃষ্টি ছিল একটু অন্যরকম। তারা কলুষতার গোড়ায় গিয়ে তাকে আবিষ্কার করত যার ফলে বিদ্যমান নিয়ামকগুলি উৎসসহ দৃষ্টিগোচর হতো। অপরপক্ষে মুসলমান মহাপুরুষগণ ইসলামকে শুদ্ধ করার ব্রত নিয়ে সংস্কার আন্দোলনে নেমে অবশেষে সমাজে গিয়ে তার গতি পরিবর্তন করতেন, তাই মানুষের আস্থার জায়গাটি তাঁরা বেশি জয় করতে পারতেন না উপরন্তু শক্তিধর প্রভূদের ক্ষমতা না জেনে মুসলিম মহাপুরুষেরা চিন্তা-চেতনাকে মিলিয়ে নিতো। মূলত এই রকমন মনস্তাত্তিক আচরনের পিছনে একটি মূলক পদার্থ লুক্বয়িত আছে। বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার পূর্বে মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির একটু আলোকপাত করা যেতে পারে।

মুঘল আমলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিল ব্যবসায় বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। দেশের ভিতরে লৌকিক প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি সমন্বয়ের কাজটি ছিল অনেক দূর এগিয়ে। নবাব-পরিবারে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান যেভাবে প্রবেশ লাভ করেছিল, তা থেকেও এই সমন্বয়ের ব্যাপারটি উপলব্ধি করা সম্ভব। মতিঝিল প্রসাদে শাহমত জঙ্গ ও মউলত জঙ্গ, মনসুরগঞ্জ প্রসাদে সিরাজউদ্‌দৌলা সানন্দে 'হোলি' উৎসব পালন

করেছিলেন।[১২] মীরজাফরও হোলিতে অংশগ্রহণ করতেন এবং মৃত্যুর মুহূর্তে দেবী কীর্তীশ্বরীর পাদোদক পান করতে সংকোচ বোধ করেন নি।[১৩]

সিরাজউদ্‌দৌলা সাড়ম্বরে ভেলা ভাসন পর্ব ও হোলি উৎসবের আয়োজন করতেন এবং আরো কয়েকটি অনৈসলামিক অনুষ্ঠানের মতো এটি অভিজাত মুসলমানদের খুব প্রিয় ছিল।[১৪] কেবল সমাজের উপর মহলেই নয়; সমস্ত সমাজদেহেই ধর্ম-সমন্বয়ের কাজ চলছিল। কেবল নবাবি আমলে নয়, তার বহু আগে থেকেই এই কাজ শুরু হয়েছিল। এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এদেশে ইসলাম প্রচারিত হয় প্রধানত সুফীভাবধারায় অনুপ্রাণিত পীর-দরবেশের দ্বারা। সুফী সাধকেরা ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকটা উপেক্ষা করেছিল। যে বিস্তৃত জনসমষ্টিকে এঁরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন, তাঁরাও ইসলাম সম্মত সকল আচার অনুষ্ঠানকে জীবনে গ্রহণ করেননি। এদেশের অধিবাসীরা অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে।[১৫] ধর্মমত-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাই সকলের মনের বদল হয়নি এবং পূর্বকালের অনেক সংস্কারও তাদের মধ্যে অক্ষুণ্ন রয়ে গিয়েছিল। অনেক ইউরোপীয় গবেষক ভারতে ইসলামের প্রভাবের উপর চারটি পথ নির্ণয় করেছেন। এগুলি হচ্ছে- হিন্দু-মুসলমানের বিবাহ (বিশেষ করে হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ মুসলমানদের মধ্যে একটি বহুল প্রচলিত প্রথা ছিল), মুসলমান পীরের হিন্দু মুরীদ এবং হিন্দু যোগীর মুসলমান শিষ্য গ্রহণ, মুসলিম-মানসে হিন্দু চিন্তাধারা ও লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব (আকবর ও দারাশিকো যার প্রতিভূ) এবং ধর্মান্তরণের অসম্পূর্ণতা (ধর্মীয় শিক্ষার নির্ভরযোগ্য পটভূমি ব্যতিরেকেই ইসলাম গ্রহণ)।[১৬] এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে দেবীপূজা, পীর পূজা, তাবিজের ব্যবহার, জ্যোতিষ বা ভবিষ্যত বানীতে বিশ্বাস, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে কুরআন শরীফ খুলে দেখার প্রথা, ভূতপ্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস, হোলি ও দিওয়ালীর মত উৎসবে যোগদান এবং মুসলমান ফকীরদের মাথার চাঁদি কামানো ও সর্বদেহ ভস্মাচ্ছিদ করার রীতি প্রভৃতি দেখা যায় । একই সাথে হিন্দু সমাজের অনুকরনে একধরনের বর্ণপ্রথাও গড়ে ওঠে।[১৭] অবশ্য ইসলামের উপরে এই অনৈসলামিক প্রভাব যে কেবল ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, একথা বলা চলে না। বিজয়ী ও বিজেতাদের ধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা মুসলিম অধিকৃত পারস্যেও হয়েছিল। তাই দেখা যায়, জোরাস্টার ইবরাহীমের সঙ্গে, আবেস্তা যুহুফের সঙ্গে এবং অনৈতিহাসিক ও পৌরানিক রাজা জমাসিদ সোলেমানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উঠেন।[১৮] একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতে মুসলমানদের উপর অনৈসলামিক প্রভাবের দরুন যত কুসংস্কারের সৃষ্টি। কেননা ইরানেও একই ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং যার মিল আরবের ধর্মের (ইসলামের জন্মভূমি) অবিকৃতকরণের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। আর ধর্মের যে বিকৃতিকরণ হয় এবং সে তার সঠিক শুদ্ধ অবস্থান খুঁজে ফেরে তার সবচাইতে বড় প্রমাণ ওহাবী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা। বিশুদ্ধ ইসলাম ওহাবী মতবাদকে স্বীকৃতি দিবে এটা সত্য, তবে এটাও সত্য যে বাংলার মানুষের ভিতরটা এই বাংলার কর্দমাক্ত মাটির মতই নরম। ধর্ম সম্পর্কে স্বাতন্ত্রবোধও আবার এক ধরনের পৌত্তলিকতার জন্ম দেয়। যেমন হিন্দুধর্মের যেখানে দেবতারা একেক জন এক এক ধরনের সৃষ্টির সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে ধরে রাখে। যেমন মনসাদেবী সে সর্পদের ক্ষমতা ধরে রাখে, আবার মেঘদেবতা সে সমস্ত মেঘ ধরে রাখে কখনও প্লাবন দেয় আবার কখনও প্লাবন থেকে মানুষকে রক্ষা করে। দেবতা রামের এক ধরনের ক্ষমতা, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের এক ধরনের ক্ষমতা। কারও কাজ কেউ করে দিতে পারেনা। এখানে সবাই সবার ক্ষমতা নিয়ে

স্বতন্ত্র। এই জন্য কখনও কখনও এক দেবতা আরেক দেবতাকে মানব মঙ্গলের জন্য অনুরোধ করে। আবার যার যে ধরনের সমস্যা সে ঠিক সেই সমস্যাকে চিহ্নিত করে তদানুয়ায়ী দেবতা বাছাই করে তার পূজা ও ভক্তি করে দেবতার অন্তর জয় করা। মানুষ বেঁচে থাকতে গিয়ে দেখল তার হরেক ধরনের সমস্যা। যেহেতু এখন আমার বিদ্যা প্রয়োজন তাই স্বরস্বতীকে পূজা করাই শ্রেয়, মানুষেরও যেন কিছুই করার নেই। কেননা বিদ্যার দেবী যেহেতু ঘরে অর্থ আনতে পারে না, বাধ্য হয়ে সে অর্থ দিতে পারে এমন ক্ষমতাবান দেবতার কাছে যায় এভাবে একটি ভারসাম্যতা সর্বদাই চলতে থাকে এবং দেবতারা স্বতন্ত্ররূপে স্বতন্ত্র ক্ষমতায় অবগাহন করে ভক্তকূলে পূজা-আর্চনা লাব করে। প্রাচীনকালে যখন আকাশে বজ্রপাত হত মানুষ ভয় পেত, সে বাঁচতে চাইত... বাঁচার অসীম আগ্রহে উপরন্তু নিজের বাচ্চাদেরকে রক্ষার জন্য সে উপরে তাকিয়ে ক্ষমতাধর সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজত যে কিনা তাকে ও তার সন্তানদের বাঁচাবে, তখন সে দেখল সূর্যের পখর রোদ,,,,,,,,,, মানুষটি দেখল সূর্যের আলো এই ঝড় ও বৃষ্টি সরিয়ে দিতে পারে। তারমানে সূর্যকে সে দেবতা ভাবল। পরে আবার অতিরিক্ত তাপে যখন বাঁচা মুশকিল তখন মানুষটি আবার উপরে তাকাত, নামত শীতল বৃষ্টি। দাবদাহ শেষ। তার মানে দুই বেদতাই ক্ষমতাধর; অতঃপর দুই দেবতাই পূজ্য হল। এভাবে ভয় থেকে অবলম্ববন এবং অবলম্বন থেকে পূজা। পৌত্তলিকতার সূরের মিল অনেক আগে থেকেই সমাজে সৃষ্ট। হিন্দুদের মন থেকে উত্থিত ধর্ম অবশেষে মুসলিমদের জন্য হল কুসংস্কার। সেটা কিভাবে তা দেখা যাক– হিন্দু দেবদেবীদের সংখ্যাধিক্য ও তাদের গুণাবলীর পরিচয় মুসলিম মানসে যে প্রতিক্রিয়ায়র সৃষ্টি করে, তার ফলে এসব দেবদেবীর মুসলমান প্রতিরূপও গড়ে ওঠে, যেমন: হিন্দু বনদুর্গার প্রতিপক্ষ মুসলমানের বনবিবি ফাতেমা, বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের রূপান্তর গাজী পীর ও কালু শাহা, মৎস্যেন্দ্রনাথের মুসলমান সংস্কার পীর মসন্দলি, সত্য নারায়নের প্রতিরূপ সত্যপীর। শীতলা, ওলাবিবি প্রভৃতি দেবদেবী হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই পূজ্য ছিল। মুসলমান সমাজে খাজা, খিজির, বদর পীর, মানিক পীর ও পাঁচ পীরের উপাসনাও দেখা যায়। এইসব পীরের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ছিল কিনা, সে সম্পর্কে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। হিন্দুরা যেমন পীরের আস্তানায় মানত করতেন ও দরগাহ শিরনি দিতেন, তেমনি মুসলমানেরাও পীরের আস্তানায় গরু-ছাগল দিত এবং মসজিদ-দরগা ও মাজারে শিরনি দিত। এখন একটি বিষয় জানার আছে। তা হল– মুসলমানদেরকে হিন্দুরা অনুকরণ করল না হিন্দুদেরকে মুসলমানেরা।

এই দেব ও পীর-পূজার পশ্চাতে অমুসলিম ভাবধারার প্রভাব কেবল প্রত্যক্ষভাবে নয়; সুফী চিন্তাধারার মাধ্যমেও কিছুটা সঞ্চারিত হয়েছিল। সুফীবাদের ভিত্তি অবশ্য কুরআন শরীফের কতকগুলি সূরায়, কিন্তু এতে নিওপ্লাতোনিজম ও বেদান্ত দর্শনের প্রভাব আছে।[১৯] খ্রিষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়।[২০] স্রষ্টার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পনের শিক্ষা দিয়েছিলেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। প্রথম যুগের সুফী সাধকদের প্রধান লক্ষও ছিল তাই, কিন্তু পরে তারা পীরের কাছেসম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করতে শেখান। সুফী ধারনামতে, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সত্যপথে চলার জন্য পীরের নির্দেশ অত্যাবশ্যক। সুফীর সঙ্গে পীরের একাত্মতায় তাঁরা আস্থাবান। তাই পীরের চিন্তায় নিজেকে লীন করে দিলেই বাঞ্ছিতের সঙ্গ সুখ লাভ করা সম্ভবপর বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন।[২১] ইমাম গাজ্জালীর মতো দার্শনিকও বলেছেন যে, যার কোন পীর নেই, শয়তানই তার

পথপ্রদর্শক।[২২] সুফী মতবাদের বিকাশের ধারায় পীরবাদের আবির্ভাবের মূলে বৌদ্ধ ধর্মত্যাগী মুসলমানদের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও হিন্দু মানসিকতা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল– এমন অনুমান অসঙ্গত নয়।[২৩] সুফী সাধনার 'ফানা', ' মোরাকাবা' ও কেরামতের সঙ্গে ভারতের 'নির্বান', 'যোগ' ও অলৌকিকতাকে মিলিয়ে নিলে দাড়ায়, 'জিকির' ও 'প্রাণায়াম' সম।[২৪] সুফী প্রভাব বিশেষ করে, সুফী সাধকদের প্রভাব সারা ভারতবর্ষেই ব্যাপক ছিল। গোঁড়া সুন্নীদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে এঁদের জনপ্রিয়তা পল্লবিত হয়েছিল। *আইন-ই-আকবরী*তে চৌদ্দটি সুফী সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে: তাঁদের মধ্যে চিশ্‌তী, সুহরাওয়ার্দী, কাদিরী, সাত্তারি ও নক্‌শবন্দী শাখা প্রধান।[২৫] ভারতে প্রাচীনকাল থেকে 'গুরু শিষ্য' প্রথা চলে আসছিল বলে সুফী সাধনাসম্মত পীর প্রথাও ভিত গাঁড়তে সক্ষম হয়। নবদীক্ষিত মুসলমানেরও পীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁদের পৌত্তলিক মনকে সান্ত্বনা দেবার একটি অবলম্বন খুঁজে পেলেন।[২৬] এভাবে আস্তে আস্তে করে নিজের মতই আধ্যাতিক চিন্তা ধারার অবয়বে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে তৈরী হয় এক আপেক্ষিক ইসলামতত্ত্ব।

সমাজ সংস্কার বিষয়টির ক্ষেত্র বিস্তৃত বলে অনুধাবনমূলক প্রেক্ষাপটের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কেননা মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার এতো গভীরে ছিল যে, এর সংস্কার প্রয়োজন এই চিন্তাটিও আসল হিন্দুদের পরে। এখানে হিন্দুদের পরে বলার কারণ এটি যে, বাংলায় ইসলাম প্রচারের পর হতেই শুদ্ধ ধারায় ইসলামের প্রচারের অভাবে সমাজে ইসলামি আদর্শ তেমনটা কার্যকর ছিল না। শিক্ষার ক্ষেত্রেও মসলমানরা পিছিয়ে ঠিল। একটি সংবাদ পত্রের ভাষায়, 'The educational Seed was sown late into the Mahomedan mind, and hence the crop was also reaped late'।[২৭] ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে হিন্দু সমাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আয়ত্ত করে নেয় এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থ ভাণ্ডার ও গণমাধ্যম থেকে ব্যস্ততার সঙ্গে পাশ্চাত্য-আদর্শ আহরণ করে। এর প্রথম প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয় প্রথম দিকের হিন্দু সংস্কার আন্দোলন সমূহে যার মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক সংস্কার। বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়[২৮] ১৮২৮ খ্রিষ্ট্রাব্দে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন– যা ছিল আস্তিকবাদী; যেখানে সতীদাহ প্রথা রদ্ চাইত এবং মৃত পূজার ও বর্ণাশ্রমেরসমালোচনা করত।[২৯] এ-ধরনের সামাজিক সংস্কার সমাজের অন্ধকার দূরীকরণে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৭৬ সাল নাগাদ বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে এক ধরনের জাগরণ সূচিত হয়। তারা পশ্চিমাধরচের রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালানোর চিন্তা করছিল। কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তখন পর্যন্ত এ-ধরনের কোন চেতনা দেখা যায় নি, যার মূল কারণ ছিল পশ্চিমা শিক্ষা-গ্রহণে ধীরগতি। সিপাহী বিদ্রোহের আগে যে এত বড় বড় আলোড়ন তৈরীতে মুসলিম মহাপুরুষগণ ছিলেন তাদের মধ্যে কখন কোন সংস্কারবাদী রাজনৈতিক কার্যকলাপ দেখা যায়নি। মুসলমানরা হলো–'Suffered most at the hands of the British when the Mutiny had been quelled.'কেননা, 'the rebellion was regraded, quite unjustly, as having had its origion among them.'[৩০] বৃটিশ শাসকরা ধরে নিয়েছিল যে, এই বিদ্রোহ ক্ষমতা দখলের জন্য মুসলমানদের চেষ্টা এবং তারা দিল্লীতে মোগল শাসকদের পুনর্বাসন চেয়েছিল।[৩১] অপরদিকে আলোচ্য বিদ্রোহের সময় বাংলা ছিল শান্ত। তবুও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের মত বাঙালি মুসলমানরাও একই অভিযোগের শিকার হয় এবং সরকার তাদেরকে অবিশ্বাস ও সন্দেহের চোখে দেখত। উপরন্তু, ব্রিটিশদের ওহাবী[৩২] ও ফরায়েজী আন্দোলন দমন বাঙালি

মুসলমানদের আরও সতর্ক হতে বাধ্য করে যাতে করে তারা সতর্কভাবে সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপ এড়িয়ে চলে। ১৮৭১-এ প্রকাশিত ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার-এর*The Indian Mussalmans*গ্রন্থ থেকে স্পষ্ট যে, তখনও বৃটিশদের মনে মুসলমানদের জন্য অবিশ্বাস বিরাজমান ছিল। ব্রিটিশদের সবকিছু এড়িয়ে চলাকেও মুসলমানরা নিরাপদ মনে করত।[৩৩]পরিণামে, এ সময় মুসলমান সম্প্রদায় এক রকম অনীহা ও উদাসীনতার মধ্যে দিন যাপন করে এবং এমন কোন রকমের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকালাপে অংশ নেয় নি- যা শাসকদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। এ-সময় মুসলমানরা ছিল, "in the deepest depths of degradation and decay." মুসলমানরা শীঘ্রই অনুভব করে[৩৪] যে, ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ না করে তাদের সম্প্রদায় একটি ভূল করছে। এইরকম উপলব্ধি বোধ বাংলার কয়েকজন অগ্রণী পুরুষের মাথায় আসে, যারা ইংরেজী শিক্ষার মধ্যদিয়ে মুসলমানদের উন্নয়নে ব্রত হন। তাদের মধ্যে সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আবদুল লতিফ, নওয়াব আলী চৌধুরী, স্যার সলিমুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী, স্যার আজিজুল হকসহ কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছেন।

সমাজে সংগটিত সংস্কার বুঝতে জ্ঞানের প্রয়োজন। কুসংস্কার হতে মুক্ত হয়ে মানুষ যত আলোর দিকে যায় ততই সংস্কার স্পষ্টতর হয়। সংস্কারপ্রাপ্ত সমাজকে মূলত কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের ইতবাচক পরিবর্তন, যেমনঃ নারীর ও শিশুর সুস্বাস্থ্যগত সচেতনতা সৃষ্টি সে হিসেবে নিরাপত্তা নিশ্চিততকরণ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও ব্যাপক প্রসারণ, তবে অবশ্যই মাতৃভাষাকে সম্মান দেখিয়ে, মেয়ে শিশুর মনোজগত ইতিবাচক হিসাবে পিতা-মাতার গড়ে তোলা যেখানে সে জানবে 'আমরা সবাই সমান', বিধবা বিবাহ প্রচলন, সন্তানের পিতার বিবাহ রোধকরণ, রেলগাড়ি ও টেলিগ্রাম চালুকরণ, যৌতুক প্রথারোধকরণ, বর্ণবৈষম্য দুর, জাতিগত দ্বন্ধের নিরসন সেই সাথে পরিচ্ছন্ন সমাজ বিনির্মাণ ও অন্যায়ের প্রতিবাদে বিভিন্ন সভা-সেমিনারের আয়োজন নিশ্চিতকরণ। এই বিষয়গুলোর চাহিদা যেমন বাংলায় আধুনিক যুগ শুরু হওয়ার আগে মুসলিমদের মধ্যে ছিল না, তেমনি এর উপস্থিতিও ছিল না; বরঞ্চ ১৮৫৭-এর পর হতে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানগণ সেটি উপলব্ধি করতেই সময় পার করে ফেলে। অতঃপর ১৮৮০-১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল জাগরণের বার্তা শ্রবন এবং তারপর বিংশ শতকের কাঠগোড়ায় গিয়ে আলোকের বার্তা গ্রহণ ও পরিবর্তনময় বাংলায় পরিবর্তনমুখী মুসলিম সম্প্রদায় (অল্প পরিসরে)। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ ও মুসলিম মানসের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সেই সাথে সচেতনা, সমাজ শোভিত করার নিয়ামক সমূহকে আলোক দীপ্ত মানুষ দিয়ে কিভাবে শোভন করা যায় তার প্রচেষ্টা। ১৯০৫ সাল হতে সময় বাড়তে থাকল মুসলমান মনোজগৎ বিকাশিত হতে থাকল। তারা ধরতে থাকল সেইসব উপাদান ও জ্ঞান যা দিয়ে পরিবর্তন হয় কলুষময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ চিত্রের কেন্দ্র।

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ধর্ম ও সমাজচিন্তা মূলত ব্যপ্ত ছিল সনাতন বিশ্বাস, প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের মধ্যে। আভিজাত্যকে বহাল রাখার জন্য মুঘল সরকার অপরিবর্তনের ধারাকে সমুন্নত রাখত। কিন্তু অপরিবর্তনের ঐতিহ্য দারুনভাবে প্রভাবিত হলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে। ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর অল্পসময়ের মধ্যে পতনশীল

অভিজাত শ্রেণির মধ্যে দেখা দেয় বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও অবক্ষয়। স্বাভাবিক কারণেই সমাজের ওপর আভিজাত্যের প্রভাব ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে পাশ্চাত্য পৃষ্ঠপোষকতায় একই সময়ে একটি নব্য সংস্কারমনা শ্রেণি গড়ে ওঠে। পাশ্চাত্যপুষ্ট এ নব্য শ্রেণির একটি লক্ষ্য ছিল সনাতন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধন। মুসলিম সমাজেও একই সময়ে কতিপয় সংস্কারমনা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। এ পরিবর্তন ধারার প্রথম পর্ব সূচিত হয় উনিশ শতকের প্রথমভাগে হাজী শরীয়তউল্লাহ, তিতুমীর, রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক। সংস্কার আন্দোলন মূলত হিন্দু-মুসলিম পাশা-পাশি চলছিল; তবে শিক্ষার কারণে হিন্দুদের সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, তাৎপর্য ও সার্থকতা ছিল অর্থবহুল। সেই তুলনায় মুসলমানরা অনেকটাই ধীর গতিতে চলছিল বলে আধুনিকতার সূচনা আনয়নে মুসলিম সম্প্রদায় অনেক দেরী করে ফেলেছিল। আলোচনার বিষয়বস্তু যেহেতু সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও কতিপয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব; এক্ষেত্রে আমাদের আলোচনার পরিসর মুসলিম ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার শোভনীয় বলে মনে করি। তবে আলোচনায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান হিন্দু সংস্কারকগণের কথাও উঠে আসবে। ইসলামী সংস্কার আন্দোলন অনেক সময় সমাজ সংস্কার আন্দোলনে রূপ নেয়। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের কয়েকজন প্রতিভূ এমন রয়েছেন যারা ধর্মের সংস্কারই করেছেন সমাজকে দূষণমুক্ত করার জন্য। আলোচনার শুরুতে তাঁদের জীবন ও কর্ম বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

বাংলায় মুসলমানদের আবির্ভাব হয়েছে প্রায় সাত শতাব্দী পূর্বে। এই দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মুসলমান সমাজকে প্রধানত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত দেখতে পাওয়া যায়, যথা– সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ। 'সম্ভ্রান্ত'মুসলমানগণ ইসলামী সংস্কৃতির উপরই অনুবর্তী ছিলেন, আর 'সাধারণ' শ্রেণি তাঁদের পূর্বপুরুষদের জীবনধারাকেই মেনে চলত।[৩৫] ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমনের পর, বিশেষ করে বাংলা তখন ইউরোপীয়দের সংস্পর্শ পায়। এই স্পর্শের সবচেয়ে ইইতবাচক দিক হল– ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই আত্ম-অন্বেষন আকাঙ্খা প্রবলভাবে সক্রিয় হয় এবং একইসাথে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনেক মহিমময় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে।

পৌত্তলিকতায় জর্জরিত মুসলমান সমাজের প্রয়োজন হল সংস্কার। সমাজ সংস্কারের অন্যান্য দিকগুলোর চেয়ে এই দিকটি বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। কেননা এখানে সংঘর্ষ হলো শরীয়তের সাথে মারফতের। সুফিবাদ নিয়ে এর পূর্বেও আলোচনা হয়েছে, তারপরও মারফতপন্থীর ইঙ্গিতে শরীয়তের সাথে সংঘর্ষ নিয়ে দুটি কথা না বললে সংস্কারের বিষয়টি স্পষ্ট হবে না। জ্ঞানের সত্যিকার শিক্ষক জ্ঞানী। জ্ঞান যাঁর ভেতরে পরিপূর্ণতা লাভ করে পুঁথি তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। ধর্মের ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনুরূপ, যেমন: ধর্মের সত্যিকার শিক্ষক ধার্মিক।

ইসলাম কিভাবে বাঙালির জীবনকে সার্থক করবে? এই প্রশ্নের জবাব পেতে তাহলে সাধারণ মানুষ কার কাছে যাবে? উত্তরটির তখনই স্বার্থকতা পাবে যখন সাধারণ মানুষজন মানবধর্ম বুঝতে পারবে। একদিকে মারফতপন্থার ভিতরে রয়েছে কিছু জীবন্ত ধর্ম, সৃষ্টির বেদনা, পরিবেষ্টণের বুকে উদ্ভাসিত ও বিকশিত আত্মা; আর অপরদিকে শরীয়ত পন্থী মাওলানা শুধু

অনুকারক, অনাস্বাদিত পুঁথির ভাণ্ডারী। যেহেতু তাঁর জীবন ও সম্পর্ক শূন্য-ছন্দোহীন; সুতরাং এক্ষেত্রে নিশ্চয় সাধারণ মানুষের যাওয়া উচিৎ মারফতপন্থী জ্ঞানগুরুর কাছে। আর এখানে তৈরী হয়েছে নানা বিতর্ক ও সংস্কার। সমাজের যে বিষয়গুলির সংস্কার সাধন হলে সমাজ আলোকিত হবে ইতোপূর্বে সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত বিষয়াবলীর চলমান পরিবর্তন সর্বসময়ই কাম্য। প্রফেসর ড. আম্বেদকার ভারতীয় উপমহাদেশে বিদ্যমান Cast System -এর সংস্কার সাধনে যেরূপ আন্দোলন ও সাধন করেছেন সেরকম কোন মুসলিম সংস্কারক করেছেন কিনা তার নজির পাওয়া দুষ্কর। সমাজের নিচুজাতের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তিনি ছিলেন কিংবদন্তী।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান সমাজের সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে যে সকল কিংবদন্তী বিশেষভাবে অগ্রণি ছিলেন তাদের মধ্যে শাহ ওয়ালীউল্লাহ অন্যতম। কেননা আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনিই প্রথম সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। শরীয়তি ইসলামের প্রতি সুফিদের উদাসীনতা ও অবজ্ঞা ইসলাম ও মুসলমান সমাজ জীবনের শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল, তাঁদের আচরিত বহু অনাচারের ও প্রচারিত ইসলাম বিরুদ্ধ মতবাদের অনুপ্রবেশ মুসলিম সমাজ-জীবনকে কলুষিত করেছিল। পেশাদার সুফীর প্রাদুর্ভাব ও কবর পূজার প্রথাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল। ওয়ালিউল্লাহ অবশ্য তাসাউফের উচ্ছেদ চাননি, তাঁর লক্ষ্য ছিল সুফিবাদের সংস্কার।

> ‘যাতে জনসাধারনের আধ্যাত্মিক জীবনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে, অথচ শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে আপস করা যায়, এই ছিল তার চেষ্টা।...তিনি সুফিবাদকে সংস্কার করে তা সমাজের কল্যানের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন; ওহাবীদের মতো নেতিবাচক বিরুদ্ধাচরন করেন নি যার ফলে কেবল দ্বন্দেরই সৃষ্টি হয়। পেশাদার পীর-ফকির ও কবর পূজা, কেরামতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁর ‘ওসিয়তনামায়, বহু যুক্তি ও নির্দেশ আছে, কিন্তু এ সম্পর্কে জোরজবরদস্তি করা তিনি অন্যায় মনে করতেন।’৩৬

ওয়ালীউল্লাহ তাঁর *তফ হিমাতে ইলাহিয়া* গ্রন্থে মুসলমান সমাজের কয়েকটি কদাচারের নিন্দা করেছেন। সেগুলো দূর করার উপায় নির্ধারণ করেন ওয়ালীউল্লাহর সুযোগ্যপুত্র শাহ আবদুল আজীজ। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, মুক্তবুদ্ধি ও ধর্মীয় উদারনীতির শিক্ষা দিয়ে শাহ আবদুল আজীজ সমাজ সংস্কারের দিকে জোর দেন। ধর্ম সাধনা ও সমাজ সংস্কারের আজন্ম ব্রতী এই আলেমের মন যে গোঁড়ামীর মলিনতায় আচ্ছন্ন হয় নি তাঁর পরিচয় মেলে ইংরেজদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কিত তার উপদেশাবলিতে।

শাহ আবদুল আজিজের শিক্ষায় অনুপ্রানিত সৈয়দ আহমদ, তারগিব-ই-মুহম্মদীয়া নামদ্বয় যে সংস্কার আন্দোলন করেন তার বিস্তারিত কর্মসূচী মেলে *সিরাতুল মুসতাকীম* নামক পুস্তকে। পুস্তকখানি মাওলানা আবদুল হাই ও শাহ ইসমাইল শহিদ এর সম্পাদনায় ১৮১৮-১৯ সালে প্রকাশিত। ফারসিতে লেখা গ্রন্থখানি এখনও প্রচলিত আছে। সৈয়দ আহমদ প্রথমে মুরিদদের বহু প্রচারিত চারটি প্রধান সুফি পন্থা– চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশা বন্দীয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকায় দীক্ষা দিয়ে পরে মুহাম্মদী তরিকতে দীক্ষা দিতেন। এই তরিকার অনুসারী সমাজে এখনও বিদ্যমান। সৈয়দ আহমদ ইমানের দৃঢ়তা সাধনের ও ধর্মাচরনের সংস্কারের ওপর জোর দিয়েছিলেন *সিরাতুল মুসতাকীম*-এ এই আদর্শের ব্যাখ্যাসহ সংস্কারযোগ্য বিষয়গুলি মোটামুটি এই: ইমানকে দুর্বল করে এমন সব অভ্যাস, যেমন শরিয়তের আইনকে উপেক্ষা করা বা অবজ্ঞা করা, পৌত্তলিক ও

নাস্তিকসুলভ কথাবার্তা বা আচরনের প্রশ্রয়, আল্লাহ ও নবী সম্বন্ধ্যে অসম্মানজনক কথাবার্তা কর্মফলের জন্যে মানুষ ও স্রষ্টার দায়িত্ব নিয়ে চুলচেরা তর্ক-বিতর্ক, কদাচারী শিথিল-বিশ্বাসী সুফিদের প্রভাবে পীরপূজা, কবরপূজা, শিরনি দেওয়া প্রভৃতি আচারণ, যা থেকে ঈমানের ক্ষতি ও অপব্যয় হয় প্রচুর। এতে সামাজিক কুসংস্কারেরও উল্লেখ আছে, যেমন– বিবাহ, শিশুর নামকরণ, সুন্নত পালন বা খাৎনা, ইত্যাদি পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আড়ম্বর উৎসব, যা অনাবশ্যক। কারণএতে অর্থের অপব্যয় হয়। মৃতের সৎকার (দাফন) উপলক্ষে নানারকম ব্যয়বহুল ও নিরার্থক অনুষ্ঠান। ইসলামী শাস্ত্রনুমোদিত বিধবা-বিবাহের প্রসারে সমাজের আপত্তি ও বিরুদ্ধাচরন; এই শেষোক্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যে সৈয়দ আহমদ স্বয়ং বিধবা বিবাহ করেন।'[৩৭]

অভিজাত মুসলমান পরিবারেই হিন্দুদের অনুকরনে বিধবা-বিবাহ হেয় গণ্য হতো; সাধারণ স্তরে এ অনিয়ম ছিল না।

উনিশ শতকে যে তিনজন মহাপ্রাণ মুসলমান সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন তাঁরা হলেন– শহীদ তিতুমীর, হাজী শরীয়তউল্লাহ ও মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরি। আলোচনার প্রথম অংশে তাদের আন্দোলনের আদর্শ কি তার উল্লেখ হয়েছে, তবে তিতুমীরের আন্দোলন ছিল সশস্ত্র আন্দোলন যা কিনা শরীয়তুল্লাহ ও কেরামত আলী প্রমুখ মহাপ্রাণের চেয়ে একটু বেশী বেগবান। সমাজ সংস্কার আন্দোলন যখন কীর্তিমান পুরুষগণ চালিয়ে নিতেন তখন তারা একটি কেন্দ্রকে অবলম্বন করে চলত। কেন্দ্রের বিষয়ে অথবা প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে সংস্কার আন্দোলন, তার চালনাকারী মহান ব্যক্তিগণকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে আলোচনা করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। সময়ের গণ্ডিতে কিন্তু সর্বদা আন্দোলনের কেন্দ্র গঠিত হত না। এমনি একজন হলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০০), যিনি উনিশ শতকে খ্রিষ্টান মিশনারীদের হাত থেকে মুসলমান সমাজকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়াও বিশ শতকে বাঙালি মুসলমান সমাজের মানসলোক গঠনের মৌলিক পটভূমি তিনি নির্মাণ করেছিলেন।

সমাজ সংস্কার আন্দোলন অনেক সময় যেসকল মুসলিম ব্যক্তিবর্গ অগ্রণি ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের মধ্যে আবার অনেকই ছিলেন গণ্যমান্য তথা জমিদার শ্রেণি, যেমন– সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ, নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী, করিমুন্নেসা খানম, হাফেজ মাহম্মদ আলী খান পন্নী, আবদুল রহিম বক্স পেস্কার প্রমুখ জমিদারগণ।

অপরদিকে আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্তির ফলে নিজেকে সচেতনভাবে তৈরী করে আধুনিক মুসলিম সমাজ বিনির্মানের অগ্রপথিকগণেরও একটি আদর্শ ও কেন্দ্র ছিল, যাকে মূখ্য করে কতিপয় ব্যক্তিবর্গ স্ব-আন্দোলন চালিয়ে নিত। তাদের মধ্যে রয়েছেন নওয়াব আবদুল লতিফ, ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী, আদালত খান, সিরাজুল ইসলাম, খোন্দকার ফজলে রাব্বি, সৈয়দ আমীর আলী, আবদুর রসুল, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, আবদুর রহিম, স্যার আযিযুল হক, ফজলুল হক, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, আবদুল করিম, খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

যেসকল সংস্কারকের হাত ধরে মুসলিম সমাজ দূষন মুক্ত হয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন– বিখ্যাত ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, কবি জসীমউদ্দীন, আবুল হোসেন, কাজী ইমদাদুল হক, গোলাম মোস্তফা, মীর মশাররফ হোসেন, শেখ আবদুর রহিম শেখ ফজলুল করিম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে বাংলার স্বাধীন নবাব মিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়, ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে একদিকে ইংরেজদের বিজয়; অন্যদিকে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং বাংলার নবাব মীর কাশিমের সম্মিলিত বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশ বিলুপ্ত হয। ক্রমান্বয়ে তাদের অর্থনৈতিক প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা অধঃপতিত হয় এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিপর্যয় নেমে আসে। আর সেই সাথে তাদের সামাজিক জীবন পতিত হয় ধ্বংসের মুখে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে সমাজসংস্কার ও সংস্কারকগণ

ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে যেসকল সংস্কারক অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তাঁরা হলেন– হাজী শরীয়তউল্লাহ, শহীদ তিতুমীর ও মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরি, মুন্সী মেহেরউল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের প্রত্যেকেরই কর্মভূমি ছিল নিরক্ষর পল্লীবাসী কৃষক ও কারিগর মুসলিম সমাজ। একদিকে ধর্মীয় সংস্কার করে তাঁরা ইসলামের মৌলিক কাঠামোতে মুসলমানদেরকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালান; অপরদিকে অর্থনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সূচনা করেন। তাদের রাজনৈতিক আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ আন্দোলন জনমনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগায়, ইসলাম রক্ষার্থে আত্মত্যাগে যেমন উদ্বুদ্ধ করে ঠিক তেমনি ত্রাস সৃষ্টি করে। উপরন্ত তাদের সামাজিক আন্দোলন ইসলামবিরুদ্ধ নানা প্রথা অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি হতে রক্ষা করে স্বগৌরবে আপন সমাজ সংস্কৃত ভুবন নির্মাণে সহায়তা করে। বলা যায় দিশেহারা মুসলিম সমাজের দেহ রক্ষার খুঁটি ছিলেন তাঁরা।

মীর নিসার আলী তিতুমীরঃ তিতুমীর ২৪ পরগনা জেলার চাঁদপুর গ্রামের অধিবাসী। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মেছিলেন এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। মক্কায় থাকা অবস্থায় তিনি আবদুল ওহাবের অনুসারীদের সংস্রবে এসেছিলেন। তাছাড়াও তাঁর উপর প্রভাব ছিল সৈয়দ আহমদের। মক্কা থেকে দেশে প্রত্যাগমন করে তিনি ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি সমাজসংস্কারেও আত্মনিয়োগ করেন। তিতুমীরের আন্দোলন ছিল সশস্ত্রধর্মী। তাঁর আন্দোলনের ক্ষেত্র ছিল পূর্ব বাংলা। তবে চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, যশোর ও ফরিদপুরে তার তৎপরতা ছিল ব্যাপক। ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যখন দেশে ফিরে আসেন তখন লক্ষ্য করলেন সমাজে বিদ্যমান নানা অশান্তি। প্রতিনিয়ত জমিদার, নীলকর, ইংরেজদের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষক-প্রজাগণ। রায়তের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট তার প্রাণে বাজে, এজন্যজমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান। জমিদারদের সাথে সংঘর্ষের একটি ঘটনা ছিল এরকম–

> পূঁড়ার জমিদার কৃষ্ণরায় যখন দাড়ি রাখার জন্য জনপ্রতি আড়াই টাকা কর ধার্য করেন, তখন তার সঙ্গে তিতুমীরের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পরিণত হয়। তাঁর শিষ্যদের বলা হতো মওলবি ও হিদায়েতি।[৩৮]

তিতুমীরের সমাজে অবস্থানরত নির্যাতিত রায়ত রক্ষার যে ইতিবাচক আন্দোলন সমাজের উচুস্তরের মানুষের প্রতি ছিল তার বোধগম্যতা তৎসময়ের মুসলিম সাধারণ জনমানস ও রায়তগন ততটা বুঝতে পারে নি। তাই তার আন্দোলনের ফলে অতি দ্রুত সমাজের চিত্র বদলায়নি সত্য, কিন্তু পরবর্তীতে বাংলার নির্যাতিত রায়তদের জন্য সমাজ মালিকদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আন্দোলন সংঘটিত হয় তার উৎস ছিল তিতুমীরের আন্দোলন।

হাজী শরীয়তউল্লাহ :অষ্টাদশ শতাব্দির শেষার্ধে ও উনবিংশ শতাব্দির প্রথমদিকে ভারতীয় উপমাহাদেশের সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে 'ফরায়েজী আন্দোলন' একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হাজী শরীয়তউল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ধর্মচিন্তায় আলোকপ্রাপ্ত হন প্রধানত তিনজন ইসলামি চিন্তাবিদের প্রভাবে। তারা হলেন আরবের মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব (১৭০৩-১৭৮৭), শাহ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬৩) এবং সৈয়দ আহমদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১)। শরীয়তউল্লাহর আন্দোলন একটি বিশেষ ধর্মীয়-সংস্কারের দিকে ছিল। হাজী শরীয়তউল্লাহ দীর্ঘকাল আরবদেশে অবস্থান করে ১৮১৮ সালে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। বাংলায় এসে মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা, সেই সাথে অর্থনৈতিক দূরবস্থা দেখে বড়ই ব্যথিত হন এবং এর সংস্কারকল্পে নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন। বাংলায় ইসলামের বৃক্ষকে তিনি ইমানের পানির অভাবে মৃতপ্রায় দেখতে পান। ইংরেজ আমলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানদে ধর্মীয় অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লেও কোথাও বাংলার মত এত শোচনীয়, করুন রূপ ধারণ করেনি।[৩৯] ইসলাম ধর্মে সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পর সম্পৃক্ত এবং একই সূত্রে গ্রথিত। এগুলির যেকোন এক স্তরের অবক্ষয় অন্য গুলিকেও জরাগ্রস্ত করে তোলে। যতদিন বাংলায় ইসলামী-সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক অগ্রগতি অব্যাহত ছিল, ততদিন মুসলিম সমাজে প্রতিবেশী সম্প্রদায়সমূহের রীতি-নীতি, আচার আচরনের অনুপ্রবেশ তেমন ছিল না। কিন্তু রাজশাসন ক্ষমতা যখনই মুসলমানদের হাত হতে চলে যায়, ঠিক তখনই শুরু হয় লুট-পাট। এই লুট-পাট ছিল সংস্কৃতির, ভাষার, জ্ঞানের, ধর্মের, ভগবানের। লুটের ক্রিয়াকলাপে দিশেহারা মুসলমান ঠিক কি করবে বুঝতে পারলেন না। কেননা তারা একসময়ে খুব আরাম পেয়ে ভবিষ্যতের চিন্তা না করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জেগে ওঠে দেখেন পায়ের নিচে মাটি নেই। কি করবেন, কি করে খুটি গাঁড়বেন বুঝতে পারছিলেন না। আর এমনি সময় শরীয়তউল্লাহ দিশেহারা সমাজস্থিত প্রজাগণকে রাস্তা দেখাতে এগিয়ে এলেন। 'রিফাইন' তথা পরিশোধন করতে থাকলেন কালো ময়লাজমা মুসলিম সমাজকে। হাজী শরীয়তউল্লাহ বাংলার মুসলিম সমাজেরই অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান। তিনি নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ-দুর্দশার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘকাল বিদেশ ভ্রমনের মাধ্যমে অর্জিত প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি নিয়ে গ্রাম-গঞ্জে জনসাধারনের দুঃখমোচনের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। তার সংস্কার আন্দোলনের কালসীমা ছিল ১৮১৮-১৮৪০ সাল পর্যন্ত।[৪০] বাংলাদেশে ফরায়েজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরিয়তউল্লাহ ছিলেন হানাফী মাজহাবের অনুসারী।[৪১] আইয়ামে জাহিলিয়া যুগের সমাজ অন্তর্ভুক্ত কুসংস্কারগুলিকে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যেভাবে সংস্কার করে বিশুদ্ধ জীবনের স্পর্শে নিয়ে এসেছিলেন, ঠিক তিমনি হাজী শরিয়তউল্লাহ রাসুলের (সাঃ) অনুসরণে মানবজীবন পরিচালনার অঙ্গীকার ঘোষণা করে ইসলাম ধর্মের বিশ্বজনীন ন্যায়পরায়নতা ও জুলুমহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আবেদন বাস্তবায়িত করার সংকল্প ব্যক্ত করেন। তিনি বিশুদ্ধ ইসলামী জীবনব্যবস্থার কর্মময় অঙ্গনে মানুষের জীবন পদ্ধতি

থেকে শেরেক, বেদাত, কুসংস্কার ও দুর্নীতি দূর করে ইসলামের মৌলিক নীতি অনুসরণে মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনকে সুসংহত, আনন্দদায়ক ও সুখময় করে তোলার আদর্শে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। হাজি শরিয়তউল্লাহ মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার যেমন– 'চাট্রি' তথা প্রসূতির গৃহে মাসাধিককাল ধরে অবিরত বাতি জ্বালিয়ে রাখার প্রথা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাট্রি বা পুট্রি ও চিল্লার প্রথা, মহররম উপলক্ষ্যে মূর্তিপূজার সমতুল্য নানা প্রকার কু-প্রথা এবং মৃতের সৎকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ফাতেহা ও ওরসের নানা প্রকার রেওয়াজ, মিলাদ উদযাপন ইত্যাদি শেরেক ও বেদাত বলে গণ্য করেন। এসব আচার অনুষ্ঠান ফরায়জি সমাজ হতে আজীবনের জন্য রহিত করার চেষ্ট করেন।[৪২] খৎনা, কানফোড়ানি ও বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান অনাড়ম্বর ও সাধারণভাবে উৎযাপন করার জন্য তিনি সবাইকে উপদেশ দেন। এগুলি উপলক্ষ্যে জাঁকজমক, শরিয়তবিরোধী নাচ-গান, বাদ্যবাদন ও অপব্যয়ের কঠোর সমালোচনা করেন এবং এগুলি ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।[৪৩] এসমস্ত কারনে হিন্দু জমিদার ও জোতদার শ্রেণি তাঁর প্রতি নারাজ হন, বিশেষত তাঁর ডাকে সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম প্রজা ও কৃষকগণ ক্রমশ ক্রমবর্ধিতভাবে একত্রিত হয়, যা ছিল জমিদার শ্রেণির শঙ্কার বিষয়। যার ফলে হাজি শরীয়তউল্লাহকে উক্ত জমিদার ও জোতদারদের সাথেও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়, যার প্রতিফলন তার পুত্র দুদু মিয়ার পুরোধা ক্ষমতা প্রয়োগ, শক্তির প্রয়োগ ভেসে উঠে। অন্যদিকে বেদাত ও শেরেক হতে সমাজকে মুক্ত করার জন্য হাজী শরিয়তউল্লাহর আপোসহীন সংগ্রাম কিছু সংখ্যক প্রাচীনপন্থী তথা রক্ষণশীল মুসলমানকেও শংকীত করে তোলে; তথাপি প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল মুসলমানদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তিনি তার কার্যাবলী চালিয়ে গিয়েছেন। আসলে শতশত বছর ধরে ক্রমবর্ধমান হারে হিন্দু-বৌদ্ধদের ইসলাম ধর্মগ্রহণ, বিয়ের মাধ্যমে হিন্দু-বৌদ্ধ মেয়েদের ধর্মান্তরিতকরণ এবং প্রতিবেশী হিন্দু-বৌদ্ধদের আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাবে বাঙালি মুসলিম সমাজে উচ্চ-নীচ জাতিভেদ ও বর্ণভেদের ন্যায় কিছুটা ভেদনীতির প্রচলন হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের ক্ষেত্রে এগুলি লক্ষ্য করা যেত। তেলি বা কলু, পাল্কি বাহক বা কাহার, জোলা বা তাঁতি, বাসাই, জেলে ইত্যাদি পেশাজীবীদেরকে অন্যরা ঘৃণার চোখে দেখত এবং নিচু জাত মনে করত। হাজী শরিয়তউল্লাহ সমাজের এই শ্রেণি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর বারবার জোর দেন এবং সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করতে সচেষ্ট হন। তিনি বিভিন্ন পেশা ও শিল্পকর্মে নিয়োজিত লোকদেরকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা প্রদান করেন এবং তাদেরকে "কারিগর' উপাধিতে ভূষিত করেন। এমনিক জোলা, কালু, কামার, কুমার, মেথর, প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পকর্মীদেরকে তিনি কারিগর উপাধি ধারণ করেত উদ্বুদ্ধ করেন। হাজী শরিয়তউল্লাহ্ এভাবে সমাজ থেকে বৈষম্য, হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করে শ্রমের মর্যাদা ভিত্তিক মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে সুদৃঢ় একতাবোধের এক সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে সচেষ্ট হন।

মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরি : মাওলানা কেরামত আলী জন্ম জৈনপুরি। তিনি ছিলেন শাহ আবদুল আজীজের প্রত্যক্ষ ছাত্র। সৈয়দ আহমদের একজন একনিষ্ঠ শাসক হিসাবে তিনি জিহাদে যোগ দেন। বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ শহীদ হলে ১৮৩৫ সালে কেরামত আলী পূর্ব বাংলায় আগমন করেন। এখানেই বাকী জীবন তিনি সংস্কারব্রতে অতিবাহিত করেন। রংপুর তার কর্মকেন্দ্র হয় এবং এখানেই মৃত্যুর পরে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।[৪৪] কেরামত আলী ছিলেন শুদ্ধচিত্ত সাধুপুরুষ,

ইসলামী শাস্ত্রে অসাধারন পণ্ডিত। তাঁর সংস্কারকর্ম ছিল শান্ত ও বিরোধ-নিরপেক্ষ। ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারই ছিল তাঁর একমাত্র ভূমিকা এবং এই সাধনায় তার ছিল দ্বিমুখী কর্মপন্থা– প্রথমত; পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজে যেসব ইসলাম বিরুদ্ধ হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান ঢুকে পড়েছে, সেগুলির নিঃশেষে নির্মূল সাধন। এজন্য তিনি *রদ্দে বিদ্যা* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। দ্বিতীয়ত; বাউল প্রভৃতি যেসব সম্প্রদায় ইসলামি আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে, সেগুলিকে সুশিক্ষা দিয়ে সংশোধন করে পুনরায় ইসলামের গণ্ডিতে আনয়ন কারা; এজন্য তিনি *হিদায়াত আল-রাফিদীন* নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে সেই গ্রন্থে তিনি সন্নিবেশন করেছে 'বিশ্বজ্ঞান'। একজন প্রকৃত মুসলমানের নিত্যনৈমিত্তিক জীবন ধারার প্রতিটি স্তরের সত্যজ্ঞানের এক অপূর্ব কোষ উক্ত গ্রন্থটি। গ্রন্থটির নাম *মিফতাহুল জান্নাত*। তৎকালীন যুক্ত বাংলায় এমন কোন শিক্ষিত মুসলমান নর-নারী ছিল না যে বাল্যকালে জীবন গড়ার সময় গ্রন্থটি পাঠ করেন নি। তবে গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় লিখিত হওয়ায় বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমানদের জন্য বেশ একটু কঠিন ছিল। সংস্কারব্রত জিঘাংসায় মাওলানা সাহেব মোট ৪৬টি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত বইগুলি যদি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ঘ্, তাহলে হয়তো একটি বৈপ্লবিক সংস্কারধর্মী অধ্যায়ের সূচনা হত।

মাওলানা কেরামত আলী একজন উদার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দিবা-রাত্রি পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে ফিরেছেন নিজের নৌকারোহনে। প্রতিটি মুসলমানকে হেদায়েত করার জন্য তিনি ব্যাকুল থাকতেন। চল্লিশ বৎসর ধরে তিনি নিরলসভাবে এ মহৎব্রতে যুক্ত থেকেছেন পরম শান্তভাবে। তিনি ইংরেজদের শাসনকে আশির্বাদ হিসাবে গ্রহণ করে মুসলমানদেরকে আপন উন্নতিতে সচেষ্ট থাকতে বলেছেন। সমাজের মূল্যাবোধের অবক্ষয় হিসেবে তিনি ইংরেজী তথা আধুনিক শিক্ষার অভাবকে দায়ী করেছেন। তাছাড়াও সমাজে অবস্থিত নানা ধরনের বড় বড় কুৎসিত কুসংস্কার হতে মুক্তির জন্য জৈনপুরি ইংরেজদের আইনের হাতকে বলিষ্ঠ করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেন।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ : উনিশ শতকের শেষপাদে দাঁড়িয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজের নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭)। বিশেষত বাংলার মুসলমান সমাজের চরম দরিদ্রতা ও আর্থ-সামাজিক জীবনের সংকটের সুযোগ নিয়ে খ্রিস্টান মিশনারিরা যখন মুসলমান সমাজকে ধর্মান্তরিত করার অপপ্রয়াস চালায় তখন মিশনারিদের বিপক্ষে কঠোরভাবে রুখে দাড়ান মুন্সী মেহেরুল্লাহ। বিশ শতকে বাঙালি মুসলমান সমাজের মানসলোক বিনির্মাণে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম।[৪৫] এই ধর্মপ্রাণ মুসলমান সমাজ সংস্কারক হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ[৪৬] ছিলেন একজন স্বশিক্ষিত, যুক্তিবাদী ও পণ্ডিত ব্যক্তি। উনিশ শতকের শেষপাদে বাঙালি মুসলমান সমাজের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক চরম দুঃসময়ে তাঁদের পাশে দাঁড়ান মুন্সী মেহেরুল্লাহ। অদম্য সাহসী, উদ্যোগী, উদ্যমী, তেজোদীপ্ত, বহনশীল, যুক্তবাদী এবং ধীর সভাবের মেহেরুল্লাহ জীবনের পুরো সময় সমাজ সংস্কারে ব্যয় করেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে বাঙালি মুসলমান সমাজকে সংস্কারের প্রয়াস চালান। প্রথমত, লেখানির মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত, যারা বাংলার পথে প্রান্তরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তাদের নিয়ে প্রচারাভিযান। তিনি বছরের পর বছর বাংলার

গ্রাম-গ্রামান্তর সফর করে মুসলমান সমাজকে তাদের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি এবং ইসলামের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সচেতন করেছেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহর রচনাবলী অনেকটা আত্মরক্ষামূলক। তিনি হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের মুসলিম বিরোধী অবস্থানের উপর দৃষ্টি রেখে তাঁর লেখনি চালাতেন। ১৮৮৭ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ *খ্রিষ্টীয় ধর্মের অসারতা* প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজকে খ্রিষ্টীয় ধর্মের বিরূপ প্রচারণা থেকে রক্ষার একটি চেষ্টা চালান। এর পরপরই প্রকাশিত হয় তাঁর *রদ্দে খ্রীষ্টিয়ান ও দলিলোল এসলাম* নামক গ্রন্থটি।[৪৭] এই গ্রন্থে তিনি বঙ্গে মৌলভী সমাজের মুরীদানার কঠোর সমালোচনার পাশাপাশি খ্রিষ্টান পাদ্রীগণের কুৎসা-রচনা সমৃদ্ধ সংবাদপত্র ও পুস্তিকার তীব্র সমালোচনা করেন। তার লেখা *মেহেরুল ইসলাম* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালে।[৪৮] হিন্দুদের গুরুবাদ ও ভক্তিবাদের আলোকে মুসলমান সমাজে যে পীরবাদের আমল দাঁড়িয়ে ছিল তার বিরুদ্ধে সোচ্চার ধ্বনি উচ্চারনই ছিল উক্ত গ্রন্থের মূল আলোচনা। এক্ষেত্রে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে উনিশ শতকের প্রথমদিকে ওহাবী, ফরায়েজী ও মুজাহিদ আন্দোলনের পটভূমিতে বাংলায় পীরবাদ স্তিমিত হয়ে আসলেও উনিশ শতকের শেষদিকে এটি আবার প্রবলতর হয়। আর উক্ত সময়টির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ পায় মুন্সী মেহেরুল্লাহর একটি অনবদ্য রচনা *বিধবা গঞ্জনা* বা বিষাদ ভান্ডার। উক্ত গ্রন্থটি প্রধানত হিন্দু বিধবাদের জীবনের করুন কাহিনী নিয়ে লিখিত। তবে মুসলিম সমাজের বিধবারাও আলোচনায় স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে প্রথম প্রকাশিত হয়।[৪৯]এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিয়ে মেহেরুল্লাহ নিজেই বলেন–[৫০]

> জ্বলন্ত ছবি অঙ্কন ও প্রদর্শন করিয়া একদিন প্রাতঃস্মরণীয়, বহুগুন সম্পন্ন, বহুবিদ্যায় বিভূষিত ভারত- সুহৃদ, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং পণ্ডিত- ফুল- চূড়ামনি, দয়ার সাক্ষাৎ অবতার, ভারত রত্ন, অবলা-বান্ধব, বিধবা-জীবন, অনাথ-বন্ধু, চিরস্মরণীয় পণ্ডিত প্রবল ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিপক্ষ দল কর্তৃক কত শত প্রকারে লাঞ্ছিত ও অপভাষায় তিরস্কৃত হইয়াছেন,তাহার ইয়ত্তা নাই; সেই অসীম যাতনাগ্রস্থ ও অনন্ত বিষাদপূর্ণ অবলা-হৃদয়ের বিষাদ সঙ্গীত কীর্ত্তন করতে যাইয়া, সাদৃশ বিদ্যা ও বুদ্ধিহীন অভাজন অজশেও যে অনেকের চক্ষের বালি এবং বহুবিধ অভিনয় বিশেষণে বিশেষিত হইতে হইবে, তাহাও নিঃসন্দেহ। এই গ্রন্থে শব্দ যোজনার কোন বৈচিত্র্য, বর্ণ বিন্যাস এবং রচনা মাধুর্যের কোন বাহাদুরী নাই এবং ইহা কোন বিশেষ ঘটনা অবলম্বনেও রচিত নহে। কিন্তু যাহারা সরলচিত্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিধবা চিত্তের তত্ত্ব অবগত হইবেন, এই গ্রন্থে লিখিত উক্তিগুলি অক্ষরে পত্রে ছত্রে ছত্রে সত্য বলিয়া তাহাদিগের নিকট প্রমাণিত ও গৃহিত হইবে। বিবিধ শ্রেণির যুবতী বিধবাগণের স্বহস্তে লিখিত খেদ ও শোকসূচক যে সকল পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে সময় ও সুযোগমতে তাহা মুদ্রিত করিয়া, আমার বঙ্গবাসী পাঠকবর্গকে উপহার দিতেও কৃত সংকল্প হইয়াছি। এই গ্রন্থের স্থান বিশেষের ফুট নোটেও নমুনা স্বরূপ তাহার কিয়াদাংশ দেখিতে পাইবেন।"

সমসাময়িক তার আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির নাম *সাহেব মুসলমান*। এছাড়াও ইরানের কবি শেখ শাদী রচিত মানুষের নীতি ও নৈতিকতা সম্পর্কিত গ্রন্থ *পান্দেনামা*-কে তিনি ফারসি হতে বাংলায় অনুবাদ করেন।[৫১] বাংলা ১২৯৮ সনের ২১, ২২ ও ২৩ আশ্বিন বরিশাল জেলার পিরোজপুরে মুন্সী মেহেরুল্লাহ খ্রিস্টান মিশনারিদের সাথে এক প্রকাশ্য তর্ক সভায় মিলিত হন। হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে এই তর্ক সভায় তিনি খ্রিস্টান পাদ্রিদের সকল প্রশের উত্তর প্রদান করেন। এ সভায় প্রশ্ন ও বিতর্কের বিষয়বলী, তার নিজের এবং পাদ্রিদের ব্যক্তব্যকে সংকলিত করে তিনি আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। গ্রন্থটির নাম *মুসলমান-খৃষ্টান তর্কযুদ্ধ*।[৫২] মুন্সী মেহেরুল্লাহর জীবদ্দশায় 'মানব জীবনের কর্তব্য' নামক ছোট্ট একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়নি। এই পুস্তিকায় তিনি আরবি,ফারসি বয়াত লিখেছেন, কিন্তু কোথাও অর্থ লেখেননি। এই পুস্তিকায় তিনি পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে নীতি-নৈতিকতা ভিত্তিক জীবন গঠন, সত্য ও সুন্দরের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বিবেক দ্বারা চালিত হওয়ার জন্য মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন।[৫৩] মুন্সী হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের হাত থেকে মুসলমান সমাজকে রক্ষার জন্য শুধুমাত্র গ্রন্থ রচনা ও লেখায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। প্রথম পর্বে খ্রিষ্টান মিশনারিদের সভায় উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্যের বিরোধীতা করতেন, তাদের সাথে বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হতেন। এরপর তিনি এলাকার হাটে-বাজারে উপস্থিত হয়ে মিশনারিদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতেন। এইসব প্রচারকর্মে তাঁর সহকর্মী ছিলেন মোহাম্মদ কাশেম ও গোলাম রাব্বানী।[৫৪]এভাবে কিছুসময় অতিবাহিত করার পর মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ কলকাতায় এসে সুধাকর দলের সাথে পরিচিত হন। তাকে সর্বোতভাবে সহায়তা করে সুধাকর পত্রিকা ও সুধাকর দল। এই দল মুসলিম সমাজের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে প্রগতিশীল পরিবর্তন আনয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল।[৫৫] সাহিত্যের প্রতি আগ্রহের পাশাপাশি তাদের ছিল ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং মুসলিম সমাজ সেবায় প্রবল আগ্রহ। মুন্সী মেহেরুল্লাহ যে একজন আত্মত্যাগী নিবেদিত প্রাণ মুসলিম সমাজ সংস্কারক ছিলেন তা তাঁর জীবনীকার হবিবর রহমানের বক্তব্য হতে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন-[৫৬] মুন্সী সাহেব মরহুম যখন প্রথম যৌবনে পদার্পন করেন; তখন মুসলমান সমাজ সুপ্তির গভীর মোহে নিমজ্জিত। জাতীয় চেতনা বলিয়া কোন জিনিস তখন তাহার ছিল না। হিন্দু সমাজ তখন পূর্ণ উদ্যমে শিক্ষা ও সর্ববিধ উন্নতির পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। খৃষ্টান পাদ্রীগণ কিভাবে সমগ্র দেশবাসীকে খৃষ্টান করিবেন সেই চিন্তায় বিভোর। আর মুসলমান সময়ের স্রোতে গাঁ ঢালিয়া দিয়া অলক্ষ্যে ধ্বংসের নিম্নতর আবর্তে ডুবিয়া যাইতেছিল। কোন সংবাদ পত্র তখন পর্যন্তও মুসলমান সমাজে প্রচলিত হয় নাই। যে সংবাদপত্র জাতীয় জীবনের একমাত্র অবলম্বন তাহার কোন প্রয়োজনও তখন কেহ বড় করিয়া দেখিত না, মুন্সী সাহেব মরহুম দেখিলেন, বাঙ্গালার মুসলমানকে সংহত ও একতাবদ্ধ করিয়া উন্নতির পথে চালাইতে হইলে বর্তমান জগতের ভীষণ সংঘর্ষের মধ্যে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে প্রথমেই সংবাদপত্র আবশ্যক। প্রবীন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মুন্সী শেখ আবদুর রহিম সাহেব মরহুম সুলেখক মুন্সী শেখ রেয়াজ উদ্দিন আহ্মদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় মুনশী সাহেব অধুনালুপ্ত 'মিহির' ও 'সুধাকরের' উন্নতি ও প্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। শেখ আবদুর রহিম সাহেব বহুকাল পর্যন্ত উক্ত পত্রিকার সম্পাদক এবং মুন্‌শী রেয়াজ উদ্দিন আহ্মদ সাহেব প্রকাশক ছিলেন। সংবাদপত্রের প্রাণ ও সার্থকতা ইহার গ্রাহক সংখ্যার উপরই নির্ভর করে। মুন্‌শী

মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেব দেশে-বিদেশে ঘুরিয়া, সভা-সমিতিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া 'মিহিরও সুধাকরের' পাঠক সংগ্রহ করিতেন। এই রূপে বাংলার মুসলমান সমাজ 'মিহির ও সুধাকরের' প্রতিনিয়ত ভেরী- নিনাদেই সেই যুগের মুসলমান সমাজের মোহনিদ্রা অনেকটা অপসারিত হইয়াছিল।"

হিন্দু সমাজের সতীদাহ ও বিধবা বিবাহ আন্দোলনটি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রদ হওয়ার পর থেকে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবা বিবাহ আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। এ পটভূমিতে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সরকারিভাবে আইন গৃহীত হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের ভারতীয় প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে হিন্দু সমাজের একটি রক্ষণশীল অংশ সরকারের এই সংস্কার পদক্ষেপকে হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তরে বানচাল করার প্রচেষ্টা চালায়। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপকে মেহেরুল্লাহ সমাজ-সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ হিসাবে দেখেননি। এগুলিকে তিনি সমাজ প্রগতির বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং বাংলায় সামাজ সংস্কার আন্দোলনের জন্য রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করেছেন। এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, এখানে তাঁর ধর্মবোধ এমন একটি যথার্থ ও উদারতার মধ্যে মুক্তি পেয়েছিল, যার ফলে কেবল স্বধর্মের ক্ষেত্রে নয়; অন্য ধর্মাবলম্বীর জীবনযাত্রা সংস্কারযুক্ত হোক এবং সমাজ জীবন মানবিক মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোক এ অসাধারণ মহৎ অভিপ্রায়ই ছিল মুন্সী মেহেরুল্লাহর জীবনের সাধনা।[৫৭]

সংস্কারবাদী জমিদারবর্গ:

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৩) : উনিশশতকের বাংলার জমিদারগণের মধ্যে সবচেয়ে খ্যতিমান ছিলেন নওয়াব আলী চৌধুরী। ময়মনসিংহের ধনবাড়ী ছিল তাঁর আবাসভূমি। দেশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সাথে তাঁর অধিক সম্পর্ক ছিল। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'মিহির ও সুধাকর' (১৮৯৫) ও প্রচারক (১৮৯৯) পত্রিকাদ্বয় তাঁর অর্থানুকুল্য ও পৃষ্ঠপেষকতা লাভ করে। 'মিহির ও সুধাকর' মুদ্রণের জন্য স্ত্রী আলফাতুন্নেছার নামে তিনি 'আলতাফী প্রেম স্থাপন করেন।[৫৮] পত্রিকাটি তাঁকে 'বিদ্যোৎসাহী জমিদার' বলে উল্লেখ করেছে।[৫৯] অপরকি ইসলাম প্রচারক পত্রিকা 'স্বধর্মপরায়ন ও সাহিত্যানুরাগী জমিদার' বলে তাঁর প্রশংসা করেছে।[৬০] আলোচ্য প্রশংসাগুলি থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, গুনবান এই জমিদার আলোচ্য ক্ষেত্রগুলিতে নিজের সৃষ্টিশীলতাকে স্থাপন করতে পেরেছিলেন। সমাজে অবস্থানরত তার প্রজাসাধারণের উন্নতি বিধানে ও পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপনের জন্য যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ছিল তা অপসারণে নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন বদ্ধ পরিকর। তাঁর সমসাময়িক বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হত অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লেখকের বই এবং তদানুযায়ী পাঠ্যসূচী গঠন। যে যে বিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান লেখকের লেখা পাঠ্যোপযোগী পুস্তকের অভাব ছিল সে সে বিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান লেখকের লেখা পাঠ্য বইয়ের বা পুস্তকের অভাব পূরণের লক্ষ্যে মুসলিম লেখকদের উৎসাহিত করেন এবং মুদ্রণে আর্থিক সাহায্য দেন। শুধু তাই নয় তিনি শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব খাটিয়ে সেগুলিকে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন। ইসলামী সংস্কৃতি ও ভাবধারা নিয়ে রচিত পুস্তক স্কুল-পাঠশালায় পড়ানো হয় না, এরূপ

একটি অভিযোগ মুসলমান সম্প্রদায়ের ছিল। পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদীর *সুরিয়া বিজয়*(১৩০২) গ্রন্থখানি 'অশেষ গুনালঙ্কৃত ধর্মপরায়ন, সমাজহিতৈষী, উদার হৃদয়, দানশীল মুসলমান জমিদার কুলরত্ন জনাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর নামে উৎসর্গ করা হয়।'[৬১] নদীয়ার কবি দাদ আলী তার *সমাজ শিক্ষা* (১৯১০) পুস্তক খানি নওয়াব আলী চৌধুরীকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ লিপিটি ছিল এরূপ:

সৈয়দ নবাব আলী খান

বাহাদুর

পতিত সমাজে রক্ষাকারী, তুমি শূর।

দীন দাদ আলী, তব সুশিব

ভিখারী

তোমার অশিব নাশ করিবেন

বারি।[৬২]

নওয়াব আলী চৌধুরী মুলত সমাজ সংস্কারে আগ্রহী ছিলেন শিক্ষার ব্যবস্থার ক্রটি ও একে ঘিরে যে অন্ধ ধ্যান ধারনা মানুষ পোষণ করে তা দূর করে। এজন্য তাকে অনেক সংগ্রাম যেমন করতে হয়েছে, তেমনি অকাতরে দান-খয়রাতও করতে হয়েছে। কলিকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলের সভা-সমিতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির (১৯০৫) সম্পাদক ছিলেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি' (১৯০০) নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠানেরও তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৮৯৯ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সের সভায় তিনি বাংলাদেশে মাতৃভাষা শিক্ষা বিষয়ক একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেন।[৬৩] ১৯১২ সালে যে 'ঢাকা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিটি' গঠিত হয় তার একজন সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯২১ সাল পর্যন্ত ঐ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯০৬-১৯১২ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯২১ সালে প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি খিলাফত আন্দোলনে (১৯২১) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ *ঈদুল আজহা* (১৯০০) এবং *মৌলুদ শরিফ* (১৯০৩) গ্রন্থ দুটি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষা রচিত। তাঁর *ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল* (১৯০০) এবং *প্রাইমারী এডুকেশন ইন রুরাল এরিয়াজ* (১৯০৬) নামে দু'খানি শিক্ষা সংক্রান্ত ইংরেজী পুস্তিকা রয়েছে।

জাতির মেরুদণ্ড তৈরী হয় শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষা এমন এক প্রক্রিয়া যা মানুষের মনের অন্ধকারকে দূর করে আলো তৈরী করে। সেই আলোর প্রতিফলন ঘটে সমাজচিত্রে। মুসলিম জাতির একসময় বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলায় অজ্ঞনতার কারণে সমাজ জীবনে ঘুণ ধওে, যা আস্তে আস্তে করে মুসলিম সম্প্রদায়কে অন্তঃস্বারশূন্য করে ফেলছিল, ঠিক সেই সময় কাণ্ডারী মহাপুরষগণ এগিয়ে এলেন এবং জ্ঞানের প্রদীপের সেই মিথ্যার জগতকে ভুলণ্ঠিত করে সত্যের জগতের সন্ধান দিয়েছিলেন। নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলার বিশেষ করে পূর্ববাংলার শিক্ষা নিয়ে যে সচেতনাতার পরিবেশ তৈরী করে দিয়েছিলেন, সেই পরিবেশই ছিল আলোর পরিবেশ। পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ উক্ত জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে হয়েছিল অধিকার সচেতন, হয়েছিল সমাজ সচেতন।

নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩): একাধারে সমাজ সংস্কারক, সমাজসেবক, নারী মুক্তি আন্দোলনের পথ প্রদর্শক, দানশীল সাহিত্যসেবী, প্রজা দরদী জমিদার নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী যিনি প্রথম একমাত্র মহিলা যিনি ইংরেজদের কাছ থেকে “নবাব” উপাধিতে ভূষিত হন। নওয়াব ফয়জুন্নেছা[৬৪] জমিদার পরিবারেরর সন্তান এবং জমিদার হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিলাসিতায় কখনও গাঁ ভাসিয়ে দেননি। সমাজ জীবনের নানা কু-প্রথা, দূষিত মননজগত, অবলা-অসহায় নারী সমাজ, অভিজাত কর্তৃক অত্যাচারিত কৃষক-দরিদ্র প্রজাসাধারণ কতিপয় সমাজস্থিত মানুষের দুঃখ কষ্টগুলি তার ভিতরে আলোড়ন তৈরী করত। তিনি অনুভব করলেন যে, অর্থাভাব এবং কুশিক্ষা তথা বাস্তবধর্মী আধুনিক শিক্ষার অভাবে মুসলিম সমাজ আজ অধঃপতিত। এমতাবস্থায় তিনি সমাজ সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেন। নওয়াব ফয়জুন্নেছা নিজের মত করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে সমাজের শিক্ষা, সংবাদ পত্র উন্নয়ন ও আর্থিক অবস্থা উন্নয়নে এগিয়ে যান এবং এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। ফয়জুন্নেছা সমাজে শিক্ষা প্রসারের জন্য নিজ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এছাড়া তাঁর প্রায় ১১টি মৌজায় একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের খরচ দেন। তাছাড়া জেলা সদরে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৬৫]১৮৭৩ সালে স্থাপিত ফয়জুন্নেছা উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় অদ্যাবধি কুমিল্লার শ্রেষ্ঠ বালিকা বিদ্যালয়রূপে টিকে আছে। ১৮৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কালেজের উন্নতির জন্য নওয়াব ফয়জুন্নেছা আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। তাঁর শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা ও কর্মতৎপরতা নিয়ে ‘ঢাকা প্রকাশ’ লিখে যে, অদ্য আমরা আমাদিগের পূর্ব বাংলার একটি মুসলমান মহিলা রত্নের পরিচয় দান না করিয়া ক্ষ্যন্ত থাকিতে পারিলাম না। ...ইনি যেমন বিদ্যানুরাগী ও বিষয় কার্য পারদর্শিনী সেইরূপ সৎকার্যেও সুমুৎযাহিনী।[৬৬]

তিনি ‘ঢাকা প্রকাশ’ (১২৮৯) , কালিকাতার ‘সুধকর’ (১২৯৬) ও ‘ইসলাম প্রচারক’ (১২৯৮) প্রভৃতি পত্রিকাগুলিকে আর্থিক সাহায্য দান করেন। কুমিল্লা সদর হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ড তাঁর আর্থিক সাহায্যে নির্মিত হয় (১৮৯৩)।[৬৭]

বলা হয়ে থাকে সঙ্গীত মনের খোরাক। সুন্দর, সুশীল পরিচ্ছন্ন সমাজ এর পূর্বশর্ত হল সঙ্গীত । নওয়াব ফয়জুন্নেছা সঙ্গীত চর্চার বিকাশের উদ্দেশ্যে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন, *সঙ্গীতসার* ও *সঙ্গীত লহরী*। সমাজোন্নয়নমূলক কাজে সরকারকে সহয়াতার

জন্য তিনি ১৮৮৯ সালে 'নবাব' উপাধিতে ভূষিত হন। সংস্কার মনোবাসনা পরিতৃপ্ত করার জন্য সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের সাথে জীবন সদস্য হয়ে নিযুক্ত ছিলেন।

আবদুস সোবহান চৌধুরী :বগুড়ার নবাব সৈয়দ আলতাফ আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র নবাব আবদুস সোবহান চৌধুরী খুব প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। সমাজ সংস্কার, সমাজ সেবক আবদুস সোবহান চৌধুরী সমাজ উন্নতিসাধনে বিভিন্ন অধিবেশন, আলাপ আলোচনা, সভা-সমিতির প্রয়োজনীয়তা বেশী মাত্রায় অনুধাবন করেন। সমাজের উন্নতির অন্তরায়স্থলে যে অসঙ্গতিগুলি মুসলিম তরুন সমাজকে ধ্বংস করে দিত যেমন: উচু শ্রেণীর মানুষ হতে তিরস্কারে প্রতারিত নিচু মানুষদের অবসাদগ্রস্থতা, অশিক্ষা, দারিদ্র ও ধর্মহীনতা। আদর্শবঞ্চিত মানুষ যখন চারদিকের অন্ধকারে প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ, ঠিক সেই সময় যখন রাজ্যের জমিদারগণ নিজেরাই প্রজা সাধারনের উপর অত্যাচারে মেতে উঠতেন তখন আবদুস সোবহান চৌধুরী ত্রানকর্তা রুপে এসে হাজির হন। নবাব জমিদারগণ আভিজাত্যের গৌরবে সে যুগে সচরাচর এরূপটি করতেন না। সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকার সাথে যুক্ত থেকে তিনি সমাজের সাথে সম্পর্ক রেখেছিলেন। আবদুস সোবাহান চৌধুরী 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের' বগুড়া শাখার ধার্মিক চিন্তার নেতিবাচকতা হতে রক্ষা করে ইসলাম ধর্মের ইতিবাচক দিকগুলি পরিচর্যা সহকারে সত্য, ধার্মিকতার বিধান স্থাপনার্থে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতিতে মনোযোগ দেন। তিনি বগুড়া শহরে একটি মাদ্রাসা ও একটি ঘর নির্মাণের জন্য অর্থদান করেন।[৬৮]

বগুড়া তাহিরন্নেসা মহিলা হাসপাতালের খরচ চালাবার জন্য তিনি বাৎসরিক ৩০০ টাকা আয়ের নিস্কার ভুমিদান করেন। তাছাড়া ছোটলাট উডবার্নের (১৮৮৯-১৯০২) বগুড়া পরিদর্শনের স্মৃতিরক্ষার্থে বগুড়া শহরে 'উডবার্ন আল-তাফন্নেসা পার্ক' নামে একটি উদ্যান নির্মাণে ৫০০০ টাকা দান করেন।[৬৯] সমাজকে সংস্কার করার জন্য তিনি মোটামুটি আধুনিকতার পরিচয় দানে সক্ষম হয়েছেন।

আবদুল রহিম বক্স পেস্কার : আবদুল রহিম বক্সের পূর্বপুরুষ নোয়াখালীর ছাগলনাইয়ার অন্তর্গত বল্লভপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা মুন্‌শী খাঁন মোহাম্মদের পেশা ছিল 'টি-প্লানটারি ও লাখেরাজ ধারী।[৭০]

তবে রহিম বক্স পেসকার জলপাইগুড়ির জমিদার ছিলেন। সমাজ সংস্কারমূলক কাজের জন্য তিনি অকাতরে অর্থ দান করতেন। জলপাইগুড়ি শহরের 'আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার' (১৮৯২) সভাপতিত্ব লাভের পিছনে তার ছিল মহৎ উদ্দেশ্য । সমাজে বিদ্যামান ধর্মীয় কলুষতা যে অশিক্ষা-কুশিক্ষার ফসল, সেটা তার ভাবনাজগতকে নাড়া দিত। উক্ত সমস্যা হতে মুসলিম সমাজকে রক্ষার্থে তিনি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে নেমে পড়েন। সংস্কার আন্দোলনকে সার্থক করার জন্য তিনি একটি বহুল আলোচিত পুস্তিকা *ওয়াকফনামা* (১৯০৪) রচনা করেন। এই পুস্তিকায় ওয়াকফ সম্পাত্তি পরিচালনার যাবতীয় নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ রয়েছে। কথিত আছে যে, ধর্মীয় কার্যে তিনি প্রায় আঠারো হাজার টাকার সম্পত্তি *ওয়াকফ*করেন।[৭১] তিনি তাঁর ওয়াকফ সম্পর্কিত বিষয়টি *ওয়াকফনামায়* লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত পুস্তিকার একস্থানে তিনি লিখেছেন, আমি নিজ জীবদ্দশায় স্বীয় চেষ্টাতে ও পরিশ্রমে নিজে অনেক উপার্জন করিয়াছি: আমি সরলভাবে সেচ্ছাপূর্বক সুস্থ শরীরে স্থিরজ্ঞানে

ধার্মিকগণের পরামর্শানুযায়ী শরা-শরীফের মতে আমার সোপাত্রিত নিজস্ব দখলী নিম্ন তফসিরের লিখিত সম্পত্তিসমূহে রাজ্যে লিল্লা ওয়াকফ করিলাম। ইহার আনুমানিক মূল্য ১৮০০০ সবলগে আঠারো হাজার টাকা । উক্ত সম্পত্তিতে আমার মালিক স্বরূপ যে স্বত্ব স্বামিত্ব দখল হইয়া তৌলিয়ত (ওয়াকফ) আপিল।"[৭২]

১৬ ফাল্গুন ১৩১০ উক্ত *ওয়াকফনামা* রচিত হয়।[৭৩] এই ওয়াকফনামা হতেই জানা যায় যে, রহিম বক্স সমাজসেবায় ও মানবপ্রেমে কতটা উদার ছিলেন। অন্য আট-দশজন সমাজ সংস্কারের মত নবাব-জমিদারদের হয়তো লড়াই করতে হত না, তবে সমাজ বিবর্তন এর প্রক্রিয়া সাধন সংগঠন এর জন্য তাদেরকে ত্যাগ করতে হয়। সর্বশ্রেণির মানুষের ভিতর শিক্ষা ও পরিবর্তনের বার্তা পরিবর্তনের নিমিত্তে তাকে সার্বজনীন দায়িত্বপূর্ণ কর্ম সাধন করতে হয়। আবদুল রহিম বক্স পেসকার ১৮৯৯ সনে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজের জন্য 'খান বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন।

হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী (১৮৭১-১৯৩৬) : সমাজ পরিবর্তনের ধারা ততদিনই অব্যাহত থাকাবে ঠিক যতদিন সেই সমাজে জ্ঞানের চর্চা হবে, সংস্কৃতির লালন হবে। সামাজের এমন পর্ব মনুষের কাম্য হওয়া উচিত নয় যেখানে থাকে পূজিবাদদের দাপট, থাকে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ও শ্রেণিকরণ। এইসমস্ত বিষয়াবলীর সমীকরনেই মূলত আদর্শ একটি সমাজ বিবর্তিত হতে থাকে। সমাজসচেতন মানুষজন উক্ত পরিবর্তন ও বিবর্তন-এর মাত্রাকে তরান্তিত করে, সাবলীল করে। যখন কোন অন্যায়, অপরাধ কুসংস্কার, ব্যাভিচার নামক সমাজব্যাধি সমাজ দেহে বাসা বাধতে শুরু করে, তখন যদি সমাজদেহকে উপযুক্ত ঔষধের মাধ্যমে সুস্থ করে তোলা না হয় তবে দেহখানি পঁচে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। উপযুক্ত ঔষধটিই হলো সংস্কার, যা সমাজস্থিত মানুষগুলির হৃদয়কে করে বিমল আর প্রাণটিকে করে সবল। এমনধারার ব্যক্তিবর্গ নিয়েই আজ আলোচনার সমাহার। হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী এমন একজন জমিদার যার সংস্কার সমাজে আলো ছড়াত। মঙ্গলের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে করটিয়াস্থ পন্নী পরিবারের বিশেষ অবদান আছে। সাদত আলীখান পন্নী, তৎপুত্র হাফেজ মাহমুদ আলীখান পন্নী এবং তৎপুত্র ওয়াজেদ আলীখান পন্নী স্কুল-কলেজ,মাদ্রাসা, পত্রিকা, প্রেস, সমিতি প্রভৃতি স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন না কোন ভূমিকা পালন করেছিলেন। কারটীয়ার 'মাহমুদীয়া প্রেস' হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭৪] জমিদারীর কাগজপত্র, দলিল ও রেকর্ড মুদ্রিত করার উদ্দেশ্যে এটি স্থাপিত হলেও এখান থেকেই মুহম্মদ নইমুদ্দীন 'আখবারে এসলামীয়া' (১২৯১) পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। এতে হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী আর্থিকভাবে সহযোগিতা ও বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন।[৭৫] এছাড়াও মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের অনূদিত কয়েকখানি গ্রন্থ মাহমুদিয়া প্রেস থেকে মাহমুদ আলী খান পন্নীর বিশেষ 'অনুমত্যানুসারে' ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত হয়। করটিয়া মাহমুদীয়া হাইস্কুল, করটিয়া সাদত কলেজ তাঁর অর্থানুকূল্য ও বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতারই ফল। বাংলা ভাষা চর্চার ক্ষেত্রেও মাহমুদ আলী খান পন্নী এগিয়ে ছিলেন। বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থবলীর পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন বলে মেয়ারাজ উদ্দীন আহমেদ ও শেখ আবদুর রহিম প্রণীত *ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ* ও *সমাজসংস্কার* (১৯৮০) নামক দু'খানি গ্রন্থ হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর নামে উৎসর্গ করেন।[৭৬] অতএব একজন স্বগৌরবাহ্নিত মুসলিম নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী সুবিশেষ বিখ্যাত।

মোহাম্মদ বখত মজুমদার : শ্রীহট্টের জমিদার বখত মজুমদার ১৮৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর হতে যৌবনে পদার্পণের পুরোভাগেই তিনি অবলোকন করেছেন পিছিয়ে পড়া মুসলিম জাতির গোড়ামী,ধর্মান্ধতা, আধুনিক শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়ে অনিমেষ দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্চনাকে। প্রভাবশালী জমিদার হিসেবে তার ছিল সেইরকম ক্ষমতা, যে ক্ষমতার অবশ্য তিনি পূর্নব্যবহার করেন। ক্ষমতার গণ্ডি বাড়ানোর জন্য তিনি তার গুনাবলীর সীমানাকেও বর্ধিত করেন। যেমনঃ শ্রীহট্টের লোকাল বোর্ডের সদস্য, অনাহারী মেজিস্ট্রেট ও জেলা পরিদর্শক হিসেবে ছিলেন সুপরিচিত। তার পিতা সৈয়দ বখত মজুমদার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি তুরস্কের সুলতানের কাছ থেকে সম্মানজনক উপাধি পেয়েছিলেন (১৮৭৯)।[৭৭]

শ্রীহট্ট রাজ্যের উন্নতিবিধানে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। জনগণের মঙ্গলার্থে তিনি রাস্তাঘাট, মসজিদ,মাদ্রাসা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। মুরারি কলেজের উন্নতিকল্পে তিনি যে অর্থ দান করেছিলেন তা আজও সুশিল মহলে সমাদৃত। বাঙ্গালির মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম ডেপুটি মেজিস্ট্রেট। 'মন্টেগু চেমসমোর্ড শাসন সংস্কার' আইন[৭৮] যখন প্রবর্তিত হয় তখন তিনি আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত ছিলেন। তিনি কাউন্সিলের শ্রীহট্র জেলার বঙ্গবিভক্তির বিরোধিতা করেন এবং সরকারকে সমর্থন জ্ঞাপন পূর্বক সংস্কার কর্ম পালন করতেন । যার ফলে তিনি মুসলিম সম্প্রদায় রক্ষণশীল অংশের বিরোধিতার সম্মুখীনও হন। তথাপি তিনি দমে যাননি। তার এই ধরনের কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড অবলোকনপূর্বক বৃটিশ সরকার তাকে 'খান বাহাদুর' (১৯০৯) উপাধিতে ভূষিত করে।[৭৯]

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯০৫): নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বিতর্কিত একজন মানুষ হলেও নিজ কর্মগুণে তিনি বিশেষভাবে সুশীল তথা আপামর বাঙালি সমাজে জনপ্রিয়। ১৮৭১ সালের ৭ জুন রাত ৮টা ২৪ মিনিটে তিনি ঢাকার নওয়াববাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। নওয়াব সলিমুল্লাহর জন্য ঢাকার নওয়াব বাড়িতে জন্মগ্রহণ ছিল এক পরিতৃপ্তিকর বিষয়। বাল্যেকালে তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন বিভিন্ন ভাষায়। যেমনঃ আরবী, ফারসী, জার্মান প্রভৃতি ও বাংলা। বাংলা ভাষার প্রতি টান ছিল নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর মজ্জাগত। তবে উর্দু ভাষাভাষি মুসলিমদের প্রতি তাঁর অশেষ ভালবাসা ছিল, অবশ্য পরে এর জন্যই তিনি মর্মাহত হয়েছেন।

১৯০৬ সালের ১৪ই জুন হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের সৃষ্ট ওয়াকফ-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত সভায় নওয়াব সলিমুল্লাহ একটি ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে তিনি বলেন, 'আমাদের অনেক ইবাদতখানা ও মসজিদ আছে। বড় বড় শহরে প্রতি আধা মাইলে একটি মসজিদ যা আমাদের ধর্মকর্মের জন্য যথেষ্ঠ। কিন্তু এখন আমাদের জরুরী প্রয়োজন হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। যার ফল হবে সুদূরপ্রসারী এবং এতে ছোট-বড় সবাই লাভবান হবেন। যদি কেউ এখন ভাল কাজ করতে চান, তবে তাকে শিক্ষার জন্য সাহায্য করা উচিত। আমাদের সমাজে পুরনো ধ্যান-ধারণার লোকেরা এমন অনেক কাজে হাজার হাজার টাকা দান করেন, যাতে শিক্ষারত দরিদ্রদের কোন কাজে আসে না। সমাজের প্রয়োজনে একটু চিন্তা করে তাদের ভুল শুধরানো উচিত।[৮০]

সলিমুল্লাহ তার সংস্কারধর্মী চেতনার বীজ খুঁজেন সমাজের নানান স্তর থেকে। শিক্ষা বিষয়টিকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ বিভিন্নভাবে অনুধাবন করে। আর তিনি এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, অনুধাবন ক্ষমতার উপর শিক্ষার প্রকৃত সুফল নির্ভর করে। এই চিন্তাধারা মাথায় রেখেই নওয়াব সলিমুল্লাহ নানান ধরনের শিক্ষার বিস্তারে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন- সংস্কৃতি সৃষ্টির জন্য যেমন সমাজে নানা পেশার লোক থাকা প্রয়োজন, তেমনি নানাপেশার লোক সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাঁরমতে শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কৃষিবিদ্যা, কারিগরি ও শিল্পবিদ্যা এবং বাণিজ্য শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকা চাই। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সমাজে বিদ্যমান নানাশ্রেণির মানববৈশিষ্ট্য থেকে যে উত্থিত তার প্রেক্ষাপটও তিনি রচনা করেন।নওয়াব সলিমুল্লাহর শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা কেমন ছিল সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়– প্রথমত; অভিজাত, জমিদার, জায়গিরদার শ্রেণির নিকট শিক্ষা কেমন অর্থ বহন করে? মূলত শিল্প উন্নতির যুগে এই শ্রেণির অবনতি ঘটে কেননা তারা শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন থেকে সমাজে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। দ্বিতীয়ত; চাকুরিজীবী, উকিল ও চিকিৎসক শ্রেণি যারা মূলত শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ, তবে আলোচ্য সময়ে হিন্দুদের তুলনায় বাংলায় এই শ্রেণির সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল। অপরদিকে নিম্নবেতনভূক কর্মচারীদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন তথা সংস্কার প্রয়োজন। তৃতীয়ত; প্রাচীনপন্থি রক্ষণশীল শ্রেণি– এই শ্রেণির লোকেরাই সাধারণত সবচেয়ে বেশি দরিদ্র। ধর্মীয় গোঁড়ামী ও অজ্ঞতার কারণে এরা নিজেদেরকে ধ্বংসের নিম্ন স্তরে নিয়ে যায় যেখান থেকে উঠতে হলে প্রয়োজন আর্থিক সাহায্য, প্রয়োজন শিক্ষা। চতুর্থত; ব্যবসায়ী তথা বণিকশ্রেণি যাদের সন্তানাদির জন্য প্রয়োজন বাণিজ্যিক শিক্ষা। তাই এখানের সমাজে বাণিজ্য শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চমত; মামুলি পেশাদার ও কৃষিজীবী শ্রেণি। এই শ্রেণির কেউ হয়ত কুটির শিল্পে কাজ করছে, কেউবা রাস্তা মেরামতের মজুরী খাটছে, মাঝি হয়ে এক টাকার বিনিময়ে নদী পার করে দিচ্ছে। উঁচুশ্রেণির মানুষের বাড়িতে স্থায়ী কামলা খাটছে (কামলা এখানে কুমিল্লার একটি আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে)। কেউবা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে-ফিরে সমাজের মানুষকে আনন্দ দেয়ার জন্য গান ফেরি করে বেড়ায়। এভাবে তারা হিসেবে পরিচিত হয় যারা গানের বিনিময়ে বড় বড় বাড়ি থেকে 'চাল' পায়, মাঝে মধ্যে মুদ্রা-কঁড়ি। এভাবেই এসব নিম্নপেশাজীবীরা তাদের জীবন অতিবাহিত করে। সমাজের বহুল আলোচিত যে অংশটি শুধু লেখক ও বিদ্রোহীর কলমের বাহক হয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখে সেই অংশ হল কৃষক তথা উৎপাদক শ্রেণি। এই সেই 'কৃষিজীবী' শ্রেণি যাদের উপর দেশের স্বাচ্ছন্দ, আনন্দ, প্রশান্তি নির্ভর করে; কিন্তু তাঁরা মুর্খ ও অশিক্ষিত। তবে তাই বলে তারা অবহেলিত তা কিন্তু নয়। বরং তারা তাদেরকে একটি সিস্টেমের মধ্যে ফেলে রেখে চলে। যে সিসেন্টমটি উঁচুশ্রেণির মানুষ সমাজে চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহার করে। এদের সন্তান-সন্তানাদিও কিন্তু অতদূর পড়তে পারে না। কদাচিৎ কিছু কৃষক ঘরের সন্তান আপন মেধায় অসাধ্য সাধান করত। নওয়াব সলিমুল্লাহর মতে- এদের সন্তান-সন্তানাদিকে পৈত্রিক পেশা থেকে টেনে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করানোর প্রয়োজন নেই বরং এদেরকে উত্তম কৃষিশিক্ষা দেয়া দরকার। নওয়াব সলিমুল্লাহ বলতেন যে, মুসলমানদের উন্নতি কেবল ইংরেজদের চাকরিতেই নিহিত এ কথা মনে করা একান্ত ভুল। জাতীয় উন্নতি ও সভ্যতায় উৎকর্ষ লাভের অর্থ এই নয় যে, সমাজে কেবলমাত্র বড়

বড় শিক্ষিত লোক সৃষ্টি হবে বরং সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত উন্নতির জন্য জাতির অনেক কিছুই থাকতে হয় এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অবশ্যই থাকতে হবে।[৮১]

তাঁর এই কথাগুলি থেকে মোটামোটি এই ধারণা করা যায় যে, একটি গঠনমূলক ও উন্নত সমাজ গঠনে তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সকল শ্রেণির সমাজস্থ মানুষকে নিয়ে তিনি ভাবতেন। তিনি সকল শ্রেণির মানুষকে সাম্যের নীতিতে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করতেন। মুসলীম লীগ গঠণের (১৯০৬) ঠিক এক বছর আগে বঙ্গভঙ্গের বছরই বোঝা গিয়েছিল মুসলিম সম্প্রদায়কে হিন্দুদের সমকক্ষ করে তোলার অভিলাষ। পিছিয়ে পড়া হতাশাগ্রস্থ মুসলিম জাতির জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহর ভাবনা ছিল সময়ের এক যুগোপযোগী আকাঙ্খা। নওয়াব সলিমুল্লাহর সকল গঠনমূলক কাজের এক উল্লেখযোগ্য কর্ম হল 'Introducation of Reformed New Schme Madrasa'.

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক ধরনের আমুল পরিবর্তনের দৃশ্য ফুটে উঠে। যখন তারা বুঝতে শিখেছিল ইংরেজী ছাড়া গতি নেই। কিন্তু কতিপয় রক্ষণশীল প্রাচীন পন্থীদের মনে একটি ভয় ছিল যদি কিনা ধর্ম শেষ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়। তখন তারা একতাবদ্ধ হলেন এবং অতি রক্ষণশীলতার মনটিকে কিছুটা শান্ত করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করলেন। সেই পন্থাটি হল ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ অতি জরুরি, তবে ইসলাম ধর্মের ঐতিহ্য রাখাও দরকার। তারা দেখল ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত ধর্ম বিবর্জিত এবং লোকায়েত শিক্ষার প্রতি সাধারণ মুসলমানদের তেমন আগ্রহ নেই।

আবার যুগের অনুপযোগী প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের বাস্তব জীবনে তেমন কোন কাজে আসে না। অন্যদিকে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে প্রতিবেশী হিন্দুগণ সকল চাকুরী ও বাণিজ্যে এগিয়ে যাচ্ছে, আর তাছাড়াও ইসলাম ধর্ম অবগাহন হচ্ছিল প্রতিটি মুহুর্তে কুসংস্কারের বেড়াজালে। তখনই নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ, সৈয়দ নওয়ব আলী চৌধুরী, মাওলানা আ. ন. ম ওয়াহিদ প্রমূখকে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করেন। সে কমিটির উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত করা। ১৯১০ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির রিপোর্ট চূড়ান্ত হয় এবং ১৯১৫ সালে তা এদেশে কার্যকর হয়।

নারী অবরোধবাসিনী, রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারময় পর্দার সীমানা পার হবার সাহস যাদের নেই কিংবা দেওয়া হয় না তাদের জন্যও নওয়াব সলিমুল্লাহ ভাবলেন। ১৯০৮ সালে তৎকালীন জনশিক্ষা কমিটির ডাইরেক্টর মি. আর নাথানকে সভাপতি করে এদেশের তথা পূর্ববাংলার সর্বস্তরের নারী শিক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়, নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ ছিলেন ঐ কমিটির সদস্য। এক্ষেত্রে সলিমুল্লাহ সমাজের সাধারণ জনসাধারণ থেকে শুরু করে কর্তা ব্যক্তিদের অভিরুচি পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে পূর্ববাংলার মুসলিম নারীদের শিক্ষার উন্নতির জন্য যুগোপযোগী সুপারিশমালা সরকারের নিকট পেশ করেন। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক আইন সভায় ভাষণদানের সময় নারী শিক্ষার অবস্থা বর্ণনা করার সময় বলেন- "While speaking of education, I must observe that our females are admittedly

lamentably backward in this respect ...let us hope that the public will seize the opportunity, now offered and exert itself to the utmost to remove the reproach of ignorance from its wives and daughters".[৮২]

পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য সবচাইতে বড় প্রয়োজন ছিল শিক্ষা– নওয়াব সলিমুল্লাহ পুরোপুরিই বুঝতে পেরেছিলেন। এলক্ষ্যে তিনি ঢাকায় আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট), মির্টফোর্ড হাসপাতাল (সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ), সলিমুল্লাহ এতিমখানা, ঢাকা হোস্টেল (বর্তমানে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল), সলিমুল্লাহ ডিগ্রী কলেজ (স্থাপিত ১৯২৫), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তৎকালীন বড়লার্ট লর্ড হার্ডিঞ্জকে প্রভাবিতকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর অর্থ ও জমিদান করেন। এছাড়াও তিনি ১৯১১ সালে ঢাকা মাদরাসা স্থাপন, ১৯০২ সালে নেত্রকোনা মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১৯০৪ সালে তিনি ঢাকার বিক্রমপুর দিঘিরপাড় দুলিমিয়া মাদ্রাসার উন্নয়নে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। এছাড়াও টাঙ্গাইলের জামুর্কীতে ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ জনকল্যাণার্থে একটি মসজিদ ও একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন।[৮৩]

শিক্ষা সচেতন আধুনিক মনোভাবাপন্ন সংস্কারকগণ ও বাঙালি মুসলমানঃ

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার মুসলমান সমাজকে ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পরবর্তীতে লাখেরাজ সম্পত্তি আইন বাতিল এবং ১৮৩৭ সালে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজীকে রাজভাষা করার ফলে বাংলা ও ভারতের মুসলমান সমাজের জীবন-জীবিকার সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। মুসলমান সমাজ পরিণত হয় একটি হতদরিদ্র শ্রেণিতে। বাংলা ও ভারতের মুসলমানদের ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের একটি মাইলফলক হলো ১৮৫৭ সাল। সিপাহী বিপ্লবের ফলে ভারতীয় সমাজে বেশ কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিবির্তন সূচিত হয়।এ সময়ে শিক্ষা সচেতন আধুনিক মনোভাবাপন্ন মুসলিম সংস্কারকগণের আগম ন ঘটে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী, আদালত খান, সিরাজুল ইসলাম, খন্দকার ফজলে রাব্বি, আবদুর রসুল, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হুসাইন, আবদুর রহিম, স্যার আযিযুল হক, মনিরুজ্জামান ইসলমবাদী, আবদুল করিম (ইনস্পেক্টর), খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখিত ব্যক্তিদের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামের দর্শন ও শিক্ষাকে অক্ষুণ্ন রেখে ইউরোপের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে গ্রহণ করা। তবে এক্ষেত্রে এক একজনের যুক্তি ও ধ্যান জ্ঞান ছিল এক এক রকম।

পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ের পর (১৭৫৭) ভারতের কট্টরপন্থি মুসলিমগণ ভেবেছিল তাদের যে চলমান সংকট তার জন্য দায়ী হিন্দু ও ইংরেজগণ। ফলে তারা শুরু করল বিদ্রোহ। নিজেদের করুন অবস্থা থেকে উত্তরণের রাস্তা না খুঁজে তারা শুরু করল ক্ষমতাধরদের সাথে বিদ্রোহ। ফলে ইংরেজ সরকারের কাছে তারা পরিণত হল সন্ত্রাসরূপে। আর অপরদিকে হিন্দুরা ইংরজী শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে নিজেদের পোয়া ভারী করতে লাগল। সন্ত্রাসবাদী মুসলমানদেরকে ইংরেজরা নিজেদের অস্তিত্বের জন্য বিপদজনক হতে পারে মনে করল। ফলে তাঁরাও শুরু করল দমননীতি প্রয়োগ, যে দমননীতির বলি হয়েছে হাজারও

মোল্লা ও মুঘল পরিবারের অসংখ্য সদস্য। এ পটভূমিতে বাংলা ও ভারতের মুসলমান সমাজ তাদের রাজনৈতিক কর্মকৌশল ও নীতিতে পরিবর্তন আনয়ন করে। সশস্ত্র আন্দোলনের পাশাপাশি শুরু হয় সমাজ সংস্কার আন্দোলন। ইতোপূর্বে যেমন কেউ রক্ষণশীলতার ভিত্তিতে করেছে সংস্কার, কেউ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে আবার কেউবা প্রগতিবাদীতার সূত্র ধরে।
উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে বাংলা ও ভারতে শুরু হয় হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল প্রাচীন ভারতের আদলে আধুনিক ভারত নির্মাণ, প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ভারতীয় ঐতিহ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা, মুসলমান সমাজকে এই ঐতিহ্য থেকে দূরে রাখা যেহেতু সম্ভব নয় তাই তার ঐতিহ্যকে বিতর্কিত করে তোলা। সমাজ সংস্কার আন্দোলনটিকে এই পর্যায়ের বুদ্ধিজীবীগণ যখন দেখলেন ঐতিহ্য রক্ষা (মুসলিমদের), ক্ষুধা নিবারণ ও মানুষরূপে বাঁচার জন্য মূল্যবোধকে জাগানোর প্রয়োজন; তখনই শুরু হয়ে গেল সমাজ সংস্কার আন্দোলন নিয়ে নতুন শিক্ষিত ব্যডক্তবর্গের এই ত্রিমুখী ভাবনা বা আদর্শ নিয়ে আন্দোলন।

নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩): ১৮২৮ সালে ফরিদুপর জেলার রাজাপুর গ্রামে আবদুল লতিফের জন্ম। তার পিতা কাজী ফকির মোহাম্মদ (মৃত ১৮৪৪) কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দিতে বাংলার মুসলমানদের উন্নতির জন্য যে কয়েকজন ব্যক্তি অসমান্য অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্যে নওয়াব আবদুল লতিফ ছিলেন অন্যতম। বাংলার দুর্দিনে তাঁর আবির্ভাব হয়। তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলে তৎকালীন বাংলার মুসলিম সমাজ আশু ধ্বংসের হাত হতে মুক্তির পথ দেখে। ইংরেজী শিক্ষা বিমুখ বাংলার মুসলমানদের উদ্ধারকল্পে উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তিনিও বাংলায় ঠিক তেমনি ভূমিকা পালন করেন।[৮৪]
১৮৪৬ সালে মাদ্রাসার সরকারি শিক্ষক হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন। ১৮৪৯ সালে তিনি ডেপুটি মেজিস্ট্রেট হন। ১৮৫৯ সালে আলিপুরের প্রেসিডেন্সি মেজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হয়ে ১৮৮৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৬২ সালে তিনি নবগঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৭০ এবং ১৮৭৩ সালেও তিনি ঐ সভার সদস্য হন। তিনি ১৮৬৩ সালে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। একই বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন এবং ১৮৬৩-৯৩ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষক বোর্ডের সদস্য ছিলেন। এছাড়াও ১৮৬১-৬৫ সালে কলিকাতার আয়কর কমিশন এবং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৮৬০ সালে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' এবং ১৮৭০ সালে 'বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্সস এসোসিয়েশনের' সদস্যভূক্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারকে সহযোগিতা করা, সামজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা এবং শাসক শ্রেণির প্রতি পুর্ণমাত্রায় আনুগত্য স্বীকার করার কারণে আবদুল লতিফ ১৮৭৭ সালে 'খান বাহাদুর', ১৮৮০ সালে 'নবাব', ১৮৮৩ সালে 'সি.আই.ই' এবং ১৮৮৭ সালে 'নবাব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন।[৮৫] সিপাহী বিদ্রোহের রেশ কাটার পরও ওহাবী আন্দোলন আরও কিছুকাল চলছিল। ফলে ইংরেজগণ মুসলিম সম্প্রদায়কে আরো বেশি মাত্রায় সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। এমতাবস্থায় নওয়াব আবদুল লতিফ একদিকে যেমন ইংরেজদের প্রতি স্বধর্মাবলম্বীদের বিরূপ মনোভাব দূর করে

সরকারের প্রতি তাদের অনুগত করে তোলা; অপরদিকে দেশীয়দের প্রতি ইংরেজদের নেতিবাচক মনোভাব দূর করে দেশীয়দের মধ্যে থেকে ইংরেজ প্রীতিভাজন বিদ্বান ব্যক্তি তৈরি করা। তবে দেশীয়দেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার স্পৃহা নিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়ে তিনি বাঁধা পেলেন অর্থের কাছে। তিনি দেখলেন মুসলমানরা চরম আর্থিক দৈন্যে ভূগছে। অতএব মুসলিমদের অর্থসংকট দূর করার অভিপ্রায়ও নিলেন তিনি স্বীয় সংস্কার কর্মযজ্ঞে। তিনি তখন হুগলী স্কুল ও কলেজে মহসিন ফান্ডের যে টাকা মুসলিম ছাত্রদের জন্য ব্যয় করার কথা অথচ তা না হয়ে বরং তার ফল ভোগ করছে হিন্দুগণ। তখন তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন এবং সফলও হোন। তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সকল সম্প্রদায়ের সমঅধিকারের বিষয়ে মত দেন। এরপর নওয়াব আবদুল লতিফ গ্রাম পর্যায়ে সচেতন এলিটদের নিয়ে সভা-সমিতি স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে ঘুমন্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সম্পদায়ের সেই অংশটিকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস চালান। মূলত তিনি সাংগঠনিক চিন্তা ও ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সভা-সমিতি স্থাপন করেন। তাঁর এমনই এক অনবদ্য সমিতি হল 'মোহামেডন লিটারেরী সোসাইটি'। এই সোসাইটির জন্য তিনি সরকারের কাছ থেকে ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ও স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। মূলত নওয়াব আবদুল লতিফের এই সোসাইটি স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজ পরিবর্তন, বদলে যাও বদলে দাও নীতি প্রয়োগ।

ওহাবী আন্দোলনের প্রভাবে হোক অথবা মোল্লাদেরকঠোর প্রচারের ফলে হোক, 'কুফরে কালাম' ইংরেজী ভাষা ও 'এলমে বেদিন' পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রতি একশ্রেণির মানুষের বিরূপ মনোভাব ছিল, তদুপরী ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মূলত মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করে চিহ্নিত করা। এমতাবস্থায় নওয়াব আবদুল লতিফ বিশেষ কর্মসূচী হাতে নিলেন, যেমন– ১৮৭৪ সালে চট্টগ্রামে মাদ্রাসা স্থাপন এবং এর সাথে মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ, উচ্চ শিক্ষার্থে সরকারী খরচে প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৮৫৪ সালে নির্মিত) মুসলমানের প্রবেশের দ্বার উন্মুক্তকরণ, কোলকাতা মাদ্রাসা সংলগ্ন 'এলিয়ট হোস্টেল' নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ, যার বাস্তবায়ন হয় ১৮৯৬ সালে। ১৮৫৪ সালে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর সুপারিশক্রমে বাংলা ও উর্দু শিক্ষা চালুর সাথে সাথে ইংরেজী ও ফারসী বিভাগ খোলা হয়। তৎসময়ে কলিকাতা মাদ্রাসায় কেবল ভদ্র পরিবারের ছেলেরা পড়ার সুযোগ পেত। সাধারণ শ্রেণির ছেলেরা পড়তে পারত না বলে তিনি তাদের জন্য কলিঙ্গায় সাধারণ শাখা মাদ্রাসা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন; যেখানে গরীব অথচ মেধাবী ছাত্রদের জন্য ২৮,০০০/- টাকার বৃত্তি তহবিল গঠনের ব্যবস্থা করেন।

ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উত্তরণে নওয়া আবদুল লতিফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিত্তিতে তিনি ১৮৫৩ সালে ভারতের মুসলমানদের কাছ থেকে ফারসীতে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। উক্ত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতের মুসলমান যুবকদের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষার উপকারীতা ও তার গ্রহণযোগ্য শিক্ষা ব্যবস্থা'। ইংরেজীতে মুসলমানগণ কতটুকু দক্ষ তা নিরূপনের জন্য তিনি ১৮৬৩ সালে ইংরেজী মাধ্যমে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করতে পারতেন। এক্ষেত্রে বোধ হয় তার রক্ষণশীল মনোভাব কিছুটা দায়ী

ছিল। এছাড়াও তিনি তার আত্মজীবনী *A short account of my public life*-এ লিখেছেন– 'দেশের জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বিশেষত মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি অতিবাহিত করেছি'।[৮৬]

সমাজ সংস্কারে বেশ কিছু রিপোর্ট, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। 'এ মিনিট অন হুগলী মাদ্রাস (১৮৬১)' শীর্ষক একটি তদন্ত রিপোর্ট, 'বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনে'র সভায় পঠিত দু'টি প্রবন্ধ, 'দি নেচার অব অবজেকটস এন্ড এডভ্যানটেজেস অব পিরিয়ডিক্যাল সেন্সাস (১৮৬৫)', 'এ পেপার অন মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল (১৮৬৮)', 'দি মহামেডান ল' অব ম্যারেজ এন্ড ডাওয়ার (১৮৭৫)', 'পেপার অন দি প্রেজেন্ট কনডিশন অব দি ইন্ডিয়ান মহামেডানস এন্ড দি বেস্ট মীনস ফর দি ইমপ্রুভমেন্ট (১৮৮০)' প্রভৃতি তাঁর মূল্যবান রচনা। নওয়াব আবদুল লতিফের সমাজ সংস্কারকে অস্বীকার করা যায় না যদিও তিনি উর্দু ভাষা পছন্দ করতেন, যদিও তিনি ছিলেন রক্ষণশীল মুসলমান। আসলে মুসলিম সমাজের উদ্ধারকল্পের কাজটি তিনি করেছেন আধুনিকতা ও গোড়া রক্ষণশীলতার মিশেল তৈরি করে। বাংলা ভাষা যে বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রাণস্বরূপ তা পাকিস্তানি হানাদারদের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত (১৯৩০-১৯৫২) রক্ষণশীল ঘরানার ব্যক্তিগণ বুঝতে পারেন নি অথবা বুঝতে চাননি কিংবা গুরুত্ব দেওয়ার পথ তৈরি হয় নি। রাজা রামমোহন রায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেও তুমুল বিতর্কিত অবস্থায় সমাজ সংস্কার আন্দোলন চালিয়েছিলেন, এভাবে তুলনা করলে নওয়াব আবদুল লতিফ বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে সমাজ সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে নেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তথাপিও তাকে অনবরত সংগ্রাম করে যেতে হয়েছে সমাজের সাথে, হিন্দু জাতির সাথে। ইংরেজগণকে যতবার তিনি সংস্কার কাজ সমাধা করতে গিয়েছেন ততবারই স্ব-জাতি কর্তৃক ভুল বোঝাবোঝির স্বীকার হয়েছেন।

সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮): সৈয়দ আমীর আলী ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল হুগলী জেলার এক সম্ভ্রান্ত শিয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল সাদাত আলী। তিনি অযোধ্যার নবাবের অধীনে চাকরি করতেন।[৮৭] আমীর আলীর শিক্ষা জীবন শুরু হয় হুগলী মাদ্রাসার মাওলানা কেরামত আলীর কাছে। তাঁর বিচক্ষণ পিতাই মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাঁর ভিতরে আগ্রহ তৈরীর সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তৎসময়ে মুসলমান সমাজ যে অন্ধকারে পড়ে আছে তার জন্য ঐ মনোভাবই দায়ী, যে মনোভাব আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে অগ্রসর হয় না। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে আমীর আলী হুগলী কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। ১৮৬৮ সালে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৬৯ খ্রি. বি. এল ডিগ্রী লাভ করে ভারতীয় সরকারের কাছ থেকে স্টেট স্কলারশিপ লাভ করে লন্ডনের ইনার টেম্পল এ ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ভর্তি হন। এভাবে আমীর আলী তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিদ্যায় অবগাহন করেন। বিখ্যাত আইনজীবী একজন খ্যাতনামা আইনের অধ্যাপক হিসাবেও তিনি বেশ পরিচিত ছিলেন। এছাড়াও ১৮৭৪ সালে আমীর আলী বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতার প্রেসিডেন্সি মেজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন।[৮৮]

কর্মময় জীবন যার যত সফল তাঁর সমাজ সংস্কার দিকটিও যে খুব তাৎপর্যপূর্ণ হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমীর আলী সমাজ সংস্কার-এ স্বীয় চিন্তা-চেতনার ধারাকে প্রবাহিত করেছেন রক্ষণশীলতার গণ্ডিকে ছাড়িয়ে। কখনও তাঁর সমাজ সংস্কার আন্দোলনে তাকে দেখা গিয়েছে উদার প্রগতিবাদী হিসাবে কখনও দেখা গিয়েছে প্রতিক্রীয়াশীলতার গণ্ডি সমেত।

আমীর আলী কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলী থেকে তাঁর চিন্তা জগতের যথার্থ বিচার সম্পন্ন করা যায়। সৈয়দ আমীর আলী দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম ইতিহাসে একটি অবিস্মরনীয় নাম। আপন মেধা, প্রতিভা, কর্ম, চিন্তা, সাধনা ও সাফল্যে তিনি গোটা বাংলার মুসলমান সমাজের কাছে এক আদর্শ কর্মী পুরুষ। সারা মুসলিম জাহানে তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। অবিভক্ত ভারতে মুসলমান সমাজ সংস্কারে তিনি এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে সৈয়দ আমীর আলী ইংল্যান্ড ও ভারতে খুবই সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংস্কার আন্দোলনের পূর্বে ইসলাম ধর্ম যখন কলুষিত তখন তাকে ধুয়ে-মুছে পরিস্কার করতে এসেছিলেন অনেকে, তবে আমীর আলীর পদার্পণ ছিল যেন একটু অন্যরকম। কিছুটা সাহসী, কিছুটা আগে-পিছে না ভেবে ছুটে চলা। তিনি যখন দেখলেন যে ইসলামের মূল আদর্শসমূহ অন্যান্য জাতি কিংবা অজ্ঞান লোকেরা অঞ্চলভিত্তিক ভাষা বুঝতে পারে না। তখন তিনি ভাবলেন এর জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক ইংরেজী ভাষার। মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞ হিসাবে ইসলামী আইন ব্যাখ্যা করে সারা ইসলামী বিশ্বে স্বীকৃত, মুসলিমগণ ন্যায্য অধিকার রক্ষার আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের সামাজিক দূরাবস্থা নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবতেন। সৈয়দ আমীর আলী যখন ছাত্র জীবন পার করছিলেন তখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ভারতীয় উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত হিন্দু মহল ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী নানামুখী অপপ্রচারে লিপ্ত। আর তাদের মুসলিম বিদ্বেষ ও অপপ্রচারের দ্বারা প্রভাবতি ইংল্যান্ডের শিক্ষিত মহল। আবার তিনি তাঁর অনুধাবন ক্রিয়ায় তাও দেখতে পেলেন যে সমগ্র ইউরোপের জ্ঞানজগতে ইসলাম সম্পর্কে এক বিভ্রান্তিকর ধারনা বিরাজমান। এই ধারণা যতদিন ইতিবাচক না হবে ততদিন মুসলমান সমাজ দিশেহারা থাকবে। তিনি বুঝতে পারলেন এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যুক্তি দিয়ে লেখা-লেখি শুরু করে দিলেন। এর ফলে ইউরোপীয় মহলে এবং বাংলা ও ভারতে ইসলাম সম্পর্কে যে বিভ্রান্তিমূলক ধারণা ছিল তা দূরীভূত হয়। ভারতীয় মুসলমানদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উপর দাঁড়িয়ে আমীর আলী অনুধাবন করেছিলেন যে, ইসলামী ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরা ছাড়া তাদের মুক্তি অসম্ভব। তবে এখানে মূল ইসলাম ও মুসলমানদের ঐতিহ্য অন্ধকারে পড়ে আছে, তারা আজ ভুল ইসলাম নিয়ে ব্যস্ত। মোহপাপ তাদের অন্তরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তাই আর উপায় নেই। আমীর আলী লিখতে শুরু করলেন। সৈয়দ আমীর আলীর লেখা ইতিহাস গ্রন্থগুলি পাঠ করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে ইসলামের মূল ঐতিহ্যকে ধরে সমাজের পরিবর্তন অবশ্যই সম্ভব। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি হল–

Life and Teachings of prophet Mohammad, Edinburgh, প্রথম প্রকাশ, ১৮৭৩;*Mohammadan Law,* দুই খন্ড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৮৮০;*The personal law of Mohammadans,* লন্ডন, প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৪;*Ashort History of Saracens,* প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৯;*Real status of women in Islam,* লন্ডন, প্রথম প্রকাশ, ১৮৯১;*Islam,*লন্ডন, প্রথম

প্রকাশ, ১৯০৬;*Christianity from Islamic stand point*,লন্ডন, প্রথম প্রকাশ, ১৯০৬;*The spirit of Islam*, লন্ডন, প্রথম প্রকাশ, ১৯২৩। এছাড়াও জিহাদ ও বেঙ্গল প্রজাসত্ত্ব আইনের উপর তার দুটি পুস্তিকা রয়েছে।

সৈয়দ আমীর আলীর গ্রন্থাবলী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়। তাঁর লেখা*Life and Teachings of Mohammad*গ্রন্থটি লেখার জন্য আরবী ও ফারসী উৎসের বেশি ব্যবহার করেছেন। ভাষা সম্পর্কে দক্ষতার জন্য তিনি অতি সহজেই যেকোন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করতে পারতেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন মানুষ আমীর আলী তাঁর গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন-[৮৯] In the following pages, my object has been to embody the principal features of the life and teachings of the Arabian Prophet in a popular shape; to disabuse the minds of many readers of false impressions and false prejudices, to try and prove that islam has been a real blessing to mankind; that in also has helped to elevate, humanity as Christanity partially did before; that in fact, it is one of those manifestations of Divine Wisdom by which the universal Father leads us on towards the final object of our existence. I have stated my views frankly, and claim from those of my readers who may differ from me, the induigence always accorded to outspokenness, the authorities I have consulted have been carefully (and to some they many seem, pedantically) referred to in the work, for in a writing of the kind I now place in the hands of the public, it is often better to err on the safer side to be too exact in quoting authorities than too remiss. সৈয়দ আমীল আলীর*Mohammad law*গ্রন্থটিপ্রকাশিত হয় ১৮৮০ সালে।এই গ্রন্থটি মুসলিম আইনের উপর একটি মৌলিক গ্রন্থ। আইনী জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনি এই বিষয়টি লক্ষ্য করেন যে, মুসলিম আইন সম্পর্কে মুসলমানদের একটি বড় অংশ অজ্ঞ। একই সঙ্গে মুসলিম আইনের অপপ্রয়োগের বিষয়টিও ছিল লক্ষণীয়। ইংরেজরা ভারত দখল ও স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম আইনেই দেশ পরিচালিত হয়েছে দশকের পর দশক; অথচ মুসলমানরা তা অনুধাবনই করতে পারছে না। তিনি বিভ্রান্ত মুসলমান সমাজকে বুঝাতে চেয়েছেন 'তোমাদের আইনের উৎস হল কুরআন'। তিনিবলেন,The Musalman legists trace almost all the principles to the koran. It is regarded, in fact, to contain the fundamental prescriptions-which regulate the various relations of life; the religious, civil and criminal laws which provide for the constitution and continuance of the body politic: and even the germs of political rules and social economy...by a reference to the daily mode of his life as handed down to posterity by his immediate followers.[৯০]

ইসলামে নারীর মর্যাদা সর্বোচ্চভাবে স্বীকৃত। নারী পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত। তার ভরণ-পোষণের পূর্ণদায়িত্ব স্বামীর। ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী বলেন–"Under the Islamic laws, as will be shown in detail hereafter, a women occupies a superior legal position to that of her English sister. As long as she is unmarried, she remains under the parental roof, and untill she attairs her majority, she is, to some extend, under the control of the father or his representatives... She can act as an administratrix or executrix, or be appointed a mutwallieh (governor of a charitable endowment).[৯১] আমীর আলী এই গ্রন্থের মধ্যদিয়ে

সমাজে নারীর সঠিক অবস্থান সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন। বেআইনি ফতোয়া দিয়ে ইসলামী আইন তৈরী করে যেখানে নারীকে অত্যাচারীত করা হয়, তার কাছ থেকে তার ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয় সে সমাজতো উন্নত সমাজের দৃষ্ঠান্ত হতে পারে না। সৈয়দ আমীর আলী উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় মর্যাদা সম্পর্কিত আইন নিয়ে কথা বলেছেন। এই অংশের সতেরোটি অধ্যায়ে রয়েছে যেমন-আইনগত ধারার মর্যাদা, কৃতজ্ঞতা বা স্বীকারোক্তির আইনগত মর্যাদা, বিবাহের মর্যাদা, শিয়ামতে বিবাহের মর্যাদা, ধর্ম পরিবর্তনে বিয়ের মর্যাদা, বিবাহের বিষয়ে উভয়পক্ষের দায়িত্ব-কর্তব্য, তালাক পদ্ধতি প্রকৃতি বিষয়াবলী। মুসলিম বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মুসলিম আইনের বিবাহের মূলনীতি প্রসঙ্গে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন-

“Regarded as a social institution, marriage, under the Muhammedan law, is essentially a civil contract, its validity depends an proposal of one side and acceptance on other... the parties retain their personal rights against each other as well as against strangers; and according to the majority of the schools, have power to dissolve the marriage-tie, should circumstances render this desirable.[৯২]

সৈয়দ আমীর আলীর কালজয়ী ইতিহাস গ্রন্থ*The spirit of Islam*প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে।[৯৩] উক্ত গ্রন্থ রচনায় আমীর আলী কুরআন ও হাদীসের উপর সর্বাধিক নির্ভর করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকা ছাড়া এ গ্রন্থ দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের শিরোনাম হলো- The life and Ministry of Prophet, দ্বিতীয় অংশের শিরোনাম- The Spirit of Islam। দ্বিতীয় এই অংশটির তাৎপর্যতা, এই অংশে ইসলামের মর্যাদাকে সর্বোচ্চ আসনে আসীন করাতে ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম তথা আদর্শ ধর্মের রূপ দিতে গিয়ে তিনি ইসলাম পূর্ববর্তী ধর্মসমৃদ্ধ, ধর্মসমূহের অপূর্ণতা, ব্যক্তি মানুষের জীবন চলা, এবং সমাজজীবনে ধর্মসমূহের অকার্যকারীতা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি আলোচনা করেছেন গ্রিস, রোম, উত্তর-আফ্রিকা, পূর্ব রোমান-সাম্রাজ্য, পারস্য, এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে রাজনৈতিক ও সামাজিক অরাজকতার বিষয়। এছাড়াও এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন মহানবী (সাঃ) পূর্ব আরবের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানুষের নৈতিক অবস্থা, আরবদের গোত্রীয় লড়াই, কবিতার প্রতি অপার প্রীতি, আরবদের সহজ-সরল চরিত্র, তাদের আহিমেয়তা, নারী সমাজের চরম দুরাবস্থা প্রভৃতি বিষয়। তৎসময়ের মুসলমান সমাজ (১৭৫৭-পর হতে...) যেন ইসলামের পূর্বেকার সমাজ ব্যবস্থার অরাজকতার করুন ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সুশ্রী সমাজ গঠনে প্রত্যয়ী হয়। তাই আমীর আলীর লেখনীর এই অভিব্যক্তির স্বরূপ উন্মোচন। আমীর আলীর গ্রন্থটি পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পিছনে যুক্তি রয়েছে। তাঁর লেখা গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ The Spirit of Islamহল সর্বকালের সামগ্রিক সমাজ সংস্কারের এক মডেল। এই অংশে তিনি আলোচনা করেছেন-সমাজনীতি, ধর্ম, দাসপ্রথা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, নারীর অধিকার, নারীর সামাজিক মর্যাদা, বিবাহপ্রথা, পরলোক, দর্শন– এক কথায় জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, পৃথিবী, সৃষ্টি-মহাসৃষ্টি, আসমান-জমিন প্রভৃতি সামগ্রিক বিষয়াবলী। তাঁর লেখা গ্রন্থে সমাজ সংস্কারের বিষয় হিসাবে চতুর্থ অধ্যায়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম সমাজে মর্যাদা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দাস প্রথা নিয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমীর আলীর আলোচনা অতি প্রাণবন্ত। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যে দাসদের মুক্তি ও দাসদের প্রতি সমান আচরণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি সমাজ থেকে দাস প্রথা নিয়ে সৈয়দ আমীর আলী বলেন- “The time is now arrived when

humanity at large should raise its voice againist the practice of servitude, in whatever shape or under whatever denomination it may be disguised. The Moslems especially for the honour of their great Prophet, should try to efface that dark page from their history a page which would never been written but for their contravention of the spirit of his laws, however bright it may appear by the side of the ghastly scrolls on which the deeds of the professors of the rival creeds are recorded... by proclaiming in explicit terms that slavery is reprobated by their faith and discountenanced by their code.” [৯৪]

সৈয়দ আমীর আলী ধর্মান্ধতা ও ইসলাম ঠিক এর বিপরীতমুখী কুসংস্কার থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষার নিমিত্তে মানব সম্প্রদায়কে উদার প্রগতিবাদ চর্চার দিকে আত্মনিয়োগ করতে বলেছেন। সময়ের পরিবর্তন, সমাজের বিবর্তন এবং সভ্যতার এগিয়ে চলার পথে নতুন আবিষ্কার, নতুন জীবনধারা, নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আত্মস্থ ও সমন্বিত করার পূর্ণ ক্ষমতা যদি ইসলামে থেকে থাকে তাহলে ইসলাম আজ কলুষিত কেন? ইসলাম সমন্বয় সাধন করে মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের সমন্বয় সাধন করে, তাহলে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে মুসলমানদের বাঁধা কোথায়? ইসলামের গতিময়তার দিকটি আমীর আলী ইউরোপীয়দের সামনে তুলে ধরেন। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য তিনি অজ্ঞতার বেড়াজাল থেকে বাংলা ও ভারতের মুসলমান সমাজকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি মুসলমান সমাজকে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ এবং স্কুল-কলেজসমূহে ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার উপর জোর দেন।[৯৫]

আমীর আলী ছিলেন উদারনৈতিক চিন্তার মানুষ। ইসলামের মৌলিক নীতিমালা অক্ষুণ্ণ রেখে ইসলাম ও আধুনিকতাকে সমন্বয় করে বাংলা ও ভারতের মুসলমান সমাজকে আধুনিকতার পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে সৈয়দ আমীর আলীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ১৮৭৭ সালে কলিকাতায় ‘Central National Mohameddan Association’ নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সারা ভারতে এ সমিতির ৫৩টি শাখা স্থাপিত হয়। সমাজ সংস্কার আন্দোলন প্রসঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যদিও তেমন প্রভাব ফেলে না; তথাপি রাজনীতির চর্চা মূলত উত্থিত হয় সমাজ সচেতন ব্যক্তির স্পর্শে। তাইত দেখা যায় সৈযদ আমীর আলীর রাজনৈতিক এই প্রতিষ্ঠানটি সমাজ সংস্কারেও ভূমিকা রাখে। যেমন কোলকাতার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তার ‘ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ও ‘ইন্ডিয়ান লীগ’ নিয়ে যখন হিন্দুদের রাজনৈতিক অধিকার আদায় নিয়ে ব্যস্ত (১৮৭৫ সাল), তখন নির্বিকার মুসলিম সমাজ দলনেতা খুঁজতে হয়রান। সে দলনেতার থাকতে হবে সমাজে মর্যাদা, প্রতিপত্তি ও মনুষ্য উন্নতির অপার নিদর্শন। আর সেই রাস্তাটিই দেখাচ্ছিলেন সৈয়দ আমীর আলী। ১৮৮২ সালে ইংরেজ সরকার সমাজ সংস্কার আন্দোলনে বিশেষ অবদানের জন্য তাকে সি.আই.ই উপাধীতে ভূষিত করে।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২): অবলা নারীরা যখন চার দেওয়ালের ভিতরে সুবাতাস পাওয়ার তৃষ্ণায় ক্রন্দনরত, যখন একফালি আলোর জন্য চোখের পাতা ভিজে উঠততাদের– তখন স্বাধীনতার অভাবে তারা তাদের মুক্তির রাস্তাখানি খুঁজে পেত না। এইসব নারীরা বন্দীদশা হতে কি করে বের হতে হবে তাও বুঝত না। অতল গহীনে যেতে যেতে একসময় দেখা যেত যে তারা যে মানুষ এই বোধটুকুও ভিতর থেকে তারা নিজেরাই মুঁছে ফেলত। জয়! নব উদ্যোমে! শাসক

পুরুষদের জয়। এমতাবস্থায় মুক্তির গান নিয়ে আসলেন মুসরিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, যিনি নিজের সমস্ত চিন্তা ও কর্মকে ব্রত করলেন নারী মুক্তির সংগ্রামে। একটি সমাজে দু'টি অংশ যদি সমানতালে সক্রিয় না হয় তাহলে যেকোন সময় সে সমাজ অচল হয়ে যেতে পারে। বাঙালি মুসলিম সমাজের এই অচল অবস্থা সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টি-গোচর হয়েছিল আধুনিক যুগের নারীর অচলায়তন হতে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। তাহলে প্রশ্ন আসছে কবে হতে নারীর জীবন অচলায়তনের ঠিকানা নিয়ে ব্যস্ত? এই হিসেবটি খুবই জটিল। ইসলামধর্ম প্রবর্তনের পূর্বেও দেখা গিয়েছে বিশ্বে নারী সমাজ ও তার চলমান জীবনধারার চিত্র সর্বদাই শাসকের অধীনে শাসন পাওয়ার অবয়ব। ইসলাম ধর্মের আগমনের পর ভারতীয় উপমহাদেশে যেসকল প্রচারকগণ প্রচারকার্যে নিযুক্ত ছিলেন তারাই আবার তাদেরই নিয়মনীতির ভিতরেই তৈরী করে ফেলেছিলেন নানাবিধ কুসংস্কার। ধীরে ধীরে কুসংস্কারগুলি দুর্বল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় অবলাদের ঘাড় চেপে ধরতে থাকে এবং পরবর্তীতে তাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। উনিশ শতকে নারীদের জীবনের করুন ইতিহাস গুলি যেন তিনি প্রমাণ সহকারে অবলোকান করলেন, সেই সাথে তার ছিল তার বোধশক্তি জাগরণের পর হতে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা। এরপরই তিনি কলম ধরলেন। লিখতে শুরু করলেন চাপিয়ে দেওয়া সমাজের সকল কুসংস্কার, যেগুলি অবলাদের উপর অর্পিত হয়েছে। তিনি প্রথমে দেখলেন পর্দাভাঙ্গার ভয়ে মেয়েরা স্কুল কলেজে যায় না, বাবা-মাও সমাজের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে মেয়ে সন্তানকে নিয়ে দ্বিধাগ্রস্থ থাকত। তাই বেগম রোকেয়া এই প্রথার মূলে আঘাত করলেন। তার মতে, নারী পর্দা মানবে, বোরকা নয়। তিনি প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করে নিঃস্বার্থ কর্মীর মনোবল নিয়ে নারী মুক্তির পতাকা হাতে সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করার প্রয়াস নিয়েছেন। নির্যাতিত, অসহায় নারী সমাজকে পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি। নারীর অধঃপতনের জন্যে তিনি নারীকুলকেই দায়ী করেছেন সর্বাধিক, নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য পুরুষের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে আসার আবশ্যকতা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতির অধিবেশনে সভানেত্রীর অভিভাষণে (১৩৩৩) বেগম রোকেয়া নারীকে ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব বলে আক্ষেপ করেছেন।[৯৬] নারী জাতিকে অবরোধ- বন্দিনী রেখে সমাজের উন্নতি একেবারেই অসম্ভব বলে তাঁর ধারণা:

> নারী ও পুরুষ বিরাট সমাজ দেহের দুইটি বিভিন্ন অংশ। বহুকাল হইতে পুরুষ নারীকে প্রতারণা করিয়া আসিতেছে, আর নারী কেবল সহ্য করিয়া আসিতেছে।...কন্যাকে মুখ এবং চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়া জ্ঞান ও বিবেক হইতে বঞ্চিত রাখা অনেকে কৌলিন্যের লক্ষণ মনে করেন।[৯৭]

মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোরান শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা তিনি অনুভব করেন, তবে কোরান শিক্ষাদান বলতে তিনি পাখীর মত আরবী শব্দ আবৃত্তি করাকে বোঝাননি। বিভিন্ন ভাষায় কোরানের অনুবাদ শিক্ষা দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য ছিল। স্ত্রী শিক্ষার প্রতি উদাসীনতাকে মুসলমানদের অবনতির কারণ হিসাবে নির্দেশ করে রোকেয়া উক্ত অভিভাষণে বলেন:

মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রী শিক্ষার উদাস্য। ভাতৃগণ মনে করেন, তাঁহারা গোটা কতক আলীগড় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর করিয়াই পুলসিরাত (পারলৌকিক সেতু বিশেষ) পার হইবেন- আর পার হইবার সময় স্ত্রী ও কন্যাকে হ্যান্ড ব্যাগে পুরিয়া লইয়া যাইবেন।[৯৮]

সমাজের একটি আপন সত্ত্বা রয়েছে, যে সত্ত্বা জাতীয়তার ইঙ্গিত বহন করে। বেগম রোকেয়া ভাবতেন নারীশিক্ষা ছাড়া জাতীয় সত্ত্বাসমেত সমাজ বিনির্মাণ অসম্ভব। আর নারী শিক্ষা এগিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছে না তার কারণ সমাজে অবস্থিত ব্যাঙের ছাতার মত কুসংস্কারগুলি। অশিক্ষার কারণে নারীরা যে বিপদসমূহের সম্মুখীন হতে পারে তা হল-নারীশিক্ষা ছাড়া নারীর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ অসম্ভব, ভোটদানের অধিকার প্রাপ্ত হয়েও সে অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়া কিংবা অধিকারের সদ্ব্যবহার না করা, অর্ধাঙ্গীকে বন্দিনী রাখার আকাঙ্খা বেড়ে যাওয়া, মানসিক ও অপমান হতে মুক্ত হতে না পেরে অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে অতলে চলে যাওয়া। এভাবে প্রায় আরও কিছু ব্যাপার যে ব্যাপারগুলি হতে নারী কখনও বের হতে পারে না; আবার কেউ বের করতেও পারে না। বেগম রোকেয়া বঞ্চিত এইসব মেয়েও নারীদের অন্ধকার হতে বের করার চেষ্টা করেন। তিনি সমাজের কুসংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। আর এই জন্য প্রথম যে পদক্ষেপ তিনি হাতে নিলেন তা হলো একটি স্কুল স্থাপন– যেখানে মেয়েরা পড়বে। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে নারীশিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি নির্মাণ করে 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল' এবং ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন মহিলা ট্রেনিং স্কুল।[৯৯] নিজের সমস্ত ধন সম্পদ স্কুলের উন্নয়ন ও ছাত্রীদের উন্নয়নে ব্যয় করেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রতিষ্টা করেন আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতীন-ই-ইসলাম" নামে একটি মহিলা সমিতি। বেগম রোকেয়া তাঁর'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' (১৩৩৮) শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন:

"...দুরাবস্থার একমাত্র ঔষধ একটি আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়, - যেখানে আমাদের মেয়েরা আধুনিক জগতের অন্যান্য সম্প্রদায় এবং প্রদেশের লোকের সঙ্গে তাল রেখে চলবার মত উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে।"[১০০]

বেগম রোকেয়া তাঁর আরেকটি প্রবন্ধ 'রাণী ভিখারিণী' (১৩৩৪)-তে পুরুষদের লক্ষ্য করে বলেছেন– "তারা নিজেদের সমাজের রাণীদেরকে ভিখারিণী করে রেখে গিয়েছেন। কিন্তু একমাত্র ধর্মই নারীকে তাহার প্রাপ্য অধিকার দান করিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে সেই মুসলিম নারীর দুর্দশার একশেষ হইয়াছে।"[১০১] মুসলিম সমাজ অনেক সময় ইসলামী আইনকে নিজের মত করে ফতোয়া দিয়ে নারীর জীবনধারাকে পরিচালনা করে এবং তখনই তা কুসংস্কারে পরিণত হয়। এই বিষয়টি বেগম রোকেয়া বুঝতেন। তিনি সমাজে এই স্বনিয়ন্ত্রিত আইনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে কন্যা ও স্ত্রীকে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির অংশভাগ দেওয়ার বিধান রয়েছে। মুসলিম নারী বিধবা হলে পুনরায় তাকে বিয়ে দেওয়ার এবং করার অধিকার থাকে। তদানীন্তন সমাজে বেগম রোকেয়া লক্ষ্য করেন যে, প্রকৃত ইসলামী আইন নারীর ক্ষেত্রে পালন করা হচ্ছে না; আর তাইত তিনি রচনা করেন 'নারীর অধিকার' প্রবন্ধ। যেখানে তিনি বলেন, আমাদের ধর্ম মতে বিবাহ সম্পর্ণ হয় পাত্র-পাত্রীয় সম্মতি দ্বারা। তাই খোদা না করুন, বিচ্ছেদ যদি আসে, তবে সেটা আসবে উভয়ের সম্মতিক্রমে। কিন্তু এটা কেন হয় একতরফা অর্থাৎ শুধু স্বামী দ্বারা? অন্তত এইটে তো প্রায় প্রতিক্ষেত্রে দেখা যায়।[১০২] বেগম রোকেয়া তাঁর *পদ্মরাগ* (১৯২৪) উপন্যাসে সমাজে পুরুষের দ্বারা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত নারীর একাধিক চিত্র অতি উজ্জলতার সাথে তুলে ধরেছেন।

সৌদামিনী, উষা, সকিনা, সিদ্দিকা প্রমুখ রমনীগণ পুরুষের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে সংসার ত্যাগ করে তারিণী ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। একদিন এসব 'ভগিনীরা' নিজেদের দুঃখের স্মৃতি পরস্পর আলোচনা করছে, ঠিক এই ভাবে- আলাপরত সিদ্দীকা বলে:

> সমাজের এইসব নারী ঘায়ের কি ঔষধ নাই? বাতুলের সহিত চির জীবন আবদ্ধ থাকিতে হইবে, বিনা কারণে পরিত্যক্ত হইতে হইবে, অবমানিতা হইয়া মাতালের সহিত সপত্নী সমভিব্যবহারে ঘর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সহোদর ভাই হাত পা বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে পাঠাইতে চাহিবেন।[১০৩]

মহিলাদের পর্দার ব্যাপারে তার কোন আপত্তি ছিল না। পর্দা বলতে মেয়েদের শালীনতা ও ইজ্জত আব্রু সংরক্ষণ করা বোঝায়; এই পর্দা স্ত্রী জাতির সম্মান। কিন্তু পর্দার নামে অবরোধ প্রথা একটি সামাজিক অভিশাপ। এই অবরোধ প্রথা কিছু নিয়ম মেনে তৈরী হয়। যেমন, মেয়েরা অন্তঃপুরে জোরপূর্বক বন্দী থাকবে, সূর্যের আলোক-বঞ্চিত নিভৃত অন্দরে দিনাতিপাত করতে বাধ্য থাকবে, তদুপরী তাকে পড়া-লেখা করতে না দেওয়া প্রভৃতি এই অবরোধ যারা তৈরী করে তারা সমাজপতিতুল্য। তাই তা ভেঙ্গে ফেলা অত সহজ নয়। বেগম রোকেয়াকে তাই এই অবরোধ ভাঙ্গতে গিয়ে সমাজপতিদের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল তাতে কিন্তু তিনি থেমে যান নি। অবরোধের সেই দেয়াল ভাঙ্গার পণ তাঁর অস্থিসত্বায়, এগিয়ে গেলেন সাহস করে অনেক দূর, তারপর লিখলেন *অবরোধ বাসিনী* (১৯৩১)। অবরোধের কঠোরতা নিয়ে তিনি লিখলেন, 'মুসলমান সমাজে নারীরা আসবাব পত্রের চেয়ে ভাল কোন অবস্থায় ছিল না। অবরোধ প্রথাকে সম্মান করতে গিয়ে তাদের সম্মান বোধ জীবজন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট পর্যায়ে নেমে যায়। এর ধারাবাহিক অনবদ্য কল্পনা বেগম রোকেয়ার *সুলতানার স্বপ্ন* (১৩২৮), যেখানে ব্যঙ্গাত্মকভাবে অত্যাচারী পুরুষ সমাজকে তিনি কঁশাঘাত করে নারীদের জন্য 'নারীর স্থান' নামক স্বপ্নরাজ্যকেই সুলতানার স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুলতানা যেখানে খুঁজে বেড়ায় স্বাধীনতা। নারী সেখানে আপন মেধা ও শক্তি বলে শাসন চালায় এবং পুরুষদের উপর তাদেরই মত করে কর্তৃত্ব চালায়। এভাবে বেগম রোকেয়া জাগরণীর রাস্তা নিজে যেমন খুঁজেছেন তেমনি রাস্তা করে দিয়েছেন স্বাধীন মন নিয়ে বাঁচার। তাঁরাই বাঁচবে যারা 'কন্যা'। কুসংস্কার সমাজ শরীরকে যখন বিষিয়ে তুলে তখন সেই কুসংস্কার যেন কোন নারীর স্বাধীন সত্ত্বাকে কেঁড়ে না নিতে পারে তার জন্য নারীকেই রুখে দাঁড়াতে হবে। রুখে দাঁড়ানোর মন্ত্র কিন্তু 'জ্ঞান' কেউ না দিলেও নিজেই সেই জ্ঞান নারীকে সমাজ থেকে সাহসবেগে কেঁড়ে নিতে হবে। মায়েরা যদি তাঁদের কন্যাদেরকে এগিয়ে দেয় তাহলে পুরুষের সেই ক্ষমতা থাকার কথা নয় যে তাকে শাসন করে মনের আলো থেকে দূরে রাখবে।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) : হিন্দু মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী ১৮৭৫ সালে চট্টগ্রামের পটিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।[১০৪] তাঁর পিতা মুন্শী মতিউল্লাহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। একজন শিক্ষকের সন্তান হিসাবে ১৮৮৮ সালে হুগলী মাদ্রাসা থেকে পাস করে শিক্ষকতাকেই জীবিকা হিসেবে বেছে নেন। তিনি কুমেদপুর, রংপুর এবং সীতাকুন্ড মাদ্রাসায় চাকুরী করেন।[১০৫] তিনি আরবী, ইংরেজী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও সমাজসেবক হিসাবে সমাজের কল্যাণে তিনি নিজেকে ব্যস্ত রাখেন।[১০৬] মোল্লা স্বভাবসুলভ 'খতম',

‘জিয়ারত’ ও ‘মৌলুদখানি’ প্রভৃতি কার্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি রেভিনিউ আইন অধ্যয়ন করত মোক্তারী আইন পড়িতে উদ্যত হইয়াই প্রথমতঃ মাতৃভাষা বাঙালা শিখিতে শুরু করেন’।[১০৭] মিসরের ‘আল সিনর’ ‘আল এহরাম’ পত্রিকায় তাঁর আরবি প্রবন্ধ ছাপা হত। তিনি টি. ডব্লিউ. আর্নলডের *প্রিচিং অব ইসলাম*-এর অনুবাদ *ভারতে ইসলাম প্রচার* নামে প্রকাশ করেন।[১০৮]সমসাময়িক জনপ্রিয় পত্রিকা *মিহির* ও *সুধাকর* তাঁকে ইসলামপ্রচারক হিসাবে আখ্যায়িত করে।[১০৯] ইসলামের আদর্শ প্রচার ও মর্যাদা বৃদ্ধি তাঁর জীবনের ব্রত ছিল সত্য, কিন্তু তিনি কখনও ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দেননি।[১১০] তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ব্যাখ্যার উপর ইসলামের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন‘ইসলাম ও বিজ্ঞান’[১১১] ‘ধর্ম ও বিজ্ঞান’ প্রভৃতি প্রবন্ধে তার প্রমাণ আছে।[১১২] মনিরুজ্জামান হানাফী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং লা-মজহাবীদের প্রতি কঠোর বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন। ‘প্রচারকে’ (মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬) তাঁকে ‘লা-মজহাব-অরি’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আরবী শিক্ষিত মৌলভীরা ধর্ম প্রচার অর্থোপার্জনের দিকে বেশী আগ্রহশীল, নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিরা সমাজ উন্নতি অপেক্ষা আত্মউন্নতির প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয় ‘ইংরেজী ও আরবি শিক্ষার পরিনাম’ প্রবন্ধে (ইসলাম প্রচারক, মে ১৯০৫) তিনি উভয় শ্রেণির বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ তুলেছেন।[১১৩] অতএব তিনি যুক্তিবাদীর ভিত্তিতে সমাজ শুদ্ধ করণের কর্মাদিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯১৩ সালের শেষভাগে মওলানা ইসলামবাদী আলেম সম্প্রাদায় নিয়ে ‘আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা’ নামে আলেম সংগঠন করে তোলেন।[১১৪] যে সংগঠনটি পরবর্তীতে রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়ে যায়। তিনি জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন তাঁর লেখা-লেখির মধ্যদিয়ে যদি বাংলার সমাজে পরিবর্তন আসে তাহলে লেখা-লেখি প্রকাশও অতি জরুরী। আর তারই নিমিত্তে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেন ‘শাহজাহান কোম্পানি’ নামে একটি পাবলিক লাইব্রেরী।”[১১৫]

সামাজিক আন্দোলনকে সক্রিয় রাখার জন্য মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী সংবাদপত্র সম্পাদনার সাথে জড়িত ছিলেন। পাশাপাশি রচনা করেন নানা ধরনের সংস্কারমূলক প্রবন্ধ। তাঁর লেখা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধসমূহের মধ্যে–‘বঙ্গীয় মোসলমান ও উর্দু সমস্যা’, ‘মোসলমান নিম্ন শিক্ষার উন্নতি বিধানের প্রস্তাব’, ‘সমাজ সংস্কার’ এবং ‘এসলাম ও মিশন’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১১৬] ইসলামবাদীর প্রবন্ধগুলি ছিল চেতনাসমৃদ্ধ মুক্তচিন্তার উপাখ্যান। যেমন তিনি তাঁর ‘বঙ্গীয় মোসলমান ও উর্দু সমস্যা’ প্রবন্ধে লিখেছেন-[১১৭] বাঙ্গালাকে ছাড়িয়ে বা বাঙ্গালার পরিবর্তে উর্দু শিক্ষা করা হউক ইহার আমরা আদৌ সমর্থক নহি এবং তাহা সম্ভবপর বলিয়াও স্বীকার করিনা। বাঙ্গালা বঙ্গদেশের মাতৃভাষা, এই ভাষা ত্যাগ করিবার কোন উপায় নাই। তবে উর্দুটা অতিরিক্ত ভাষারূপে শিক্ষা করা প্রয়োজনীয় ইহাই আমাদের বক্তব্য। অন্য একটি প্রবন্ধে সমাজ সংস্কারে ইসলামবাদী মন্তব্য করেছেন–

> ... লোকে কি বলিবে, মাছ কেনা বেচা করিলে লোকে ধীবর বলিবে ইত্যাদি কুসংস্কার সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে। হালাল ব্যবসায়কে এন্‌কার করিলে এচলাম ধর্ম্মানুযায়ী মহাপাপী হইতে হইবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য রছুলুল্লাহ্ বিশেষ তাকিদ দিয়াছেন এবং তাহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মুলত এই প্রবন্ধে ইসলামবাদী মুসলমান সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কারকে আক্রমন করেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যদি মুসলমান সমাজ তার সমূহ সুসংস্কারকে দূর করতে পারে তাহলেই উন্নতি আসবে অন্যথায় নয়।

মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী 'সোলতান' (১৯০১), 'হাবলুন মতিন' (১৯১২) ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি বাংলার মুসলিম সংবাদ সাময়িকপত্র বিশেষ করে মিহির, সুধাকর, ইসলাম প্রচারক, মোহাম্মদী, সোলতান, নবনূর, আল-এসলামে-নিয়মিত লিখতেন।[১১৮] ইসলামবাদী লিখে যেতেন সর্বদাই শিক্ষা, সমাজ ভাবনা, ইতিহাস, ইসলামের ঐতিহ্য, সমসাময়িক সমস্যা বা বিষয়াবলী, আন্তজার্তিক ঘটনাবলী প্রভৃতি বিষয় নিয়ে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী ইসলামবাদী কংগ্রেসের ঘোর সমর্থক ছিলেন। ১৯১২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করার হেতু তিনি কারাবরণ করেছিলেন। ১৯২১ সালের খেলাফত আন্দোলনেরও একজন নেতা ছিলেন এই ইসলামবাদী।[১১৯] সমাজ উন্নতির কাজে 'যুক্ত-শক্তির' প্রয়োজন উপলব্ধি করেন ইসলামবাদী এবং তদ্বীয় উদ্দেশ্যে 'জাতীয় মহাসমিতি গঠনের পরামর্শ দেন। 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকা জাতীয় সহাসমিতি প্রবন্ধে তিনি বলেন, "বলিতে গেলে এখন না আছে আমাদের জাতীয় স্কুল, কলেজ না আছে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের কোম্পানি, না আছে সমাজের দুর্দশা নিবারণ সভাসমিতি, না আছে আমাদের সংবাদ পত্রিকা এবং সুলেখক ও সুকবি, আর না আছে অর্থ সম্ভব, না আছে রাজদরবারে অধিকার। ...এসো ভাই। যুক্তশক্তি দ্বারা সমাজের জীবন রক্ষা করিতে আত্ম বলিদান করি। ঐ এসো। জাতীয় মহাসমিতি স্থাপনপূর্বক শিক্ষা বিস্তার, যৌথ বাণিজ্য করবার, সমাজের দোষ সংস্কার, উন্নতস্থান পুনঃঅধিকার করার প্রতি ধাবিত হই।[১২০]

মনিরুজ্জামান ইসলামবাদীর 'ইসলাম মিশন' প্রবন্ধটি তৎসময়ের বাংলার সমাজ ব্যবস্থাকে ভীষণবেগে আলোড়িত করেছিল। বুদ্ধিজীবীমহল মুসলিম ভাবুক চিন্তাধারাকে সমাজস্থ সকল দোষগুলি বিতাড়িত করে সাবলীল সমাজ নির্মাণে তাঁর কাছ থেকেই অনুপ্রাণিত হতেন।

আবদুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩) :স্কুল ইন্সপেক্টর আবদুল করিম যিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন শিক্ষকতা দিয়ে। ১৮৮৯ সালে তিনি 'অ্যাসিষ্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুল ফর মহামেডান এডুকেশন' পদে যোগদান করেন।[১২১] এরপর তিনি হয়েছেন বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর। ১৯০০ সালে প্রকাশিত তার 'মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' প্রকাশিত হয়।[১২২] সমাজের অসুস্থ নালী পরিষ্কারকের দায়িত্ব বর্তায় শিক্ষাচেতনামূলক গ্রন্থের উপর। শিক্ষা চিন্তা বা চেতনা এক মূলক গ্রন্থ এক গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক স্বরূপ। ইন্সপেক্টর আবদুল করিমের জীবনের অভিজ্ঞতা ও চেতনা বিকাশ মিলিত গ্রন্থটি তৎসময়ের মুসলমান সমাজকে রোগমুক্তির ঔষধসম হয়ে কাজ করেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃত মাদ্রাসার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারলে মানবগোষ্ঠী (মুসলিম) পবিত্র ও সুন্দর হয়।[১২৩] আর সুন্দর সুখী সমাজ তৈরী হয় সুন্দর, জ্ঞানী ও শিক্ষিত মহলের হাত ধরেই। তাইত শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের জন্য তিনি সরকারের নিকট সুপারিশ করতেও দ্বিধা করতেন না।

স্যার আজিজুল হক (১৮৯২-১৯৪৭) :প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন স্যার আজিজুল হক। একজন বিশিষ্ট মুসলিম বুদ্ধিজীবী হিসাবে তিনি ছিলেন সর্বত্র সমাদৃত। এক অনবদ্য ব্যক্তিত্ব ধরে রাখার কারিগর ছিলেন স্যার আজিজুল হক। পশ্চ্যাপদ মুসলমান সমাজের সামাজিক মুক্তির লড়াইয়ে যে সকল মুসলিম মনীষী ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন

তাদের অন্যতম হলেন স্যার আজিজুল হক। মহান এই ব্যক্তি ছিলেন একাধারে আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ, প্রশাসক এবং সর্বোপরি একজন চিন্তাশীল লেখক হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯২৬-১৯২৯), বাংলা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী (১৯৩৪), বঙ্গীয় আইনসভার স্পিকার (১৯৩৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম উপাচার্য (১৯৩৮-১৯৪২), লন্ডনে ভারতের হাইকমিশনার (১৯৪৩), ভাইসরয়ের মন্ত্রিসভার সদস্য (১৯৪৩-৪৬)[১২৪] এবং অনেক গ্রন্থের প্রণেতা। সমাজের সাধারণ এবং প্রশাসনিক এই দুই অবস্থান থেকে তিনি বাংলার মুসলমান সমাজের আর্থ-সামাজিক করুন অবস্থা নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বিশেষত অনেকগুলি সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি এটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, বাংলার মুসলমান সমাজের মূল সমস্যা হলো নানাবিধ অবাঞ্চিত রীতিনীতি, মোল্লা দুনিয়াদারীর অযৌক্তিক ফতোয়া, জ্ঞানচর্চার অভাব ও শিক্ষা থেকে একশত হাত দূরে থাকা। তিনি আরও উপলব্ধি করেন মুসলিমগণ তাদের আপন ইসলামিক ঐতিহ্য ও মুসলমানী সংস্কৃতি হতে মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি অনেক খাম-খেয়ালী মনা। উপরন্তু বাঙালি মুসলিমগণ তাদের বাংলার আপন সংস্কৃতির সাথে ইসলামের প্রকৃত সংস্কৃতির শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে পুরোপুরিভাবে ভারসাম্যতা রক্ষা করতে বা মিলাতে পারছে না। ফলে মুসলিম সমাজে সৃষ্টি হয়েছে এক ভয়ানক ব্যাকুলতা। তৎসময়ে প্রবাহমান সমাজস্থ এই ব্যাকুলতাকে বাঁচাতে প্রচেষ্টা চালান স্যার আজিজুল হক।[১২৫]

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি সক্রিয়ভাবে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের (বাঙালি) সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এগিয়ে আসেন। সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে এ সময়ে তার মধ্যে সচেতনতা তৈরী হলে তিনি বৃহত্তর স্বার্থে নিজেকে নিয়োজিত করার প্রয়াস পান। একজন বিশিষ্ট আইনজীবী হিসেবে তিনি এ.কে.ফজলুল হক, আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী, নওয়াব আলী চৌধুরী, নবাব সৈয়দ শামসুল হুদা, নবাব খাজা সলিমুল্লাহ, বর্ধমানের আবুল কাশেম, স্যার আবদুর রহিম, স্যার এ.কে.গজনবী, স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ নেতাদেরনিকটে যাওয়ার সুযোগ পান। একই সাথে তিনি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন ভূগোল, ছত্তরি, রামপুর, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার নবাব এবং নদিয়া, কাশিমপুর, সন্তোষ প্রকৃতি অঞ্চলের জমিদারদের। সমাজে প্রতিষ্ঠিত এলাকার মানুষের সান্নিধ্যে এলেও তিনি সমাজের নিম্নবর্গের বিশেষত পশ্চাৎপদ মুসলিম প্রজাদের কথা কখনও ভুলে যান নি। বরং তার কর্ম সাধনায় প্রতিনিয়তই লড়াই করেছেন। আর এর প্রমাণ পাওয়া যায় মুসলিম কৃষকদেরকে নিয়ে তাঁর কর্মকাণ্ডেও। ১৯৩৭ সালে বাংলায় যখন প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা-পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়নি। অতঃপর কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের সিদ্ধান্ত হলে নির্বাচনে স্যার আযিযুল হক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সদস্য নির্বাচিত হন এবং সেই সাথে প্রথম অবিভক্ত বাংলার নির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। বাঙালিই নয় বরং সার্বজনীনভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য থাকাকালীন সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই বিভাগটি খোলার মধ্যে দিয়ে তদিয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আশু আগ্রহ ও শিক্ষায় ভারতীয় মুসলমান জাতি যেন প্রকৃত শেকড় খোঁজার রাস্তা পেতে শুরু করে। দিকভ্রান্ত, কুসংস্কারচ্ছন্ন মুসলমানরা যেন আধুনিকতায় আস্থা পেতে শুরু করে। জ্ঞানার্জন ফরজ, তা যেকোন বিষয়ের উপরই হোক না কেন, এই বিশ্বাস ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অন্তরে প্রোথিত হতে

শুরু করে। ১৯১২ সালে স্যার আজিজুল হক যখন কলিকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউটের অনারারী সাধারণ সম্পাদক তখন তিনি একটি জ্ঞানগর্ভ পুস্তিকা রচনা করেন। পুস্তিকার নাম *Mahomedan Education*। মুসলমানদের শিক্ষা সংক্রান্ত এ লেখাটি বিভিন্ন মহলে সমাদৃত হয়। পুস্তিকাটি উচ্চ সরকারী মহল, কলিকাতা মাদ্রাসা ও মিডিয়ার ব্যাপক প্রশংসা লাভ করে।[১২৬] তারপর তিনি লিখেন মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা নিয়ে, নাম*History and Problems of Moslem Education in Bengal*।[১২৭] ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধোত্তর কাল থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান সমাজের শিক্ষার এক সামগ্রিক রূপ আলোচিত হয়েছে উক্ত গ্রন্থে। শিক্ষা বিষয়ক আজিজুল হকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল – *Education and Retrenchment*।[১২৮] স্যার আজিজুল হক তাঁর*Man Behind the Plough*গ্রন্থে বাংলার মুসলমান সমাজের শিক্ষা এবং আর্থিক অবস্থা তুলে ধরে। ১৯৩৬ সালের ঈদসংখ্যা 'দি মুসলমান' পত্রিকায় প্রকাশিত 'Primary Education in Bengal' তাঁর লেখা একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। তৎসময়ের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রবাহমান মুসলমান সমাজ ছিল বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত। স্যার আজিজুল হকের শিক্ষা পুরোপুরি কেন্দ্রিভূত ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজ তথা ভারতীয় মুসলমান সমাজকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকের ত্রিশের দশকটি ছিল ভারত এবং বাংলার মুসলমান সমাজের জন্য এক মহাসংস্থাময় অধ্যায়। ঐ সময়ের সংকটকে কাঁটিয়ে তুলতে বিশেষভাবে সক্ষম হয়েছিল স্যার আজিজুল হক। সমাজ পরিষ্কার করতে আলোকিত মানুষ চাই। এই আলোকিত মানুষ তৈরী হয় জ্ঞানের আলোতে, শিক্ষার আলোতে। তাই সমাজ হতে বিষাক্ত নালীসমূহের প্রবাহধারাকে পবিত্র করতে শিক্ষাবিদদের কলমের মূল্য অত্যন্ত বেশি। সেটাই বোধ হয় স্যার আজিজুল হক বাঙালি মুসলমানদের জন্য প্রমাণ করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বলা হয়ে থাকে সমাজচিত্রের দর্পণ হলো সাহিত্য। বাঙলা সাহিত্য তাহলে কী? কোথায় এর সার্থকতা? কারা সাহিত্যিকার, ঘটনাবলীকে কোন কৌশলে, সম্প্রদায়গত বিবেচনা মাথায় রেখে লেখনির মধ্যে দিয়ে পরিবর্তন করেছেন জাতির অভিশাপকে এ ধারাকে, তাড়িয়ে দিতে পেরেছেন সেই জাতির অভিশাপকে? প্রশ্নগুলি বাঙালি মুসলিম মানুষের এক চরম জিজ্ঞাসামূলক বাসনা। এই জিজ্ঞাসাগুলিকে অতি নিখুত হাতে সাজিয়ে, বাংলার ঘরে ঘরে চলমান ঘটনাগুলিকে মনের মাধুরী মিশিয়ে বাঙালি মানব জগতে তুলে ধরতে পেরেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, জসীম উদ্দীন, আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, মীর মশাররফ হোসেন ছাড়াও আরো কতজন তার কিন্তু হিসেব মিলানো কঠিন।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬): সংস্কার যুগের আবর্তে থেকে যখন বাঙালি মুসলিম সমাজ কুসংস্কারে নিমজ্জিত; ঠিক সেই সময়কে যদি এমনভাবে ধরা হয় যে, সমাজ তথা বাঙালি সমাজ হল একটি কারাগার। পুরো সমাজটিকে কুসংস্কার ও অন্ধকারের দৈত্য এসে দারুনভাবে আটকিয়ে তালা দিয়ে চাবি নিয়ে পালিয়ে চলে গেল। পায়ে বেঁড়ি পড়ে দুঃখী সমাজ কারাগার থেকে মুক্তি চায় কিন্তু চেতনাবোধের অভাবে মুক্তির নেশা তৈরী হচ্ছে না। তখন উপায় কাজী নজরুল ইসলাম। কেননা বিদ্রোহ ছাড়া, জাগরণ ছাড়া, মুক্তি অসম্ভব। কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালির মনের কুসংস্কার ও যুক্ত অলসতাকে

কাটিয়ে দিয়েছেন তাঁর অন্যান্য মুখরিত সাহিত্য সাধনা দিয়ে। বলা হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথে আচ্ছন্ন হিন্দুবাদী বাংলা সাহিত্যের মুখর সভা থেকে ইসলামবাদী বাংলা সাহিত্যের মুখরিতপটে ফিরিয়ে আনতে যিনি সম্ভব হয়েছিলেন, তিনি কাজী নজরুল ইসলাম।[১২৯] মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। ধর্মের চেয়ে তাই মানুষ বড়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান জ্ঞান করার মধ্যেই প্রকৃত কল্যাণ নিহীত। এই কল্যাণ ধর্মই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম। ১৮৫৭-১৯৪৭ সালের মধ্যে বাঙালি লেখকদের কারো কারো রচনায় এই ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন এই লেখকবৃন্দ ধর্ম সংস্কার যুক্ত ও উদারচিত্ত ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ জীবনচেতনায় অনুপ্রাণিত এই উদারপন্থী লেখকদের রচনায় সাম্প্রদায়িক মিলন প্রয়াসও প্রতিফলিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে কাজী নজরুল ইসলামের আদর্শ হতে এরকম আলোই প্রস্ফুটিত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম সামাজিক সংস্কার আন্দোলন চালিয়েছেন সমাজেই বিদ্যমান নানাধর্মের মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন স্থাপনের মধ্যে দিয়ে। এর প্রমাণ মেলে তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের মধ্যে দিয়ে, যেমন– কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ‘ভাঙ্গার গান’ (১৯২৪) কাব্যের ‘জাগরণী’ কবিতায় তিনি মানবতার জয়গান করেছেন, জেগে উঠার আহ্বান করেছেন সত্য মানবকে:

দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।
পুরুষ সিংহ জাগোরে।
সত্য মানব জাগোরে।
বাধা-বন্ধন-ভয়-হারা হও
সত্য-মুক্তি-মন্ত্র গাও।[১৩০]

সামাজিক স্থিতিশীলতা এনে সমাজকে যাবতীয় অন্ধকার হতে দূরে রাখার পূর্বশর্ত ‘সাম্যবাদীতা’। নজরুল যেন তা খুবই বুঝতেন। তাইতো তিনি রচনা করলেন সাম্যবাদী কবিতা। ‘সাম্যবাদী’ কাব্য রচনা করেন নজরুল ১৯২৫ সালে। এই কবিতার মধ্যদিয়ে তিনি সমাজের সকল স্তরের মানুষ, সকলশ্রেণির মানুষকে একস্তরে নিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, তাঁর ভাষায়,-

গাহি সাম্যের গান...
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে
সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম
ক্রীশ্চান।...
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা, মুসা পেল সত্যের পরিচয়।[১৩১]

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর মানুষ কবিতার মধ্যে দিয়ে সমাজে বিদ্যামান বৈষম্যতার মূলে আঘাত করেছেন। তাঁর ভাষায়–

মুর্খরা সব শোনো,

মানুষ এনেছে গ্রন্থ,– গ্রন্থ আনেনি

মানুষ কোনো।[১৩২]

এই কবিতার মধ্যদিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, মন্দির মসজিদে মানুষের দাবী অগ্রাহ্য হচ্ছে, মোল্লা পুরোহিত ‘দুয়ারে’ চাবি লাগিয়েছে। ধর্মের নামে এই প্রতারণার প্রতি তীব্র ঘৃণা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ঘৃণিত হচ্ছে মূল্যবোধ, দলিত নিষ্পেষিত হচ্ছে মানব সম্প্রদায়।

কাজী নজরুল ইসলাম নারী আন্দোলনকে জাগরুক রেখেছেন সর্বদাই তাঁর বিপ্লবী গাঁথা কবিতা দিয়ে। তিনি নারী পুরুষের মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করতেন না। নারী কেবল পুরুষের সেবা দাসী– এ হীন ধারণার তিনি নিন্দা করেছেন। পুরুষের সঙ্গে সমান আধিকারের দাবীতে জেগে উঠার জন্য তিনি নারীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সাম্যবাদী (১৯২৫) কাব্যের নারী কবিতায় তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন:

যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে

ভীরু ওড়াও সে আবরণ।...

দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন

ঐ যত আভরন।...[১৩৩]

নারী পুরুষের সমান অধিকার কোরআনেও সমর্থিত। ‘জিঞ্জীর’ (১৩৩৫) কাব্যের ‘মিসেস এস রহমান’ কবিতায় নজরুল বলেন:

বলে না কোরআন, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস।

নারী নর-দাসী, বন্দিনী র’বে হেরেমেতে বারোমাস।

হাদিস কোরআন ফেকা ল’য়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী,

মানে না ক’ তারা কোরআনের বাণী সমান নর ও নারী।

ইতিহাসের সন্তান কাজী নজরুল ইসলাম। সুস্থ, প্রেরণাজাত, প্রলয়ংকর ধূসার মত কলঙ্গ উড়িয়ে অতীত চর্বনের আয়েসে গাজনের বাজনা বাজিয়ে স্বর্গীয় সমাজ বিনির্মাণে প্রত্যয়ী ছিলেন তিনি। যুগের অশেষ প্রয়োজন কাজী নজরুল ইসলাম। বাঙালি মুসলিম সমাজে তিনি এনেছেন বৃহৎ চেতনার পত্র, তিনি তার সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহী হতে শিখিয়েছেন নারী-পুরুষ, উচুঁ-নিচু সবাইকে। ১৩২৬ সালে ইংরেজী ১৯০৯ সালে নজরুল ইসলাম যখন কলিকাতার সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত হন তখনই এক হিসেবে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী। তৎসময়ে বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল, সে কথা বুদ্ধিজীবী মহলে জ্ঞাত। তাঁর বিদ্রোহী প্রকাশের পূর্বেই প্রকাশিত ‘শাতিল আরব’ ‘মোহররম’ ‘কোরবানী’ প্রভৃতি জনপ্রিয় কবিতাসমূহে ব্যক্ত হয়েছে মুসলমান সমাজের গতানুগতিক জীবনের প্রতি ধিক্কার, এক বলিষ্ট নব জীবনারম্ভের জন্য তীব্র কামনা, অস্ত্রশস্ত্রের শক্তি ও মহিমায় তাঁর প্রত্যয়। এটি ছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্য খেলাফত রক্ষার যুগ। ১৮৬৮

খ্রিষ্টাব্দের ওহাবী বিদ্রোহ দমনের পরে থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত বাংলার মুসলমানের ইতিহাস মোটের উপর এক গভীর নৈরাশ্যের ইতিহাস। সেই নৈরাশ্যের ঘোর কাটল যখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগে মুসলমানগণ তথা মুসলিম সমাজ আধুনিক শিক্ষার দিকে ঝুঁকল। স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুদের সাফল্য খেলাফত আন্দোলনে মুসলমানদের জন্য প্রেরণার কারণ হয়েছিল বটে। এরূপ নজরুল অর্থাৎ বিদ্রোহী কবিতা রচনার পূর্বের নজরুল, এক হিসাবে ছিলেন এই খেলাফত যুগের প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় কবি। তাঁর 'মোহররম' কবিতার অধুনা পরিত্যাক্ত শেষ দুটি চরণ এই সম্পর্কে স্মরণ করা যেতে পারে–

দুনিয়াতে দুর্মদ খুনিয়ারা ইসলাম-
লহু লাও, নাহি চাই নিষ্কাম বিশ্রাম।[১৩৪]

বাংলাদেশে একশ্রেণির সাহিত্যরসিক আছেন যারা নজরুল ইসলামকে জ্ঞান করেন একজন যুগপ্রবর্তক কবি হিসাবে। আর তাদের উক্ত সাহিত্য রচনা কিংবা জীবন যাপন পদ্ধতির প্রধান অবলম্বন কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা। উক্ত সাহিত্যরসিকগণের এমন একটি ধারণা যে, নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় এক দুর্বার তেজস্বিতা রয়েছে– যা বাংলা সাহিত্যে, সম্পূর্ণ নতুন চির তারুণ্যের দ্বিধাহীন দুর্মদ আবাহনে আবিষ্ট করেছে। বাংলার দার্শনিক আবহাওয়ায় চিন্তালেশহীন ভাস্বর-ললাটে নজরুল প্রতিভার দান চিরগৌরবময়, চির উন্নত মম শির্। তিনি হলেন সেই কবি যিনি বাঙালি সমাজের মানুষসম আবর্জনা ও বাহিরের শত্রু দ্বারা দ্বিধাগ্রস্থ মনুষকে উপড়িয়ে ফেলার জন্য সমজস্থ আরেক শ্রেণির সুপ্ত মানুষের সুপ্ত সাহসকে জাগিয়ে তুলেছেন অতি হুংকার সাজে। শিকল থেকে মুক্তির স্বাদ নিতে শিখিয়েছেন বাঙালিকে, মুসলিম জাতিকে আড়ষ্ট বুদ্ধির কালক্ষেপণ থেকে রক্ষার চেষ্টা চালিয়েছেন। সমাজের দেহ হতে ভীরুতা দূর করে জয়ধ্বনি করা শিখিয়েছে প্রিয় কবি কাজী নজরুল। বাংলার সুজলা-সুফলার লিখা দিয়ে পাতা না ভরিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচার মন্ত্র শিখিয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম।

তিনি লিখেছেন,

প্রলয়-বিষাণ 'কিয়ামতে'
তবে বাজবে কোন্ বোধন?
সে কি সৃষ্টি সংশোধন?
ওরে তাথিয়া তাথিয়া নাচে ভৈরব বাজে ডম্বরু শোন্! -
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রাহ'
শক্তির উদ্ বোধন।

- কোরবানী[১৩৫]

কবি কাজ নিজরুর একই সঙ্গে ছিলেন জ্ঞানী ও প্রেমিক। জ্ঞানী যদি তিনি কিছু কম হন তবু খুব ক্ষতি হয় না; কিন্তু প্রেমিক হওয়া চাই তাঁর পুরোপুরি। সেই প্রেমের সাধনাই মূলত নজরুল সাধনা। দেশ ও জাতির প্রতি সেই প্রেমে, সেই পূর্ণ

আত্মনিবেদনে নজরুল একালে মুসলমানদের মনে অথবা হিন্দু মুসলমান সবার মধ্যে, এক সম্মানিত ব্যক্তি– যে বৃহৎ জীবনের অথবা জাতীয় জীবনের চেতনা বাঙালি মানসে অনুভূত হয়েছে তাঁতে নজরুলের স্পর্শ মহিমান্বিত। এই জনজাগরণের দিক দিয়ে দেখলে সহজেই চোখে পড়ে নজরুলের ঐতিহাসিক মর্যাদা কত বড়।[১৩৬]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) :বিশ শতকে বাঙালি মুসলিম সমাজ সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে এক মহা সংকটের দিকে যাচ্ছিল। মহা এই সংকট যেন-তেন নয়; তার গাম্ভীর্যতা ছিল ব্যাপক, কেননা তা হলো আত্মপরিচয়ের সংকট। বাঙালি মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা, সংস্কৃতির বিকাশ এবং একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের পটভূমিতে এ আত্মপরিচয়ের সংকট পুরো মুসলমান সমাজকে তাড়িত করছিল। আত্মপরিচয়ের সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছিল বাঙালি না মুসলমান বিতর্ক নিয়ে, উদার সহনশীলতা ও রক্ষণশীলতার সংঘর্ষ নিয়ে। এই সবকিছুকে গুরত্বসহকারে ভেবে যিনি সমাধানের চিন্তা করেছিলেন তিনি হলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ[১৩৭] বিশ শতকের শুরু থেকে বাঙালি মুসলমান সমাজের আত্মপরিচয়ের সংকট অতিক্রম করে জাতিকে সামনে এগিয়ে চলার জন্য যে সকল মনীষী পথ নির্দেশনা প্রদান করেছেন তাদের অন্যতম হলেন পণ্ডিত ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি অর্ধশতাব্দীব্যাপি লেখনির মাধ্যমে এ বিষয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজকে জাগ্রত করেছেন, তাদেরকে সচেতন করেছেন, তাদের কাছে তুলে ধরেছেন বাঙালি মুসলমান সমাজের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধারা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর অসাধারণ জ্ঞান প্রতিভার মাধ্যমে সর্বদাই বাঙালি মুসলমান সমাজে শ্বাশত ঐতিহ্য এবং বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতির ভেতরে মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। পণ্ডিত ব্যক্তি কিংবা সাহিত্যিক তাকে ঘিরেই যাকে সমাজের ক্রিয়াশীল নিয়ামকগুলি, ভাবায় সংস্কৃতিও ঐতিহ্যের ছোঁয়ায়। যার ফলে জীবন ও চলার পথের চারদিকের সীমাবদ্ধতাগুলিকে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করার একটি মন তৈরী হয়। এই লেখক মন তখন উতলা হয়ে উঠে সকল সীমাবদ্ধতাকে ঘুচিয়ে মিটিয়ে ফেলার নেশায়। তখন শুরু হয় সংস্কার অধ্যায়ের। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সংস্কার আন্দোলনটি ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। মূলত তিনি ছিলেন ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী একজন মানুষ। প্যান-ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন তিনি, তবে ধর্মনির্ভরতায় নয়। তাই তাঁর আন্দোলনের গতিবেগও ছিল একটু অন্যরকম। তাঁর আদর্শে আবার তাকে আবিষ্কার করা যায় একজন ইসলামীচিন্তাবিদ, সমাজতন্ত্র আদর্শে ভাবুক হিসাবে। যার ফলে সমাজ বিনির্মাণ-এ কিংবা সংস্কারে সাম্যবাদীতাই যেন ছিল তাঁর আদর্শ। শহীদুল্লাহর সমসাময়িক বাঙালি মুসলিম সমাজে দাসত্ব প্রথার অস্তিস্ত ছিল। তিনি এই প্রথাকে সমাজ হতে নির্মূল করার জন্য হাতে কলম ধরেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, দাসত্ব প্রথা সাম্যবাদের পরিপন্থী, তাই ইসলামেরও পরিপন্থী। এটি ইসলাম-বহির্ভূত প্রাচীন জগতের প্রথা। তিনি আশা করেন, ইসলামের সাম্যবাদের আদর্শের প্রভাবে দাসত্ব প্রথা একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।[১৩৮]ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার গুরুত্ব স্বীকার করতেন। ইসলাম নারী শিক্ষা ও নারীর অধিকার সমর্থন করে– এ কথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। নারী শিক্ষা ও পর্দা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অনুধাবন করলে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি এক "অভিভাষণে" (১৯২৮) বলেন–

শিক্ষা বিস্তারের কথায় মেয়েদের বাদ দিলে চলবে না। তাঁরা সমাজের অর্ধেক। ...ইসলামে নারীকে তার উপযুক্ত অধিকার দেওয়া হয়েছে ...যদি নারীর শিক্ষা ও অধিকারের কথা উঠল, তবে পর্দার কথা এখানে তোলা অন্যায় নয়। পর্দা দুরকম একরকম ইসলামী পর্দা, সে হচ্ছে মুখ, হাত, পা ছাড়া সর্বাঙ্গ ঢাকা, আর এক অন্ইসলামী পর্দা, সে মেয়েদের চার দেওয়ালের মধ্যে চিরজীবনের জন্য কয়েদ করে রাখা। আমাদের প্রাণপন চেষ্টা করতে হবে এই অন্ইসলামী পর্দা ফাঁক করে দিতে। তা না হলে আমাদের নারী হত্যার মহাপাপ হবে।[১৩৯]

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ 'ইসলামের আদর্শ ও আমাদের আশা' (১৩২৬) প্রবন্ধে বলেন–

নারী-পুরুষের ভোগের জিনিস নহে, পুরুষ কায়ার ছায়া নহে। জীবন যুদ্ধে নারী-পুরুষের সহযোগিনী, জীবনের লক্ষ্য পথে নারী পুরুষের সহযাত্রীনী। নারী যদি পুরুষের দাসী হয়, তবে পুরুষও নারীর দাস, ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এইরূপ স্বীকার করে। পুরুষের আত্মদাসিনী নীতির ফলে নারীর সত্ত্বখর্বীকৃত ইহয়াছে।[১৪০]

স্ত্রী অধিকার যেহেতু পুরুষের সমান, তাই স্ত্রী-স্বাধীনতা সমাজের মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য। আর স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ছাড়া সমাজের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই কথাখানি মনে-প্রাণে যেমন বিশ্বাস করতেন, তেমনি তাঁর সাহিত্যকর্মেও এর প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতি পুরোপুরি একটি মিশ্র সংস্কৃতি। এখানে যুগে যুগে বহুজাতির, বহু ধর্মের, বহু বর্ণের মানুষের আগমন ঘটেছে। প্রত্যেকটি জাতি, ধর্ম ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির বেলায় এ কথাটি সর্বোতভাবে প্রযোজ্য। বাঙালি মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন–

জাহাঙ্গীর, শায়েস্তা খান, ইসলাম খান ও আযীমুশশানের স্মৃতি বিজড়িত জাঙ্গীরনগর আজ আজাদ পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী, ঢাকার নিকটবর্তী পূর্ববঙ্গের এককালীন রাজধানী সোনারগাঁও ন্যায়বান বাদশাহ গিয়াসুদ্দীন আযমশাহের পূণ্য স্মৃতি আজও বুকে ধরে আছে। স্মৃতি আমাদের নিয়ে যায় ঢাকার অদূরবর্তী বিক্রমপুরে সেন রাজাদের শেষ রাজধানীতে, সেখানে একদিন লক্ষণ সেন, কেশব সেন ও মধুসেন রাজত্ব করেছিলেন। দূর স্মৃতি আমাদের টেনে নিয়ে চলে বিক্রমপুরের সন্নিকটে রাজা রামপালের স্মৃতিচিহ্ন রামপালে এবং বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত শীলভদ্র, কমলশীল ও দীপঙ্কর অতীশের স্মরণপুত জন্মভূমিতে। এই অঞ্চল বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমানের স্মারকলিপি হয়ে আছে।[১৪১]

মূলত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পরস্পর নির্ভরশীল। যেকোন অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হয়। এ দুয়ের বিবর্তন ও বিকাশ গতির পরিচায়ক। অন্যথায় সমাজে স্থবিরতা দেখা দিতে পারে। বাঙালি মুসলিম ঐতিহ্যের একজন মহান সাধক হলেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তার সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হলো সমগ্র বাঙালি মুসলমান সমাজ তথা সমগ্রজাতির সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প কলার বিকাশ ও পরিপূর্ণতা দান।[১৪২] বাঙালি মুসলমান সমাজের পথহারা, দিশেহারা মানুষগুলির আত্মপরিচয়ের সন্ধান এনে দিতে গিয়ে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকে অনেক বেগ পোহাতে হয়েছে। তবুও কি বিতর্কের কিংবা সমালোচনার অবসান হয়েছে? না। হয় নি। আর এই দ্বারাটুকুর মধ্যে অতৃপ্ত প্রশ্বাসের সাথে মিশ্রিত ছিল ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সংস্কার আন্দোলন। ড. শহীদুল্লাহ বাঙালি মুসলমানদেরকে সংকটের প্রশ্নে একটি

উত্তরই কেবল দিয়েছেন, আর তা হল বাংলা ভাষা ও তার ঐতিহ্য, বাংলা ব্যাকরণ ও তার অভিধান। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলমান সমাজের সামাজিক বিন্যাসের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায় যে সমাজের উচু স্তরের পরিবারসমূহে উর্দু ভাষার প্রচলন থাকলেও সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। নিম্ন স্তরের মানুষের ভাষা হায়রে! অভাগা 'বাংলা ভাষা' তাকে নিয়ে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ গবেষণা করেছেন। লড়েছেন কিংবা লড়ে যাওয়ার জন্য যুক্তি নির্ভর করে তুলেছেন অধুনা বঙ্গমাতার শিরকে। যতবার বাংলাকে আঘাত করেছে উচ্চবংশজাত উর্দু, আরবী কিংবা ফারসী (উর্দু মূল প্রতিপক্ষ) বাংলা ভাষাকে নিস্তেজ করতে চেয়েছে, ততবারই এই বাংলা ভাষা অসাধারণ পন্ডিতব্যক্তি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর হাত ধরে জয়ধ্বনি করেছে।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩)ঃ 'পুথির কুবের' আবদুল করিম। তিনি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার সুচক্রচণ্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি শিক্ষকতা দিয়ে তার পেশা জীবন শুরু করেন। ১৮৯৮ সালে আবদুল করিম চট্টগ্রাম কমিশনার অফিসে কেরানী হিসাবে নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯০৬ সালে শিক্ষা বিভাগে কেরানী চাকুরীতে নিযুক্ত হন। ১৮৯৮-১৯০৫ মাঝখানের এই সাত বছর মনোয়ারা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে পেশাগত জীবন চালাতে থাকেন। ১৯৩৪ সালে আবদুল করিম অবসর নেন।

পুথি সাহিত্যের গবেষক আবদুল করিম। পুথি সাহিত্য বাংলার তথা বাঙালি সমাজের প্রাণ। তিনি কলিকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য (১৩০৮), পরে পরিষদের সহকারী সদস্য ছিলেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় তাঁর বহু মনোজ্ঞ আলোচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ (১৩২০-২১)' দু'টি খণ্ডে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশ করে।[১৪৩]'সত্যনারায়ণের পুথি' (১৩২২), 'মৃগলব্ধ' (১৩২২), 'গোরক্ষবিজয়' (১৩২৪) প্রভৃতি গ্রন্থও পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। হুগলীর 'পূর্ণিমা' (১৩০২) পত্রিকায় আবদুর করিমের লেখা ছাপা হত। এছাড়াও আলো, সাহিত্য, সাহিত্য-সংহিতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, বীরভূমি, আশা, ভারত-সুহাদ, ইসলাম প্রচারক, জ্যোতি, কোহিনূর, নবনূর, প্রদীপ, প্রকৃতি, অবসর, নববিকাশ প্রভৃতি পত্রিকায় শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি প্রাচীন পুথির উপর আলোকপাত করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রায় আটশত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[144] সমকালীন সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত কুসংস্কার, উৎপীড়ন, সামাজিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের মৃত্যু, প্রথাগত সংকট ছাড়া সমাজস্থ বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম সমাজস্থ চলমান ভয়ংকর ব্যাধি হতে সমাজকে রক্ষার নিমিত্তে কলম হাতে নিয়েছিলেন এই পান্ডিত্যপূর্ণ গবেষক। সমাজ হতে মানবপৃষ্ঠ ব্যধি দূর করতে তিনি মৌলিক চিন্তাশীল অনেক প্রবন্ধরচনা করেছেন। বিশেষত 'মাতৃভাষা' ও 'জাতীয় সাহিত্য', নিয়ে যে দ্বন্দ্ব উনিশ ও বিশ শতকে মাতিয়ে রেখেছিল তার বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মূলত সমাজসংস্কার আন্দোলনটি চালিয়েছেন তাঁর গবেষণা ও চিন্তাশীল প্রভাবকসম দু'টি বিষয়কে কেন্দ্র করে। যেমন, প্রথমটি হল 'মাতৃভাষা, এবং দ্বিতীয়টি 'পুথি। বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী পুথিতন্ত্রকে তিনি নিয়ে

এসেছিলেন তার সাহিত্য সাধনায়। ‘পুথি সাহিত্য’ ও বাংলাভাষাকে তিনি বাঙালি মুসলিম সমাজকে সংস্কার করার এক সিড়ি হিসেবে জ্ঞান করেছিলেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের দক্ষতা নিয়ে ড. মুহাম্মদ এনামুল হক বলেন–

> তখন বাংলার মুসলমানদের অন্ধকার যুগ। তারা অজ্ঞতা ও দারিদ্রে নিমজ্জমান। সাহিত্যবিশারদ ভাবতে লাগলেন এই জীবনমৃত মুসলমানদেরকে যদি বাঁচাতে হয় তবে তার প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন দিয়েই তাকে বাঁচাতে হবে। এরপর থেকে বাঙালি মুসলমানের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নির্ণয়ে, তার স্বরূপ অনুসন্ধান ও আবিষ্কারে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে।[১৪৫]

বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিকশিত হয়েছিল মূলত মধ্যযুগের মুসলমান শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়। পরবর্তী শাসকগণ বিশেষ করে মুঘলরা উর্দু ও ফারসীকে বেশি পৃষ্ঠপোষকতা দান করাতে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় অনেকটাই ভাটা পড়ে যায়। মধ্যযুগের অন্যতম বিশাল রচনা পুঁথি সাহিত্যও ভাটী পড়ে। কালক্রমে অবশেষে এই পুঁথি সাহিত্য হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরে গিয়ে যত্ন পায়। মুসলিম জাতির জ্ঞানচর্চার দুর্বলতার সুযোগে পুঁথি সাহিত্য খুব সযত্নে হিন্দু সাহিত্যের অঙ্গনে পৃষ্ঠপোষকতা পেতে থাকে এবং তাদের একচ্ছত্র সাহিত্য সম্পদে পরিণত হয়। হিন্দুদের একচ্ছত্র সাহিত্য সম্পদ হতে মুসলিম সাহিত্য ঐতিহ্যের এ পুঁথি সাতিহ্য ভিক্ষার চালের মত হিন্দু গৃহকোন থেকে তাকে চেয়ে চেয়ে নিয়ে এসে মুসলিম সাহিত্যের অংগনে পুঁথিসাহিত্যকে প্রতিস্থাপন করতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন–

> ‘সংকলনকর্তার অধ্যবসায়, পরিশ্রম, বাঙ্গালা-সাহিত্য-অনুরাগ, ধর্মমত সম্বন্ধে উদারতা প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। বাঙালির ধর্মেতিহাসের আলোচনায় এই পুঁথির বিবরণ প্রচুর সাহায্য করিবে।”[১৪৬]

নন্দিত এই সাহিত্যবিশারদের পুঁথি সংগ্রহ সম্পর্কে এক প্রামাণ্য বর্ণনা প্রদান করেছেন শ্রী ব্যোমকেশ মুস্তফী। তিনি বলেন-

> পুঁথি সংগ্রহ করতে গিয়ে সাহিত্যবিশারদকে যে উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে তা যেমন অদ্ভুত তেমন বিস্ময়কর। তিনি মুসলমান, কোন হিন্দুর আঙিনায় তার প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু হিন্দুর ঘরে পুঁথি আছে শুনে তিনি ভিখারীর মতো তার দ্বারে গিয়ে পুঁথি স্বরস্বতী পূজার দিনে পূজিত হয় অতএব মুসলমানকে স্পর্শ করতে দেয়া হবে না তাকে দেখতে দেয় নাই। অনেকে আবার তার কাকুতি মিনতিতে নরম হয়ে পুঁথি খুলে পাতা উল্টিয়ে দেখিয়েছেন, মুন্সী সাহেব দ্বারের বাইরে দাড়িয়ে হস্ত স্পর্শ না করে দেখে নোট করে এনেছেন। এত অধ্যবসায়, এত আগ্রহে, এমন করে কোন হিন্দু অন্তঃত নিজের ঘরের পুঁথিগুলির বিবরণ লিখেছেন বা এ কাজে হাত দিয়েছেন কিনা জানি না।[১৪৭]

সাহিত্যবিশারদ ১৯৫০ সালে বিনাশর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৯৭টি পুথি প্রদান করেন। এর মধ্যে ৫৮৫টি বাংলা ভাষায়, ১০টি ফারসী ভাষায়, ২টি উর্দু ভাষায় এবং ৪৯টি পুঁথি আরবী হরফে লেখা। তন্মধ্যে ৫৮৫টি পুঁথি ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘পুঁথি পরিচিতি’ নামে প্রকাশিত হয়।[১৪৮] আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সাহিত্য সাধনার সময়কাল ছিল হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক বিরোধ, বিদ্বেষ ও সংঘাতের সময়কাল। বাংলা ও ভারতের মুসলমান সমাজ তখন সবেমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণির গুরুত্ব অনুধাবন করতে শিখেছে। তখন তাদের এমনই সংকট অবস্থা যে হাতে নেই চাকুরী নেই ব্যবসা, নেই

উচ্চশিক্ষা তদুপরি নেই ভাল খাবার, ভাল বাসস্থান, নেই ভাল বস্ত্র (সর্ব মুসলমান-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)। অপরদিকে বৃটিশ ও হিন্দুদের প্রতি মারাত্মক ক্ষোভ জন্ম নেওয়া মোল্লাশ্রেণির হুজুরদের ফতোয়ার ভিত্তিতে নানা ধরনের কুসংস্কার যেন মুসলিম সমাজ ব্যবস্থাকে বিষিয়ে তুলেছিল। বাঙালি মুসলমান তখন অবাঙালি মুসলিমদের রীতি-নীতি আভিজাত্য যেমন সুখকরভাবে মেনে নিতে পারছিল না; তদুপরি বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতি রীতি-নীতিও যখন বাংলার সংস্কৃতিতে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। তখন তারা কোনটা নিবে তার মধ্যেই ঘোরপাক খাচ্ছিল। এমতবস্থায় বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানকে 'পুঁথি সাহিত্যের' মধ্য দিয়ে জাগরিত করা ছিল সময়ের বিশেষ প্রাপ্তি। আর অসাধ্য কর্মটি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সুন্দও ও সাবলিলভাবে সম্পন্ন করতে সচেষ্ট হন। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হলো বিশ শতকে বাঙালি মুসলমান সমাজের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্দোলন-সংগ্রামের এক চরম দুঃসময়ে দাঁড়িয়ে তিনি যেমন বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন বাঙালি মুসলমানগণ এদেশেরই সন্তান। তাদের রয়েছে সুদীর্ঘ ঐতিহ্য, সংস্কৃতির পত্র পরিক্রমা। তারা আপন ইসলামী সভ্যতার উত্তরাধিকারী, তাই অন্ধকারে পতিত না হয়ে আলোর পথে আন্দোলন করার অধিকার তাদের রয়েছে। সাহিত্য বিশারদের আজীবন গবেষণা বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমান সমাজের আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের প্রয়াস প্রচেষ্টাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। বাঙালি মুসলমান সমাজকে শেকড়ের আলো ফুটিয়ে অন্ধকার হতে আপন স্বগৌরবে বলীয়ান হওয়ার মন্ত্র ধরিয়ে দিয়েছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১) : উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সাহিত্য স্রষ্টাদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন অগ্রগামী। রচনার অধিক্যে ও প্রতিভার গৌরবে তিনি বাংলার সকল শ্রেণির পাঠকের কাছে সুপরিচিত। তার চল্লিশ বছরের সাহিত্য সাধানায় পঁচিশটি প্রকাশিত গ্রন্থ ও সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় ছড়ানো আরও অনেক প্রবন্ধ রচিত আছে। বিষয় ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে এগুলি বিচিত্র অবয়বসম; এর মধ্যে উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, কবিতা, প্রবন্ধ, জীবনচরিত্র, ধর্মবিষয়ক রচনা সবই বিদ্যমান। নদিয়া জেলার অন্তর্গত লাহিনীপাড়া গ্রামে মশাররফ হোসেনের জন্ম হয়। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ শে নভেম্বর তার মৃত্যু হয়। মশারফ হোসেনের সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয় রামচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় এবং বাঙালি হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত গ্রামবার্তা প্রকাশিকায় (১৮৬৩-৭৪)। উনিশ শতকের অনেক বাঙালি লেখকের এবং সমাজকর্মীর মতো মশাররফ হোসেনও অন্যায়-অত্যাচার দেখে শংকিত হতেন, ক্ষুব্ধ হতেন, প্রতিবাদের প্রেরণা অনুভব করতেন। এই আদর্শগুলির ছাপ তার লেখায় বিদ্যমান। মশাররফ হোসেন লক্ষ্য করেছেন সমাজস্থ মানুষগুলিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিত্ত জাগাতে বললে তাদের চিত্ত জাগত না; বরং তারা অন্যায় অত্যাচারকে সমাজের এক অসংলগ্ন ঘটনা বলে মনে করতেন এবং করেন। এ সমস্ত কুসংস্কার, অন্যায় যে একটি বিশেষ সামাজিক বা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফল– এ উপলব্ধি তাদের চিত্ত কোহরে প্রবেশাধিকার পেত না। তথাপি চিন্তা-চেতনার অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সমাজের মানুষদের একটি বেদনাবোধের জায়গা রয়েছে আর সেখানেই মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য সাধনার যত অনুপ্রেরনা। এই বেদনাবোধের প্রকাশে এবং তার চাইতেও যা বড় কথা সম্পূর্ণ সম্প্রদায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তনে মশাররফ হোসেনের অবদান

অনস্বীকার্য। মশাররফ হোসেন তার লেখনিতে স্বাধীনচিন্তার অধিকারী ছিলেন 'গো-জীবন' (১৮৮৮) প্রবন্ধটি তৎসময়ের রক্ষনশীল মুসলমানদেরকে দারুনভাবে ক্ষেপিয়ে তোলে। তিনি তাঁর প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজাল হতে সমাজকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি অনুপ্রেরনা লাভ করেছিলেন দয়ানন্দ (১৮৮২)- থেকে। যেমন মীর মশাররফ হোসেন তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন–

> আমি মোসল্মান-গো জাতির পরম শক্র। আমি গো-মাসং হজম করতে পারি, পালিয়া পুষিয়া বড় বলদটির গলায় ছুটি বসাইতে পারি, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দুগ্ধ্যবতী গাভী, দুগ্ধ পায়ি গো-বৎসের প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরিশোষন করিতে পারি, কিন্তু ন্যায়চক্ষে যাহা দেখিতেছি, যুক্তি ও কারণে যাহা পাইতেছি, তাহা কোথায় ঢাকিব, স্বাভাবিক ভাব কোন্ ভাববশে গোপন করিব?...
>
> জানিবেন ভারতে হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া একযোগে কোন কর্য্য না করিলে তাহা সিদ্ধ্য হইবে না। এক পক্ষ শর্ত বর্ষ মাথা কুটিলেও কার্য্য না করিলে কখনোই তাহা সিদ্ধ্য হইবে না। একপক্ষ শর্ত বর্ষ মাথা কুটিলেও ইশ্বর সদয় হইবে না।[১৪৯]

মূলত 'গো-জীবন' প্রবন্ধ রচনার জন্য রক্ষনশীল মুসলমানের ক্ষোভ জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। তবে হিন্দুদের মমতাবোধকে প্রকাশ করে মুসলমানের অন্তরের নির্দয়তা যেন ঘোঁচাতে চেয়েছে তাঁর যুক্তি ও বাস্তব বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা। বাঙালি হিন্দু-মুসলমান ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নিজেদের কু-প্রথা ও কুসংস্কার দূর করে সভ্যতার আলো ফোঁটাতে সক্ষম হয়েছে বা হবে, তাও মশাররফ হোসেন তাঁর 'গো-জীবন' প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, এ ব্রিটিশ রাজ্য, ব্রিটিশ সিংহ ইহার শাসনকর্তা, ন্যায্য কথা বলিতে কোন বাধা নাই- ভয়েরও কোন কারণ নাই সুতরাং লিখনি ক্ষান্ত হইবার নহে।[১৫০]তথাকথিত অভিজাত সমাজে কতদূর নৈতিক অধঃপতন ও সামাজিক দুর্নীতি প্রবেশ করেছে- 'গাজী মিয়াঁর বস্তানীতে, মশাররফ হোসেন তা প্রকাশ করতে সক্ষম ছিলেন। এই উপন্যাসে তিনি এনেছেন অরাজকপুরের হাকিম ভোলানাথ ও অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে কুঞ্জ- নিকেতনের বেগম পয়জারুন্নেছার অন্তরঙ্গতার একটি কাহিনী এবং জমদ্বার গ্রামের জমিদার সোনাবিবি ও তাঁর 'বেয়ান' মিনিবিবির পারস্পরিক শক্রতা নিয়ে গড়ে উঠেছে কাহিনীটি।[১৫১] 'গাজী মিয়ার বস্তানীতে' লেখক সেসময়ের নারী স্বাধীনতার বিরোধী সমাজ ও হিন্দুদের উচ্চ সাম্প্রদায়িক মনের পরিচয় প্রকাশ করেছেন। যেমন উপন্যাসে তার হিন্দু চরিত্র বলছে–

> ভায়া। নেড়ে জাত আমার চক্ষুর শূল। আমার ক্ষমতা থাকলে বাঙালা দেশ থেকে সব মুসলমানকে তাড়িয়ে দিতাম।[১৫২]

ঠিক এইভাবেই মীর মশাররফ হোসেন সমাজের সমস্যাসমূহের অন্তঃগর্ভে প্রবেশ করে পাঠক চিত্তকে আলোড়িত করার চেষ্টা চালিয়েছেন। মশাররফ হোসেনের সাহিত্যকর্মের মধ্যে তাঁর চিন্তাধারার প্রতিবাদীমুখর তথা সমাজ-এর চিহ্নিত সমস্যাবলীর

চিত্র ফুটে ওঠে। মীর মশাররফ হোসেনের গৌরব এখানে যে, তাঁর যা কিছু রচনা তা মূলত সাহিত্যপদবাচ্য, আসম্প্রদয়িক চেতনায় বলিষ্ঠ।

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০): মুক্ত বুদ্ধির কণ্ঠস্বর কাজী আবদুল ওদুদ[১৫৩] ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের সূচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। পরের বৎসর, ১৯২৭ এর এপ্রিলে প্রকাশিত হয় প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র বার্ষিকী সাময়িকপত্র 'শিখা'। উদ্যোক্তাদের অন্যতম প্রমুখ পুরুষ কাজী আবদুল ওদুদ। মুসলিম সাহিত্য সমাজের মূল ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি' অর্থাৎ বিচার বুদ্ধিকে অন্ধঅনুকরণ ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তি দান। বাংলার মুসলমান সমাজে (হয়ত বা ভারতের মুসলমান সমাজে) এ ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। তবে আরও বিস্ময়কর হলো সেসব দিনে বাংলার শিক্ষিত মুসলিম তরুণের উপর এর প্রভাব ছিল বিস্ময়কর। মূলত একটি জিজ্ঞাসু ও সুহৃদ সমাজ সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠানটির অবদান ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই 'বুদ্ধির মুক্তি' (Emancipation of the intellect)মন্ত্রের জন্য বাঙালি মুসলিম সমাজ কাজী আবদুল ওদুদের কাছে ভীষণভাবে ঋণী। এই মন্ত্রটি একটি চাবির মত কাজ করে। চাবি দিয়ে তালা খুলে যেরকম বন্দীকে মুক্ত করার হয় ঠিক তেমনি এই মন্ত্র ব্যবহার করে সমাজে বিদ্যমান অন্ধঅনুকরণ ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে বের হওয়া যায়। তাই বুঝি তার কণ্ঠস্বর থেকে উদ্ভাসিত "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।"

কাজী আবদুল ওদুদ-এর আজীবন মুখ্য সাধনা ছিল সম্মোহিত মুসলমানের জাগরণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের যে নবমানবিকতার সাধনা(New Humanism).

পাশ্চাত্যে যেমন তার শ্রেষ্ট ফল গ্যেটে; ঠিক তেমনি প্রাচ্যে তার শ্রেষ্ট ফল নিয়ে এসেছিল কাজী আবদুল ওদুদ-এর সৃষ্টি 'কবিগুরু গ্যেটে' কাজী আবদুল ওদুদের সমসাময়িক বাংলার মুসলমানের অদৃষ্ট দুঃসময়ে ভরপুর ছিল। আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রেই ছিল সংকট। চারদিক রুদ্ধ কারাগার খোয়াড়ে শৃঙ্খলিত মানুষ পালে পালে ছিল জীব বিশেষ। অনুভূতি বঞ্চিত, চেতনাহীন, চোখবাঁধা কলুর বলদ তুল্য মানুষগুলি ছিল যেন সমাজে কোন প্রকারে দিন-রাত্রি কাটানো জীব। এই সমস্ত মানুষগুলি অন্ধভাবে নিয়তীর উপর ভর করে চলত। ওদিক দিয়ে সমাজেরই এক অংশ যারা অভিজাত, উপরতল দখল করে যাদের বসবাস, সেজে বসা মাতব্বর সমাজ প্রভূ যারা, হুজুর কেবলা যাদের ইশারায় চলে, আর তাদের হাতেই লুট হয়ে যায় 'আশারাফুল-মাখলুকাত' মানুষের অধিকার। কিন্তু সবাই চুপ। চারদিকে কু-শিক্ষা, অন্ধকার তদুপরি নিত্যদিনের জীবনে পদে পদে সদ্য কেতাবের দোহাই, মোল্লাকীর আর ফতোয়ার হুমকি। তাও চুপ। কোন সংস্কারের বারুতা নেই, কোন প্রতিকার নেই, কোন ঔষধ যেন; নেই সমাজদেহে পোকার কামড়ের ঘাঁ সরানোর জন্য। তাছাড়াও তখন সামজব্যবস্থায় মধ্যযুগীয়তার অন্ধকারে পিছুটান, যুগপৎ কবন্ধ কুসংস্কার গ্রাসিত, ইতিহাস সাক্ষ্য ছিল তৎসময়ের সমাজচিত্রের ভয়ংকার রূপ।[১৫৪]

এইসব দূষিত অবস্থা থেকে সমাজস্থ মানুষকে মুক্তি দিতে আলোক শিখা হাতে নিয়ে এলেন ‘কাজী আবদুল ওদুদ’। সাহিত্য তাঁর আজীবন সাধনা। তিনি বলেন, সাহিত্য জীবন বৃক্ষের ফল, জাতি বা সমাজ বিশেষের মগ্নচৈতন্যের রসের যোগানে তার বিকাশ ঘটে। সেই গূঢ় রস বাংলার মুসলমান সমাজের অন্তরে সঞ্চিত আছে কিনা তাদের সাহিত্য-সমস্যার আলোচনা সম্পর্কে তার সন্ধান নিশ্চয়ই অপ্রয়োজনীয় নয়; বরং প্রয়োজন ও অধিকার। কিন্তু বাঙালি মুসলিম চিত্তে কাজী আবদুল ওদুদ তা দেখলেন না। সেসময়ের মানুষজন ভাবত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইসলাম কিছু নীতি কঠোরভাবে মেনে চলবেই, যেমন– নারীর অবরোধ ইসলাম সমর্থন করে, ব্যাংকিং সিস্টেমকে অভিসম্পাত জানায়, ললিত-কলার চর্চা, সঙ্গীত চর্চা, চিত্র চর্চায় আপত্তি জানায়, তাছাড়াও ইসলাম মানব চিন্তার ক্ষেত্র সীমিত করে কোরআন ও হাদিসের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকতে বলে। এভাবে চিন্তার স্বাধীনতায় শিকল পরিয়ে ইসলাম কি পেরেছে বাঙালি মুসলমানদের কল্যাণ বয়ে আনতে? এ প্রশ্নের জবাব কি। ইসলামের শ্রেষ্ঠ সত্য তৌহিদ মানবচিত্তের চির মুক্তির বাণী। তাহলে বুঝা যায় আধিপত্যবাদী মুসলিম কয়েকজনা এই ধরনের ফতোয়া খেয়াল খুশিমত তৈরী করে সৃষ্টির সেরা জীবকে তাঁর কীর্ত্তির শৃঙ্খলে আটকে ফেলে। মানুষও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে সেই শৃঙ্খললে বাঁধা পড়ে। Every idea is a prison, every heaven is a prison।[১৫৫]মানুষের অগ্রগতি চির সহচর। তার কাজ সত্যের পানে সদা চিত্তকে উন্মুখ করে এগিয়ে চলা। তবেই আসে মুক্তি। আনন্দ ও সৌন্দর্য চর্চা তথা মানসিক প্রশান্তি থেকে, ললিত কলার চর্চা থেকে মুসলমান ধর্মের দোহাই দিয়ে দূরে থাকে। তারা বোঝে না আত্মা না বাঁচলে দেহের যে দাম থাকে না। কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন বাংলা সাহিত্যে বাংলার উচ্চশ্রেণি মুসলমানের বিশেষ কোন অবদান নেই, তবে বাংলার লোক সঙ্গীতে নিম্ন শ্রেণির মুসলমানদের দান অপরিসীম। যেমন, পাগলা কানাই ও লালন ফকিরের গান ইত্যাদি। এইসব গানের মধ্যে একেশ্বরত্বের খোঁজ মেলে, যা ইসলাম ধর্মের মূল। কিন্তু মানুষের অন্তরের বেদনার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন আমাদের আলেম সম্প্রদায় শাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে শিক্ষা সাধনাহীন সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা আদায় করে মুসলিম মানস চিত্তের উন্মুক্ত বিকাশ কে চাষীর গানের ফোয়ারার সাথে সাথে অমিতবেগে থামিয়ে দিয়েছে, দিত এবং দেয়। কাজী আবদুল ওদুদ তা অনুধাবন করলেন এবং সমাজের ঠিক সেই জায়গাটিতে আঘাত করলেন, যেখান থেকে মুক্ত তথা স্বাধীন বিচার বুদ্ধিকে গলাটিপে ধরা হয়। এরজন্য তাঁকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। অনেকবার তাঁর প্রাণনাশের পরিস্থিতিও তৈরী হয়েছিল তবুও তিনি থেমে থাকেননি, চলেছেন আপনভাবে দুর্বারবেগে। সাহিত্য জ্ঞানের সুরভি, তাই জ্ঞান চর্চা সমাজে অব্যহত থাকলে সাহিত্যের জন্য আর কোন ভাবনা থাকে না। কিন্তু সে জ্ঞান চর্চার জন্য প্রয়োজন মুক্তবুদ্ধির; অথবা তারও চাইতে বেশী প্রয়োজন সমাজ জীবনে বৈচিত্র্যের– মুক্তবুদ্ধি যার সন্ততি। অবরোধ ও নিরক্ষরতার চাপে তৎসময়ের বাঙালি সমাজের মুসলমান সম্প্রদায়ের অর্ধেকেরও বেশী ব্যক্তিত্বহীন ও অকর্মন্য; সেই অর্ধেকের সংস্পর্শে এসে অপর অর্ধেক ও চিত্ত বিকাশ বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে। মানুষের চিত্ত যার আঘাতে জেগে উঠবে সেই বৈচিত্রতাও তাৎসময়ে সমাজে ছিল দুর্লব। সংস্কার ছাড়া বাংলার মুসলমানের সুন্দর ও সুস্থ জীবন সম্ভব নয়। একথা কাজী আবদুল ওদুদ মানতেন। তাইতো তার সাহিত্য সাধক জীবনে তাঁর লেখনিতে সেই আমেজ প্রাপ্য। মুসলিম সমাজ জীবনকে সংস্কার করতে গিয়ে মনের একটি ভাব ঠিক এইভাবে প্রকাশ করেছেন-

"আমার সব চেতনা সব বেদনা

রচিল এ যে কী আরাধনা ...

নটীর পূজা।"

কাজী আবদুল ওদুদের প্রথম প্রশংসিত পরিচিতি কথাসাহিত্যিক হিসাবে। তাঁর ছোট গল্প সংকলন 'মীর পরিবার' (১৯১৮), উপন্যাস নদীবক্ষে (১৯১৯)। পরবর্তীতে তাকে আর থেমে থাকতে হয়নি, তিনি লিখলেন– বাণীর সাধনা, *কবিগুরু গ্যেটে*(১৯৪৬), *কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ* প্রথম খণ্ড (১৯৬২), দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬৯), *শরৎচন্দ্র ও তাঁরপর* (১৮৬১)। এছাড়াও রয়েছে *শাশ্বত বঙ্গ, বাংলার মুসলমান, বাংলার জাগরণ, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি, কোরআনের আল্লাহ*। শেষজীবনে তাঁর দু'টি মহৎ কীর্তি–*হজরত মোহাম্মদ (সা:) ও ইসলাম* এবং দুইখণ্ডে*পবিত্র কোরআন*।[১৫৬]কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর ছোট গল্প 'মীর পরিবার' (১৯১৮) মূলত ছিল সামাজিক হীনতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখা গল্প। সমাজের উচু-নিচু ভেদাভেদ কে তিনি মানতেন আর আভিজাত্যের অহংকারে টগবগকরা 'হামিদ, গল্পেও স্থান পেয়েছে। উক্ত গল্পদ্বয়ে তিনি মুসলমান সমাজের বংশ গৌরবের অহংকার যে কত তীব্র খারাপ তা চিত্রায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। ঠিক এইভাবে-, হামিদের সব ভাই উচ্চ শিক্ষিত ছিল; তার পিতাও বড় ঘরের সন্তান ছিলেন। কিন্তু হামিদ ছিল শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত, অশিক্ষিত, নিষ্কর্মা, অথচ এই নিষ্কর্মা ছেলে নিয়েই তার পিতার কত অহংকার, শেখদের বাড়িতে হামিদের খাওয়া, যাওয়া-আসা তিনি পছন্দ করতেন না। হামিদ যখন শেখের বাড়ি চলে যায় তখন ক্রদ্ধ পিতা ভর্সসনা করে বলেন–

> "শেখদের বাড়ি গিয়ে, তুই একদিন থেকে এলি কোন আক্কেলে? তুই কি জানিস না এটা আমাদের বংশের পক্ষে কত বড় অপমান।...আর আজ কিনা তুই তাদের ছেলের সাথে সমানের মত আলাপ করতে যাস।"[১৫৭]

কাজী আবদুল ওদুদ সজাগ ছিলেন যেন মধ্যযুগীয় অন্ধকারের অপদূতরা দুঃসাহসী তৎপর হয়ে তাণ্ডব লীলায় মেতে ওঠে সামাজিক সংস্কার কে ধুলিস্মাৎ করে না দেয়!

আবুল হোসেন (১৮৯৬-১৯৩৮): সমাজকে কুসংস্কার, হীনতা, নীচতা থেকে উদ্ধারকল্পে সমাজ সংস্কারকগণ আজীবন তাদের চিন্তা ও চেতনাকে ঢেলে সাজিয়ে দেন। তাদের আন্দোলন পরিচালনায় তারা সর্বোপরী সমাজ হতে সাহায্য পান নি; বরং শত হুমকি, লাঞ্চনা মাথায় নিয়ে, মৃত্যকে চোখের সামনে মাড়িয়ে, কাঁটা বিছিয়ে দেওয়া রাস্তায় হেঁটে যেতে হয় অনেক পথ। আলোচ্য সময়ের (১৮৫৭-১৯৪৭) বাঙালি মুসলমান সমাজ জর্জারিত ছিল নানাবিধ রীতি-নীতি, আচার-আচরন, প্রথা, উচু-নিচু ভোদাভেদ, মিথ্যা আভিজাত্যতা, ধর্মীয় গোড়ামী, নারীর পায়ে শেকল, হানাফী- মোহাম্মদীয় কলহ-বিবাদ নিয়ে। এমতবস্থায় বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে হতে শিক্ষা ও চিন্তা- চেতনার শক্তিতে বলিয়ান মুসলমান কয়েকজন লেখক তাদের চিন্তা-ভাবনার স্বরূপ উদঘাটন করে সমাজের যাবতীয় কু-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন। তাঁরা হলেন মুসলিম সাহিত্যিক, লেখক, চিন্তাশীল ব্যক্তিমানস যাদের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে সমসাময়িক সমাজ জীবনের বিবিধ অবস্থার চিত্র। এমননি একজন লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সমাজ সংস্কারক হলেন আবুল হোসেন[১৫৮] আবুল হোসেন মূলত উদারনৈতিক

মনোভাবী ছিলেন। ইসলাম ধর্মের শরীয়তের সত্য দিকগুলির প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল। তবে তিনি যখন সমাজে মুসলমানদের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে লিখতেন তখন ইসলামধর্মকে যেন দায়ী করছেন এমনটা মনে হত। ধর্মভীরু মুসলমানদের সু-শিক্ষা বা প্রকৃত ইসলামী জ্ঞান ছিল না বলে তারাই এমনটি ধারনা করত আর তাদের সেই ধারনাকে উসকে দিত গোঁড়া মৌলভীরা। ইসলামের ভয় দেখিয়ে বক ধার্মীকগণ অন্তত একটি কাজ খুব ভাল পারে, আর তা হল স্ব-ধর্মের সমাজ সংস্কারকে গ্রাস করে খেয়ে ফেলা। তৎসময়ের মুসলিম সমাজের এক রোগ ছিল 'বৈরাগ্যবাদ'। অথচ ইসলামে বৈরাগ্যের স্থান নেই। সংসার সাধনায় অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থ যখন পুরুষের থাকত না তখন সে ধর্মের দোহাই দিয়ে সাধুবেশে বউ-বাচ্চা ফেলে মদীনা ডাকে আমায় বলে উধাও হয়ে ভিন্ন জেলায় আধ্যাত্মিক কথা বলে বলে মানুষ তকিয়ে চলত ও খেত। সংসার ধর্ম পালনে যে সত্যকে পাওয়া যায়, খোদার সান্নিধ্য পাওয়া যায় তা সে জানত না। এ প্রসংঙ্গে ১৩৩২ সালে আবুল হুসেন তার 'সত্য' নামক প্রবন্ধে বলেন:

> খোদার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা বিলীন করে দাও - তুমি মানুষের সমাজে থেকেই সত্য পথ সহজে বের করে নিতে পারবে। সংসার ছেড়ে যেতে হবে না।[১৫৯]

১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা কাজী আবদুল ওদুদের ঠিক পাশের সহযাত্রী আবুল হুসেন। 'বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলন' (emancipation of intellect) ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। আধুনিক জ্ঞান ও যুক্তি প্রয়োগ করে আবুল হুসেন ধর্ম ও সমাজকে সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার মুক্ত করে সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন। বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুনের ধর্ম সংক্রান্ত ভাবধারার সাথে আবুল হোসেনের ধর্ম চিন্তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই চিন্তা ও যুক্তি প্রয়োগে তিনি চেয়েছিলেন সামাজিক মুর্খতা নিমূল করে সমাজকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতে। 'অহমিকা' প্রবন্ধ (১৩৩২)-এ আবুল হুসেন বলেছেন- অহমিকা মানুষের উন্নতির পথ রোধ করে দেয়। প্রকৃত মানুষ হতে হলে মোহাম্মদের (সা:) মহৎ জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে হবে। অহমিকা মাথা তুলে দাঁড়ালে হজরতের পুন্য প্রভাব দূরে সরে যাবে। সংকীর্নতাকে আবুল হোসেন কখনও প্রশ্রয় দেন নি। লোক দেখানো ভক্তি ও ধর্মপ্রেম মানুষকে বড় হতে দেয় না বলে তিনি মনে করেন।[১৬০] বাহ্যিক অনুষ্ঠানকে যারা বড় করে দেখে অন্ধ অনুশাসনকে অকাট্য অবলম্বন করে জীবনকে যারা অতিষ্ঠ করে ধর্মের দোহাই দিয়ে আবার সমাজ-এর উন্নতির পথকে যারা রুদ্ধ করে তাদের উদ্দেশ্যে আবুল হুসেন রচনা করেন 'আদেশের নিগ্রহ' (১৩৩৬) শীর্ষক প্রবন্ধ। তিনি বলেন–

> তাই দেখতে পাই, মানবের ইতিহাস ধর্ম- বায়ু-গ্রস্থ মানুষের পরস্পর দ্বন্ধ দ্বেষাদ্বেষির কলঙ্কে অতি নির্মমভাবে কলঙ্কিত। এ কলঙ্ক অপনোদন করতে হলে- মানবের প্রতি পরস্পর প্রীতিই চরমধর্ম বলে ধরতে হবে।[১৬১]

মূলত বিশ্বাসকে বুদ্ধির কষ্টি পাথরে যাচাই করে তার ভাল-মন্দ নির্ণয় করা আবশ্যক- মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের উদগাতাদের মূল কথা। আবুল হুসেন বুঝি এর ব্যতিক্রম নন। তিনি আজীবন একটি শেকড়কে ধরে মুসলমান সমাজকে সংস্কার করার আন্দোলনে মত্ত ছিলেন, আর তা হলো- 'ধর্ম জীবনের জন্য, জীবন ধর্মের জন্য নয়'।[১৬২] আসলে, যত সংকীর্ণতা, কুসংস্কার

ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধেই ছিল তার সংগ্রাম, একথাই আজ বড়বেশী স্বীকার্য। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য আবুল হুসেন সমাজের প্রতিভূ নামক মানুষরূপী বস্তুগণের সাথে যেমন আন্দোলন করেছেন; ঠিক তেমনি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও তাঁর প্রতিবাদ ছিল অতি তীব্র। আবুল হুসেন বিধবা বিবাহের ব্যাপারে মুসলমানদের উদাসীনতা ও বহুবিবাহের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধানের অপব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। বিধবা বিবাহ ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ নয়; কিন্তু সমকালীন মুসলমান সমাজে একে অনেকেই লজ্জাকর কাজ বলে গণ্য করতো। এ সম্পর্কে আবুল হুসেন তার 'আদেশের নিগ্রহ' (১৩৩৬) প্রবন্ধে বলেন–

> এই যে বিধবা বিবাহ ব্যাপারটি, যার প্রবর্তনের জন্য হিন্দু সমাজ আজ প্রায় শতশত বৎসর ধরে নানা প্রকার চেষ্টা করেছেন, এমনকি রাজ সরকারের মারফতে আইন পর্যন্ত রচিত হয়েছে, সেই বিধবা বিবাহ আজ মুসলমান সমাজে অনেকটা ঘৃণ্য ও লজ্জাকর ব্যাপার হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ শিক্ষিত ও বুনিয়াদী ভদ্র মুসলমানই এ বিষয়ে আগ্রণী।[১৬৩]

এভাবে আবুল হুসেন তাঁর বিভিন্ন রচনায় সামাজিক আচারের ক্ষতিকর দিক যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি তার প্রতিকারও তাঁর লেখনির মধ্য দিয়ে সাধন করেছেন। সংকীর্ণ সংস্কার নয়; বরং তাঁর কামনা ছিল বৃহত্তর সংস্কারের মধ্য দিয়ে সত্যকে অনুধাবন করার সঠিক জ্ঞান- তৈরীর জন্য মুসলিম সমাজকে প্রেরণা দান।

তথ্যসূত্র :

১. Qeyamuddin Ahmad, *The Wahabi Movement in India,* National Book Foundation, Calcutta, 1966, P,11.

২. *Ibid,* P,13.

৩. মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৬, পৃ, ৯০-৯২।

৪. মুহাম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী প্রভাব,* র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৩৫, পৃ,৩০।

৫. Qeyamuddin Ahmad, *Op.cit,* P,11-13.

৬. Shah Waliullah, Translated by marciak Hermanssn, *The Conclusive Argument of God,* Brill, Academic Publishers, Delhi, 1996, P, 163.

৭. S.M. Ikram, *History of the freedom movement: being the story (1707-1947),* Renaissance Pub. House, Delhi, 1984, P,457.

৮. *Ibid*, P, 506-508.

৯. W.W. Hunter, *The Indian Musalmans,* Trubner and Co., London, 1872, P, 22.

১০. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস (অনুবাদক) ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ, ৯।

১১. WW. Hunter, *Op.cit,* P, 23.

১২. James wise, *Notes on the Races, castes and Trades of Eastern Bengal*, Harrison and Sons, London, 1883, P, 49.

১৩. করম আলী খান, অনুবাদক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া,*মুজাফ্‌ফরনামা*, প্রথমা প্রকাশন, বাংলাদেশ, ১৯৯৮, পৃ, ১৬৬।

১৪. Gholam Hossain, *Riyazu-s-Salatin,* Translated by Moulavi Abdus Salam, Asiatic Society of Calcutta, Calcutta, 1904, P, 265, 558.

১৫. *Ibid*, P,142-146.

১৬. ‘India’, *Encylopedia of Islam*, Vol-II, P,479.

১৭. Murray T Titus, *Islam in India and Pakistan (1862-1962),* Vol. 1, Y.M.C.A. Publishing House, Culcutta, 1959, P, 56

১৮. Edward G. Browne, *A Literary History of Persia,* Cambridge University Press, London, 1920, P, 166-169.

১৯. *Ibid,* P,416-421.

২০. H.A.R. Gibb, *Mohammedanism,* Oxford University Press, London, 1953, P,130-138.

২১. Tara Chand, *Influence of Islam on Indian Culture,* Indian Press, Allahbad, 1954, P,81-82.

২২. *Ibid,* P, 150.

২৩. মুহাম্মদ এনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ২২৯।

২৪. Tara Chand, *Op.cit,* P, 67, 82.

২৫. Murray T Titus, *Op.cit,* P, 111-112.

২৬. *Ibid,* P.111-131.

২৭. জনৈক,'Indian Mussalman and Indian Politics' *The Hindustan Review,* ফেব্রুয়ারী ১৯০৯, পৃ, ১৪৩।

২৮. রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী দেখুন,H.V. *Biographical Studies in Modern Indian Education,* P, 1-57; Bradley-Birt, F.B., *Twelve Men of Bengal in Nineteenth Century,* P, 1-33; *Andrews, C.F., and Mukeryi, G.The Rise and growth of the Longress in India,* P,14-28.

২৯. Spear. P, *India, Pakistan and The West,* Oxford University Press, London, 1949, P, 538.

৩০. Andrews, C.F., and Mukerjee, G., *The Rise and growth of the Congress in India 1832-1920,* G. Allen & Unwin Ltd., London, 1938, P, 49.

৩১. *Ibid*

৩২. *The Rehatsek, History of the wahhaby's In India, The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society of Bengal,* 1894, অংশ ৩, প্রথম সংখ্যা, পৃ, ৪৮-৫৩।

Wise, Dr.J.,Eastern Bengal, The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society of Bengal, 1894, অংশ ৩, প্রথম সংখ্যা। পৃ, ৪৮-৫৩।

৩৩. Sherwani, H.K*; The Political thought of sir Syed Ahmad khan,* Concept Publishing Copmany PVT, Ltd., Aligarh, 2009, P, 237.

৩৪ জনৈক,*'Indian Mussalman and Indian Politics', The Hindustan Review,*ফেব্রুয়ারী ১৯০৯, পৃ.৫০

৩৫. আবদুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৮২

৩৬. ঐ

৩৭. ঐ

৩৮. ঐ

৩৯. আলী সম্পর্কে জানতে দেখুন, জৌনপুরী কেরামত, রংপুরের বরেণ্য বক্তিত্বঃ সম্পাদিত রঙ্গপুর গবেষণা পরিষদ।

৪০. ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান, অনুবাদক ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০।

৪১. ইমাম আবু হানিফা, হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক। প্রথমযুগের হানাফী ইমাম হলেন- ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ শায়বানী। তাঁর ফিকহাশাস্ত্রে যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। পক্ষান্তরে তাদের মতাদর্শ ছিল "রসুলুল্লাহর কর্মধারার মাহাত্ম হৃদয়ম করে ইসলামের সরল সঠিক পথ বেঁছে নেওয়া ও তদানুযায়ী আমল করা"।

৪২. Muin-ud-Din Ahmad khan, *Op.cit,* P, 24.

৪৩. *Ibid*,P, 243.

৪৪. মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরি ১৮৭৩ সালের ৩০মে মৃত্যুবরণ করেন।

৪৫. ড. নূরুল ইসলাম মনজুর, *বিশ শতকে বাঙালি মুসলিম মানসের বিবর্তনধারা*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১৭, পৃ.৯

৪৬. ১৮৬১ সালের ৭ ডিসেম্বর (বাংলা ১২৬৯, ১০ পৌষ) তারিখে যশোর জেলার ঐতিহ্যবাহী বিলুপ্তনগরী বারবাজারেরর নিকটবর্তী ঘোপ গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুনসী মুহাম্মদ ওয়ারেস উদ্দিন। তিনি পাঠশালার শিক্ষা হিন্দু পাঠশালা থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

৪৭. আলী আহমদ সংকলিত, *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৫৬, ৬১

৪৮ আনিসুজ্জামান, প্রবন্ধ, মুনসী মেহেরুল্লাহ ও জমিরউদ্দিন, শীতসংখ্যা সাহিত্যে পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৩৬৭, পৃ.৬

৪৯. মুনসী মেহেরউল্লাহ*মুনসী মেহেরউল্লাহ রচনাবলী প্রথম খন্ড*, নাসির হেলাল সম্পাদিত আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ.৩৬

৫০. আলী আহমদ সংকলিত,*বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, পৃ. ৬৫৩

৫১. আলী আহমদ সংকলিত*বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, পৃ. ৬৫৩

৫২. মুনসী মেহেরউল্লাহ,*মুনসী মেহেরউল্লাহ রচনাবলী প্রথম খন্ড*, নাসির হেলাল সম্পাদিত সম্পাদকীয় আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৬২

৫৩. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮),* চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ.৩০৩

৫৪. Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bangla, 1884-1912,* Oxford University Press, Bangadesh, 1974, P.310

৫৫. শেখ হাবিবুর রহমান, 'সাহিতিক ও কবি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্', নাসির হেলাল সম্পাদিত, *মুনস্‌ী মেহেরুল্লাহ : জীবন ও কর্ম*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০ পৃ. ২১৯

৫৬. *লেখক সংঘ পত্রিকা*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

৫৭. *মিহির ও সুধাকর*, ২৭ পৌষ ১৩০৭

৫৮. *ইসলামপ্রচারক*, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬

৫৯. জনাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেব করকমলেষু, ধার্মিকবর, অনিত্য আমোদোপযাচিকা সংসারপতির ঘোর আবর্তনের অবস্থিত করিয়া ভবদীয় জীবন এবং সম্পদ সেরূপ অকাতরে পবিত্রধর্মকর্মে উৎসর্গ করিতেছেন এবং সমাজহিতকর বিবিধ বিষয়ের অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে ধর্ম ও জাতীয় একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে সর্বস্ব সমপর্ণ করিয়াছেন। অধিকন্তু এই সকল সদেচ্ছা ও সৎপ্রকৃত্তি অপ্রতিহত ভাবে রাখিয়া ধর্মের আদেশানুবর্তী হইয়া পবিত্রভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই ভবদীয় জীবনের মাহ উদ্দেশ্য। সেই মহা উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া মহোদয় আমার এক চির বাঞ্চিত উদ্দেশ্য কার্যে পরিনত করার কৃতজ্ঞতার দীন-চিহ্ন স্বরূপ "সুরিয়া বিজয়" ভবদীয় করকমলে অর্পন করিলাম।

ইতি

রেয়াজুদ্দীন

আহমদ মাশহাদী

সংগ্রাহক ধারাবাহিক পত্রিকা মাসিক 'মিহিরে' (১৮৯২)-এর সম্পাদক 'শেখ আবদুর রহিম'।

৬০. গোলাম সাকলায়েন,'কবি দাদ আলী', *বাংলা একতেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৫৫, পৃ. ৯

৬১. ওয়াকিল আহমদ, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩৮২-৩৮৫

৬২. কুমিল্লা জেলার (সাবেক ত্রিপুরা) লাকসাম উপজেলার অন্তর্গত পশ্চিম গাঁয়ে ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে 'নওয়াব ফয়জুন্নেছা জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল আহম্মদ আলী চৌধুরী ও মাতার নাম আরাফানুন্নেচা চৌধুরানী। ছোট বেলা হতেই ফয়জুন্নেছার। তার একজ গৃহশিক্ষক ছিল নাম তাজউদ্দিন। কেননা ফয়জুন্নেছা জীবনে কখনও স্কুলে যান নি। আর না যাওয়ার কারন কঠোর পর্দা প্রথা।

৬৩. রওশন আরা বেগম, *ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ,২৫।

৬৪. কুমিল্লা জেলার (সাবেক ত্রিপুরা) লাকসাম উপজেলার অন্তর্গত পশ্চিম গাঁয়ে ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে 'নওয়াব ফয়জুন্নেছা জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল আহম্মদ আলী চৌধুরী ও মাতার নাম আরাফানুন্নেছা চৌধুরানী। ছোট বেলা হতেই ফয়জুন্নেছার একজন গ্রহশিক্ষক ছিল তার নাম তাজউদ্দিন। কেননা ফয়জুন্নেছা জীবনে কখনও স্কুলে যান নি। আর না যাওয়ার কারণ কঠোর পর্দা প্রথা।

৬৫. রওশন আরা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৩০।

৬৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ মাঘ, ১২৮৯।

৬৭. মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস '*জেলার বায়েকত্রন প্রখ্যাত ব্যক্তি*',নকীব, কুমিল্লা, ১৯৭৫, পৃ, ১৯।

৬৮. *আখবারে এসলামীয়া*, শ্রাবন ১৩০২।

৬৯. *The Moslem Chronicle*, Vol, 29, No, 15, September, 18995-1905.

৭০. আবদুল রহিম বক্স পেসকার,*ওয়াকাফনামা*, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কোলকাতা, ১৯০৪, পৃ, ১-২।

৭১. ওয়াকিল আহমদ,*উনিশ-শতকে বাঙ্গালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ, ৮২।

৭২. আবদুল রহিম বক্স পেসকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ১।

৭৩. ওয়াকিল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৭৮।

৭৪. *আখবারে এসলামিয়া*, বৈশাখ, ১৩০২, ৪৬৬ সংখ্যা।

৭৫. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব, আর্কাইভ কর্তৃক ৩০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে সংগ্রহীত তথ্য হতে প্রদত্ত।

৭৬. অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, বাংলা পিডিয়া ট্রাস্ট, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় খন্ড, ২০০৩।

৭৭. নরেন্দ্র কুমার গুপ্ত চৌধুরী, 'শ্রীহট্ট- প্রতিভা', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৮, পৃ, ২৫।

৭৮. ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের এক দশক পরে ব্রিটিশ সরকার ভারতে শাসন সংস্কারের জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যার নাম ছিল ১৯১৯ সালের মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইন।

৭৯. সৈয়দ মর্তুজা আলী, 'শ্রীহট্টের ইতিহাস', *বাংলা একাডেম পত্রিকা*, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৮, পৃ, ২৫।

৮০. মোহাম্মদ আলমগীর, *নওয়ার স্যার সলিমুল্লাহর জীবন ও কর্ম এবং ঢাকা নওয়াব এস্টেট*, ঝিঙেফুল, ঢাকা, ২০১৮, পৃ, ২৩৮।

৮১. *ঐ*, পৃ.১৪৪।

৮২. Proceedings of to Legislative Council of Eastern Bengal and Assam, April, 6, 1908.

৮৩. পুরনো নথি, নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত, পৃ, ১৯।

৮৪. F.B. Bradley Birt, *Twelve men of Bengal in the Nineteenth Century*, S.K. Lahiri & Co, Calcutta, 1910, P,111.

৮৫. মাহবুবুর রহমান, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৯৭১)*, বুকস ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৬, পৃ, ২১৪।

৮৬. Nawab Bahadur Abdul Latif, C.I.E.,*A Short Account of my Public Life*, Thacker Spink, Calcutta, 1885, P, 80.

৮৭. F.B. Bradley Birt, *Op.cit*, P, 128.

৮৮. Shamim Firdous, Journal Article, Role of Nawab Abdul Latif in the Development of Modern Education in Colonial Bengal, Vol, 76, Indian History Congress, INU, New Delhi, 2015, P, 506.|

৮৯. K.K. Aziz,*Ameer Ali: The life and Work (1889-1928)*, Publishers United, Lahore, 1968, P, 556-557.

৯০.	De. Amalendu, *Roots of separatism in nineteenth century Bengal*, Ratna Prakashan, Calcutta, 1974, P, 92-93.

৯১.	Report of the Indian Education Commission, 1882, P, 217-24.

৯২.	Syed Ameer Ali, *The life and Teachings of Mohammad*, S.K. Lahiri & Co., Calcutta, 1902, Preface, P.xiv-xv.

৯৩.	Syed Ameer Ali, *Mohammedan law*, Thacker Spink & Co., London, 1917, P,2.

৯৪.	*Ibid*, P, 13-14.

৯৫.	Ibid, P, 243.

৯৬.	শাহজাহান মনির, *বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-ধারা (১৯১৯-১৯৪০)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ, ২৩০।

৯৭.	রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, *রোকেয়া রচনাবলী (১ম খণ্ড)*, অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ, ২০৩।

৯৮.	রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, অনুবাদক, রাত্রী রায়, মতিচুর, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন, ২০১৫, পৃ, ২৮৩।

৯৯.	*সুধাকর*, ২৩ কার্তিক, ১২৯৬

১০০.	*ঐ*, পৃ.৩০৫।

১০১.	*ঐ*, পৃ, ৩১৪।

১০২.	*ঐ*,পৃ, ৩১৪।

১০৩.	*ঐ*, পৃ, ৩৯১।

১০৪.	চট্টগ্রামের অপর নাম 'ইসলামাবাদ'। ইসলামাবাদের অধিবাসী হিসাবে তিনি নামের শেষে 'ইসলামাবাদী, ব্যবহার করতেন। সিরাজগঞ্জের অধিবাসী ইসমাইল হোসেনও নামের শেষে 'সিরাজী' ব্যবহার করতেন। এরূপ 'জৌনপুরী' ' দেওবন্দী'' প্রভৃতির ব্যবহার রয়েছে।

১০৫.	বার্ষিক সওগাত, ১ম বর্ষ, ১৩৩৩।

১০৬.	ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ (১৮৮৫-১৯২১)*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ, ১২৮।

১০৭.	মনিরুজ্জামান ইসলামবাদীর জীবনীর উপর আলোকপাত করে সওগাত পত্রিকা এই লেখাটি লেখেন 'বার্ষিক সওগাত' ১ম বর্ষ, ১৩৩৩।

১০৮.	*মিহির ও সুধাকর*, ৮ পৌষ, ১৩০৬।

১০৯.	*মিহির ও সুধাকর*, ৮ পৌষ, ১৩০৬।

১১০.	ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, '*বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত*', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ, ৬। সেখানে মনিরুজ্জামান ইসলামবাদীকে নিয়ে লেখা হয়েছে, 'মওলানা সাহেব ছিলেন আলেম কিন্তু অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী জ্ঞান বিজ্ঞানের পক্ষপাতী। ...নানা অর্থ কষ্টের মধ্যেও তিনি সাহিত্য সাধনা ও সমাজসেবা করে গিয়েছেন।'

১১১.	*আল এসলাম*, ৩য় ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২৪।

১১২. *ইসলাম প্রচারক*, ৫ম বর্ষ, ৯-১০ সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১০।

১১৩. *ইসলাম প্রচারক*, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩০।৬

১১৪. *মিহির সুধাকর*, ৮ পৌষ, ১৩০৬।

১১৫. *মাসিক সওগাত*, ১ম বর্ষ, ১৩৩৩।

১১৬. *আল এসলাম*, ৩য় ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২৪।

১১৭. *আল এসলাম*, ৫ম বর্ষ, ৯-১০ সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১০।

১১৮. বি.এ. আজাদ ইসলামবাদী (সম্পাদিত), *চট্টগ্রাম স্বরণী*, ১৯৮৭।

১১৯. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮৩১-১৯৩০)*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ, ২৪।

১২০. *মিহির ও সুধাকর*, ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৩০১।

১২১. *দি মুসলমান*, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯২৭।

১২২. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ১৪০।

১২৩. *The Mussalman*, April and May, 1913.

১২৪. CUC Report, Vol, vii.

১২৫. Shahanara Alam and Husniara Huq, ed. Azizul Haque, *A Bigrophical Account of his life sketch and selected writings*, S.Alam & H. Haq, Dhaka, 1984, P, 10.

১২৬. *Ibid* , P, 14.

১২৭. স্যার আজিজুল হক লিখিত History and Problems of Moslem Education in Bengal গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে কলকাতার প্রকাশনা সংস্থা Thanker Spink & Co. থেকে । ১৯৬৯ সালে বাংলায় মুসলিম শিক্ষা সমস্যা শিরোনামে গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন প্রফেসর মুস্তফা নূর-উল-ইসলাম। অনুবাদটি প্রকাশ করে বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।

১২৮. বাংলায় শিক্ষাখাতে ব্যয় সংকোচন শীর্ষক সরকারী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। এ প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক ব্যয় সংকোচনের জন্য শিক্ষাখাতকে কেন্দ্রের হাত থেকে প্রদেশের হাতে ছেড়ে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। এ কমিটির প্রতিবেদনের প্রতিবাদে আজিজুল হক লেখেন Education and Retrenchment নামক পুস্তিকা। এ পুস্তিকায় তিনি উক্ত প্রতিবেদনের যুক্তি জোড়ালোভাবে খন্ডন করে শিক্ষা বিভাগকে কেন্দ্রের হাতে রাখার জন্য বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে।

১২৯. বাংলা ১৩০৬, ইংরেজী ১৮৯৯ সালে আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফকীর আহমেদ এবং মাতার নাম জায়েদা খাতুন।

১৩০. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল রচনাবলী*, প্রথম খন্ড পৃ, ৬১১-৬১৪।

১৩১. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৫-৬।

১৩২. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ, ৮।

১৩৩. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ, ১৫-১৭।

১৩৪. বুদ্ধদেব বসু, নজরুল ইসলাম, *প্রবন্ধ সংকলন*, পৃ, ৯১।

১৩৫. কাজী আবদুল ওদুদ, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, নজরুল ইসলাম, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ, ।৮১-৮২

১৩৬. মুস্তফা নুরউল ইসলাম, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, নজরুল পার্ট প্রসঙ্গে, অন্যপ্রকাশ, একুশের বইমলো, ঢাকা, ২০০৪, পৃ, ১০৯।

১৩৭. কাজী আবদুল ওদুদ কর্তৃক কবির ৪৩ তম জন্মোৎসবে পঠিত প্রবন্ধ, 'নজরুল ইসলাম' - ১৩৪৮ সাল,বাংলা, তার পরের বৎসরেই কবি নজরুল দূরারোগ্য ব্যধিতে ভোগেন। কাজী আবদু ওদুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৯১।

১৩৮. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহকুমার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

১৩৯. মুস্তফা নুরউল ইসলাম, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, *কান্ডারী মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ*, অন্যপ্রকাশ, একুশের বইমেলা, ঢাকা,০০৪, পৃ, ১২৭।

১৪০. ১৩২৪ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর অভিভাষণ, *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, মাঘ, ১৩২৪।

১৪১. শাহজাহান মনির, *বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৯১৯-১৯৪০)*; শহীদুল্লাহ, ইসলামের আদর্শ ও আমাদের আশা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ, ২২৬।

১৪২. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র ১৮৩১-১৯৩০*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ, ১০৫।

১৪৩. খোন্দকার সিরাজুল হক, *ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ঐতিহ্য সাধনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ, ২৮৯।

১৪৪. মুহাম্মদ এনামুল হক ও কবীর চৌধুরী (সম্পাদিত), *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্মারকগ্রন্থ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ, ৪১।

১৪৫. *ঐ*, পৃ, ৭১।

১৪৬. *ঐ*, পৃ, ৭০।

১৪৭. বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, ১৩১০ (অতিরিক্ত সংখ্যা)।

১৪৮. *নবনূর*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১।

১৪৯. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *পুঁথি পরিচিতি*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃ, ২০১।

১৫০. আনিসুজ্জামান, *বিদ্যাসাগর ও অন্যেরা*, অন্যপ্রকাশ, একুশের বইমেলা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ, ৭৩-৭৪।

১৫১. *ঐ*, পৃ,৭৪।

১৫২. মীর মশাররফ হোসেন, *গাজী মিয়াঁর বস্তানী*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ, ২৭৬।

১৫৩. মুনীর চৌধুরী, 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৯।

১৫৪. কাজী আবদুল ওদুদ ২৬ এপ্রিল ১৮৯৪ সালে ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার বাগমারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম কাজী সাঈদ হুসাইন এবং মাতার নাম খোদেজা খাতুন। কাঝী আবদুল ওদুদ ১৯ শে মে ১৯৭০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

১৫৫. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *শিখাসমগ্র (১৯২৭-১৯৩১)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ, ৩৫।

১৫৬. কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৩৭।

১৫৭. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *নির্বাচিত প্রবন্ধ (১৯২৭-১৯৩১)*, মুক্তবুদ্ধির কণ্ঠস্বর, কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ, ১৩৪-১৩৫।

১৫৮. আবদুল হক সম্পাদিত, *কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী*, প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ, ১৪৮।

১৫৯. আবুল হোসেন ১৮৩৬ সালের ৬ই জানুয়ারী যশোরে তার মামারবাড়ি পানিছড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক বাসস্থান যশোরের খুবিয়া গ্রামে। তার পিতা হাজী মুহাম্মদ মুসা ছিলেন একজন চিন্তাবিদ।

১৬০. আবদুল কাদির সম্পাদিত *আবুল হোসেন রচনাবলী*, প্রথম খন্ড, সত্য (১৩৩২), শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৩৮৩, পৃ, ৯।

১৬১. *ঐ*, পৃ, ৩।

১৬২. *ঐ*, পৃ, ৬১।

১৬৩. *ঐ*, পৃ. ৭০।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মধ্যবিত্তশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি

১৮ শ শতকের সূচনা থেকে ‘Albion’s distant shore’[১] পার হয়ে বাণিজ্যস্রোতে ‘Rule Britannia rule the waves’ আঁকা পতাকা উড়িয়ে ধেয়ে আসে শ্বেতাঙ্গ বনিকসংঘ। অনেকের যেমন ধারণা তেমনি সত্যেরও কাছাকাছি যে, তখন বাঙালির জীবন ও সমাজ গ্রন্থিচ্যুত হয়ে পড়েছে, মধ্যযুগের উপান্তভূমিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির চাষ বন্ধ হয়ে গিয়েছে ইত্যাদি নানান কথা। তারপর ইংরেজ শাসনের প্রায় দু’শ বছর ধরে নাগরিক বাঙালি চেতনার এক বিস্ফোরণ শুরু হয়,‘Strum and Drang’-এর মত ঝঞ্জায় বাঙালির সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ক আলোচনায় নবজীবনের বন্যাধারা প্রবলভাবে হানা দেয়।ঐতিহাসিকগণ একেই বলেছেন উনিশ শতকে বাঙালির নবজাগরণ, ইউরোপের নকলে যাকে বলা হয়- The Nineteenth Century Bengali। অবশ্য এই ধোপাকাচা ভদ্রলোক দেশের মৃত্তিকামূলে কতদূর প্রবেশ করেছিল তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এই ‘ফিল্টার ডৌন’ পদ্ধতির বুদ্ধিহীনতা রামাকৈবর্ত হাশিম শেখদের আদৌ স্পর্শ করতে পেরেছিল কিনা সে প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ নাগরিক মধ্যবিত্ত ছাড়া বাংলা শিক্ষিত অথবা বর্ণজ্ঞানহীন বাঙালি সমাজ নব্য ভাবনার দ্বারা কতটুকু উপকৃত হয়েছিল সে বিষয়েও কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়। তবে এটাও সত্য যে, একটি শ্রেণি নব্যযুগের বাড়ুতায় গাঁ ভাসিয়ে মুখে দুটো ইংরেজী বলে মানবমুক্তির স্বাদ নেওয়ার উপযুক্ত দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। তাহলে পাল্টাভাবে একটি প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, এর পূর্বে কি তাহলে বাঙালি মানসের মধ্যে মানবমুক্তির স্বাদ অনুভূত হয় নি কখনও? এসেছিল। তবে সেটা চেতনাকে আলোকিত করে নয়। ভাবা যায় যে ষোড়শ শতকে বাংলার নারীর চিত্র কেমন ছিল। আবার উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থা থেকে বিশ শতকের শেষার্ধে কি তারও ভাল ছিল না, কিংবা একবিংশ শতকে তারও ভাল। ইংরেজরা যখন এদেশে আসে তখন ইউরোপে মোট ৫৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে, তখন বাংলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও নেই।[২]

তাহলে মুক্তি বিশ্ব সমাদৃত ধারায় ছিল না, ছিল এমন অন্ন পেলে, বস্ত্র ও বাসস্থান পেলে সুখে শান্তিতে বাস করা। আধুনিক শিক্ষার আরেকটি ইতিবাচক দিক ছিল স্বনির্ভরতা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাণ্ডার হতে জ্ঞান আহরণের সুযোগ সৃষ্টি। এরপরও পুঁজিবাদ একটি অদৃশ্য মানুষ খেকো ভূত স্বরূপ। এখানে একশ্রেণি অনেক উপরে গিয়ে ধনী হয় আর আরেক শ্রেণি না খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে, কেই তার খোঁজ রাখে না।

আলোচনাটি মানবমনের স্পর্শকাতর স্থানটিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং যুক্তি দিয়ে অনুধাবন করাই বিশেষ প্রয়োজন। ‘আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও মধ্যবিত্তশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি’ বিষয়টির পরিধি ১৮৫৭-১৯৪৭ সালের সীমানা ছাড়িয়েও আজ বর্তমান সময়ের এক তাৎপর্যপূর্ণ উপযোগের সূতিকাগার। কেননা এর মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণির চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের

বিবর্তনের মাত্রা দেখতে পাওয়া যায়। তাই বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনায় ইতিবাচকতা ও নেতিবাচকতার স্বরূপ উদঘাটন যেমন জরুরী তেমনি এর প্রভাবও বাঙালির জীবন ধারার প্রতিটি পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দর্শন তৈরি করবে।

ভারতীয় উপমহাদেশে দুই সম্প্রদায়: হিন্দু-মুসলিম বনাম মুসলিম-হিন্দু:

বাংলায় সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। আর এই সংস্কৃতির সমন্বয় হিন্দু-মুসলমানকে একই ধারায় প্রবাহিত করতে পারেনি। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু আধিপত্য অনেকাংশেই বিস্তৃত। মুসলিমরা শাসন করেছে, হিন্দুর তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করেছিল; তবে বিচারবুদ্ধিতে কিন্তু এগিয়ে যেতে পারে নি। ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাই বলে সেরা হবার লড়াইয়েইসলামের অনুসারীগণ যে অবনমিত হবে না তা কিন্তু নয়। উত্থান-পতন মানব-সভ্যতা এবং ধর্মেরই এক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মূল স্বর কখনও পরিবর্তনীয় নয়– এটা চিরন্তন সত্য। বাংলার স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে বিদেশী মুসলমান, অর্থাৎ আরবী, পারসিক, তুর্কী, ইরানীও আফগান মুসলমানদের বংশধর যে নেই তা নয়; কিন্তু তাঁদের প্রাধান্য বা কৌলিন্য সর্বত্র বজায় আছে কি-না সন্দেহ। আরব-তুরস্ক-পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে বাণিজ্য করার জন্য এদেশে মুসলমান বনিকরা এসেছিলেন, ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য মুসলমান সাধকরাও এসেছিলেন। চেঙ্গিস খাঁর অত্যাচারে আরব, ইরান, তুর্কিস্তান, খোরাসান, ইরাক, আজারবাইজান, খারেজম, রুম প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক মুসলমান ভারতে পালিয়ে আসেন, খোঁড়া তৈমুরের সঙ্গে লুঠতরাজ করতেও আসেন অনেকে। দিল্লীতে সেই সময় তাদেরই বাসস্থানের জন্য অনেক স্বতন্ত্র মহল্লা তৈরি করা হয়। যেমন: আরাদী মহল্লা, খারজমী মহল্লা, দেলেমী মহল্লা, গোরী মহল্লা, চঙ্গেজী মহল্লা, রুমী মহল্লা, সমরকন্দী মহল্লা, কাশগরী মহল্লা ইত্যাদি।[৩]

নবাব বাদশাহদের আমলা আমত্যদের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশী মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের মুসলমানরা আরবী, পারসীক, ইরানী, তুর্কী ও আফগানদের বংশধর নন। উত্তর-পশ্চিম নামান্তের পথে যেসব আক্রমনকারী বা আশ্রয়প্রার্থী বিদেশী মুসলমান উত্তর-ভারতে এসেছিলেন, সমুদ্র পথে যেসব বিদেশী মুসলমান বনিক ও সাধকরা মুসলমান অভিযানের পূর্বে দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন, হিন্দুদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রক্তের সংমিশ্রনের জন্য তাঁদের পক্ষে কুলমর্যাদা রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি। তাঁদের বংশধরদের দেহে হিন্দুর রক্ত মিলেমিশে রয়েছে। কিন্তু তাদের সংখ্যাও ভারতে নগন্য বলা চলে। অর্থাৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। ধর্ম ও ভাবজগতে মুসলমানরা বৈপ্লবিক আদর্শ আনয়ন করলেও একথাটা এখানে পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত যে, মধ্যযুগেও ছিল ধর্মকলহ, বিরোধ চলছিল সমাজজীবনে; আর প্রায়শই তা রূপ পরিগ্রহ করত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের। আমীর-ওমরাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের চেয়ে ধর্মবিরোধের প্রভাব তুলনায় নগন্য বা অল্প নয়।[৪]

ভারতে সনাতন হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির যে সংঘাত দেখা দেয় সে সংগ্রামে ইসলাম জয়ী হয়েছে। কারণ তৎকালীন ভারতে প্রচলিত সামাজিক আদর্শের তুলনায় ইসলামের আদর্শ ছিল অগ্রসর। তবু ইসলামের বিজয় তেমন সুফল বয়ে আনতে পারে নি। যার কারণে দুটি সমাজ পৃথকভাবেই স্ব-স্ব অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। চৈতন্যদেবের আমলে এবং পরবর্তীকালেও হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সংঘাত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চলছিল। এ সংঘাতের বাস্তবচিত্র পাই চৈতন্য পূর্ববর্তী *বিদ্যাপতির*

কীর্তিলতায়, আর সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্য ভাগবতে*। মুসলমান অভিযান হিন্দু সমাজের উপর প্রবল আক্রমনের সূত্রপাত করেছে, এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দু সমাজপতিরা নানা প্রকার মেলবন্ধনের দ্বারা যেমন সমাজে স্থিতিস্থাপকতা আনয়নের চেষ্টা করেছে, সেই রকম মুসলমান স্পর্শ হতে যোজন যোজন দূরে থাকার বিধান দিয়ে বিভেদের প্রাচীর আরও সবল ও কঠিন করে তুলেছে। তারা মানসজগতের আভিজাত্য, সংস্কৃতির আভিজাত্য সংরক্ষণের অন্ধ মোহে সুস্থ নীতিবোধ ও কল্যাণবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে হিন্দুত্বের অচলায়তন আরও দুর্ভেদ্য করেছে এবং মুসলমানকে এ অচলায়তনের জাত শত্রু ভেবে যেন সমঝোতা বা মিলনের কথা চিন্তাও করেনি। বস্তুতহিন্দু-মুসলমান বিরোধ একটি বহু বিতর্কিত প্রশ্ন হিসেবে থেকে গেল। বর্তমানে একটি বহুল প্রচলিত মত হচ্ছে: এ বিরোধ তৃতীয় পক্ষের (অর্থাৎ ইংরেজদের) রাজনৈতক কারণে সৃষ্টি; আসলে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে এক ভারতীয় তথা এক বাঙালি সংস্কৃতি জন্ম দিয়েছে যা এককভাবে হিন্দু সংস্কৃতি নয়; আবার মুসলমান সংস্কৃতিও নয়। এ মতটি শ্রুতিমধুর সন্দেহ নেই। কিন্তু কঠিন সত্য যে, ইতিহাস এরকম মমতাময়ী কাহিনীতে চলমান থাকে না।

এ সম্পর্কে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, মুসলমানেরা মধ্যযুগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত স্থলবিশেষে ১৩০০ হইতে ৭০০ বৎসর হিন্দুর সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিয়াও ঠিক পূর্বের মতোই আছে।...অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানেরা যখন সিন্ধুদেশ জয় করিয়া ভারতে প্রথম বসতিস্থাপন করে তখনও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদগুলি ছিল, সহস্র বৎসর পরেও এক ভাষার প্রার্থক্য ছাড়া ঠিক সেই রকমই ছিল। ...বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে আমাদের দেশে একটি মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে, মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রনের ফলে উভয়ই স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে এবং এমন একটি নতুন সংস্কৃতি গঠিত হইয়াছে যাহা হিন্দু সংস্কৃতি নহে, ইসলামীয় সংস্কৃতি নহে– ভারতীয় সংস্কৃতি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর প্রমুখ এবং শেষভাগে বঙ্গিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়সহ বাংলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নায়কগণ ইহার ঠিক বিপরীত মতই পোষণ করিতেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য এই বিপরীত মতেরই সমর্থন করে। হিন্দু রাজনীতিকেরাই এই নতুন মতের প্রবর্তক ও সমর্থক।...১২০০ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দুধর্ম ও সমাজ যাহা হইয়াছিল, এই দুয়ের তুলনা করিলেই সত্যতা প্রমাণিত হইবে।[৫]

এছাড়াও কে. এম পান্নিকরের একটি উদ্ধৃতি দিলে শ্রী মজুমদারের উদ্ধৃতিটি আরোও উপভোগ্য হবে। তিনি বলেছেন, ভারতে একটি ধর্ম হিসাবে ইসলাম প্রবর্তনের প্রধান সামাজিক ফল দাঁড়ালো, সমাজদেহকে খাড়াভাবে দুভাগে বিভক্তকরণ। তেরো শতকের পূর্বে হিন্দু সমাজে যেসব বিভাজন দেখা দিয়েছিল সেগুলির প্রকৃতি ছিল কতটা আনুভূতিক; তখন বৌদ্ধ ধর্ম বা জৈনধর্ম সমাজদেহে তেমন সর্বাঙ্গীন বিচ্ছিন্নতা ঘটাতে পারে নি। হিন্দুত্ত্বের পক্ষে এসব উপধর্মকে আত্মস্থ করে নেওয়া সম্ভব ছিল এবং কালক্রমে এরা হিন্দুধর্মের পরিধির মধ্যেই যার যার আঞ্চলিক আবাস গড়ে নিয়েছিল। অপরপক্ষে ইসলাম ভারতীয় সমাজকে আপাদমস্তক স্পষ্ট দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলে এবং আজকের দিনের ভাষায় আমাদের নিকট যা দুই জাতি তত্ত্ব বলে পরিচিত হয়েছে, তা সেই প্রথম দিনেই জন্মগ্রহণ করে। এরপর থেকে একই ভিত্তিভূমির উপর দু'টি সমান্তরাল সমাজ

খাড়াভাবে বিভক্ত অবস্থায় বিরাজ করতে থাকে। জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুটি সমাজ আলাদা হয়ে গেল এবং আলাদা আলাদারূপে আত্মপ্রকাশ করল। এ দু'য়ের মধ্যে কোনোরকম সামাজিক সংশ্রব বা জীবনের ক্ষেত্রে আদান-প্রদান থাকল না। অবশ্য হিন্দুত্ব থেকে ইসলাম ধর্মান্তরকরণ অবিরামভাবে চলতে থাকল, কিন্তু সঙ্গে নতুন মতবাদ ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং নতুন প্রতিরোধমূলক নিরাপত্তার মনোভাব উদ্দীপনের ফলে হিন্দু সমাজদেহ উত্তরোত্তর অধিকতর শক্তিশালী হয়ে দেখা দেয়।[৬]

অতএব হিন্দু-মুসলমান বিরোধ মানসিক ব্যাপার মনঃস্তাত্ত্বিক বললে একটু ভাল শুনায়। পরিবর্তনশীল সমাজে পরিবর্তনশীল মানুষের স্বভাবগত কারণে প্রতিদিনই নতুন নতুন ঘটনার সূত্রপাত হয়, যার ফলে সম্পর্কটাও প্রতিদিনের ঘটনার সাথে সাথে দুই সম্প্রদায়ের মনঃজগতে এমনভাবে ক্রিয়া করে যেমনটা হয় চাঁদের আলোতে সমুদ্রে জোয়ার ও ভাটার সৃষ্টির ন্যায়। ইতিহাসসাক্ষী হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক কখনও মিলনাত্মক হতো আবার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কখনও হত বিয়োগান্তক। বহু বহু শতাব্দী হিন্দু ও মুসলমান এদেশে পাশাপাশি বসবাস করেছে এবং একই আকাশের তলে একই মাটির ফসলে ও পানিতে এবং পানির জীব মৎস্যে উদরপূর্তি করে জীবনধারণ করেছে; কিন্তু কখনও তাদের মধ্যে হাঁড়ির ও নাড়ির সম্পর্ক জন্মায়নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সকলের চেয়ে গবীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় বয় না। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত বলে কল্পনা করেন, তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্য যদি অবরুদ্ধ থাকে, তাহলে তাঁদের মিলন কখনওই প্রাণের মিলন হবে না।[৭]

মুসলমানদের পূর্বে গ্রিক, শক, পহ্লব, কুশান, হুন প্রভৃতি জাতি আমাদের পরে আসা হিন্দুদের সাথে মিলে হিন্দুত্ববাদকে বরণ করেছে; কিন্তু তারা নিজেদের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিল যখন কিনা আস্তে আস্তে হিন্দুরা মুসলমান হতে শুরু করেছিল।[৮] ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারীতে এই তথ্যটি প্রকাশিত হয় যে সারা ভারতের মধ্যে কেবলমাত্র বাংলার জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলিম। বিপুল সংখ্যক মুসলমান হয়ে যাওয়া তা কি কেবল ধর্মান্তরকারণেই হয়েছে তা কিন্তু পরিসংখ্যানগতভাবে দেখানো সম্ভব নয় (Census, 189; 111, 147-48)। মোট সংখ্যা বিশ্লেষণ করে মুসলিম জনসংখ্যা অনুধাবন করা সম্ভব।[৯]

১৮৮১ খ্রিঃ বাংলার জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ছিল ১,৭২,৫৪,১২০ জন ও মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ১,৭৮,৬৩,৪১১ জন। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায়: হিন্দু ১,৮০,৬৮,৬৫৫, জন ও মুসলমান ১,৯৫৮২, ৩৪৯৭৯ জন। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে আদমশুমারীতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১,৭১,১২৯৮৫ জন ও মুসলমান ছিল ১,৬৬৮০,৬৪৩ জন। দেখা যাচ্ছে ১৮৭২ থেকে ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যা বেড়েছে ০.৩ ভাগ ও মুসলমান জনসংখ্যা বেড়েছে ৭.১ ভাগ। ১৯ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু জনসংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে ৫ লক্ষ বেশী থাকলেও ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় হিন্দুদের চেয়ে ১৫ লক্ষ বেশি। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারীতে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৭৮,১০,০০০ জন। এই সংখ্যা ছিল ভারতের মুসলিম জনসংখ্যার ৩৫.৪ ভাগ। (Census, 1931, vol.V. part-1)

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় সারা বাংলার মুসলমান সংখ্যা ২৩,৬৫৮,৩৪৭। তার মধ্যে খাস বাংলায় ১৯,৬৭৭,৪৮১ বিহারের ৩,৫০৪,৪৮৭; উড়িষ্যার ৯২,৪৬৮ এবং ছোট নাগপুরে ২,৫৭,৮০৯।

ভারতে মোট মুসলমানের সংখ্যা তখন ছিল ৫ কোটি; যার মধ্যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরেই প্রায় অর্ধেক এবং খাস বাংলা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।[১০]

সারা ভারতের মুসলমানের সংখ্য বৃদ্ধির অনুপাতে বাংলার মুসলমানেরও সংখ্যা বেড়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধর্মান্তরন প্রক্রিয়া উনিশ শতকে কতটুকু সক্রিয় ছিল তা পরিসংখ্যানগতভাবে জানা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই প্রক্রিয়া চলছিল বিক্ষিপ্তভাবে, বিভিন্ন অঞ্চলে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারীতে (Census, 1901, Vol. V. Part, App, II: X-XVI) এই সম্পর্কিত তথ্যাদি বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নবর্ণের হিন্দুরাই প্রধানত ইসলাম ধর্মে বেশী দীক্ষিত হয়। এরা ছিল মুচি, গোয়ালা, বেনিয়া, ধোপা, তেলি, মালি, চামার, কাহার, ভার গেরারী, কুমার, খাওয়া, নাপিত, পাসিম, বাগদা, তিয়ার ইত্যাদি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। মূলত উচ্চবর্ণের তথা রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের মধ্যে তখন যে কঠোরতা ও দৃঢ়তা ছিল তাকে উপেক্ষা করে বা পরাজিত করে হিন্দু সাধারণকে ধর্মান্তরিত করা ইসলামের পক্ষে সম্ভব হয়নি– একথা মানতে হবে। তবে রায়, ঠাকুর, সরকার ব্যতিক্রম ছিল। ১৯০১-এর আদমশুমারীতে যশোরে ১২ জন, ঢাকায় ১৪ জন, ত্রিপুরায় ৪ জন, নোয়াখালীতে ১০ জন ধর্মান্তরিত হিন্দুর বিবরণ পাওয়া যায়। ধর্ম বদল করে সামজে তাদের অবস্থান ছিল ঝুঁকিপূর্ণ।[১১]

নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মূলত বিশেষ মর্যাদা লাভের আশায় (মুসলমানের কাছে) ধর্মান্তরিত হয়েছে।[১২] অর্থাৎ এভাবে কিন্তু ইসলামের আসল জয় হয়নি। অপরদিকে হিন্দুদেরও মূল আশা পূরণ হয়নি। এখানে দুই জাতি নয় বরং দুই সম্প্রদায়ই থেকেছে তৃষ্ণার্ত। তারা বরাবরই একই জাতীয়তার ভিত্তিতে একসাথে থাকলেও স্ব-স্ব পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে দুটি সমান্তরাল রেখার মতো। মূলত ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত ভাগ ছিল সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে; আর ১৯৭১-এ পাকিস্তান ভাগ হয়েছিল জাতিগত কারণে। তাই ধর্মই সমাধান নয়, সংস্কৃতি এবং ভাষাও সমাধান নয়– সমাধান হল স্বার্থগত দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে মানবতার মুক্তিতে। ভারতে আর্য থেকে রূপান্তরিত হয়ে হিন্দু হল। আবার হিন্দুধর্ম যখন উদ্ভব হয় তখন কিন্তু দ্বি-মতবাদের ভিত্তিতে তার শেকড় তৈরি হয়নি। হিন্দু ধর্মের মূলতত্ত্ব হল বহুঈশ্বরবাদ তথা এক এক অসীম ক্ষমতার জন্য এক এক ধরনের ঈশ্বর। ইসলাম ধর্মের অনুসারীগণ এক আল্লাহর উপাসনাহ্ করে। তাহলে ইসলামের মত শান্তির ধর্মই শ্রেষ্ঠ, হানাহানি'ত থাকার কথা নয়। কিন্তু তেমনটি দু'রহ ব্যাপর। ভারতীয় উপমহাদেশে দুই নীতি, দুই ধারায় ইসলাম প্রচার হয়েছে এবং বিকশিত হয়েছে তুমুলভাবে। অভিজাত মুসলমান বলতে যাদেরকে বুঝায় তাদের উদ্ভব আরব, তুর্কী ও ইরানীয় থেকে। আর অনভিজাত মুসলমান যারা, তাদের উদ্ভব সুফী-দরবেশগণের মতবাদ গ্রহণ করে। তাই ভারতে ইসলাম প্রচারকার্য সমাধানই হয়েছে দুই ধারা দ্বি-মতবাদধারী দ্বি-প্রবাহ ধারা থেকে। তাই এক আল্লাহর উপর ঈমান আনতেই যদি দুই ধারা উৎস থেকে প্রচারের বাণী আসে তাহলে এটাও সহজে বোধগম্য যে, ভারতে মুসলমান-মুসলমান মিলন অসম্ভব, দ্বন্দ্ব অনিবার্য। তাইতো ভারতে কোলকাতার হিন্দু ও দিল্লীর হিন্দু স্বার্থের খাতিরে এক হয়ে যেতে পারে; কিন্তু স্বার্থের খাতিরে

পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান এক হতে পারে নি কখনও (এক্ষেত্রে বৃহত্তর স্বার্থের কথা বলা হয়েছে)। অতএব ভারতের পাশাপাশি বাংলায় হিন্দু জাতীয়তাবাদ এক সংস্কৃতিগত পার্থক্য ও দুই ভাষার পার্থক্য থাকলেও তা কখনও সাম্প্রদায়িকতার রূপ পরিগ্রহ করেনি। কিন্তু বৃহত্তর ভারতের বাংলায় মুসলিম জাতীয়তাবাদ এক ও অভিন্ন নয় একথা আজ নৃতত্ত্ববিদ, জাতিতত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদরা সকলেই স্বীকার করেন।[১৩] বিশাদ এই আলোচনার পিছনের উদ্দেশ্যটি হলো– মধ্যবিত্তশ্রেণির যেকোন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে তার নৃ-তাত্ত্বিক, সম্প্রদায়গত ও জাতিগত উৎসের অনুসন্ধান ও পর্যাবেক্ষণ।

মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি, আধুনিক যুগের সূচনা ও বাঙালি মানসে পরিবর্তন প্রবাহ (১৬৬০-১৭৬৫):

১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসন চলছে। মীর জুমলা[১৪] নিজ যোগ্যতা ও প্রতিভাবলে বাংলার সর্বোচ্চ আসনে বসে। সামারিক ক্ষেত্রে মীর জুমলা যথেষ্ঠ কৃতিত্বের দাবী রাখে। মীর জুমলা ঢাকার উত্তরে টঙ্গী ব্রীজ ও পাগলা ব্রীজ সংস্কার করে ঢাকার সাথে সমস্ত বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করেন। যাহোক, মীর জুমলার আমলে শান্তি প্রিয় বাঙালি শান্তিতেই বসবাস করছিল। বাংলার আদিপর্ব হতে শুরু করে মধ্যযুগীয় বাংলায় সমাজের মূল ধারক শক্তি হিসাবে চিহ্নিত ছিল ভূমি। মূলত ভূ-সম্পত্তি ছিল সমাজের প্রায় সকল কাঁচামাল সরবরাহ, জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং এর 'মালিকের' সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও কর্তৃত্ব প্রদর্শনের ভিত্তি।[১৫] পশ্চিম বাংলার তুলনায় সে সময়ে পূর্ববাংলা ছিল অপেক্ষাকৃত সমতল ও নদীবিধৌত। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালে সমগ্র এলাকা পূর্ণ বা আংশিক প্লাবিত হতো। অধিকন্তু জালের মতো বিস্তৃত নদী, খাল ও ঘন জঙ্গলের কারণে যাতায়াত ও সৈন্য পরিবহন ছিল দুরূহ। ফলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো একক গ্রামভিত্তিক চাষ পদ্ধতি পূর্ববাংলায় অনুপস্থিত ছিল।[১৬]

মধ্যবর্তী কৃষক বংশানুক্রমিকভাবেই হোক মনসবদার এবং মজুমদার, চৌধুরী প্রভৃতি আংশিক কর্মকর্তা কিংবা ভূঁইয়ার মতো আঞ্চলিক প্রধান হোক, মুঘলদের ভাষায় তারা 'জমিদার' হিসেবে চিহ্নিত। মূলত সে সময়ে কৃষি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত যেসকল লোক জমির মালিকদের মাধ্যমে অথবা অন্যভাবে রাষ্ট্রের খাজনা পরিশোধ করত তারাই ছিল রায়ত। মুঘল শাসনামলে জমির উপর রায়তদের অধিকার ছিল। এ অধিকার প্রচলিত প্রথাও রীতি-নীতি দ্বারা সংরক্ষিত হতো। মুঘলদের ভূমি ব্যবস্থায় দু'ধরনের রায়ত ছিল। যথা- খুদকাশত (স্থায়ী) ও পাইকাশত (অস্থায়ী) রায়ত। খুদকাশত রায়ত ছিল গ্রামের স্থায়ী আবাসিক চাষী। মুসলিম ও হিন্দু উত্তরাধিকার আইনানুযায়ী তাদের উত্তরাধিকারীরা ভূমিসত্ত্ব লাভ করত। পাইকাশত রায়তরা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে জমিচাষ করতো না।[১৭]

সুবাহ্ বাংলার কৃষি ব্যবস্থা ও সমাজস্থ মানুষদের পেশাভিত্তিক সন্তুষ্টির উপর সুবাদারদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ১৬৬৩ সালে সুবাদার শায়েস্তা খান সুবাদারীর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে বেশ জনপ্রিয়তার সাথে ১৬৮৮ পর্যন্ত দু'বার দায়িত্ব পালন করেন।[১৮] ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দেশতকরা ২ ½ টাকা শুল্ক ও জিজিয়া করের বিনিময়ে ইংরেজরা পুরো মুঘল সাম্রাজ্যে বাণিজ্য করার অধিকার পায়। এভাবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে ব্যবসা করে বিপুল সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু এদেশের শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা ইংরেজ বণিকদের হয়রানি করতে থাকে। অন্যদিকে তখন ইংরেজ বণিকরাও কর ফাঁকি দিতে শুরু করে।

ফলশ্রুতিতেইংরেজ ও শায়েস্তা খানের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। ইংরেজ ও শায়েস্তা খানের দ্বন্দ্বকে ইতিহাসবিদগণ অতীব গুরুত্বের সাথে দেখননি। ইংরেজগণের সাথে দ্বন্দ্ব করে শায়েস্তা খান টিকতে পারেন নি। মূলত তখন থেকেই সমৃদ্ধিশালী বাংলায় ইংরেজগণ অধিপত্য বিস্তারের শেকড় বিস্তার করতে থাকে। বাংলার আপামর সহজ-সরল অথচ অলস প্রকৃতির মানুষগুলি একটি সাংগঠনিক মধ্যবিত্তশ্রেণির অভাবে এধরনের পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীর রাজনীতি ধরতে পারেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অর্থাৎ ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক মুর্শীদকুলী খান বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে বাংলায় আসেন। ১৭১৭ তে সুবাদারী পদ প্রাপ্ত হয়ে তিনি বাংলায় ঐতিহাসিক শাসন পক্রিয়া পরিচালনার বন্দোবস্ত করেন। এ প্রসঙ্গে স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, “The Land revenue system taken over by the English was in its main features the creation of Murshid Quikhan”[১৯]

মুর্শিদকুলী খানের[২০] প্রবর্তিত সুষ্ঠ ব্যবস্থাই মূলত পরবর্তীকালে লর্ড কর্নওয়ালিশ বহুলাংশে গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত করেন।[২১] বাংলার ইতিহাসে নবাবী আমলের সূচনা এই মুর্শিদকুলী খানই করেন। যাহোক, অবশেষে শুরু হল বিখ্যাত নবাবী আমল। আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাটগণ ছিল দুর্বল, তাদের একমাত্র লোভ ছিল বাংলা থেকে প্রেরিত অর্থের প্রতি। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে মুর্শিদকুলী খান স্বাধীনভাবে নবাবী আমলের সূচনা করেন। এই নবাবী আমল পরবর্তীতে বাংলার ইতিহাসে প্রথমবার নাটকীয় মোড় তৈরি করে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল মধ্যযুগীয় বাংলায় সমাজ কাঠামোর অসম পরিবর্তন। তখন নবাবদের অধীনস্থ সমাজ ব্যবস্থায় তিনটি শ্রেণি গড়ে উঠে। নবাব ও নবাব পরিবার, অভিজাত শ্রেণি, জায়গীরদার এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল প্রথম শ্রেণি। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছিল জমিদার, তালুকদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, কুটির শিল্পের মালিক ও বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ। আর সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, শিল্পী ও কারিগরদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল তৃতীয় শ্রেণি।[২২]

১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে সুজা খান প্রবর্তিত জমা-তুমারী-তাশখিস (সংশোধিত রাজস্ব তালিকা) মুর্শিদকুলীর রাজস্ব বন্দোবস্তকে স্থায়ী করে ৬১৫টি পরগনা এবং ত্রিপুরা নিয়ে বিস্তৃত সুবাহ বাংলার অধিকাংশ এলাকাকে ১৫টি বৃহৎ জমিদারিতে বিভক্ত করে। এই জমিদারিগুলির দেয়া খাজনা ছিল পঁয়ষট্টি লক্ষ রুপি– যা ছিল সুবাহ বাংলার বার্ষিক খাজনার প্রায় অর্ধেক। বাকী পরগনাগুলি ক্ষুদ্র জমিদার ও তালুকদারদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। আঠারো শতকে আয়তন ও দেয়া খাজনার পরিমানের ভিত্তিতে বংশানুক্রমিক জমিদারি একটি বিশিষ্ট শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়।[২৩] ১৭৪০ খ্রি: সরফরাজ খানকে উৎখাত করে আলীবর্দী খানকে ক্ষমতায় বসাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার শ্রেণি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।[২৪]

নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার শ্রেণি ঢুকে পড়ে বাংলার বিশেষ সেই স্থানটিতে, যেখানে রয়েছে অর্থ-কড়ির মেশিন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনে আরোহনের পর তার বিচলিত শাসন ব্যবস্থায় ত্রিমুখী ক্ষমতার একটি মিলন সম্পন্ন হয়;যার পরিণতি হয় ১৭৫৭ খ্রি: পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের জয় ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন। নবাবী আমলের পতন হল; এবং সেই সাথে ইতি ঘটল মধ্যযুগের। আধুনিক যুগ শুরু হল ইংরেজ বানিয়ানদের হাত ধরে। পুরাতন খোলস ফেলে

আধুনিক আবরনের দিকে হাত বাড়াতে লাগল বাঙালি সমাজ। এভাবে ১৭৫৭-এর পর অবিভক্ত বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা ইংরেজগণ প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় তদুপরী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নের সুযোগ পুরোপুরি নিয়ে নিল। বাংলার ধন-প্রাচুর্যে ইংরেজ বানিয়ান ঢুকে পড়েছিল অনেক আগেই। তবে তারা সর্বময় ক্ষমতায় ছিলেন না। অবশেষে ১৭৬৫ সালে রবার্ট ক্লাইভ অর্জন করে নিল এই দেওয়ানি যন্ত্র। মুসলমানদের পরাজয়ের ফলে পুরো বাংলা মুহূর্তেই অচেনা হতে থাকল। বাঙালিদের মধ্যে যারা মুসলমান তারা অচেনা হতে থাকলেও হিন্দুরা যেতে থাকল সোজা পথে। ১৭৫৭ সালে পর ১৭৬৫-তে দেওয়ানি, ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙালি সমাজে পরিবর্তন ও আধুনিকতার প্রথম যে কুফল অর্থাৎ বাংলার তৎসময়ে কী অবস্থা ছিল তা একটু দেখা প্রয়োজন। ১৭৭০ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ– যার ভয়াবহতা বড় বড় ট্রাজেডিকেও হার মানায়। এই দুর্ভিক্ষ সমস্ত বাংলাকেই প্রায় শ্মশানে পরিণত করে ফেলেছিল, তা সত্য। এই ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষের চিত্র জন'শোর তার একটি কবিতায় জীবন্তরূপে এঁকেছেন:[২৫]

> “Still fresh in memory’s eye the scence I view,
>
> The shrivelled limbs, sunk eyes, and lifeless hue;
>
> Still hear the mother’s shrieks and infant’s moans.
>
> .. ..
>
> .. ..
>
> Dire scencs of horror, which no pen can trace,
>
> Nor rolling years from memory’s page efface.”

এই দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে করুন ফল ভোগ করেছিল বাংলার কৃষককূল। কৃষকদের তিনভাগের একভাগ পুরোপুরিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাছাড়াও বাঙালি সমাজ হারাল পুরাতন অভিজাতশ্রেণি।[২৬]

ইংরেজগণ ক্ষমতায় যাওয়ার পর যদি বাংলার অবস্থা হয় এত দুর্বিষহ তাহলে তাদের প্রতি নিশ্চয়ই বাঙালি তথা ভারতবাসীর ভাল দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কথা নয়। কিন্তু এমনটি মোটেও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি; কেননা ইংরেজগণ ছিল অমীমাংসীত বিষয়ে মীমাংসা সাধনে পটিয়সী। যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ ধরে ইংরেজরা এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল, এই প্রক্রিয়ার প্রভাব ইংরেজ শাসনের চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। প্রথম দিকে শাসনকার্য প্রধানত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়িক স্বার্থে পরিচালিত হতো। সে সময়ের ইংরেজ শাসকরা সরকার পরিচালনার ব্যাপরটিকে প্রয়োজনীয় ঝামেলা বলে মনে করত নেহাতই কোম্পানী তার ব্যবসায়িক আধিপত্য ধরে রাখবে বলে এই বিষয়টি সংরক্ষণ করত। আর যে কারণে সরকার পরিচালনার প্রক্রিয়াকে ইংরেজরা স্বল্প পরিধিতে সীমাবদ্ধ রাখত। কেবল রাজস্ব আদায় এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ছিল সরকারের মূল দায়িত্ব।[২৭] এমনকি বিচারকার্য চালানোর ক্ষেত্রে কোম্পানি এদেশে ইংল্যান্ডের আইন ব্যবস্থা প্রচলন করতে আগ্রহ দেখায় নি।

সরকারের কোন অবিবেচক কর্মকাণ্ডের ফলে এদেশের জনগণের মধ্যে যদি ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয় তাহলে এদেশে অবস্থানরত মুষ্টিমেয় ইংরেজদের জাতীয় ঐতিহ্যের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল আপোষপ্রবনতা; তাদের ব্যবসায়িক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ ক্ষুন্ন না হওয়া পর্যন্ত তারা কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতো না। ইংরেজদের বিচক্ষনতা ঠিক এইভাবেই তাদেরকে জলমগ্ন বাংলায় আধিপাত্যতা বিস্তারে সাহায্য করেছিল। ইংরেজ ও ভারতীয়দের পক্ষে অবশ্য পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং নিশ্ছিদ্র ভাবজগতে অবস্থান করা সম্ভব ছিল না। ব্যবসা ও প্রশাসন সংক্রান্ত কাজকর্মের মাধ্যমে যোগাযোগের ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বাংলাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারিত পরিবর্তন ছিল অবধারিত।

বাংলার দুঃখী মানুষ ও তাদের চিন্তা-চেতনার পরিধিঃ

বাংলার চিত্র কেমন? উত্তরটি হল– নদী ঘেরা, গাছ-গাছালিতে ভরা বিরাট বিরাট ধানের জমিতে ভরপুর একটি দেশ। নৌকায় ধান বোঝাই করে কৃষক হাঁটে ধান বিক্রি করতে যাচ্ছে; কিন্তু আকাশ কালো করে বৃষ্টি পড়া শুরু, এমতবস্থায় পলিথিন মাথায় করে কৃষক এগিয়ে যায়। সে একটু এবার বেশীই সাহসী। বাড়ী ফিরে দেওড়িতে বসে হুক্কা টেনে বৃষ্টির অবিরাম শব্দের সাথে তাল মেলাতে মেলাতে রূপকথার গল্প করে, পুঁথি শুনে, এক সময় ছেঁড়া কাঁথার নিচে নোংরা বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। তার কাছে দেশ-জাতির ভাবনা নিতান্ত অবান্তর। সে ভাবে কিভাবে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে বেঁচে থাকা যায়। বিখ্যাত পর্যটক র‍্যালফ ফিচ বুকানন[২৮] পল্লী বাংলার দৈন্যদশার একটি চেনা চিত্র অঙ্কন করেছেন। তার লেখার পাদপিঠ ছিল দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চল। জীবন চিত্র ঠিক এইরকম, অর্ধ-উলঙ্গ দরিদ্রের সংসার, সেখানে গৃহস্থালীর আসবাব কয়েকটি মাটির বাসন, দা- বটি-ঘটি ও কাঁথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আবুল ফয়েজ বর্ণিত পণ্যমূল্যের তালিকায় একখানা সূতিকাপড়ের দাম মাত্র চার আনা। তবুও দরিদ্র চাষিরা নেংটি পরে ও কাঁথা গায়ে দিনযাপন করত।[২৯]

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় *মধ্যযুগে বাঙলা* গ্রন্থে বলেছেন, সেকালে টাকায় পাঁচ মনের কম চাউল কোনোকালেই বিক্রয় হয়নি; কখনও কখনও টাকায় সাত মন বিক্রি হয়েছে। যেমন নওয়াব শায়েস্তা খান (১৬৮৬ খ্রিঃ), নওয়াব সরফরাজ খানের (১৭৩৯ খ্রিঃ) আমলে। কিন্তু বিস্মিত হলে চলবেনা, সেকালে সাধারণ শ্রমজীবীর দৈনিক মঞ্জুরী ছিল চার পয়সারও কম। সুতরাং তাদের পক্ষে অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা এখনকার চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না। আবার এরই মধ্যে হত চরম দুর্ভিক্ষ। শস্য-সুজলা, সুফলা দেশের দুর্ভিক্ষ কান্না হয়ে ঝরে পড়ে। কোন সংস্কার নেই, পরিবর্তন নেই। এটিই যেন বাংলার বহমান চিত্র। এরপরও আরও ভয়াবহ অবস্থায় বাংলা দাড়ায় গিয়ে কামরূপী দস্যুদের কাঠগড়ায়। মুঘল সম্রাট আকবারের সময় হতে শায়েস্তা খান পর্যন্ত আরাকানের মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুরা বাংলা, বিশেষ করে পূর্ব বাংলা লুণ্ঠন করত। এই দস্যুরা হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলকেই বন্দী করে হাতের পাতা ছিদ্র করে সরু বেত প্রবেশ করিয়ে বাঁধত এবং একজনের উপর আরেক জনকে চাপিয়ে জাহাজের পাঠাতনে ফেলে রাখত। পাখিকে যেভাবে আহার দেয় বন্দীদেরকে তারা সেভাবে

চাউল ছিটিয়ে আহার দিত। দস্যুতার দাপট ও হিংস্র এই রূপ চলছিল ১৭৪২ সাল পর্যন্ত।[৩০] তখন সমস্ত বাংলায় মারাঠী বর্গীর অত্যাচর ছিল শির্ষে। তারা লুণ্ঠন করত, বীভৎস অত্যাচার চালাত।[৩১]

বাংলার অভাবী গ্রামের মায়েরা শিশু সন্তান নিয়ে রাতে ঘুমাতে পারত না কখন বর্গী আসে এই ভয়ে। তাইতো সেই ছড়াগানটি রচিত হল–

খোকা ঘুমালো পড়া জুড়ালো,

বর্গী এলো দেশে,

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে,

খাজনা দেবো কিসে!

পল্লী বাজারের বড় বড় মিষ্টির দোকানের মালিক, কৃষিজপণ্য যেমনঃ সার, কীটনাশক, ধানের বীজ কিংবা অন্যান্য ফসলের বীজের দোকান মালিক, ডিলার, বিস্তর ধানের জমির মালিক তারা ছিল পল্লীর সচ্ছল পরিবারের প্রতিভূ।তাদের ঘরে অন্ন ছিল, বস্ত্র ছিল অপ্রতুল বরং দরিদ্র বিশ-পঁচিশজনও যদি প্রতিবেলা তাদের খায়-ফরমাশ শেষে খাবার খেত তারপরও তাদের কমত না। তাদের ঘরে মুন্সি-মাস্টার থাকতে পারত। তবে দস্যু ও লুণ্ঠনের স্বীকার কিন্তু তারাও হত। কিন্তুসচ্ছলতার কারণে তারা সেই শোক কাটিয়ে উঠতে পারত। পল্লীর আরও একটু সচ্ছল বনিক-কারিগরদের জীবনচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, এই বনিকগণ পুরো একটি বাজার নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাদের আধিপত্য এতই প্রতাপশালী ছিল যে, ইংরেজ বণিকরাও তাদেরকে সমীহ করে চলত। মূলত তারা বণিকরাজ হিসেবে পরিচিত ছিল। দক্ষিণ ভারতের চেয়ে উত্তর ভারতে এই ধরনের বনিকরাজ বেশি ছিল।[৩২] পর্যটক ম্যানরিখ তাদের সম্পর্কে বলেন, "তাদের গৃহে এত মুদ্রা সঞ্চিত থাকত যে, সাধারণ চোখে শস্যের পাহাড়ের মতো মনে হতো।"[৩৩] তবে সমাজস্থ দরিদ্রদের প্রতি তাদের অত ভালবাসা ছিল না। যদি থাকত তাহলে হতভাগ্যদের দুঃখ এক দিনের জন্য হলেও কমত। কারিগর শ্রেণি সম্পর্কে পিরার্ড এর উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য। পিরার্ড বাংলার কারিগরদের ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, "পুরুষ স্ত্রীলোক সূতি ও রেশমি সূতা কর্তনে, বস্ত্র বয়নে, সূচীকার্যে এতো সূক্ষ্মভাবে নিপুন যে, তাদের নির্মিত শিল্পের চেয়ে উন্নততর কাজ আমি অন্য কোথাও দেখি নি।"[৩৪]

বাংলার বিখ্যাত বস্ত্র যেমনঃ মসলিন, ফুলতোলা, জামদানি, মখমল প্রভৃতি। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বাঙলায় প্রবেশ করেনি বলে প্রচণ্ড দাপটের সাথে এইসব কারিগর যেমন নিজেদের কর্ম সম্পাদন করতেন, তেমনি নিস্তারও পেতেন না। তাদের আকাশচুম্বী চাহিদদার জন্য তারা বিখ্যাত এবং একই সাথে সচ্ছলও ছিল। কুটির শিল্পে জড়িত সম্প্রদায় মূলত স্ব-স্ব কুটিতে কাজ করত। কুটিয়ালরা পাইকার ও দালাল মারফত শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করা ও কারিগরশ্রেণিকে দাদন দিত। পর্যটক পিটার মুন্ডি ১৬৩২ সালে গঙ্গারাম নামক একজন দালালের বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন, মাসে দু'তিন হাজার টাকা দাদন দিয়ে

মাল কেনা যায়, কিন্তু দাদন দিয়ে কারিগরদের কুটির থেকে সংগ্রহ করে কাপড় বাজারে ছাড়তে চল্লিশ-পঞ্চাশ দিন সময় লেগে যায়।[৩৫]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে খুব স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায় যে, ঠিক কী কী অসুবিধার কারণে মধ্যযুগে ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণি ও কারিগর শ্রেণির সমবায়ে যথেষ্ঠ সুযোগ থাকলে বাংলায় একটি সুসংবদ্ধ মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে উঠতে পারে নি। যার ফলে বিকারগ্রস্থ হয়েছে সে সময়ে দেশের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্র। আর গরীব শ্রেণি পরিবর্তনের ছোয়া না পেয়ে গরীবই থেকেছে, আর না হয় বিলীন হয়ে পড়েছে। কেউ খোঁজ রাখেনি কিংবা স্বজীবনের কাছে তাদের কোন দায়ই ছিল না। তাহলে সেখানে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি (যে কোন বিষয়ে) কিভাবে আশা করা যায়।

বাঙালির আধুনিকতাঃ

পুরনোদের বিদায়, তবে গ্রহণ আর নতুনকে আনো। খাঁটি আধুনিকতা কি এই সূত্রই মেনে চলে? একটু আলোচনা প্রয়োজন। আধুনিকতার সুর বাংলায় প্রথম যখন বেজেছিল সেটা যে মুসলমানদের মধ্যে থেকে উত্থিত হয় নি তা সবারই জানা। তবে বাঙালি হিন্দুগণ এই আধুনিকতায় কিভাবে মেতেছিল তা দেখা প্রয়োজন। ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতির মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য নিয়ে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান ব্রিটিশ আমলে প্রবেশ করে, বাঙালির ইতিহাসে তাই আধুনিক যুগ।[৩৬] ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যেও দায়িত্বে থাকাকালীন শিক্ষা সম্পর্কে যেসব রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে দেখা যায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রায় ব্যর্থ হতে চলেছে। যদুনাথ সরকার আরও দেখিয়েছেন আই.সি.এস এবং তার সহযোগী পরীক্ষাগুলিতে বাঙালির ব্যর্থতার করুন রূপ।[৩৭] তাই ইংরেজী বাদ দিয়ে চলা অসম্ভব। তবে সবাই যে ভালো মানের ইংরেজী শিখেছে কিংবা আধুনিক থেকেছে তাও কিন্তু নয়। বস্তুত যারা গতানুগতিক অবস্থা হতে পরিবর্তন চেয়েছেন, তারাই ইংরেজী শিখেছেন এবং এ শ্রেণিই উন্নত জীবনমান গ্রহণ করে আধুনিকতার দিকে ঝুকে পড়েছেন। এখানে আধুনিকতার বিষয়টি কিছুটা মনঃস্তাত্ত্বিক, আর ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ জীবন-জীবিকার পাথেয় অর্জনের জন্য অত্যাবশক। তবে বৈচিত্র্য পৃথিবীর বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর বেলায় শিক্ষা গ্রহণ করা যদি কখনও কখনও আপেক্ষিক হয়ে থাকে তবে বাংলা তথা ভারতের দু'টি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও ইংরেজী শিক্ষা ক্ষেত্র বিশেষে আপেক্ষিক। আর তাইতো আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর মধ্যবিত্তশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক না নেতিবাচক তা সম্পূর্ণ সময়ের বাস্তবতা ও মননের উপর নির্ভর করে। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের ভিত্তিতে যেমন বাঙালির আধুনিকতা ফুটে উঠে তেমনি পাশ্চাত্য বা ইংরেজী ঢংগে জীবন-যাপনেও আধুনিকতার ছাপ পড়ে। নিম্নোক্ত উদাহরণের মধ্যে দিয়ে বাঙালির আধুনিকতা ফুটে উঠে– সকলের নাস্তায় বা জল-খাবারে বাঙালি মূলত পান্তা কিংবা গরম ভাত খেত, সেই বাঙালির জল-খাবারের টেবিল সাজে পাউরুটি, জেলি ও মাখনে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংরেজদের তিনটি জিনিস পছন্দ করতেন তন্মধ্যে পাউরুটি একটি।[৩৮]

আধুনিকতার ছোঁয়া যে লেগেছে তা বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে উনিশ শতকের এ্যারিস্টোক্র্যাসি থকে স্পষ্ট। যেমন: বাঙালি মন-মানসিকতা। তারা ইংরেজদের রুচিশীল সাজসজ্জায় নিজেকে আবৃত করন। দাঁতের জন্য ঐতিহ্যবাহী কালো নিমের মাজনের স্থানে আধুনিক নানারকম অ্যারোমাসমৃদ্ধ পেস্ট, চুলের যত্নে কন্ডিশনার শ্যাম্পু আর তার সাথে সাবান। নারী-পুরুষ উভয়ের চুলে এসেছে বিভিন্ন ধরনের 'কাট', যাকে বলা হয় হেয়ার কাট।

পিতারা তাদের সন্তানদের জন্মদিনের উৎসবে চালের পায়েসের পরিবর্তে দিত বিলেতী ঘরনার 'কেক'। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিদ্যাপিঠে পড়ার সাথে সাথে ইংরেজীতে পারদর্শিতা অর্জন করতে না পারলে চাকুরী মিলবে না সত্য কিন্তু ইংরেজী বিদ্যাকে প্রয়োজনের জন্য বেশি বড় মনে না করে সমাজে নাম ফুটানোর জন্য ইংরেজদের দৃষ্টিতে ভাল থাকার জন্য কিছু অসচেতন পিতা-মাতা উনিশ ও বিশ শতকে একটু বেশি; এমনকি আজও আছে তবে সাম্যবস্থায়, সন্তানের মুখ থেকে বাংলা বুলি প্রায় কেড়েই নিয়েছিল। তারা ইংরেজীটাও ঠিক ভাল করে রপ্ত করাতে পারতো না। এ নিয়ে একটি প্রান্তিক উদাহরণ রয়েছে। 'অসুস্থ ছেলে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে water, water বলে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করছে। কিন্তু বাড়িতে কথাটির মানে বুঝবে কে? যা হবার তা হল। মৃত ছেলের দিকে তাকিয়ে মা চিৎকার করে কাঁদছেন 'কী পড়া পাড়াইলাম তোরে, হট্রার হট্রার করি প্রাণ দিলি?'[৩৯] এভাবে পরিবারে হঠাৎ করে ইংরেজী জানা ও বলার করুন পরিণতিময় আরও উদাহরণ বাঙালি সমাজে খুঁজে পাওয়া যায়। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে ইংরেজীকে খাটো করা। একবিংশ শতকের ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলগুলোতে 'মামার বাড়ি ও খুকুমনির ছড়া' সরে গিয়ে স্থান পেয়েছে একান্তভাবে 'বা বা ব্লাকশিপ ও হিকড়ি-বিকরি' ডগ- মন্দ নয় তবে 'মামার বাড়ি ও খুকুমনি ছড়া'[৪০] বাদ দিলে হবে সেই হট্টার ও ওয়াটার এরই মতন ভয়াবহ কিছু। হাজারও হোক দেশ বাংলা, কথা বাংলা, ভাষা ও জাতীয়তা বাঙালি, তাইতো শেকড় ছাড়তে মানা। আধুনিকতার আরেকটি বিশেষ উদাহরণ কিন্তু 'কুকুর পোষা'। উনিশ ও বিশ শতকে কুকুর পোষা যে আধুনিক হওয়া কিংবা এলিট হওয়া কিংবা হঠাৎ একটি গাড়ি হলো, বাড়ি হলো সেসব প্রকাশের একটি চিহ্নই কিন্তু বিদেশী কুকুর, সেই কুকুরের গলায় রশি থাকবে অনেক দামী ঘন্টা থাকবে, টমি বলে ডাকলে লেজ নাড়াতে নাড়াতে দৌড়ে কাছে আসবে আর সবাই তাকিয়ে দেখবে আধুনিকতা কিভাবে বেগবান হচ্ছে, তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ভারতীতে* (১২৮৬)[৪১] লক্ষ্য করা যায়। তিনি ইংরেজদের আদব-কায়দা নিয়ে যে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তাতে দেখতে পাওয়া যায়- কীভাবে চলতে হবে, কাকে কীভাবে সম্মান জানাতে হবে, আনন্দ প্রকাশের ধারণাটা কী রকম হবে, শোকের বার্তা কীভাবে গ্রহণ করতে হবে। সঙ্গে যদি কুকুর থাকে তবে তাকে নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। আপনার কুকুর নিমন্ত্রনকর্ত্রীর পোষা বেড়ালটিকে বিরক্ত করতে পারে।

উপরের আলোচনাটি মূলত শহরের বাঙালি পরিবারের আধুনিকতার কিছু ছাপ চিত্র। গ্রামে যেসব হিন্দু পরিবার থাকত তারা অর্থের অভাবে বুদ্ধির অভাবে অতটা আধুনিকতা দেখাতে পারত না। আধুনিক বাঙালি মুসলিমদের কথায় যদি যাওয়া যায় তাহলে সেখানে অতটা বৈচিত্র্য চিহ্ন দেখা যায় না।[৪২] আর তার কারণটিও সবার জানা। ইংরেজীয়ানা ছিল তাদের জন্য ঘৃণার বিষয়। তাই ইংরেজদের দেখলেই মুসলমানদের মনে হতো- এইতো তারা, যারা আজ আমাদেরকে আসন থেকে সরিয়ে

নিজেরাই আসন পেতে বসে আছে স্যুট-প্যান্ট পরে। আর সেই স্যুট-প্যান্ট পরা আমাদের জন্য অপমান। মহান আল্লাহপাক যেন আমাদেরকে এই পাপ হতে রক্ষা করেন। তবে এটাও ঠিক যে মুসলিমরা এই প্রতিজ্ঞা বেশিদিন মনে ধরে রাখতে পারেনি। তাদেরকে জীবিকার তাগিদে সাড়া দিতে হয়েছে আধুনিক ইংরেজদের প্রতি। মুসলমানদের ঘরে একটি বেতার যন্ত্র, বিকেল বেলায় মুড়ি-খৈয়ের সাথে আম-কাঠাল মেঁখে খাওয়ার পরিবর্তে এসেছিল পেয়ালা ভর্তি চা ও বিস্কুট। আরেকটি বিষয় আধুনিকতার স্পর্শে মুসলিম পরিবারে এসেছে– যেমন: চেয়ার, চার-পায়ের একটি টেবিল, চৌকির পরিবর্তে খাট। এক সময় ছিল যখন মুসলিম সন্তানদের জন্মদিন কখনওই পালিত হত না। পরবর্তীতে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মধ্যবিত্ত নয় বরং উচ্চবিত্ত মুসলিম পরিবার, যারা ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন তাদের জন্মদিন পালিত হতো।[৪৩] যাহোক ইংরেজ আমল কিংবা বৃটিশ আমল মুসলিমগণ বিদ্যা-শিক্ষার অভাবে (বাঙালি), অর্থের অভাবে নিজেদের রূচিবোধ ততটা প্রকাশের সুযোগ পান নি। তাই হিন্দু সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণির অস্তিত্বের চেয়ে মুসলিম সমাজের মধ্যবিত্তশ্রেণির অস্তিত্ব অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

কলিকাতাকেন্দ্রিক জীবনবোধ ও বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির মনন চর্চার বিকাশ:

১৮৩০-এর দশকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন এবং সরাসরি প্রতিষ্ঠানে অধিক হারে দেশীয় লোকদের নিয়োগনীতির মাধ্যমে একটি প্রশাসনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে।[৪৪] অপরদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠানের বাইরেও নৌ পরিবহন, অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য, অর্থকারী ফসলের বাজার, বড় বড় দোকানের মালিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মহাজন, জোতদার, কতিপয় ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ ঘটে।[৪৫]

মহানগরে যাও, মুক্তি পাবে, উন্নতি হবে। বাংলার বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষও এই মর্মে যাত্রা শুরু করল কলিকাতায়।[৪৬] অষ্টাদশ শতকের শোষার্ধে ও উনিশ শতকের অবিভক্ত বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ প্রশাসন কতগুলো প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করে। এগুলির মধ্যে ইংরেজী ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে প্রচলণ করা, ভূমি সংস্কার, রেলপথ স্থাপন এবং শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। এই পদক্ষেপগুলি বাঙালির জন্য সুফল বয়ে আনে। এই পদক্ষেপগুলি যে সুফল বয়ে আনে তার প্রমাণ হল কর্মময় বিচিত্র মানুষের সময়ে নব্য মধ্যবিত্তশ্রেণির গঠন। সমাজ বৈচিত্রময় হতে শুরু করল তখনই, যখন মানুষজন মহানগর অভিমুখে যাত্রা শুরু করল। তখন একদিকে যেমন গ্রাম ভাঙ্গতে শুরু হল; অপরদিকে আবার শহর বাড়তে শুরু করল। তবে গ্রাম যে জনমানবশূণ্য হয়ে পড়েছিল তা কিন্তু নয়; বরং গ্রামও তাকে ভারসাম্যতা প্রদানের জন্য পরিবর্তন হতে শুরু করল। নব্য এই যে মধ্যবিত্তশ্রেণি সমাজ রূপান্তরের ফলে সৃষ্ট।এই শ্রেণি সম্পর্কে কলিকাতার বঙ্গদূত পত্রিকায় প্রথমে আলোকপাত করা হয়। ১৮২৯ সালের ১৩ জুন পত্রিকাটি লিখে– ‘যে লোক পূর্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তারা উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিনে দিনে দীনের হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহার দিগের বাস্তবদিক প্রকাশ পাইতেছে।[৪৭]

রেলপথ ও যানবাহনের প্রসারের ফলে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষ সংহত ও কেন্দ্রীভূত হয়। শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের প্রতিযোগিতায় কারুশিল্প ও কুটিরশিল্প উৎখাত হয়ে যায়। কারুশিল্পী ও কারিগরেরা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে নি। সামান্য পুঁজিতে তাদের লাভের চেয়ে লোকসান যখন বেড়ে যাচ্ছিল তখনই তারা ঐ মন্ত্র যপলেন–

মহানগরে যাও

মুক্তি পাবে

উন্নতি হবে। [৪৮]

আর তারাই পরবর্তীতে বণিক ও ধনিক শ্রেণির অধীনে বেতনভূক মঞ্জুরীশ্রেণিতে পরিণত হতে থাকে।[৪৯] প্রাচীন মধ্যযুগীয় 'কোর্ট টাউন' গুলির জাঁকজমক ক্রমে ম্লান হতে থাকে, শিল্প ও যানবাহন কেন্দ্রে যে নতুন মহানগর বা শিল্প নগরী গড়ে উঠে সেই দিকেই যাত্রা শুরু হয় পিপাসার্ত মানুষের। তৎকালীন কোট টাউন আমেদাবাদ, সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- 'আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম, চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছন ফেলা বড়ো- ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলি যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নিচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল ক্ষুধিত পাষাণ-এর গল্পের।[৫০]

> নতুন যুগের স্বর্গপুরী হল শিল্পনগর, শহর ও মহানগর। মহানগরেই দেশ-বিদেশের লোক সমাগম হয়। মহানগরেই থাকে কাজকর্মের অফুরন্ত সুযোগ-সুবিধা। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, চাকুরী মোসাহেবী সবকিছুর পীঠস্থান মহানগর। তাই মহানগর অভিমুখেই থাকে ধন-সম্পদ ও মুনাফা বৃদ্ধিতে লাভে আগ্রহী বণিক ও ধনিকদের অনিমেষ যাত্রা। সুযোগ সন্ধানী ভাগ্যান্বেষী মধ্যবিত্তরা ভাগ্যবান হবার আশায় আর হতভাগ্য ভূমিহীন নিঃস্ব কৃষক ও কারিগরেরা দিনমজুরির আশায় ভীড় করে মহানগরে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, কানপুর, জামসেদপুর প্রভৃতি নতুন যুগের শিল্পনগর,শহর ও মহানগরের দ্রুত বিকাশ হয়, জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপে নগর পরিকল্পনার পরিবর্তন শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যেসব শিল্পনগর গড়ে উঠেছিল সেগুলিকেই চালর্স ডিকেন্স তাঁর *হার্ড টাইমস* গ্রন্থে 'কেক টাউন' বলে বর্ণনা করেছেন। শিল্প নগর নিয়ে যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, তিনি বলেছেন-
>
> '১৮২০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে নতুন শক্তি ও সঙ্গতি নিয়ে যেসব শহর গড়ে উঠল সেগুলি ঠিক যেন যুদ্ধক্ষেত্রের মতন। শক্তি ও সঙ্গতি অনুযায়ী তাদের বিকাশ হল। শিল্পপতি ব্যাংকার ও নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবকরাই হলেন নতুন শহরের হর্তাকর্তা, বিধাতা।
>
> ... .
> . . . . আর এই নতুন নগরীর অর্থনৈতিক স্তম্ভ হল কয়লাখনি, লোহা অর স্টীম ইঞ্জিন।[৫১]

এবার কলিকাতা নগরীর কথায় আসা যাক। শ্রমশিল্পের যুগে বাংলার ঐতিহাসিক গুরুত্বহনকারী রাজধানী কলিকাতা। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কলিকাতার দুর্নিবার অগ্রগতি মানে বাংলার অগ্রগতি তাই সবার জানা। নতুন যুগের ঐতিহাসিক নবজাগরণের নেতৃত্ব এবং অর্থনৈতিক প্রাধান্য নিঃসন্দেহে কলিকাতার, তাই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নবজাগৃতির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব বাংলার। [৫২] কোম্পানির আমলের প্রথম যুগের 'মার্কেন্টাইল হাউস' ও 'এজেন্সি হাউসগুলি' কলিকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় বেশি। [৫৩]

ব্রিটিশ মার্কেন্টাইল হাউসের সংখ্যা (১৮৩৭ সাল পর্যন্ত)[৫৪]

নগরী	হাউস সংখ্যা
কলিকাতা	৬২
বোম্বাই	১৭
সিঙ্গাপুর	১৫
মাদ্রাজ	১০
পেনাঙ	২
ক্যান্টন	২১

সূত্রঃ J. Crawford, *Sketch of the Commercial Resources, Monetary and Mercantile System of British India*, Crawford Colvin & Company Limited, London, 1837, P. 27

কলিকাতা নগরী গড়ে তোলা অত সহজসাধ্য কাজ ছিল না। স্বয়ং উইলিয়াম হান্টার বলেছেন, বাণিজ্যের বিরাট কেন্দ্র কলিকাতা ঐতিহাসিক তাগিদে গড়ে উঠে, কোন সেচ্ছাচারী শাসকের খামখেয়ালে নয়। এই গড়ে তোলার দায়িত্ব রীতিমত কঠিন, এত কটিন যে আমাদের আগে পর্তুগীজ, ডাচ ও ফরাসী সকলেই ভারতবর্ষে এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। একমাত্র আমরা ইংরেজাই সর্বপ্রথম সফল হয়েছি। আমরা হিন্দুদের মত মন্দির অথবা মুসলমানদের মত প্রাসাদ, মসজিদ আর কারখানা নির্মাণের দিকে নজর দিইনি, মারাঠীদের মত দুর্গ কিংবা পর্তুগীজদের মত গির্জাও গড়িনি। আমরা এসেছি আধুনিক নগর নির্মাণের জন্য। একাজে আমাদের যোগ্যতা ও প্রতিভা যে অতুলনীয় তা আধুনিক শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্রে আমাদের মহানগর নির্মাণের সাফল্যে প্রমাণিত হয়। আমাদের মহানগর নির্মাণের অসাধারণ প্রতিভা ছিল বলেই ভারতবর্ষে নতুন শ্রম-শিল্প যুগের সূচনা হয়েছে।[৫৫]

উইলিয়াম হান্টারের কথায় উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, কলিকাতাকে ঘিরে নিম্নে ইংরেজদের চেষ্টা ছিল আকাশচুম্বী। তারা নিজেদের আধিপত্যের স্বার্থে এই নগর গড়ে তুললেও বাঙালিরা এর থেকে জীবনের জন্য এক নতুন দিগন্তের ঠিকানা খুঁজে

নিতে সক্ষম হয়েছিল। তবে নতুন ঠিকানার সূত্রটি হিন্দুগণ যেভাবে আতস্থ করতে পেরেছিল মুসলিমরা সেভাবে পারে নি। মানসিক শান্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে সময়ের কাছে থেকে সুযোগ বেড়ে নেওয়ার মধ্যে অন্যায়ের কিছু থাকতে পারে না। তবে এই কলিকাতা নগর-এর গর্ভে কেমন শক্তিশালী বাঙালি কিংবা ভারতীয় উত্তরাধিকার জন্ম নিয়েছিল সেটা বড় বিষয়। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের বাস কলিকাতায় হলেওইংরেজদের বিশেষ সাপোর্টে সেখানে আধিপত্য টিকে ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণির। এই সাপোর্টই এক সময় নব্য মধ্যবিত্তশ্রেণিকে লেজুড় বিশেষ হিসেবে তৈরি করে ফেলেছিল।[৫৬] পরবর্তীতে এই নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিভিন্ন কার্যকলাপে সমাজে তা চিহ্নিত হয়েছে। আজকের আলোচনাটি ঠিক এই বিতর্কিত অবস্থানটিকে ঘিরেই সমাধানের রাস্তা খুঁজে নেবে। অস্বাস্থ্যকর ক্যালকাটা নিয়ে *বেঙ্গল জার্নাল* অভিযোগ করে আর ক্যালকাটা গেজেট এই অভিযোগ অস্বীকার করে।[৫৭]

অভিযোগটি ছিল এই রকম– স্থান হিসাবে কলিকাতা মোটেও স্বাস্থ্যকর ছিল না। ম্যালেরিয়ার প্রকাপ ছিল সাংঘাতিক, নদী তীরগুলি পশু আর মানুষের মৃতদেহে পূর্ণ। ১৭০৫ পর্যন্ত শহরে ডাক্তার মাত্র একজন, আর হাসপাতালের কোন চিহ্ন ১৭০৭ পর্যন্ত কলিকাতায় ছিল না। ১৭৬৯ পর্যন্ত পয়ঃপ্রনালীগুলি ছিল উন্মুক্ত। ১৮২৬ সালেও কলেজ স্কোয়ারের আশ-পাশে ছিল চোর-ডাকাতের আড্ডা। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বৃটিশ ভারতের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃত হয়।[৫৮] যাহোক, তবুও কলিকাতায় সুযোগসন্ধানী যারা, তারা 'দেওয়ানি বা মুচ্ছদ্দিগিরি কর্ম' করে পয়সা কামাতে লাগল।[৫৯]

[এরাই কলিকাতার হঠাৎ নবাবের দল। এরা ঘটা করে শ্রাদ্ধ করত, লক্ষ টাকা খরচ করে বেড়ালের বিয়ে দিত, বাঙালি বিদায় করত, দূর্গাপূজায় বাই নাচাত। এই মুচ্ছুদ্দিগিরি পাবার জন্য সেকালে লোকে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত উৎকোচ দিতে ইতস্তত করত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ নবকৃষ্ণ বা মধাব দত্তের নাম উল্লেখ করা যায়।]

এই পয়সা নিয়ে তারা আবার গ্রামে-গঞ্জে জমিদারী কিনে নব্য জমিদারীর খাতায় নাম তুলতে সক্ষম হয়। একদিকে গ্রাম থেকে টাকা আসত, অপরদিকে শহর থেকে তা নিয়ে রঙ্গরসে দিন কাটাত সেই 'বাবু'। ইংরেজদের সৃষ্ট আজব শহর কলিকাতা ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে জন্মলাভ করে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্রিটিশদের ভারত সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক স্নায়ুকেন্দ্র ছিল এই কলিকাতা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির তীর্থভূমি। সব মিলিয়ে ইংরেজদের আশীর্বাদ ও অভিশাপের সংমিশ্রণ এই কলিকাতা।[৬০] ইংরেজদের আশির্বাদ ও অভিশাপে সৃষ্ট বাবুরা ছিল অসম্ভব ক্ষমতাধর, প্রতাপান্বিত, অনবরত পণ্ডিত বেষ্টিত, অপূর্ব পোশাকে আবৃত হয়ে পালকি করে ঘুরে বেড়াত, কর্মস্থলেও পালকি করেই যেত। আবার সন্ধ্যার সময় রুচিপূর্ণ বিলাস-ব্যসনে, কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে লাখ লাখ টাকা খরচ করত। এভাবে তারা অকতরে অনুপার্জিত ধন ব্যয় করত।[৬১]

হিন্দু মধ্যবিত্তরাই মূলত কলিকাতায় নতুন সংস্কৃতির পত্তন করে। হিন্দু মধ্যবিত্ত এই শ্রেণিটি ইংরেজদের অনুকরণে দ্বৈতায়িক চরিত্রে প্রকাশ পায়। একটি চরিত্র সমাজকে করে কলংকিত আর একটি চরিত্র সমাজ থেকে দুর করে সব আবর্জনা, অন্ধকার ও পাপকে। বৃটিশ আমলে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির হীন চরিত্রের দিকাটিকে উন্মোচিত করে তার প্রকৃত একটি পরিচয় পাওয়া যায়।

'তৎকালে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে এবং পরস্ত্রীগমন নিন্দিত বা বিশেষ পাপজনক না থাকাতে প্রায় সকল আমলা, উকিল, মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত।...পূর্বে গ্রিকদেশে যেমন পণ্ডিত সকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন, সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল... সন্ধ্যার পর দেড়প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পূর্ণ থাকিত। বিশেষত পূর্বোপলক্ষে লোকের সেখানে স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, তেমনি বিজয়ার রাত্রিতে বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।[৬২] নতুন মনিবরা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিকে 'বাবু' নামে সম্মোধন করত। তিনি যতই ইউরোপীয় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হোন এবং বিলেত ফেরতই হোন, তিনি বাবু (আমলাতন্ত্র কাভেনান্টড আকুর 'মিস্টার', বাকী সব 'বাবু কিংবা মওলবী')।

আলোচ্য এই মধ্যবিত্ত বাবুরা ছিল অল্প শিক্ষিত। আরেক শ্রেণির গোড়া বাবু ছিল মোটামুটি শিক্ষিত ও ইংরেজ অফিসে হৌলে চাকুরী করত। তাদের চরিত্রে আবার ছিল জাত খোয়ানোর ভয় ও তজ্জনিত আচরণে অসঙ্গতি। তারা রামের ভারত যেমন চাইত তেমনি ইংরেজদেরকে তুষ্ট করার জন্য তাদের বড়দিনের উৎসবেও যোগ দিত। তবে সর্বদাই তারা বাবু বাবু হয়ে থাকত। অপরদিকে যারা হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করত এবং ইয়ংবেঙ্গল নামে পরিচিত ছিল তাদের আচরণ ছিল একেবারে উগ্র। তারা হিন্দু ধর্মকে যেমন ত্যাগ করেছে তেমনি আবার খ্রিষ্টান ধর্মের পিছনেও যুক্তি খুঁজে বেরিয়েছে। এবার মুসলিমদের আলোচনায় যাওয়া যাক। মুসলমান সম্প্রদায় হতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয় নি। ১৭৯৩ সালের পর হতে শুরু হয়েছিল মুসলিম সমাজের ক্রমান্বয়িক পতন। মুসলমানের জমিদারীগুলির বৃদ্ধিত ছিলই না, উপরন্তু উত্তরাধিকারী আইনের ফলে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ফলে এককালের জমিদার কয়েক পুরুষের ব্যবধানে ভূমি-কৃষকে পরিণত হয়।[৬৩]

এছাড়াও ১৮২৮ সালের নিষ্করজমি বাজেয়াপ্ত আইন, ১৮৩৫ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত আইন, ১৮৩৭ সালের রাজভাষার পরিবর্তন, ১৮৪৪ সালের নতুন চাকুরীতে নিয়োগ পদ্ধতির প্রবর্তন- পরপর এইসব নিয়মের ফলে মুসলমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যায়।[৬৪] এতে অনেক শিক্ষক, মৌলবী, মুন্শী জীবিকা হারান ও চরম দারিদ্রের মধ্যে পতিত হন। যার ফলে সন্তানদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার অর্থও তাদের ছিল না। ফলাফল যেটা হল– মুসলিম শূণ্য মহানগর, নিষ্ক্রিয় মুসলিম অবস্থান এবং কলিকাতা। মুসলিমদের নিষ্ক্রিয় এই অবস্থা চলছিল প্রায় ১৮৮০ পর্যন্ত।[৬৫] কলিকাতায় যখন বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির (হিন্দু) ত্রি-মুখী দৌড় তখন সেখানে হিন্দু মধ্যবিত্তের এই ত্রি-অবস্থানকে টেক্কা দেওয়ার আর কেউ রইল না। ইংরেজদের সর্বোচ্চ স্বার্থের জন্যই এমনটি হয়েছিল তা পুরোপুরি ঠিক নয়। এখানে হিন্দুদের এক ধরণের আধিপত্যতাবাদের চিন্তা যেমন ছিল তেমনি দীর্ঘসময় ধরে মুসলমান শাসকদের অধীনে হিন্দুস্থানকে দেখে তাদের মধ্যে মুসলিম হতে নিস্কৃতির একটি আবেদন ছিল; তদুপরি মুসলিমরা পরাজয়কে টপকিয়ে পরবর্তী অবস্থাকে মেনে নিতে সম্পূর্ণ নারাজ ছিল।

এই সময়ে কলিকাতা শহরের মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামে এক শ্রেণির মানুষ যারা ছিল তারা ফারসি ও স্বল্প ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাহীন হয়ে পড়ে। ভোগ ও সুখ ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনের নেশা। ভ্রূ-মুখর পার্শ্বে

ও নেত্রকেনে নৈশ অত্যাচারের চিহ্ন স্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাবরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে বালাপেড়ে ঋৃতি অঙ্গে উৎকৃষ্ঠ মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনটকরা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগলস সম্বলিত চিনে বাড়ির জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমায় আর রাত্রে বারঙ্গনাদের আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করে কাঠায়। বীনা ও সেতার সুরে তাদের রজনী পার হয়, তারাই কলিকাতার বাবু।[৬৬]

বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির অর্থনৈতিক বুনিয়াদ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল।[৬৭] আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির যখন উত্থান ও বিকাশ পর্ব চলমান তখন জাতি আশা করতে পারে মধ্যবিত্তশ্রেণি ইংরেজদের ভাষা বুঝে, দুঃখীর দুঃখ তারা ঘুচাবে, অত্যাচারিত নির্যাতিত কৃষক-প্রজার পাশে তারা দাঁড়াবে। তাদের হয়ে দু'টি কথা সরকারকে বলে তাদের ন্যায্য দাবিগুলি আদায় করবে। কিন্তু উনিশ শতকের শুরু থেকে কী হলো বাংলায় ? মধ্যযুগের স্বার্থপরতার সমাজ পার হয়ে আধুনিক যুগের বাংলায় কৃষককুলের কোন পরিবর্তনই হলো না। অত্যাচার হতে যদি মুক্তিই পাওয়া না যায় তাহলে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণত ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু এই ভাবনা তৎসময়ে কাররও মধ্যেই ছিল না। তবে তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকায় ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দূরাবস্থার উপর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৬৮] এই প্রবন্ধগুলির ভাষা তৎকালীন হলেও উনিশ শতকের বাংলায় কৃষক জীবনের যে চিত্র সেগুলিতে পাওয়া যায় তার সাথে আমাদের সমসাময়িক কৃষকজীবনের চিত্রের আশ্চর্য সাদ্রশ্য আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী পর্যায়ে বাংলার কৃষকদের অবস্থা জমিদার, পওনিদার, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি উৎপীড়কদের নির্যাতনের ফলে কোন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে তা স্পষ্ট হয়:

"যে রক্ষক সেই ভক্ষক, এ প্রবাদ বুঝি বাঙলার ভূ-স্বামীদিগের ব্যবস্থার দৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবেক। ভূস্বামী স্বাধিকারে অধিষ্ঠান করিলে প্রজারা এক দিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; কি জানি কখন কি উৎপাত ঘটে ইহা ভাবিয়াই তাহারা সর্বদাই শঙ্কিত। তিনি কি কেবল নির্দিষ্ট হয়েন? তিনি ছলে-বলে-কৌশলে তাহাদিগের যথাসর্বস্ব হরণে একগ্রচিত্তে প্রতিজ্ঞারুঢ় থাকেন। তাহাদিগের দারিদ্রদশা, শীর্নশলীর, ম্লান বদন, অতি মলিন তীর বসন, কিছুতেই তাঁহার পাষাণময় হৃদয় আর্দ্র করিতে পারে না, কিছুতেই তাঁহার কঠোর নেত্রের বারি বিন্দু-বিনির্গত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি ন্যায্য রাজস্ব ভিন্ন বাটা যথাললে অনাদায়ি রাজস্বে নিয়মাতিরিক্ত বৃদ্ধি, বাটার বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, আগমনি, পার্বনি, হিসাবানা প্রভৃতি অশেষ প্রকার উপলক্ষ্য করিয়া ক্রমাগতই প্রজা নিপীড়ন করিতে থাকেন। অনেক ভূ-স্বামী অনাদায়ি ধনের চতুর্থাংশ বৃদ্ধি স্বরূপে গ্রহণ করেন। ইহার অপেক্ষা অনর্থমূলক ব্যাপার আর কি আছে? ইহাতে তাহাদের সর্বনাশের সূত্র সঞ্চার হয়। তারাদিগকে যাতনাযন্ত্রে পেষণ করা হয়। ভূ-স্বামীর ভবনে বিবাহ, আদ্যকৃত, দেবোৎসব বা প্রকরন্তর পূণ্য ক্রিয়া ও উৎসব ব্যাপার উপস্থিত হইলে প্রজাদের অনর্থপাত উপস্থিত। তাহাদিগকে ইহার সমুদয় বা অধিকাংশ ব্যয় সম্পন্ন করিতে হয়। ইহা মাঙ্গন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তিনি মাঙ্গন অর্থাৎ ভিক্ষা উপলক্ষ করিয়া বলপূর্বক অপহরণ করেন, ভিক্ষুক নাম গ্রহণ করিয়া দস্যু-বৃত্তি সাধন করেন। যে বৎসর দুই-তিনবার এই রূপ ভিক্ষা না হয়, সে বৎসরই নয়। রাজস্ব সঙ্কলনের ন্যায় ইহাও নির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে সংগৃহীত হয় এবং তৎপরিশোধে বিঞ্চিৎমাত্র ক্রটি জন্মিলেও প্রজাদিগকে অতিশয় অনুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হয়।[৬৯]

পুরাতন জমিদারদের পরিবর্তে যারা নতুন জমিদার অর্থাৎ নব্য জমিদার। তারা অধিকাংশই ছিল কলিকাতা শহরকেন্দ্রিক বানিয়ান, দালাল, ব্যবসায়ী। শহরে বসবাস করার ফলে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে নিয়মিতভাবে তারা রাজস্ব আদায় করতে পারতো না। এই খাজনা আদায়ের প্রয়োজনে তারাই নতুন সৃষ্টি করে আরেক নতুন মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির। এই শ্রেণিটিকে সরকারও স্বীকার করে নিলো এবং তারা জমিদারের মোট প্রাপ্যের উপর নিজেদের অতিরিক্ত প্রাপ্য কৃষকদের থেকে আদায় করতে গিয়ে তাদেরকে সর্বস্বান্ত করে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিলো। এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ 'সাময়িকপত্রে বাঙলার সমাজচিত্রের' ভূমিকায় লিখেছেন- জমিদারদের পরবর্তীস্তরে পওনিদার, দর-পওনিদার গাঁতিদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগী ক্ষুদে জমিদার শ্রেণিতে পরিণত হলেন। হেস্টিংসের আমলে ১৭৭২ সালে বড় বড় জমিদার ও জমিদারীর সংখ্যা একশতের খুব বেশী ছিল না। কিন্তু তারপর চিরস্থায়ীত্ব ও মধ্যস্বত্বের ফলে ১৮৭২ সালের মধ্যে জমিদারীর সংখ্যা বেড়ে দেড় লক্ষ্যের বেশি হল। এর মধ্যে ৫৩৩টি হল বড় জমিদারী; যা ২০০০০ একরের উপর, ১৫৭০৭টি জমিদারী হল ৫০০-২০০০০ একরের মধ্যে এবং ৫০০ একর ও তার কম জমিদারীর সংখ্যা হল ১৩৭৯২০ টি। এই ক্ষুদে জমিদারীর সংখ্যা বৃদ্ধি থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের উৎপাতের আধিক্য অনুমান করা যায়।[৭০]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রং বে রং এর মধ্যস্বত্বভোগী শোষকরা যে কী কী রকমের শাস্তি দিত তার কয়েকটি নমুনা প্রকাশ করে। যেমন: দণ্ডাঘাত, বেত্রাঘাত, বাঁশ ও কাঠ দিয়ে বক্ষ্যস্থল দলন, গায়ে বিছুটি দেওয়া, চুনের ঘরে বন্ধ করে রাখা, কারারুদ্ধ করে উপোস রাখা ইত্যাদি আরও হরেক রকম কৃষক নিযার্তন। এভাবে দেখা যাচ্ছে আধুনিক যুগে বাংলার কৃষকদের দূর্গতি ও তার রেখাচিত্র। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শহরের মধ্যবিত্তদেরই পরিচালনায় প্রকাশিত হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা-বিচারে মধ্যবিত্তশ্রেণি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেন নি, তারা শহর-নগরের দৃশ্যমান জৌলুস বজায় রাখতে গিয়ে গ্রামের সমস্যা গ্রামেই তালাবদ্ধ করে রেখে দিতে সাচ্ছন্দ মনে করতেন। দেখা যাচ্ছে কলিকাতার মধ্যবিত্তশ্রেণি এক্ষেত্রে সামাজিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের অবমান, দুঃখীর দুঃখ, কৃষকের করুন অত্যাচারিত জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উৎপক্ষিত মন নিয়ে যেমন চলতেন তেমন নির্যাতনও করতেন স্বয়ং নিজেরাই। তৎসময়ের সমাজে কোলকাতা নগরীর পাশাপাশি অন্যান্য নগর-শহরের মধ্যবিত্তশ্রেণির আধুনিক মানসের ঠিক এইরকমই চিত্র পাওয়া যায়। তাই এইরকম নেতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যবিত্তশ্রেণি যা কিনা আধুনিক শিক্ষার ফল তাই তা কখনও অন্যান্য বাঙালি মানসের আইডল হতে পারে না। এই সেই কলিকাতা যে নগরী যেমন নেতিবাচক মধ্যবিত্তশ্রেণির জন্ম দিয়েছে তেমনি দিয়েছে ইতিবাচক মধ্যবিত্তশ্রেণি সমাজের জন্য। এখন তাদেরকে নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। পাশ্চাত্য চিন্তাধারা এমূল্যবোধ বাঙালির জীবন ও মানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়।

ইংরেজদের প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি যেমন বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন উৎসকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় ঠিক তদ্রুপ কারণ হেতু তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও সমাজের নানা স্তরে নানান রকম আঙ্গিকে প্রকাশ পায়। যেমন আধুনিক বাংলার জনক রাজা রামমোহন রায় এর দৃষ্টিভঙ্গি একরকম, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কও, রঘুমনি বিদ্যাভূষণ, গোপীমোহন ঠাকুর,

গোপীমোহন দেব, রামদুলাল দে তাদের আবার একরকম। আবার দেখা গিয়েছে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক যারা ছিল ডিরোজিওর ঘনিষ্ঠ মতানুসারী তাদের একরকম। তাছাড়াও কিছু কিছু সময় গুরুতর রক্ষনশীল মতবাদের চিন্তকও বিপ্লী চিন্তা তৈরী করতে চেয়েছিলেন, যেমনঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির রকমভেদঃ

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের কথা। চতুস্পাটিতে সীমাবদ্ধ বাঙালির শিক্ষা ব্যবস্থার কথা। গুরু মশায়ের ভয়ে একটি ছেলে খেজুর গাছে ওঠে পড়েছিল, তাকে নামাবার জন্য অন্যরা হঠাৎ মারতে লাগলে সে নিরুপায় হয়ে অতি কাতরস্বরে বলে, ‘হে ঈশ্বর। যদি তুমি খেজুরের কাঁঠায় আমার চোখ দুইটি অন্ধ করিয়া দাও, তবে আমায় আর পাঠশালায় যাইতে হয় না।’[৭১]

ঠিক এইরকম অবস্থায় পাশ্চাত্য শিক্ষা কিছু সংখ্যক বাঙালির কাছে নতুন অর্থ বহর করে আনল। ইংরেজী শিক্ষালাভের জন্য সর্বত্র দেখা দিল এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা। হেয়ার সাহেবের পালকির সঙ্গে ঐ শিক্ষালাভের সুযোগের আশায় ছেলেরা দৌড়াতে আরম্ভ করল। ডাফের পালকির দরজা খুলে ছেলেরা কতরকণ্ঠে ইংরেজী শিক্ষালাভের প্রার্থনা জানাতে লাগল।[৭২]

অভিভাবকরাও তাদের সন্তানদিদেরকে ইংরেজী শিক্ষার শিক্ষিত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কেননা ইংরেজী শিখলে সরকারি চাকুরী পাবার সম্ভাবনা থাকে। ইংরেজী আবশ্যিক শিক্ষা বিষয় না হওয়া সত্ত্বেও, সংস্কৃত কলেজের ৯১ জন ছাত্রের মধ্যে ৪০ জন ইংরেজী শিখত। অর্থাৎ প্রাচ্যধারার শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্ররা পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণে ছিল আগ্রহী। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং তার জন্য উন্মাদনা মূলত ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গুরুতরভাবে এবং ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যথাক্রমে কলিকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চল এবং পরে প্রায় পুরো বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। তবে এক্ষেত্রে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাই ছিল বেশি।[৭৩]

১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের একটি কমিটির কথায় যাওয়া যাক। হিন্দু কলেজের মূল কমিটির ৩০ জন সদস্যের মধ্যে হাইড ইস্ট হলেন সভাপতি। বাকী ২৮ জনের মধ্যে ৮ জন ইউরোপীয় সদস্যের কথা বাদ দিলে, বাকী ২০ জনই ছিল রক্ষণশীল হিন্দু, বিত্তের খ্যাতিতে তারা ভরপুর। এই ২০ জন দেশীয় সদস্য হলেন চতুর্ভুজ ন্যায়সূত্রী, সুব্রহ্মমহেশ শাস্ত্রী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রঘুমনি বিদ্যাভূষণ, গোপীমোহন ঠাকুর, পুরিমোহন ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামরতন মল্লিক, কালী শঙ্কর ঘোষাল।[৭৪]

এইসব বিত্তবান রক্ষণশীলের দল দেশীয় রীতিনীতি ও আদর্শে সম্পূর্ণ আস্থাবান হয়েও পাশ্চাত্য তথা আধুনিক শিক্ষাধারাকে স্বাগত জানিয়েছিল। আগামীদিনের প্রজন্ম বার্তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও জীবন-যাপনের পথকে সুগম করার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা নিজেদের আধিপত্যবাদ বিস্তারের স্বচিহ্নিত ধারাকে প্রশমিত রাখতে তারা যথেষ্ঠ ছিল অগ্রণী। এক্ষেত্রে ইংরেজ সাহায্য তাদের জন্য ছিল আশীর্বাদ। কিন্তু এইসব রক্ষণশীল ঘরনার হিন্দুগণের সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গিতে কখনও তেমন বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। চিরাচরিত ধর্ম ও সামাজিক আচার-বিচারকে তারা গলদহীন বলে মনে করত। বহিরাগত কোন কিছুকে

ভীতি ও সন্দেহের চোখে দেখত। ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন সভ্যতা থেকে যতটুকু পারত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে নিজের জাতকে বাঁচিয়ে রাখাই ছিল এই শ্রেণির বৈশিষ্ট্য। তাঁরা 'ম্লেচ্ছ' ,'অদৃশ্যতা', বা অহিন্দুর কোন প্রকার সংস্পর্শ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলত।[৭৫] এভাবেই রক্ষণশীল এই মধ্যবিত্তরা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর স্বতন্ত্র রাজ্যের মতো ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও নিজেদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থানকে ধরে রেখেই এগিয়ে চলছিল। তাই তৎসময়ে এই বিশেষ মধ্যবিত্তশ্রেণিটির জন্য হিন্দু সমাজের কিছু পরিবর্তন ও সংস্কার সম্ভব হলেও মূল সনাতনী ও রক্ষণশীল চরিত্রের মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন আসে নি। উনিশ শতকে রক্ষণশীল, সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল রাধাকান্ত দেব।

শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত খৃষ্টান মিশনারী পত্রিকা রাধাকাণ্ডের রক্ষণশীল ধর্মমতকে সমর্থন না করলেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিল এই বলে যে, "উচ্চ শ্রেণীভূক্ত এবং প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে যে গুণাবলী পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হল বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর বিশদ পরিচিতি, উদার মনোভাব এবং ইউরোপীয় জ্ঞান অর্জনের প্রতি গভীর উৎসাহ। রাধাকান্ত দেব ১৮১৮ সালে হিন্দু কলেজের পরিচালক হয়েছিলেন। রাধাকান্ত দেব কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সচিব হিসাবে বিদ্যমান স্কুলসমূহের মান উন্নয়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে শোভাবাজারে অবস্থিত তার নিজস্ব বাসভবনে স্কুলের পরীক্ষা নিতেন।[৭৬] রাধাকান্দ দেব সব সময় হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য, বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাতেন।[৭৭]

সেসময় সামাজিক উদাসীন ও কুসংস্কারের জন্য স্ত্রী শিক্ষা ছিল অত্যন্ত অবহেলিত, সেই সময় রাধাকান্ত মেয়েদের শিক্ষাকে সমর্থন করতেন। সেকালের একজন রক্ষণশীল হিন্দু পন্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের সহযোগিতায় ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে "স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক" নামে একটি পুস্তিকা রচনা করে, যেখানে স্ত্রী শিক্ষাকে জোড়ালোভাবে সমর্থন করা হয়। তবে রাধাকান্ত এইখানে তার সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির কাছে হেরে গেলেন, কেননা স্ত্রী শিক্ষাকে তিনি জোড়ালোভাবে সমর্থন করলেও মেয়েদেরকে স্কুল পাঠানোর পক্ষে তিনি সমর্থন জ্ঞাপন করেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন মেয়েদেরকে ঘরে কিংবা প্রতিবেশির কোন ঘরে কড়া নজরে রেখে পড়াতে হবে।[৭৮]

হিন্দু নারী কিংবা অপরাপর ধর্মীয় নারীই হোক, তাদের সম্পর্কে তাঁর যে অনুদার ও গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তা কিন্তু মোটেও প্রশংসনীয় নয়; বরং তা ছিল অভিশাপ। তার নিজের পরিবারে সে সময় সতীদাহ প্রথার প্রচরণ ছিল না অথচ তিনি হিন্দু সমাজে এ প্রথা বহাল রাখার জন্য, তার সপক্ষে এগিয়ে এসেছিলেন যখন সরকার আইন করে সতিদাহ প্রথা বন্ধ করতে চেয়েছিল তখন তিনি ইংরেজের ঘোর সমর্থক হয়েও রক্ষণশীল প্রথাটি রক্ষা করার পক্ষে হিন্দু সমাজকে একত্রিত করার চেষ্টা করেন।[৭৯]

এই পরোক্ষ উল্লেখ করা হয়েছিল যে সময় পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের হিন্দুদের চিরাচরিত প্রথার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার নীতির পরিপ্রেক্ষিতে। যেহেতু স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ছিল প্রতিটি সহমরণের ঘটনায় উপস্থিত থেকে লক্ষ্য করা যেন কোনো বিধবাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সতী করার চেষ্টা করা না হয়। তার ফলে

একটা ভ্রান্ত ধারণা অনেকের মনে জন্মেছিল যে সরকার সতিদাহ প্রথাকে রক্ষা করছে। রাধাকান্তদেব ও রক্ষণশীল হিন্দুরা যখন দেখল তারা সতীদাহ প্রথা আন্দোলন করেও রক্ষা করতে পারল না তখন তারা ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 'ধর্মসভা' নামে একটি সংস্থা স্থাপিত করে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন দিক হতে বিভিন্ন ধরনের আক্রমণকে প্রতিহত করা এবং সেই সাথে সামাজিক চলমান প্রথা রক্ষার্থে সে ধরনের পন্থাগুলি অবমন করা হবে তার স্বপক্ষে জনমত জাগ্রত করা। জেনে রাখা দরকার যে, এই ধর্ম সভা অচিরেই কলিকাতার হিন্দুদের (রক্ষণশীল) সবচেয়ে বড় বিত্তশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৮০]

আর এই দলের প্রধান মুখপত্র ছিল বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'; যার সম্পাদক ছিলেন ধর্মসভার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।[৮১] এছাড়া তৎসময়ের 'সংবাদ প্রভাকর', 'সংবাদ রত্নাকর' প্রভৃতি ছিল রক্ষণশীল মতাদর্শীদের যোগ্য পীঠস্থান।[৮২] হিন্দু সমাজে শত শত মানুষের ভীড়েও রক্ষণশীল গোড়া মধ্যবিত্ত এই শ্রেণির মানুষগুলি রামের হিন্দুস্থান [৮৩] গড়ে তোলার তাগিদে একই সম্প্রদায়ে যে নিখুত সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটান তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। উদাহরণটি ঠিক এইরকম, সমাচার দর্পনে মজার ঘটনায় উল্লেখিত মথুরনাথ মল্লিক ছিলেন সেকালের একজন প্রভাবশালী জমিদার।[৮৪] ১৮৩৪ সালে তার ভাগনীর বিবাহ উপলক্ষে বিরাট এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ধর্মসভার পক্ষে হতে তার সমর্থকদের উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এই নির্দেশকে অকার্যকর করার জন্য বর এবং কনে উভয় পক্ষের অভিভাবকরা এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। বর আবার ছিলেন একন উদারপন্থি জমিদার রাজকৃষ্ণসিংহের জ্ঞাতি। উভয় পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, যাঁরা এই বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবেন তাঁদেরকে আর্থিক পুরষ্কার দেওয়া হবে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে যাঁরা ঐ বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেননি তাঁদেরকেও ধর্মসভার পক্ষ হতে অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল। সমকালীন মিশনারী পত্রিকায় এই কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ এইভাবেই দেওয়া হয়। "উচ্চবর্ণের কায়স্থ যাঁরা বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদেরকে মাথাপিছু পঁচিশ টাক দেওয়া হয়। অন্যদিকে যাঁরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন নি ধর্মসভার পক্ষ হতে তাদেরকে প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছিল মাত্র কুড়ি টাকা। এজন্য অনেকে এখন দুঃখ করেছেন যে তারা কেন অনুষ্ঠানে যাননি। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ কম টাকা পেয়ে বেশী টাকার লোভে বিবাহ অনুষ্ঠানে ফিরে গিয়েছিলেন।[৮৫]

বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির সমাজ চিন্তায় স্বতন্ত্র ধারায় অবস্থান করে স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির যে বহিঃপ্রকাশ মেলে দিয়েছিল তার প্রতিটি মতবাদের বা পন্থারই উপযোগিতা রয়েছে। পরিবর্তনের স্রোতে বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি হয়। যেমনটা বেঙ্গল রেঁনেসার সময় হিন্দুদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। হিন্দুরা জেগেছিল, সাড়া দিয়েছিল বিভিন্ন আঙ্গিকে নতুন অথচ একেবারে স্বচ্ছ নয় ঠিক সেই রকম আধুনিকতাকে। যারা প্রচলিত সামজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতিকে যুক্তির মাধ্যমে বদলাতে চেয়েছেন এখন তাদেরই একজন রাজা রামমোহন রায়।[৮৬]

রাজা রামমোহন রায় একটি গ্রন্থের কেবল একটি অধ্যায় নন বরং তিনি নিজেই এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস। আধুনিক বাংলর জনক, বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়। চিন্তা চেতনার উৎকর্ষ সাধনে উনিশ শতকের শুরুর দিকে বাংলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচাইতে বেশি খ্যাতিমান। আর তাই বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার প্রয়াসে রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তা-চেতনা ও সংস্কারমূলক কার্যাবলী ও আন্দোলনের সাথে পরিচিত হওয়া বাঞ্চনীয়। মুসলিম শাসন অবসানের পর্যায়ে রামমোহন রায় অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের মঞ্চে আবির্ভূত হন। নতুন দিনের আশায় সারা ভারতবাসী ব্যাকুল ও বিচলিত; কিন্তু ঠাঁই করতে পারছে না কোন তরীতে। কিনারা খুঁজতে যায় কিন্তু নির্দিষ্ট গন্তব্যের অভাবে কোথায় গিয়ে উঠবে সেটা তাদের অজানা। হঠাৎ করে ভারতসহ বাংলা তার পুরোনো অথচ প্রচলিত, বহুদিনের চেনা-জানা সেই নিয়মনীতি সম্বলিত সমাজ ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক অবস্থাকে ভেঙ্গে চূড়ে দিয়ে অচেনা, অজানা এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার রাজনৈতিক অবস্তার ভিতর প্রবেশ করছে। তদুপরী দুই বৃহত্তর সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও আপন ধর্মকে তখন মনে হচ্ছিল ভূল নাকি শুদ্ধ? পাল্টাব না পাল্টিয়ে দিব, কোনটি অস্থির মনোভাবাপন্ন মানবসম্প্রদায়ের জন্য সঠিক কেউ বলতে পারে না। ঠিকানা নেই হিন্দু-মুসলিমের। চোখের সামনে চকচকে ইংরেজ জাতি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। ইংরেজ এই শাসকগণ কি হতে পারবে বাঙালি কিংবা ভারতবাসীর বন্ধু। জলমগ্ন, মশা-মাছি, পান্তা ভাতের বাঙালি হতে পারবে কি আধুনিক? ঠিক তখন এলেন রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন একটি গোঁড়া হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর পবির যেমনই হোক না কেন রামমোহন একজন হিন্দু সমাজ সংস্কারক ছিলেন না।[৮৭] ব্রাহ্মবাদ ও হিন্দু ধর্মমতও ছিল না। রাজা রামমোহন রায় জ্ঞানান্বেষণের খ্যাতিরে ভারতসহ ভারতের বাহিরে বিশেষ করে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী পাঠ করেন। বাইবেল, বেদ, পবিত্র কোরআন, ত্রিপিটক প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে তার ধারণা ছিল প্রখর। তিনি আরবী, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় ছিলেন সুপন্তিত এবং ধর্মীয় দর্শন বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। চারটি ধর্মের মূল গ্রন্থ পাঠ করে অবশেষে কোরআন শরীফের নিকটে এসে তিনি একেশ্বরবাদের প্রতি তার মতামত ব্যক্ত করেন এবং ধর্মের মৌলিক যুক্তিবাদিতা পুনঃআবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।[৮৮]

পাটনায় থাকা অবস্থায় রামমোহন রায় যখন তার গৃহশিক্ষকের নিকট আরবী ভাষায় এরিস্টটল এবং ইউক্লিড সম্বদ্ধে যে পড়াশোনা করেন তা তাঁর চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।[৮৯] এছাড়াও তাঁর ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও আইন সম্পর্কে যে জ্ঞান নিয়েছিলেন তার সাথে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের তুলনামূলক পাট পরিপূর্ণ করে আরবী ভাষার মাধ্যমে এরিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানাজন ব্যাপক থাকতে তৎসময়ের প্রতিষ্ঠিত ধর্মের ভিতর বিদ্যমান অন্ধকার কালিমাগুলিকে দূর করার জন্য এক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগে সক্ষম হয়েছিলেন।[৯০] রামমোহন রায়ের চরিত্রের একটি আপোষহীন দিক ছিল যার ফলে তিনি তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ দূরদর্শিতাকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। তিনি তার পিতার গচ্ছিত ভূ-সম্পত্তির উপর ভর না করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের বেনিয়ারূপে কাজ করতে থাকেন। তুলনামূলক অল্পবয়সে স্বাধীন পেশায় যোগ দিতেও সক্ষম হন তিনি। পূর্ব বাংলার রংপুরের কালেক্টরটে 'দিওয়ান' পদে তিনি যোগ দেন। এখানে তিনি কালেক্টর জন

ডিগবির সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ লাভ করেন। ডিগবির সাহচর্য রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিক আধুনিক করে তোলে এবং রাজনৈতিক সামাজিক বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করে।[৯১]

কলিকাতায় রামমোহন ও তারপর :

And this is a city
In named but in deed
It is a pack of people
That seek ofter meed [gain]
For officers and all
Do seek their own gain
But for the wealth of the commons
Not one taketh pain
And hell without order
I may it well call
Where every man is for himself
And noman for all. [৯২]

[Robert Crowley]

১৮৮০ সালে 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট' মিশনের প্রতিষ্ঠার সময় ডেভিড হেয়ার সবে কলিকাতা শহরে ঘড়ির ব্যবসা করতে আসেন। ঠিক সেই সময় রামমোহন রায় কলিকাতা শহরে আসা-যাওয়া শুরু করেন। রামমোহন রায় লক্ষ্য করলেন চোখের সামনে ইংরেজগণ কিভাবে সমাজে প্রচলিত কুসংস্করকে (হিন্দুদের) দূর করছে, যেমন-১৮০২ সালে (২০ আগস্ট) সাগর দ্বীপে সমুদ্রের জলে দেবতার উদ্দেশ্যে হিন্দুদের সন্তান উৎসর্গ করার নিষ্ঠুর প্রথা আইন করে নিষিদ্ধকরণ।[৯৩] রবীন্দ্রনাথের কাহিনীকাব্য, 'দেবতার গ্রাম'-এ অতি মর্মান্তিকভাবে সামাজিক এই ঘৃণ্য প্রথার এ ঘৃণ্য পন্থাটিকে তুলে ধরা হয়েছে।

মূলত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে ইংরেজগণ ছিল ইতিবাচক ফ্যাক্টর। তাই ইংরেজদের নিয়ে তার কার্যাবলীর সীমানা কখনও সফলভাবেও কখনও বিফলতার সাথে এগিয়েছে। ১৮১৪ সালে রামমোহন স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বসবাস শুরু করেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই তিনি নগর বুদ্ধিজীবীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। কলিকাতায় বেশ কয়েকটি আন্দোলনের সূচনাও তিনি করেন। এ সকল আন্দোলনের মধ্যে প্রথমটি ছিল 'ব্রাহ্ম সমাজের আত্মপ্রকাশ' তার মধ্যে ১৮১৫ তে আত্মীয়

সভা স্থাপন, ১৮১৭ সালে পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার জন্য 'হিন্দুকলেজ স্থাপন, ১৮১৮-১৮১৯ সতীদাহ-সহমরন বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের প্রচারণা শুরু, ১৮২৮ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা, ১৮২৯ সতীদাহ নিবারণ আইন বিধিবদ্ধকরণ। ১৮৩৩-এ গোলামী প্রথা ইংল্যাণ্ডে নিষিদ্ধ হলে বাঙালি আশা করেছিল বাংলায়ও গোলামী প্রথা বন্ধ হবে; কিন্তু তা হয়নি। কলিকাতার রাজপথেই প্রকাশ্য অপরাধের জন্য বিচার ও দণ্ডদান সংঘটিত হতো, কখনও ফাঁসিও দেওয়া হতো; কিন্তু এই বিষয়টি রামমোহনের দৃষ্টিগোচরে ছিল না। এছাড়াও তিনি আন্দোলন করেছিলেন নারী মুক্তির জন্য, স্থানীয় সাংবাদিকতার সূচনা, সংবাদপত্রের জন্য সংগ্রাম।[৯৪]

সংস্কার কর্ম ও আন্দোলনের সময় রামমোহন কখনও জঙ্গী বিপ্লবী রূপ নিতেন না বরং তিনি সর্বদা একজন মধ্যপন্থী ও সাবধানী সংস্কারক হিসেবেই এগিয়ে চলতেন। জ্ঞান গরিমায় তিনি সময়ের চেয়ে বেশি এগিয়ে ছিলেন। ইংরেজী ভাষার উপর রামমোহন রায়ের দক্ষতাকে ইউরোপীয় ব্যক্তিরাও প্রশংসা করেছেন।[৯৫] মূলত হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আগেই রামমোহন এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে একটি ইংলিশ ফ্রি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৯৬] এছাড়াও ১৮২২ সালে তিনি তাঁর বন্ধু উইলিয়াম এডামের সহযোগিতায় এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে আর একটি স্কুল স্থাপন করেন।[৯৭]

ইংরেজী শিক্ষাকে তিনি ধর্মের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার চেষ্টায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর জীবনেরই একটি মনোজ্ঞ ঘটনা হতে এর ধারণা পাওয়া গিয়েছিল। ১৮৩০ সালের ১৩ই জুলাই রামমোহন ও স্কটিশ মিশনারী আলেকজান্ডার ডাফকে নিয়ে সে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'পাদ্রী ডাফ, খ্রিষ্টায় প্রার্থনা করায় এবং উপস্থিত ছাত্রদের হাতে যখন একটি করে বাইবেল উপহার দেওয়া শুরু করে সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে গুঞ্জন ধ্বনি তুলতে থাকে।[৯৮] রামমোহন রায় তৎক্ষনাৎ তাঁর যুক্তি দিয়ে উত্তেজনা নিরসন করেন। তিনি বলেন, "ড. হোরেস হাইম্যান উইলসনের মতো খ্রিস্টান পণ্ডিত হিন্দুশাস্ত্রসমূহ অধ্যায়ন করেছেন এবং তোমরা জানো এর ফলে তিনি হিন্দু হয়ে যান নি। আমি নিজে সম্পূর্ণ কুরআন বরাবার পাঠ করেছি, কিন্তু তার ফলে কি আমি মুসলমান হয়ে গেছি? শুধু তাই নয়, আমি সম্পূর্ণ বাইবেলটি পাঠ করেছি এবং তোমরা জানো আমি খ্রিস্টান হইনি। তাহলে তোমরা কেন বাইবেল পড়তে ভয় পাও? তোমরা এটা পড়ো এবং নিজের বুদ্ধি দিয়ে এর বিচার করো।"

এছাড়াও কোম্পানি সরকার যখন ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের ব্যয়ের জন্য ইংরেজী শিক্ষাকে বা দিতে চেয়েছিল তখন রাজা রামমোহন রায় গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহাস্টকে ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে জোরালো যুক্তি সহকারে একটি চিঠি লিখেন। যুক্তি প্রদর্শনঃ We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European gentlemen of talents and education to instruct the natives of India in Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy and other useful sciences, which the nations of Europe have carried to a degree of perfection, that has raised them above the inhabitants of the other parts of the world.

রামমোহনের বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা প্রবর্তনের এই ধরনের আবেদন সত্ত্বেও সরকার সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দৃঢ় থাকে। তিনি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং সংস্কৃত শিক্ষার অগ্রসরতা সম্পর্কে তার চিঠিতে লিখেন- This Seminary can only be expected to load the minds to youth with Iramatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society.[৯৯]

সংস্কৃত শিক্ষার অসড়তা তুলে ধরে রামমোহন রায় সংস্কৃত গ্রন্থ 'মীমাংসা', 'বেদান্ত', 'ন্যায়শাস্ত্র' থেকে উদাহরণ টেনে যুক্তি প্রদান করেন। তিনি লিখেন-[১০০]

> Since no improvement can be expected from inducing youngmen to consume a dozen of years of the most valuable period of their lives in acquiring the niceties of Vyakaran or Sanskrit grammr ..
>
> Neithen can much improvement arise from such speculations...in what manner the soul absorbed in the Diety? (Vedant) what relation does it bear to the divine essence?...What is real nature and operative influence of passages of the Vedas (Mimansa)...what spectulative relation the soul bears to the body, the body of the soul, the eye to the can etc.

রামমোহন রায়ের চিঠি থেকে তার মধ্যযুগীয় পুঁথিগত শাস্ত্রীয় বিদ্যা সম্পর্কে প্রখর ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। শাস্ত্রীয় বিদ্যা যে সেকালে এবং চলমান সময়ের জন্য অকেজো তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বলে এই প্রতিবাদমূলক চিঠির উপস্থাপনা। চিঠির পিছনের যে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তা থেকে রামমোহন রায়ের চরিত্রে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ইংরেজ সরকারকে এক পর্যায়ে প্রায় কাতর হয়েই চেয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজ ভারতবাসীর জন্য ইংরেজীকে। কিন্তু তার সে ইচ্ছা সরকার তখন পূরণ করেনি। গভর্নর জেনারেলের কাছে লিখিত তার স্মারকের শেষে রামমোহন রায় মত প্রকাশ করে বলেন-[১০১]

> In order to enable your lordship to appreciate the utility of encouraging such imaginarylearning as above characterized. I beg your lordship will be pleased to compure the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with progress of knowledge made science be wrote.

লর্ড বেকনের পূর্ববর্তী সময়ের জ্ঞান বিজ্ঞানের অবস্থার সঙ্গে বর্তমান ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের যে পার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কে রামমোহন গভর্নর জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক স্মারকের উপসংহার-এ রায় লিখেন [১০২]

> But as the improvement of the native population is the object of the government it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction embracing mathematics, natural philosophy, Chemistry, Anatomy with other useful sciences, which may be

accomplished with the sum proposed, by employing a few gentlemen of talents learning educated in Europe and providing a college furnished with necessary books instruments other apparatus.

স্মারকটি ছিল রায়ের ধর্মীয় দৃষ্টিকোন বহির্ভুত। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে গঠন করা স্মারকটি যখন বাস্তবায়িত হয় নি তখন তিনি ঘোষণা করেন-[১০৩] 'আমার দেশবাসীর কাছে এবং সদাশয় সরকার ও আইনসভার কাছে ঋণ আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কর্তব্য মনে করেই স্মারক চিঠিটি লিখেছি।'

সৃষ্টিশীল রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী পুস্তক ও প্রবন্ধগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে তার জ্ঞানমূলক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় মেলে। জ্ঞানের জগতে যখন তিনি ডুবে ছিলেন, কিংবা সমাজ চিন্তায় যখন মশগুল ছিলেন, তখন চলমান অযৌক্তিক ও গোড়ামীর সাথে তিনি কখনও আপোষ করতেন না। তার ধ্যান জ্ঞান ছিল স্বাধীন। তিনি তার বুদ্ধি বিবেচনা ও ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছেন বাঙালির দুঃখীজনার দুঃখ দূর করার চেয়ে উন্নতর পরিবর্তনের দিকে। তিনি আঘাত করেছেন সমাজের সেই জায়গাগুলিতে যেখানে সমাজ নিয়ন্ত্রকরা নিজেরাই নিজেদেরকে প্রভূ ভাবত, যেখানে মূলবোধকে গ্রাস করে খেয়ে বংশের পর বংশে জন্ম নিতে চলেছিল বিবেকশূণ্য মানব। যেখানে মানুষ বিত্তশালী হতে চায় আধুনিকতা ও উৎকার্ষ জ্ঞানের গলাটিপে; যেখানে এমন কুসংস্কার রয়েছে যেগুলি থেকে বের হতে না পারলে বাংলার উন্নতি হতেই না বরং অচলায়তনে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সে হারাবে তার অস্তিত্বকে। তার দূরদর্শি দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ সবটা যদিও হিন্দু সমাজকে নিয়ে তথাপি আধুনিক বাংলার জনক হিসেবে তিনি ছিলেন হিন্দু-মসুলিম-বৌদ্ধ, অস্পৃশ্য, বেদ সবার কাছে উজ্জ্বল আদর্শ। রামমোহন রায়ের ১৮০৪-১৮০৫ এর মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে তার রক্ষণশীল বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ দিয়েছিলেন তার ফার্সি ভাষায় রচিত পুস্তক *Tuhfat -ul-Muwahhidinor A Gift to Monotheists (১৮৩০)* মূলত হিন্দু সামজে বইটি তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল।[১০৪] '*Vedanta* (1815), *Ishopanishad* (1816), *Kathopanished* (1817), *Moonduk Upanishad* (1819), *The Precepts of Jesus-Guide to peace and Happiness* (1820), *Gaudiya Vyakaran* (1826), *Brahmapasona* (1828), *Brohmasangeet* (1829), *Universal Religion* (1829). ইত্যাদি গ্রন্থাবলী হতে ইংরেজী জ্ঞানী হিসাবে তার অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটে। রামমোহন রায়কে বাংলা সাংবাদিকতার জনকও বলা হয়।[১০৫] 'সংবাদ কৌমুদীর' সম্পাদক হিসাবে জনাব রায় ১৮১৮ সালে সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করে।[১০৬] এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই ছিল 'অবৈতনিক শিক্ষার দাবি, 'নারী শিক্ষা, ও তার মুক্তি। ১৮২১ সালে রায় ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু করেন। যার নাম ছিল 'The Brahmanical Magazine or the Missionary and the Brahmun' যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টান মিশনারীদের আক্রমন করে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা।[১০৭]

১৮২১ থেকে ১৮২৩ এই সময়ে The Brahmmical Magazine or the Missionary and the Brahmun: Being a vindication of the Hindoo religion against the attacks of Christian Missionaries শিরোনামে রায় পত্রিকার সর্বমোট চারটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন।

এছাড়াও তাঁর *A Bengali Newspaper* (1821), *Mirat-ul-Akbar-Persian Journal* (1822), রামমোহন রায়ের সংস্কারধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির সবচাইতে আধুনিক যে ব্যাপারটি ইতিহাসে তাকে শ্রেষ্ঠ মনীষীকে রূপান্তরিত করেছে তা হল সতীদাহ প্রথাকে আইনের মাধ্যমে রোধ করেন। রক্ষণশীল হিন্দু মতের মানুষগুলির সাথে সংস্কারপন্থী, উদার ধর্মনিরপক্ষতাবাদ রাজা রামমোহন রায়ের কঠিন সজ্ঞের প্রকাশ তার বিখ্যাত পুস্তিকা *A Conference between an advocate for and apponent of the practice of burning widow's alive*পুস্তিকাটি তিনি ১৮১৮ সালে লিখেন।[১০৮] ১৮২২ সালে রায় হিন্দু রমনীদের সামাজিক সুবিচার দাবি করে আর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন যার নাম *Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of the Femals.*[১০৯] ১৮৩০ সালে ব্যক্তিমানসের সম্পত্তিতে স্বাধীনতা বিষয়ে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী পুস্তিকা প্রকাশ করেন যার নাম *Essays on the Rights of the Hindoos over Ancestral Property according to the law of Bengal*[১১০]আলোচ্য গ্রন্থে তিনি আইনের সাথে যুক্তির সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী চিন্তার সমন্বয় ঘটান। রামমোহন ও রমামোহনপন্থীদের (দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সি, মথুরনাথ মল্লিক) কার্যকলাপ যখন হিন্দু ধর্মীয় জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, সেই সময় ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিসাবে তরুন ডিরোজিও-র নিযুক্তি বাঙালি সমাজ অঙ্গনে এক নতুন যুগের সূত্রপাত করে।[১১১]

আমূল সংস্কারবাদীতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল, বাঙালি হিন্দু-মানসলোকে আলোড়িত করতে পেরেছিলেন। তরুণ ডিরোজিও[১১২] আসলে একটি ক্ষণিক বিপ্লবের নাম। তবে ক্ষণিক বিপ্লবের রেশ আজও বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণির জাগরনের উদ্ভ্রান্ত, উল্লাসিত, বাধন ছাড়া নীতির আদর্শ। ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গলরা কখনও ছিল সমাজের আশীর্বাদ। আবার সমাজের জন্যই ছিলেন তারা এক 'ত্রাস'। 'ইয়ংবেঙ্গল' [১১৩] (YoungBengal) গোষ্ঠীর অন্যতম রূপকার ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)। এই রেডিকেল ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি অন্ধ। তারা প্রাচ্য সভ্যতার প্রতি এমন বৈরী হয়ে পড়ে যে, এদের চোখে যা কিছু প্রাচ্য তার সবই জড় এবং প্রত্যাখিত। বিপ্লবের যুগ, শুধু একদিক দিয়েই নয়, বুঝার উপায় নেই কোনটি ইতিবাচক কিংবা কোনটি নেতিবাচক বিপ্লব। তবে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্থির চলাফেরা অনেক সুগঠিত বিপ্লবের উত্থানকেও ধ্বংস করে দিয়েছিল। আবার এই মধ্যবিত্তরাই যুগের পরিবর্তনকে পাশ্চাত্য জ্ঞান দিয়ে ধরে রাখতে পেরেছিলেন সম্পূর্ণভাবে স্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখে। পুরো ব্যাপারটিই কেমন যেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করত।

আধুনিক বাংলার স্বদেশপ্রেমের প্রথম কবি ডিরোজিও-র কাছে ইয়ংবেঙ্গল তাঁদের স্বদেশ সম্পর্কিত বোধ লাভ করেছিলেন। এই ডিরোজিও ছিলেন যুক্তিবাদী স্বার্থ শূণ্য পুরুষ এবং স্বাধীনতার পূজারী। ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশুদ্ধ আদর্শের প্রতীকের মতো। রামমোহন পন্থীরা যেখানে মাঝে মাঝে শ্রেণি স্বার্থে জড়িয়ে পড়ত সেখানে ইয়ংবেঙ্গল রেডিকেলের স্বদেশচিন্তা ছিলো স্বার্থশূণ্য। স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে প্রথম জীবনে ইয়ংবেঙ্গল আপসহীন মনোভাবপন্ন, ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, সমস্ত পাপ-অন্যায়-অবিচারের বিরোধী। তবে তাদের স্বাধীনচেতা দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষ প্রভাব

ছিলো।[১১৪] ডিরোজিও আসলে মন্ত্র জানতেন। ইয়ংবেঙ্গল কে ডিরোজিও তিনটি মন্ত্র দিয়েছিলেন- পাপের প্রতি ঘৃণা, যুক্তিবোধ এবং সত্যনিষ্ঠা,[১১৫] সেগুলি তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও বর্তমান ছিল। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর তরুণরা ছিল ছিন্নমূল। হিন্দু সমাজ তাঁদেরকে প্রীতির চোখে দেখত না। অপরদিকে পাশ্চাত্য চিন্তা তাদের আদর্শ হলেও ইউরোপীয় স্বার্থরক্ষী সমাজে তারা ছিল অপাংক্তেয়। বিশেষ কোন স্বার্থবুদ্ধি এই সময় তাদের চালিত করে নি বলে তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারত। ফরাসী বিপ্লবের স্বপ্নঘোর ছিল তাদের দুইচোখে, যদি শিল্পবিপ্লবের গভীর তাৎপর্য তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে যে বেশিদূর সংস্কার সম্ভব নয়, বিপ্লবী পথ চলা সম্ভব নয় এ কথা তারা অনুভব করতে পারেন নি। পাশ্চাত্য শিক্ষার শক্তিই তাদের সামনে জ্ঞানের জগৎকে খুলে দিয়েছিল, এজন্য তারা ইংরেজদের প্রতি ভীষণ প্রীতিও প্রকাশ করেন। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা তাদেরকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। মূলত বেকন, হিউম আর টমপেন ছিল তাদের আদর্শ। ইউরোপীয় দার্শনিক হিউম-এর অভিজ্ঞতাবাদ, বেকনের উপযোগবাদ এছাড়াও কবি শেলী ও বায়রনের রোমান্টিক মানসিকতা তাদের চিন্তা-চেতনার বিকাশকে আরও গভীরতর করে। দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব (১৮৩০) তাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। হিন্দু কলেজের কিছু ছাত্র ভারতে এই ধরণের বিপ্লবের কথা চিন্তা করায় শ্রীরামপুর মিশনারিদের পত্রিকা 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' তীব্র ভাষায় তাদের কটাক্ষ করে। ইয়ংবেঙ্গলের বিপ্লবী চিন্তার প্রসার হয় তিান্ত তরুন বয়সে। ডিরোজিও ১৮২৮ সালে গঠন করেন একাডেমিক এসেসিয়েশন।[১১৬] এখানে আলোচনা হত স্বাধীন ইচ্ছা, পবিত্র সত্য, পাপের নীচতা, স্বদেশপ্রেম, ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি, পৌত্তলিকতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে।[১১৭]

'অ্যাকাডেমিক আসোসিয়েশন' বা সাধারণ জ্ঞানোপর্জিকা সভা'র বাইরে ইয়ংবেঙ্গলের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রকাশ লিপিবদ্ধ আকারে প্রকাশ হত মুখ্যত সাময়িক পত্রিকায়। ১৮৩০ থেকে ১৮৫৪ এর মধ্যে তাদের পরিচালনায় কমপক্ষে সাতখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলি হল: ১) 'দি পার্থেনন' (১৮৩০); ২) 'দি হিন্দু পায়োনিয়র' (১৮৩০); ৩) 'দি এনকোয়েরার' (১৮৩১); ৪) 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১); ৫) 'দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর' (১৮৪২); ৬) 'দি কুইল' (১৮৪৩); ৭) 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪)।[১১৮] 'পার্থেনন-এর প্রথম ও শেষ সংখ্যায় ইংরেজদের ভারতবর্ষে বসতি স্থাপন ও গভর্নমেন্টের বিচারস্থানে খরচের বাহুল্য এ দুটি লেখায় তাদের আধুনিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। 'হিন্দু পায়োনিয়ারে' 'Freedom', `India under foreigners' ইত্যাদি লেখা প্রকাশিত হত। যাতে তাদের স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠত। দ্বিতীয় লেখাটিতে ইয়ংবেঙ্গল ইংরেজ সরকারকে স্বৈরাচারী বলে মন্তব্য করেছেন। তাদের রাজত্বে জনসাধারণের বঞ্চনার কথা বলতে গিয়ে বললেন, আইন সভায় জনগণের মতামতের কোন মূল্য নেই, আইন প্রণয়নে তাদের কোন হাত নেই। ব্রিটিশ রাজত্বে রাস্তাঘাট, ব্রিজ হয়েছে সত্য, বাণিজ্য ও জ্ঞানও বিস্তৃত হয়েছে সত্য, কিন্তু তাতেই তো আর সব দোষ ঢাকা যায় না। সরকারে এদেশীয় জনগণের কোন স্থান নেই, দায়িত্বপূর্ণ পদে তার অন্ত্যজ, ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে দুঃখের।[১১৯]

'জ্ঞানন্বেষণ' এবং 'এনকোয়েরার' মূখ্যত ছিল ধর্মীয় এবং সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। 'জ্ঞানন্বেষণ' প্রতিনিধি নির্বাচন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি সর্মথন করতে পারে নি। 'দি কুইল' এর সম্পাদক তাঁরাচাদ

চক্রবর্তী। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে এতে, 'রাজনীতি সম্পর্কে এতে গরম গরম প্রবন্ধসকল বাহির হইত।' দ্বিভাষিক 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'[১২০]-এর পৃষ্ঠায় রাজনীতি অত্যন্ত আলোচ্য বিষয় ছিল। তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি নায়কদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এখানে প্রতিফলিত। ইয়ংবেঙ্গল এর দাপট সময় ছিল উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশক।[১২১] সেই সময় ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর সমাজকে জাগানোর পুরোভাগে ছিল প্রতিবাদ পুরোধা যেমনঃ জুরিপ্রথা প্রবর্তন, চাকুরির ভারতীয়করণ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ সনদের সংশোধন, বিদেশে কুলি চালানোর প্রতি প্রভৃতি। অগ্নি বর্ষিত হতো, 'এনকোয়েরার' ও 'জ্ঞানান্বষণের'- ইয়ংবেঙ্গলের উপস্থিত লেখা-লেখি হতে। প্রতিবাদে মন মন্দির আস্ফালন করত, বাঙালির দৃষ্টিসীমার পরিবর্তন যেন ছিল অবশ্যম্ভাবী। তরুণ র‍্যাডিক্যালরা হিন্দু ধর্মের উপর তীব্র আক্রমন চালাত।[১২২]

১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ডিরোজিওর এক পরম শিষ্য মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রকাশ্যে হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ করে গোটা হিন্দু সম্প্রদায়কে হতবাক করে দেন। 'বেঙ্গল হরকরা' নামে কলিকাতার ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট লিখিত পত্রে তিনি ঘোষণা করেন: "স্বর্গের নী.চে (পৃথিবীতে) যদি এমন কিছু থাকে সেটাকে আমি এবং আমার বন্ধুরা প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করি- সেটা হল হিন্দুধর্ম।" [১২৩]

১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ডিরোজিওর অকালমৃত্যুতে র‍্যাডিক্যালদের আন্দোলন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।[১২৪] যৌবনের উন্মাদনা আস্তে আস্তে করে যখন হ্রাস পেতে থাকে তখন তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারেও কিছুটা আপোসপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন হতে থাকে। এই সময় জর্জ টমসন নামক বিলেতি দার্শনিক এর মতবাদের যুগধতায় পড়ে যায়। টমসন (টমিপেন/টমপেন) ছিল জমিদার স্বার্থে বিশ্বাসী, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর ছিল আবার ভূম্যধিকারী সভার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগ। তাই এই সময় ডিরোজিও বিহীন চিন্তায় ভাঁটা পড়া ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা জমিদারদের অনুকূল হয়ে উঠে।[১২৫]

ডিরোজিওর যন্ত্র ছিল মূলত পেইনের (টেমাস পেইনের, মার্কিন প্রকাশক) 'এইজ অফ রিজন' (Age of Reason) বইটির আদর্শকে বাঙালির ইয়ং, তরুনদের সামনে উপস্থাপন ও দীক্ষা জ্ঞাপন। তাছাড়া Metaphysics বা অধিবিদ্যার সূত্রগুলি ছিল তার বিপ্লবী মনের মন্ত্র বা আদর্শ যাই বলা যায়। তিনি যখন পটলডাঙ্গায় কলিকাতা স্কুল সোসাইটির স্কুলে, তখন পায় দেড়শত যুবক উপস্থিত থাকতো এবং দারুনভাবে প্রভাবিত হতো।[১২৬] তখন প্রভাবিত সেই যুবকরা তৎকালীন ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙ্গতে গিয়ে সমস্ত ত্যাগ, বাঁধা-বিপত্তি স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হত না। ইয়ংবেঙ্গলের রাজনৈতিক, সামাজিক শিক্ষায় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মূলত ধর্মনিরপেক্ষ এবং কিছুটা বস্তুনিষ্ঠ।[১২৭] রামমোহনের মতো ইয়ংবেঙ্গলও একাধিকবার জমিদারের অত্যাচারের ফলে কৃষকের দুরবস্থার কথা বলেন। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এর একাধিক সংখ্যায় জমিদারের দৌরাত্মে প্রজাদের দুরাবস্থা বর্ণিত হয়েছে। গভর্ণমেন্ট প্রজাদের 'এতাদৃশ দুঃখ দেখিয়া যদি তন্নিবারনের উপায় না করেন তবে আমরা তঁহাদিগকে দোষী করিতে পারি'।[১২৮] ডিরোজিওর শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র প্রজাদের দূরাবস্থার অন্যান্য কারণের সঙ্গে জমিদার অথবা তার প্রতিনিধির অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেন। তার ভাষায়- 'Promote their well being, and the well being

of he country is promoted'.[১২৯] তবে ইয়ংবেঙ্গলের সামাজিক নানা দুর্নীতি, ত্রাস, অত্যাচার-নির্যাতন এর বিরুদ্ধে যেরকম কট্টরপন্থি দূর্বার আন্দোলন ও প্রতিবাদ ছিল জমিদার কর্তৃক কৃষক অথবা রায়তের প্রতি নিদারুন, মর্মাহত অত্যাচার, নিস্পেশনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ছিল তার মধ্যে দূর্বার গতির অভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইংরেজদের প্রতি ইয়ংবেঙ্গলের মনোভাব ছিল একই সঙ্গে স্বার্থজড়িত এবং কিছুটা সমালোচনাত্মক। রামমোহনের মতো পূর্ববর্তী মুসলমান শাসকের প্রতি ইয়ংবেঙ্গলের দৃষ্টিভঙ্গির ছিল নেতিবাচক। তাঁরা তাই মুসলমান শাসককে নৃশংস অত্যাচারী মনে করে ইংরেজ কর্তৃক সেই অত্যাচার মুক্ত হবার মধ্যে ঈশ্বরের কল্যাণ স্পর্শ লক্ষ্য করেছেন। ভারত বর্ষ তথা দোজখময়ী স্বর্গীয় বাংলা ইংল্যান্ডের জ্ঞানভাণ্ডরের দ্বারা পুষ্ট হোক এই ছিল তাঁদের কামনা।[১৩০] রামমোহনের মতো এদেশে ব্রিটিশ আগমন তাদের কাছেও ছিল বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ। 'এনকোয়েরার' ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল সম্পর্কে তখন একটি গরুত্বপূণ কথা লিখেছিল - " If ever any conquest proved a blessing to the conquered it was the empire of Great Britain in India... the kind and wise dispensation of God must be acknowledged by the improved Hindoo in timely sending a civilized and in every respect a clever people to give light where there was darkness, to elevate what was low, to improve what was mean, and to reform what was corrupt."[১৩১]

উনিশ শতকের বাংলা বহু কীর্তিমান পুরুষের জন্ম দিয়েছিল। এদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অন্যতম। তিনি সর্বদাই এক গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রেখে চলতেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'বিশ্বকর্মা যেখানে চারকোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন', যুগান্তরেও আমাদের সে বিস্ময়বোধের অবসান হয় না।[১৩২] বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)[১৩৩]-এর চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তেজ। আট বছর বয়স হতেই তিনি ইংরেজী শিক্ষা ও ভাষার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন। বিদ্যাসাগর এর শিক্ষা সম্মান ছিলো আকাশচুম্বী। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৫৬), রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য (১৮৫৪) নির্বাচিত হন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল বিধবা বিবাহ আন্দোলনের নেতা হিসাবে তাঁকে এক বিশেষ সম্মান লিপি প্রদান করেন। ১৮৮০-তে ভারত সরকার তাকে সি. আই.ই উপাধিতে ভূষিত করেন।[১৩৪] উনিশ শতকের নবজাগরণের অনুপ্রেরণার মূলে যে প্রগতির ধ্যান ধারনা- 'Idea of Progress' সক্রিয় ছিল, তা ভারতের মধ্যে ফরাসী বিপ্লব, শিল্প বিল্পব হিসাবে জাগরুক করেছে বাংলার নবগঠিত 'এলিট সোসাইটি, বাষ্পীয় ইঞ্জিন, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ইলকট্রিসিটি, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রচালিত শিল্পোৎপাদনের প্রসার এর সে বাস্তবধর্মী ক্ষেত্র ইংল্যান্ডে তথা পাশ্চাত্যে ছিল তেমনটি বাংলার নবজাগৃতির সময় বাংলায় ছিল না।[১৩৫] তারপরও 'To seize the living seroll of human progress, inscribed with every successive conquest of man's intellect."[১৩৬] এই ধ্যান ধারনা ইংরেজ শাসক ও এলিট সোসাইটি বাংলার মস্তিষ্কে রোপন করেছিলেন কিছুটা জবরদস্তিতে আবার কিছুটা আগ্রহী শ্রেণির নিদারুন উৎসাহে। পুরাতন মধ্যযুগীয় সামাজিক ইনস্টিটিউশনের লৌহ প্রাচীরে বার বার প্রতিহত হয়েও প্রগতির ভাবধারা আদর্শগত আলোড়ন তৈরি করেছিল এই বাংলায় কতিপয় সৃজনশীল মধ্যবিত্তশ্রেণি অন্তর্গত বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের ফলে। যে কৌলিক সংকীর্নতার

পরিবেশে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মে ছিলেন, তার বিরুদ্ধেই তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন। এ বিদ্রোহ তীব্র হলেও আকস্মিক নয়। বিনয় ঘোষ সংগত ভাবেই নির্দেশ করেছেন যে, প্রথম স্তরের রামমোহন রায়ের সামাজিক আন্দোলন এবং দ্বিতীয় স্তরে ইয়ংবেঙ্গল দলের বিদ্রোহ পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবকে যেন অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন যে উনিশ শতকের সবচেয়ে বড় সমাজ সংস্কার আন্দোলন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই আন্দোলন শহরের গন্ডি ছাড়িয়ে সর্বভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন বিধিবন্ধ হবার পর উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কয়েকটি মাত্র বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার অধিকাংশই বিদ্যাসাগরের নিজের উদ্যম ও অর্থব্যয়ে অথবা একান্ত ভক্তদের প্রচেষ্টায়। তাও দেখা গিয়েছে বিধবা বিবাহ করতে যারা আগ্রহী হয়েছিলেন; তাদের অধিকাংশই অর্থের লোভেও শটতার আশ্রয়ে, আদর্শপ্রীতির জন্য বিবাহ করেন নি।[১৩৭]

কিন্তু সে বিষয়ে বিদ্যাসাগরের তেমন কিছুই আসে যায় না। কেননা তিনি ছিলেন মানববাদে বিশ্বাসী। মানববাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। তার প্রমাণ মিলে তাঁর লেখা প্রবন্ধ ‘বাল্য বিবাহের দোষ’ থেকে।[১৩৮] এই প্রবন্ধের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ মানবিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এ প্রবন্ধ রচনা করেন; এর আবেদন শাস্ত্রজ্ঞানীর কাছে নয়, মানুষের বুদ্ধি ও অনুভব শক্তির কাছে। শাস্ত্রনিরপেক্ষ এই মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই মূলত বিদ্যাসাগরকে হিউম্যানিস্ট পন্ডিতের মর্যাদা দিয়েছে। এই মানববাদ তিনি পেয়েছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে, বাকীটা তাঁর সহজাত মানব প্রীতি থেকে। বিদ্যাসাগরের গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজী প্রবন্ধমালা থেকে তাঁর প্রখর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।[১৩৯] যেমনঃ Betaal Panchabinsati (1847); Jeebancharit (1850); Bodhadoy (1851), Bornoporichoy (1854); Sitar Bonobash (1860) ।১৮৫১ সালে বিদ্যাসাগর বিধবাদের জীবনের করুন ইতিহাস সম্বলিত একটি পুস্তিকা রচনা করেন। নাম ‘বোধোদয়’।[১৪০]

বিদ্যাসাগর এই পুস্তিকাটি প্রকাশের পর বিধবাবিবাহ নিয়ে আলোচনার ধুম পড়ে যায়। বহু শাস্ত্রীয় পণ্ডিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রকৃত হয়ে নানা যুক্তি তর্ক খণ্ডন করে অবশেষে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষরক প্রস্তাব অনুমোদন করে। বাঙালি হিন্দু সমাজের জন্যে বিদ্যাসাগর নবযুগের আলোক বর্তিকা নিয়ে এসেছিলেন; ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা ও শাস্ত্রচর্চা এবং ধর্মসমালোচনার মাধ্যমে তিনি মানববাদী চিন্তার পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। শাস্ত্রীয় বিতর্কে মাতৃভাষার ব্যবহার এবং যুক্তিতর্কের বাহন গদ্যরীতির আশ্রয়গ্রহণ এও সেই মানবাদী চিন্তাধারার অপরিহার্য রূপ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তার প্রতিফলন গুলি ছিল একচেটিয়া সমকালীন বাংলা পত্রিকাগুলিতে।

‘বেঙ্গল স্পেক্টেটর’ বা ‘তত্ত্ববোধিনী’, পত্রিকা, ‘সোম প্রকাশ’, ‘সম্বাদ ভাস্কর’ বা ‘সংবাদ প্রভাকর’, ‘মাসিক পত্রিকা’ বা ‘নিত্যধর্মা-নুরঞ্জিকা’ ‘সংবাদ সাধুরঞ্জন’ বা ‘সমাচর সুধাবর্ষন’-এ ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁর ইংরেজী পত্রিকা যেমন ‘ইংলিশম্যান’, ‘হিন্দু ইন্টেলিজেন্সস’ বা ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’-এর পুরোনো সংখ্যা।[১৪১] বাংলার জাগরন অথচ মুসলমান কোথায় ? তখন পট এমনি ছিল। পুরু জাগরণটি হিন্দুদের করতলে, তাতে হিন্দু মধ্যবিত্তের তেমন বিশেষ দোষ দেওয়া অনুচিত।

চলমান ঐতিহাসিক পরিবর্তনই তাদেরকে সুযোগটি করে দিয়েছে এবং তারা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। তবে এটাও অস্বীকার করার মত নয় যে তারা মুসলিম শাসকদের থেকে মুক্তি চায়নি। মুসলমানগণ কখনও ভাবতেও পারেনি যে ভারতীয় উপমহাদেশে তরবারীসহ হুংকার দেওয়া মুসলিমগণ এত তাড়াতাড়ি চর্তুদিক দিয়ে পরাজিত হবে। মুসলিম প্রজারাও ছিল শাসকদের উপর নির্ভরশীল যার ফলে শাসক কিংবা রাজা যখন অন্ন দিতে ব্যর্থ তখন তারা এমনভাবে কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন দলীয় ব্যবস্থার কারণে নিজেরাও অন্ন জোগাতে হয়ে গেলেন অপারগ। তাই হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণি যখন অতি দাপটের সাথে আধুনিকতার বীজ বপন করে সেই বীজের ফলও ভোগ করছে। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী [১৪২] (১৮৮০-১৯৩১) তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অনলপ্রবাহে’, দেশহিতৈষনার অকৃত্রিম আবেগ অথচ তীব্র ক্ষোভে, স্বাধীনতার কামনায় মুসলমানদের জেগে উঠার আহ্বান করেছেন:

কোথা ভারতরে স্বর্ণ-সিংহাসন

কোথা সে স্পেনের মহিমা-কেতন

কোথা আরবের প্রতাপ-তপন

সকালি কি আজি

ঘোর অন্ধকার।[১৪৩]

এরপর এসেছে তাঁর মুসলিম জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন–

উঠ তবে ভাই ! মুসলমান,

জাগ তবে সবে ধরি নব প্রাণ

সাধহ কর্তব্য রাখিবারে মান,

এখনি নিশার হবে অবসান।

এখনি ভাতিবে আলোক রাশি।[১৪৪]

এইভাবে শত শত বছর ধরে শাসন করা মুসলমান জাতি যখন ইংরেজদের আধুনিক ধনবিদ্যা, গতিবিদ্যা, কর্মবিদ্যা, ভূ-লোক, বিশ্বলোক, অধিবিদ্যা, রাজনৈতিক বিদ্যায় হেরে গিয়ে অচলায়তনে বসবাস শুরু করল যেখান থেকে উঠার মত প্রাণ শক্তি তাদের ছিল না। তখন তাদেরকে জাগরণের জন্য কত মুসলিম পন্ডিত ব্যক্তি, কত কবি, সাহিত্যিক, সংস্কারকগণ যে তাদের জ্ঞান বুদ্ধিকে তলোয়ার করে ব্যাকুল চিত্ত-আকুল প্রাণে আহ্বান করেছিলেন তার অন্ত নেই। ইতিহাসের সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধকতা এই যে, তা সব কালজয়ী পুরুষকে সমানভাবে নিজের খাতায় রাখেন না। তবে জাগরণের বেশিরভাগ নায়কই হলেন মধ্যবিত্তশ্রেণিভুক্ত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হতে বাঙালি মুসলমানের নতুন যাত্রা শুরু হয়। আর এই নতুন যাত্রার মধ্যে ছিল ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা; সেই ভাষা ও শিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রতিবেশী হিন্দু জাতির মত মুসলমান সমাজেও

নবচেতার সূত্রপাত হয়। পঞ্চাশ বছর পর মুসলমান সমাজকে সেই পথ অনুসরণ করতে হল। বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্তের সহিত তুলনায় মুসলমান, মধ্যবিত্ত কেবল ক্ষুদ্রাকার ছিল না, গঠনগত উপাদান ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও পার্থক্য ছিল। এর সাথে কালগত পার্থক্যের কথাও স্বীকার করতে হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে মুসলিম মধ্যবিত্তের কর্মধারার প্রথম গরুত্বপূর্ণ দিক হল স্ব-শ্রেণি ও সমাজের মধ্যে ইংরেজী ভাষার প্রচলন ও আধুনিক বিদ্যাশিক্ষার বিস্তার।

ইংরেজী ভাষার প্রচলনে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে নওয়াব আবদুল লতিফ প্রথম প্রবক্তা ছিলন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল 'শরীফ শ্রেণি, যার মধ্যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের লোক আছেন। ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারি, সওদাগরি চাকুরিরর সংস্থান করা যাতে করে মুসলমান পরিবারে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এসেছে তা কাটিয়ে উঠতে পারে।[১৪৫] তিনি মক্তব, মাদ্রাসায় আরবি-ফারসি শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁর মতে, আরবি-ফারসি না জানলে শরীফ সমাজের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করা যায় না। শরীফ শ্রেণির পারিবারিক ভাষা উর্দু, আবদুল লতিফ জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুর সপক্ষে ওকালতি করেন।[১৪৬] আবদুল লতিফের সমর্থক সোসাইটি ঐরূপ মনোভাবই ছিল। তাঁরা ইংরেজী শিক্ষাকে সে অর্থে গ্রহণ করেছেন, যেভাবে প্রাচীন শিক্ষাধারার সমর্থন দিয়েছেন এবং মাতৃভাষা হিসাবে বাংলাকে বর্জন করেছেন, তাতে তাদের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিলে। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে যে বৈপ্লবিক ও উদারনৈতিক চেতার উন্মেষ হয় তার কোনো লক্ষণ নওয়াব আবদুল লতিফের চিন্তা-চেতনার মধ্যে ছিল না।[১৪৭] সামজের নতুন বিপ্লব ঘটানোর কথা নওয়াব আবদুল লতিফ ও তার 'শরীফ সোসাইটি'-র সদস্যরা ভাবেনি; ইংরেজী ভাষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বাংলার হিন্দু সমাজের আন্তর্জীবনে যে ভাববিপ্লব এনেছিল 'লতিফ সোসাইটি'-র, মধ্যে তার প্রতিফলন দেখা যায় না। তিনি যে 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'তে যাঁদের একত্রিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ক্ষয়িষ্ণু সামন্তপতিও ছিলো। তাঁরা মধ্যযুগীয় ধ্যান-জ্ঞান, চাল-চলন, ভাব বিলাসিতা ও সংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের গৌরব মর্যাদা ও সম্মানের সূত্র খুঁজতেন। মূলত লতিফ সোসাইটির আধুনিক শিক্ষা এইরূপ পিছুটানের কারণে বেশীদূর এগুতে পারে নি।[১৪৮]

সৈয়দ আমীর আলীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মুসলিম আধুনিক শিক্ষায় প্রগতিশীল।[১৪৯] তিনি ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি জোর দেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার বিপক্ষে থেকেছেন। আইন, ইতিহাস ও ধর্মবিষয়ক তাঁর বহু মূল্যবান গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় রচনা করেন। উত্তরের সৈয়দ আহমদ-এর মতাদর্শীতার সাথে আমীর আলীর মতাদর্শের মিল ছিল। ডক্টর নাজমুল করিম আমীর সোসাইটিকে নিউ এলিট বলেছেন।[১৫০]

হুগলির সন্তান ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম গ্র্যাজুয়েট দেলোয়ার হোসেন পুরোপুরি যুক্তিবাদী ছিলেন (১৮৪০-১৯১৫ খ্রি:)। তিনি মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে ধর্মীয় ও সামাজিক আইন, প্রথা ও প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করেন। উত্তরাধিকার আইন, মহাজনী কারবার, বহুবিবাহ প্রথা ইত্যাদি সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করে তিনি একাধিক প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করেন।[১৫১] তাঁর সাথে তার মতবাদে যারা যোগ দিয়েছিলেন তারা হলেন মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, শেখ আবদুর

রহিম, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। ১৯০৫ এর রাজনীতির উত্তপ্ত বাষ্প এই যুক্তিবাদী সোসাইটির চিহ্নিত চলায় বিরাট বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর তিনি মনে করতে লাগলেন যে, সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করে মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। তিনি প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্তশ্রেণির নেতৃত্ব অনুকরণে এগিয়ে আসেন এবং জোরালো ভাষায় সরাকরী নীতির বিরোধিতা করেন। তিনি মুসলমানদের শিক্ষা, চাকুরী ইত্যাদির ব্যাপারে মুসলিম মধ্যবিত্ত নেতৃবৃন্দের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দাবি জানান।[১৫২]

মুসলমান সমাজের সমস্যা সম্পর্কে তাঁর এই স্পষ্ট বক্তব্য মুসলিশ মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রশাংসার সাথে গ্রহণ করে। যা পত্র-পত্রিকায় প্রতিফালিত হয়।[১৫৩]ফজলুল হক তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর জোর দেন।[১৫৪] তবে এ কে ফজলুল হকের শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গিও বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছেন। তারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯০০-এর লাহোর প্রস্তাব ও অখন্ড স্বাধীন বাংলার চিন্তা মাথায় আসে। এছাড়াও ফজলুল হক ১৯৫০ সালে বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন পাশ[১৫৫] করান এবং নিজে পরিশেষে কৃষক-প্রজা-পার্টি গঠন করেন। কৃষকের বন্ধু হিসাবে কৃষক-প্রজা-পার্টি নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

উনিশ শতকের অনেক বাঙালি লেখকের বা সমাজকর্মীর মতো 'মীর মশাররফ হোসেন (১৮০৮-১৯০১) ছিলেন সাহিত্য স্রষ্টাদের অন্যতম; নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ।[১৫৬] তিনি বাংলার সমাজ ব্যবস্থার অন্যায় অত্যাচার দেখে শঙ্কিত হতেন, ক্ষুব্ধ হতেন, প্রতিবাদের প্রেরণা অনুভব করতেন। তিনি এইসব অন্যায়-অত্যাচারকে অসংলগ্ন ঘটনা হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেছেন যে এগুলি হলো একটি বিশেষ সামাজিক বা শাসনতান্তিক ব্যবস্থার ফল, এ উপলদ্ধি মানবের চিত্তে জাগেনি। চিন্তা ধারার পরিপূর্ণ বিকাশের অভাব থাকলেও মানব বেদনাবোধের মূল্যকে তিনি ভীষণভাবে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর বিখ্যাত তিনটি নাটক ১. জমিদার দর্পন (১৮৭৩), ২. বঙ্গদর্শন (১৮৭৪), ৩. এর উপায় কী ? (১৮৭৫) প্রভৃতি নাটকে তার যে বেদনাবোধের প্রকাশ তার চাইতেও বড় কথা সম্পূর্ণ সম্প্রদায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবতর্নে মীর মশাররফ হোসেনের জুরি নেই।[১৫৭] বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির মনোভাব মনুষ্যচেতার ধর্মীয় ও বিদ্রোহী চেতনার টানাপোড়েন উপর নির্ভর ছিল। ১৯৪৭ পূর্বে তথা দেশভাগের পূর্বেকর গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ঘটনাপ্রবাহসমূহে দৃষ্টি দিলে একটি সত্য সবমিথ্যাকে ছাপিয়ে প্রকাশিত হয় তা হল মধ্যবিত্তশ্রেণির বিচ্ছিন্নতাবোধের চিন্তা।

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষত মানুষগুলি ভারতজুড়ে যেন স্বার্থ নিয়ে মেতে ছিল। উন্নতি হয়েছে অনেক, সাবলম্বীও হয়েছিল বাঙালি কিংবা আপামর শিক্ষিত ভারতবাসী; কিন্তু দৈন্যতা ছিল মধ্যবিত্তের জাতীয়তার লড়াইয়ে। জাতীয়তার প্রশ্নে বাঙালি কখনও আপোষ করেনি একই মায়ের দু'ই সন্তানরূপে বরং আপোষ করেছে স্ব-স্ব ধর্মীয় অনুভূতির কাছে। ব্যাপারটি ছিল এইরকম তুমি 'মা, আমার কাছে বড় নও, আমার ধর্মীয় পিতার খোঁজ দিতে পারলে তবেই তুমি সতিস্বাধ্বী 'মা'। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ঘটনা পুরোপুরিই ছিল ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ব্যাকুল আগ্রহের প্রতি ফলন। এই আগ্রহ দেখাতে গিয়ে

প্রথম বাঙালিরা স্বার্থ সচেতন হয়ে উঠে। প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়ে প্রতিষ্ঠাকামী মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির। কেন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা কিন্তু তেমনি আছে শুধু তাকে নিয়ে শুরু হলো টানা-টানি। হিন্দুগণ দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে মানুষ বাঙালিকে প্রাধান্য দেয় ফলে তাদের সচেতন মধ্যবিত্তশ্রেণি এই বাংলা ভাগের বিপক্ষে দাঁড়ায়। তাদের কঠিন দুর্বার আন্দোলনে বঙ্গভঙ্গ যখন রদ হয় তখন বেঁচে যায় লাখ বাঙালির প্রাণ, বাসস্থান স্থানান্তর যে কত কঠিন যা কিনা ভোগ করে নারী, শিশু, বৃদ্ধরা তা থেকে অন্তত রক্ষা পায়নি বাঙালি। তাহলে সেদিন বাঙালি মুসলমানদের মনোজগৎ এত উদ্বেল ছিল কেন? মূলত শিক্ষায় হিন্দুদের একচেটিয়া আধিপত্যতা এবং মুসলমানদের প্রতি বিরাগ দৃষ্টিভঙ্গিই তার অন্যতম কারণ। তবে সেদিনের নব্য মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির চিন্তাবিদগণ এটা যদি বুঝতে পারত ভাগাভাগিতে সমাধান নেই, সমাধান রয়েছে যেখানে যেভাবে থাক সংগ্রাম করে হলেও নিজের স্বাধীন মনোভাব প্রকাশ কর, সেভাবেই হোক ইংরেজীবিদ্যা গ্রহণ করে বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক মুসলিম সমাজ গঠন করা, হিন্দুদের সাথে কিংবা কোন বেদ্বীনের সাথে লড়াই এর সময় এটা নয়, লড়াই করতে হবে নিজের সাথে নিজের রক্ষণশীল এবং অন্ধকারে ডুবে থাকা সত্ত্বার। তবে আফসোস শিক্ষা-চিন্তার এই প্রসারতা মুসলিম সমাজ তখন হারিয়ে ফেলেছিল। পীরবাদিতা কিংবা সুফীবাদীতার সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবই মূলত মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের পথে এক অমিমাংসীত অন্তরায়।

বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ এর দ্বিধাগ্রস্থনীতিই মূলত তাদের অপ্রশস্থ দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির মূল। বিংশ শতাব্দীর '৫০'-এর দশকের পূর্ব পর্যন্ত (হিন্দু-মুসলিম) বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির যত মাতামতি হয় তার পুরোঠাই হয় জাত নিয়ে। হিন্দুদের পক্ষ হতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী যেমন বাঙালিকে একসত্ত্বায় বসবাস কৃত মানুষ্যজাতি হিসেবে ভাবতেন ঠিক তেমনি কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী ইমদাদুল হক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী তারাও মুসলিমদের পক্ষ হতে ছুলে জাত যাবে না, নীতিতে ছিলেন বিশ্বাসী। কিন্তু ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ ও ১৮৮৫-তে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের কিছুসংখ্যক ঘরোয়া মধ্যবিত্তশ্রেণিভুক্ত রাজনীতিবিদদের চরম অদূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে রবীন্দ্র নজরুল চেতনা সেই সাথে বাঙালি শুদ্ধীকরণ ইসলামের জাগরণ দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যারিস্টার মহাত্মা গান্ধী এবং কায়েদে আজম জিন্নাহ এই ক্ষতি রুখতে পারে নি। বাঙালি মুসলমান যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মর্ম বুঝতে শিখছে তখন তারা হিন্দুদের কাছ থেকে আঘাত পেল, ইংরেজগণ তখন তাদের দুঃখ দূর করতে আগ্রহী; ঠিক সেই সময় স্যার সৈয়দ আহমদ খানের শিক্ষানীতি বিশেষ করে মুসলিমদেরকে আলাদা করে তার বিরাট সুযোগ নিল পরবর্তীতে কায়েদে আজম জিন্নাহ। অথচ ইংরেজী শিক্ষাকে পৃথকীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সৈয়দ আহমদের উদ্দেশ্যে ছিল মুসলিম ভারতবাসীর উন্নতি। কিন্তু জিন্নাহ সেটিকে নিয়ে যায় জাতিগত দ্বন্দ্বের দিকে। আলোচ্য এই দ্বন্দ্ব জগত আরও প্রসারিত হল যখন তাতে প্রবেশ করল নেহেরু-প্যাটেল। দুই ধারার এই তিনব্যক্তি ও তাদের সহযোগীরা যখণ রাজ্য নিয়ে ভাবত তখন তারা সাধারণ মানুষকে গুরুত্ব দিত না। ইংরেজদের সাথে যখন গোল টেবিল বৈঠক বসত তখন সেখানে জাতীয় স্বার্থই ফুটে উঠত কিন্তু জাতীয়পর্বের সাধঅরণ মানুষ, খেঁটে খাওয়া অসহায় কৃষক-প্রজা, নিচুজাতদের ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই। তাইতো এক এক বছর প্রসূত শিক্ষিত এইসব নেতাদের

দেশবাসী নিয়ে এক একটি পদক্ষেপ হতো এক একটি মৃত্যুও কারাগার। রাস্তায় রাস্তায় পড়ে থাকত অগণিত সর্বহারা মানুষের পঁচা মৃতদেহ। এক একটি উদ্বাস্তু শিবির হয়ে উঠত এক একটি আবর্জনার ডাষ্টবিন যে ডাষ্টবিনে জন্ম নিত ফুলের মত শিশুরা। নবজাতক হয়ে জন্মাত বটে তবে না খেতে পেরে মরে পড়ে থাকত আবর্জনার অভিশপ্ত শিবিরে। নবউত্থিত মধ্যবিত্তশ্রেণি স্ব-স্ব ধর্মকে এতই ভালবাসত যে মানব ধর্ম লজ্জায়, ঘৃণায় নিজেকেই নিজে কবর দিত কিংবা শ্মাশনের চিতায় দহিত হত। চুঁচুড়া নগরে হাজী মোহাম্মদ মুহসীনের কালেজ সংস্থাপিত হয় ১৮৩৬ সালের ১ জুলাই। এটি এমনি এক বিদ্যামন্দির যা মুসলমানদের বিদ্যাশিক্ষায় বিপ্লব ঘটাতে পারত কিন্তু আফসোসের বিষয় হিন্দুদের একচেটিয়া অধিকার বোধের কারণে মুসলমানগণ তা করতে পারেনি। এতে হিন্দুদেরকে অনেকে দায়ী করে কিন্তু তা ঠিক নয় কেননা হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির মানবিক চিন্তা-চেতনার ক্ষমতায় তারা ভারতের প্রায় সকল শিক্ষাস্তরের আগা-গোঁড়া নিজেদের ভাবজগতে প্রবেশ করিয়ে নিয়েছিল। তাই সে সুযোগ মুসলমানদের জন্য তৈরি হত হিন্দুরা তা লুফে নিতে পারত। তলোয়ারের জোড়ে মুসলিমরা সেই বিদ্যা তাদের বিদ্যা বাক্য হতে কুড়িয়ে আনতে পারতো না। এই চাবিকাটি তখন ইংরেজের কাছে। তখনই তারা ঝুঁকে পড়ত বৃহত্তর শক্তি শাসক বৃটিশদের করুনার কাছে। বৃটিশরা ভাবতে থাকে মুসলিমদের শিক্ষা নিয়ে। ভারসাম্যহীন অথচ গুরুত্বপূর্ণ নানান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্থিত কয়েকজন মুসলিম চিন্তাবিদের মাধ্যমে মুসলমানগণ আধুনিক শিক্ষা নিতে শুরু করে। তখন শুরু হয় বাংলায় মহাসংকট- রক্ষণশীল সুফীবাদী ও ওহাবীপন্থিদের সাথে দ্বন্দ্ব। আধুনিক হতে আগ্রহী পরিবর্তনকামী মুসলিম চিন্তাবিদদের যাদের হাত ধরে বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি বিনির্মাণ পায়। পরিবর্তনশীল র‍্যাডিকেলদের উপর একদিকে আসে হিন্দু আধিপত্যতার ঢেউ অপরদিকে ইংরেজদের ইংরেজী শিক্ষার তুমুল আলোড়ন। তদুপরী বছরে বছরে সমাজে নতুন নতুন আইন ও সেই সাথে ভারতের উত্তাল রাজনীতি। চিন্তাশীল মধ্যবিত্তশ্রেণি খুঁজে পায় না কোন প্লাটফরম যা তাদের সর্বোচ্চ চিন্তা-চেতনা বিকাশের জন্য উপর্যুক্ত। ঠিক তখনই আলো হাতে নিয়ে আবির্ভূত হয় ইংরেজী শিক্ষিত চিন্তাবিদ ও সংস্কারকেরা। যদিও হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা অনেক আগেই সম্পন্ন হয়েছিল। তথাপি মুসলিম আধুনিক মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে উঠার সময় তারা পাশে ছিল নিয়ামক স্বরূপ। কেননা বাঙালিদের সংস্কৃতি কিন্তু ধর্মের দ্বারা তাড়িত ছিল না। হিন্দু-মসুলিম মিলেই ছিল হিন্দুস্থান। তাই সংস্কৃতির সাথে যখনই ধর্ম এসেছে তখনই দাঙ্গা বেঁধেছে। এই দাঙ্গা বাড়িয়ে দিতে তখন আবার যোগ দিল মুসলমান ভাইয়ের পাশে দাড়াব মুসলমান হিসেবে সিন্ধু-বেলচিস্তানবাদী, ওহাবী মতাদর্শী এক আলাদা সংস্কৃতির মুসলিমরা। যারা দ্বন্দ্ব না করে থাকতে পারতো না তখন তারাই শুরু করে বাঙালিদের ধর্মীয় মর্ম বোজানো যার চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় ১৯৪৭-এ যখণ বাংলা ভাগ হয় তখন হিন্দুরা আর সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে মুসলমানদের সাথে থাকার আর আগ্রহ দেখাই নি; বরং হিন্দু মধ্যবিত্তদের এই দল বাংলাভাগকে আরও তরান্বিত করে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাজারও চেষ্টা অবশেষে ব্যর্থ হয়ে মুসলিম লীগে গিয়ে মিলেছে। যাহোক, একটি আদর্শ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বা উন্নতমানসিক দক্ষতা তৈরিতে আধুনিক বিদ্যার সাথে সাথেও যে একটি ইতিবাচক পরিবেশ প্রয়োজন বিশেষ করে প্রশাসনিক ক্ষমতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক সুস্থ গতিশীলতা এবং ধর্মীয় শান্তি ও নিরপেক্ষতাবাদ তদুপরী দরিদ্র বাঙালিদের অভিশাপ ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যে খন্ডিভাবে শতকষ্টেও ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি

নিজেদেরকে সম্পদময় করে গড়িয়ে নিতে পারেনি। যার ফলে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির মানসিক উন্নতি, দৃষ্টিভঙ্গির দক্ষতা হয়েছে সংকীর্ণ। এক্ষেত্রে ইংরেজী বিদ্যা নিতে গিয়ে বাঙালিদেরকে পড়তে হয়েছে আরেকটি দোটানায় এবং সেটাও হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মকে আঘাত করে। কেননা খ্রিষ্টান মিশনারীগণ ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতার অপরিসীম প্রতাপ দেখানোর জন্য হিন্দু কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, হুগলী কলেজ, ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ প্রভৃতি বিদ্যাপীঠে তরুণ শিক্ষার্থীদেরকে 'বাইবেলে' দীক্ষিত করতে ব্যাপক চেষ্টা শুরু করে। শিক্ষার্থীরাও উদ্বুদ্ধ হতে থাকে। তার কারণও অবশ্য বাংলার প্রেক্ষাপট যে প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় কুসংস্কার মানুষকে করত পির্যস্ত। যে ধর্ম মানুষের শান্তির জন্য সেই ধর্মই এখানে যত অশান্তির কারণ। যে ইংরেজী বিদ্যা দিন দিন দারিদ্রতা দূর করছে সেই বিদ্যার সাথে তাহলে কি এবার আপোষ করবে হিন্দু-মুসলিম নাকি বৃটিশ বিরোধী স্বদেশী হবে? ঠিক এমন মুহূর্তে দারুন বিদ্রোহ নিয়ে বাংলায় জাগরণ তুললেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। মাইকেল মধুসূদনদত্তের 'মেঘনাথবদ' কাব্য যেই সময় বাঙালির মনোজগতের বাসনার খোরাক হয়ে জাগরিত হয়; ঠিক সেই সময় রবীন্দ্রনাথ জন্ম নিলেন বাংলাকে সমৃদ্ধ করতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা সাহিত্য সাধনা চতুর্দিক হতে বাংলা ভাষার সম্মান বৃদ্ধি করেছে। তাঁরই হাত ধরে বাঙালির বাঙালিত্ব শির উচু করে দাড়াতে শিখেছে যে সমাজ হতে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি জাগলো সেই সমাজেরই প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি শিশুর বাঙালি হয়ে বেড়ে উঠার গল্প, গান যদি উত্থিত মধ্যবিত্তশ্রেণি সর্বসাধারণে সাধনা করত তাহলে হয়তো বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশপুষ্ট হত আর দৃষ্টিভঙ্গি হত সুপ্রসারিত। রবীন্দ্রনাথ ওহাবীপন্থি মুসলমানদের নিকট অতটা প্রিয় নন; রাষ্ট্রের হিন্দুবাদিতা তার মধ্যে তেমন ছিল না এটাও সত্য। সেই ক্ষেত্রে ভারতের তথা বাংলার হিন্দু-মুসলমান কখনও আলাদা হোক তিনি তা চাইতেন না। তিনি বাঙালির জ্ঞান সাধনা, উন্নতি ও জাগতিক শিক্ষাকোষ বর্ধনে ইংরেজ ও ইংরেজী শিক্ষার স্বপক্ষে দারুন অনড় ছিলেন তবে বৃটিশরা যখন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটায় (১৪ই এপ্রিল, ১৯১৯) তখন তিনি বৃটিশ কর্তৃক প্রাপ্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করে তীব্র প্রতিবাদ জানান। এখানে কবিগুরু তার নিরপেক্ষ ধর্মীয়রীতি এবং অন্যায়ের সাথে আপোষহীন মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন। তবে নিজের পূর্বপুরুষের ধর্মকে সর্বদাই বিশেষ যত্ন নিয়ে ভালবেসে ছিলেন। বাঙালি জীবনে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন ধূমকেতু স্বরূপ। তার সৃষ্টি সুখের উল্লাস, যেন ব্যাথার মধ্যে মানুষকে হাসতে শিখিয়েছে। ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির মনোজগৎকে ইংরেজদের গোলামী হতে মুক্ত থাকার জন্য তিনি তাদের হাতে রাখতে বলতেন রনতুর্য। জাতের বজ্জাতি দিয়ে তিনি স্রষ্টার বিধান দিয়ে সমাজের সব উঁচু-নিচুকে এক করার চেষ্টা করেছেন অবিরত। নবী করিম (স:) মুসলমানদেরকে সাম্যবাদের শিক্ষাই দিয়েছিলেন। দেশীয় জমিদার, মহাজন, ইসলামী চিন্তাবিদগণ যাদের একটি সিদ্ধান্ত কখনও কখনও সাধারণ বাঙালিদের জীবনকে করে তুলত বিপর্যস্ত তখন যে নতুন এর কেতন উড়িয়ে আসে বিদ্রোহ বীর যার হাতেও থাকবে রনতুর্য- সে তুর্য বিনাশ করবে সেসমস্ত কলুষতা যা কিনা উত্থিত মধ্যবিত্তের চিত্তকে সদা কলুষিত করছে। হিন্দু নবজাগরণে সেরকম মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুবিকাশপর্বে ধর্মীয় কিছু বিধি-বিধান, কুসংস্কার বাঁধা হয়ে দাড়ায় ঠিক তদ্রুপ মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণিও তাদের পুষ্টি সমৃদ্ধ বিকাশ পর্বে ধর্মীয় বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখিন হয়। ধর্মীয় আইন মানুষকে রক্ষা করে সৃষ্টির সব ভয়ানক দানব হতে কিন্তু ধর্মেরই কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে পুঁজি করে নিজেকে ক্ষমতাবান করতে মজা

পায়। সাধারণ মানুষও না জেনে অন্ধভাবে তা অনুসরণ করে এবং পিছিয়ে পড়ে অবশেষে দোষী হয় আল্লাহ, না হয় ঈশ্বর, না হয় ভগবান। ধর্ম সত্য, ধর্ম সুন্দর, ধর্ম ঐশ্বরিক, ধর্মের কাছে সব আশরাফুল মাখলুকাত সমান। যে ফসিল সেতো মানুষ নয়। সেতো পশু। সে শাস্ত্র মানুষের নিমিত্তে মানুষ তৈরী করে তা কখনও খোদার চেয়ে, ভগবানের চেয়ে বড় হয় না। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যচর্চার সময় বাংলা ছিল উদ্ভ্রান্ত। হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণি একদিকে যেমন হচ্ছিল রাজনীতি সচেতন অপরপাশে মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেনি গঠনপর্বের ধাপে ধাপে হচ্ছিল ইংরেজী শিক্ষা সচেতন। ব্রিটিশ সরকার ছিলেন দোটানায়। মুসলিমরা যত বৃটিশদের নিকটর হচ্ছিল হিন্দুরা তত শাস্ত্রের দিকে ঝুঁকছিল। হিন্দুদের শাস্ত্র, মুসলিমদের জ্ঞান তৃষ্ণা কিন্তু তারা বাঙালি মুসলিম যারা হিন্দুশাস্ত্রে নিজেদের একাংশকে ম্লান করে রেখেছে, অপরপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার অভাবে এতদিনে গড়া মাথার মগজ যা কিনা রীতিমতো আড়ষ্ট তবে উপায় ? ঠিক এমন সময় বাঙালি মুসলিমরাবৃটিশদের সাথে সাথে প্রভাবিত হতে থাকল অবাঙালি মুসলিমদের দ্বারা। তখন শুরু হল দাঙ্গার সমারোহ। কাজী নজরুলের কাব্যচর্চা এই সময় মোড় নেয় অসাম্প্রদায়িকতার দিকে। প্রচারিত করতে লাগলেন তার মন্দিরে-মসজিদে ও হিন্দু-মুসলমান কবিতা। যার প্রভাব সমসাময়িক পরিস্থিতিতে তুমুল জোয়ার আনলেও রাজনীতির শায়তানি জোয়ারকে কেউ আটকীয়ে রাখতে পারেনি। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি দ্বারা রাজনীতির এই ধ্বংসজ্ঞ সর্বোতভাবে একটি বিশেষ শ্রেণিকে অবহেলার ফসল একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ১৯৪৩ সালের বাংলায় সংগঠিত দুর্ভিক্ষের প্রতিটি চিত্র শাসক ও মধ্যবিত্তশ্রেণির অসচেতনতার ফসল বলা যায়। ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির অধিকাশ উন্নতজীবনধারণ, চাকুরীর সুবিধাদি, তদুপরী সন্তান ও পরিবার লালন-পালনকে গুরুত্ব দেয়া হেতু নগরে বসবাসকে উন্নত সভ্যতার বহিঃপ্রকাশ মনে করত। যার প্রেক্ষিতে যারা ইংরেজী জানত কিংবা অশিক্ষিত তারা যেমন চাকুরী পেত না; তেমনি তাদের জীবন ছিল গ্রাম ও তার জমিচাষ এবং গোয়ালের গরু। কৃষক ও হতদরিদ্রদের এই দুই বিষয়ে আবার স্বঅধিকার না থাকতে তারা ছিল হতাশ ও আনন্দহীন, শক্তিহীন তার উপর শহুরে মধ্যবিত্তদের স্বার্থপরনীতির ফলে তাদের দুঃখের কথা, ক্ষেভের কথা, অধিকারের কথা বৃটিশ সরকারের কানে পৌছাত না। ফলে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ না হওয়ায় দেখা দিত খাদ্য সংকট। এই সংকট হতে আবার চাল-গম চলে যেত বৃটিশ সৈনিক ও উচ্চবিত্ত মানুষের পেটে। ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষুধার্ত দিনমজুর, ভিখারী গরিব ও কৃষকরা যখন মন্দিরের পুরোহিতের ভোজনালয়ে যেত, তখন দ্বার বন্ধ হয়ে যেত, আবার বুকে আশা নিয়ে যখন মসজিদেও মৌলভীর মিলাদ, ফিন্নী, গোশত-রুটি খেতে দিতে বলত তখন সেই মসজিদের দ্বারও বন্ধ হয়ে যেত। এমন সময় ক্ষুধার্ত শিশু ও ক্ষুধার্ত পেট নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত মানুষেরা হাত দু'খানি উপরে তুলে সৃষ্টিকর্তাকে ডেকে ফরিয়াদ জানাত আর বলত– এ তোমার কেমন মন্দির, কেমন মসজিদ! যেথায় দয়া নেই। ওখানে বসে যারা তোমায় পূজে তারা তোমার রূপে নেই, তারা এখন এক একটা শয়তান, এক একটা ক্লীভ। সমাজতন্ত্রের দোলা তখন সমগ্র ইউরোপে এবং ইউ.এস.এস আরে সে মন্ত্রনায় কৃষক, শ্রমিক পেত শান্তি, সে তন্ত্রে ধর্ম বড় না হয়ে বড় হত মানুষ। ঠিক এই যন্ত্রণা তখন ভারতবাসীর মধ্যবিত্তশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টাতে থাকল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হিন্দুরা যতবেশী মাত্রায় ধর্মকে ভুলতে থাকল; তার চেয়ে বেশি মাত্রায় বাংলার মুসলিম চিন্তাবিদগণ ইসলাম ধর্মকে ভুলে যেতে থাকল। কাজী নজরুল ইসলাম মুসলিম সাহিত্য সমাজের একজন

একনিষ্ঠ সেবক কবি, সংস্কারের কবি, জাগরণের কবি তখন মুসলমানদের বোঝাতে শুরু করলেন সমাজতন্ত্রের সাথে ইসলাম ধর্মের কোন বিরোধ নেই।

বরং এই দুটি ধারার মিলনেই আসবে মুসলমানের মুক্তি। মধ্যবিত্তশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সাম্যবাদী মন্ত্রের দারুন প্রভাব পড়লেও রক্ষণশীল কট্টর ইসলামবাদী মুসলিমগণ তা মেনে নিতে পারে নি বলে শিক্ষা কার্যক্রম পূর্ব বাংলায় দারুনভাবে ব্যাহত হয়। কেননা বুদ্ধিজীবী মুসলমান শিক্ষকগণ বিশেষভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাদের মধ্যে দু'টি ধারার সৃষ্টি হয়। আর যার সুযোগ নেয় অবাঙালি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বালুকাময়, কোথাও উত্তপ্ত দাবদাহ, কোথাও বরফের কাঁটার মত শীতল মুসলিম চিন্তাবিদও তাদেও রাজনীতি সচেতন শিক্ষিত নেতারা। ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগ, বাংলা ভাগের পর হিন্দু প্রফেসর যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ ছিলেন তাঁরা যখন চলে গেল পশ্চিম বাংলায়, তখন প্রাচ্যের এই অক্সফোর্ড-এ শিক্ষক ঘাটতি দেখা দেয়। যখন মুসলিম লীগের নেতাদের হাতে পূর্ববাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা। মুসলমানদের বুদ্ধিমুক্তির চিন্তা ছিল সাম্যবাদী মন্ত্রনায় মিশেল। তাই ঐ শিক্ষক সমাজ যারা মুসলিম সাহিত্য সমাজের সাথে জড়িত তারাও হতে থাকলেন অপর্যস্ত। যে মুসলিম শিক্ষকরা পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ববাংলায় এলেন তারা থাকত সর্বদা স্থানান্তরকরণের ব্যথায় হতাশ। উচ্চশিক্ষার এমন দৃরাবস্থায় মধ্যবিত্তশ্রেণির মানবিক বিকাশ সংকীর্ন হতে থাকল। এর প্রভাব পড়ল তখন সমগ্র পূর্ববাংলায়। এদিক দিয়ে সবে পাট চাষে সমৃদ্ধ হওয়া শিখল পূর্ববাংলা। যাকে ঘিরেই আর্থিক উন্নতি এবং ইংরেজী শিক্ষার্জন, ভাল চাকুরী, পরে মধ্যবিত্তের প্রভাবশালী অবস্থান। ভাল অথচ সুযোগ সমৃদ্ধ চাকুরীগুলির দখলদারিত্বে তখন চলে আসতে থাকে পশ্চিম-পাকিস্তানের শিক্ষিকেরা। পূর্ববাংলা হতে থাকল উপনিবেশ মুসলিমদের হাতে উপনিবেশিক কায়দায় নির্যাতনের শিকার।

তবে এক্ষেত্রে ইংরেজদের বড়দান ইংরেজী শিক্ষা পূর্ববাংলার মুসলিমদের জন্য আশীর্বাদ হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের জেনারেলদের এমন কোন আশীর্বাদ ছিল না যা পূর্ব বাংলার মানুষ নিতে পারে। ইংরেজী শিক্ষা তথা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রভাবিত পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে বড় স্বার্তকতা ছিল মুসলিম উপনিবেশ হতে বলা যায় গোশত-রুটির মুসলিম সম্প্রদায় হতে ভাত-মাছের মুসলিম সম্প্রদায়ের মুক্তি। মূল্যবোধ আর বেঁচে থাকার লড়াই যদি একবিন্দুতে মিলে যায় তাহলে সামজ উন্নত হবেই। আন্তর্জাতিগক ভাষায় শিক্ষিত হলে বেঁচে থাকার লড়াই স্বাদ পায়। তখন মানবজাতির কর্মোদ্যম বৃদ্ধি পায়। আর মূল্যবোধকে যদি এখানে মিলাতে হয় তাহলে নিজ নিজ ধর্মের সঠিক শিক্ষা এবং আইনও তাকে এখানে প্রদান করতে হবে। তখনই তৈরী হবে পরিবর্তন এবং ইতিবাচক পন্থায় এগিয়ে যাবে মানব সম্প্রদায়। সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি মঙ্গল নিহীত থাকে তাহলে যে সম্প্রদায় ধর্মের জন্য সেই শিক্ষা গ্রহণ করেনা, বুঝতে হবে সেই সম্প্রদায় আপন ধর্মের সঠিক জ্ঞান নিতে পারেনি ফলে দৃষ্টিভঙ্গি এখানে দোদুল্যমান। ইংরেজরা যখন ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলায় আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষকে প্রভাবিত করে তখন তাদের উদ্দেশ্যে যদিও আত্মকেন্দ্রিক হয় তথাপি বিশ্বকোষকে ধারন করার মনোভঙ্গির পথ তৈরিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। হিন্দুরা যত দ্রুত তার তাৎপর্যতা বুঝতে পারে মুসলমানরা তার গুরুত্ব অতি দ্রুত বুঝতে পারেনি কেননা মুসলিমদের গতানুগতিক চলমান শিক্ষায় ত্রুটি ছিল। তাই বলে ইসলামকে

দোষারোপ করলে চলবে না। কেননা ইসলাম কখনওই একজন মুসলিমকে বলে না যে পার্থিব জ্ঞান মুসলিমদের জন্য সীমাবদ্ধ। বরং ইসলামের সুমহান মর্যাদা সেইসব মানুষের হাতে ধ্বংস হয় যারা এই ইসলাম ধর্মের শিক্ষাকে সংকুচিত করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। বাংলার মুসলমানদের জীবনে (সময় ইসলাম প্রচার পর হতে বর্তমান পর্যন্ত) সবচেয়ে বড় দু:খের বিষয় রাসূল (সা:)-এর জ্ঞানের চাবিটি মুসলিম শাসক, চিন্তাবিদ ও সংস্কারকগণ সঠিকভাবে মানুষের কানে পৌঁছাতে পারে নি। মন ও হৃদয় সম্প্রসারণের জন্য মানুষের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা চিরশ্বাসত। কিন্তু এই ইচ্ছাশক্তিকে কেউ যদি ভূল পথে নিয়ে যায় তাহলে মানুষের আর উপায় থাকে না। বাঙালিরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণিতে প্রবেশ করে। সংস্কারবাদী মধ্যবিত্তশ্রেণির অন্তর্ভূক্ত মানুষজন ছাড়া বাকীরা তাদের অন্ধজগত নিয়েই চলতে থাকল। আঁকড়ে ধরে থাকল তাদের সমাজব্যবস্থা কিন্তু নাম আসল ধর্মীয় ব্যবস্থার। ধর্ম এক স্থানে দাড়িয়ে চুপ থাকে আর বলে আমি যদি বলতে পারতাম তাহলে তোমরা আমাকে নিয়ে এত টানাটানি করতে পারতে না, দোষারূপ করতে পারতে না, এ তোমাদের মূর্খতা যে তোমরা ধর্মের প্রকৃত অথচ পবিত্র আইনগুলি জান না। মানুষের উন্নতির জন্য যে ধর্ম সে কখনও মানুষের ধ্বংস করতে পারে না। জ্ঞানের অভাবে মানুষ আজ নিজের মতের সাথে ধর্মের বিরোধে মত্ত তাই এই অবস্থায় মধ্যবিত্ত সচেতন শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল্যবোধ সঠিক পুষ্টি পায় না। ফলে সমাজ ব্যবস্থা হয় অস্থির, জেনারেশন এর গঠনতন্ত্র হয় অপুষ্ট। বাংলায় শতবর্ষ ধরে মুসলমান শিক্ষা ব্যবস্থার যে চলমান গতি ছিল তা ১৭৫৭-এর পর নতুন দিকে মোড় নেয় আর তা হলো পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে। পাশ্চাত্যশিক্ষাকে আশীর্বাদ হিসাবে প্রমান করতে গিয়ে অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ ইসলামধর্মের সাথে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে ফেলেছিলেন, ইসলামী চিন্তাবেতনাকে দোষারোপ করেছিলেন ঢালাওভাবে যার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্মুখ যে অভাবনীয় ফলাফল বাঙালিদের পাওয়ার কথা তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। অপরদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের জাগতিক চিন্তাবিদগণও ধর্মের সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘর্ষে ছিলেন অগ্রগমী। তাইতো মধ্যবিত্তশ্রেণি মুক্ত মনে এগুতে পারেনি। শিক্ষা মানুষের সৃষ্টিগত অধিকার। পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের অধিকার আরও বেশি কেননা যে জাতি শিক্ষার সামগ্রিক তাত্ত্বিক আলো জ্বালাতে পারে মানুষ তার পিছনে ছুটে যেতে যায়। সে যেই হোক না কেন আরব, ইংরেজ, পারসিক, গ্রীক, ফ্রান্সিস কিংবা তিব্বতীয়। কিন্তু বাংলায় সৃষ্ট মধ্যবিত্তশ্রেণি হঠাৎ করে ইংরেজগণের ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এতবেশি পরিমানে প্রভাবিত হতে শুরু করেছিলেন বিশেষ করে উনবিংশ ও বিংশ শতকে যে তারা তাদের নিজেদের ধর্মকে অন্তর থেকেই আলাদা করে দিতে লাগলেন। স্বধর্মকে সরিয়ে ছিটকে ফেলে দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি তথা শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি নির্মাণ করা সম্ভব হলেও মানবতামুখী, মূল্যবোধ অন্তরে জাগানো সম্ভব নয়। ইসলাম ধর্মের যে মানুষ কিংবা তার দ্বারা চালিত সমাজ ব্যবস্থা অসচেতন, গোড়া রক্ষণশীল শাস্তি কিংবা ইংরেজী বিদ্যা গ্রহণ না করার জন্য দোষের ভাগীদার হবে সে নিজে ইসলাম ধর্ম নয়। ঠিক একইভাবে হিন্দু বাঙালিদের বেলায়ও তাই। কুরআন ও হাদীসের সঠিক শিক্ষা যদি মুসলমানরা তৎসময়ে পেত তাহলে হয়তো দীর্ঘসময় ধরে রাজত্বে থাকা মুসলমান সর্বহারা হয়ে বাংরার দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াত না। অপরদিকে মুসলমানদের কাছ থেকে বাংলা ভাষাকে ও তার সংস্কৃতিকে নিয়ে আলাদা হওয়ার মনো বাসনায় মেতে উঠতো না। তাই বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণি পাশ্চাত্যবিদ্যায় বিদৃষী হয়েও উদার মনোভাব কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে শেষ পর্যন্ত কোটি মানুষের

নয়নের জলকে উপেক্ষা করেও এই সুশীল পন্ডিত ব্যক্তি ও রাজনীতিবিদগণই ভারতকে খন্ডিত করে সর্বউদ্দেশ্য চরিতার্থ করে।

তথ্যসূত্রঃ

০১. Winchester Simon, *Atlantic: A Vast Ocean of a Million Strories*, Harper Press, New York, 2011, P, 221.

০২. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*, দি প্রকাশন, কোলকাতা, ১৯৬৮, পৃ, ৭৮।

০৩. Kondker Fuzli Rubbee, *The Origin of the Musalmans of Bengal: Being a translation of Haqiqate Musalman-I Bengalah*, Thacker, Spink& Co, Calcutta, 1895, P, 56.

০৪. অরবন্দি পোদ্দার *মানবধর্ম ও মঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগ*, ইন্ডিয়ানা লিমিটেড, কোলকাতা, ১৯৫৫, পৃ, ৬৮।

০৫. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাঙলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, ২য় খন্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৯৯৩, পৃ, ২৪২-২৪৩, ৩৩৪-৩৫০।

০৬. K. M. Panikkar, *Survey of Indian History*, Asia Pub. House, USA, 1954, P, 198.

০৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী (শতবার্ষিকী সংস্করণ)*, ১৩ শ খন্ড, বিশ্বভারতী, কোলকাতা, ১৩৫৭, পৃ, ১৯২।

০৮. K. M. Panikkar, *Op.cit.*, P, 199.

০৯. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, বাংলাদেশ ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতি, প্রবন্ধ, ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ (১৮৭২-১৯৩১),অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ, ৯২ ও ৯৪।

১০. Report of the Census of Bengal 1891, Vol. V., C.J.O. Donnell, *The Lower provinces of Bengal and their feudatories*, The caste tables, The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1893, P, 24.

১১. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৯৯।

১২. Bengal Dist. Gazetteer, Hoogly, 1901, P, 98.

১৩. বিনয় ঘোষ,*বাংলার নবজাগৃতি*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা ২০১৬, পৃ, ৯৭।

১৪. মীর জুমলার প্রকৃত নাম মীর মোহম্মদ। পারস্যের ইস্পাহান শহরে তার জন্ম। কর্মের সন্ধানে তিনি ভারতে আসেন এবং কালক্রমে আওরাঙ্গজেবের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। ১৬৬০ খ্রিস্ট্রাব্দে তিনি বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন।

১৫. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ৩য় খন্ড, শিরীন আখতার, 'নবাবী আমলে জমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি ভিত্তিক সমাজ', বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ, ২৪।

১৬. B.H. Baden Powel, Land System of British India, Clarendon Press, Oxford, 1892, P, 54.

১৭. আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি (১৭৫৭-১৮৫৭)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃ, ৩।

১৮. শায়েস্তা খান (১৬০০-১৬৯৪) মোঘল আমলে বাংলার একজন বিখ্যাত সুবেদার বা প্রাদেশিক শাসক ছিলেন। তিনি ১৬৬৪ থেকে ১৬৭৮ সাল পর্যন্ত প্রথম বার এবং ১৬৮০ থেকে ১৬৮৮ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বার বাংলা শাসন করে।

১৯. J.N. Sarker, *History of Bengal*, Vol, II, Ratna Prakushna, Calcutta, P, 397.

২০. Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1963, P, 18.

২১. বিস্তারিত ধারণালাভের জন্য দেখুন আবদুল করিম (অনুবাদ, মোকাদ্দেসুর রহমান), *মুর্শিদকুলী খান ও তার যুগ*, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯, পৃ, ৪৮।

২২. আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ২১।

২৩. N.K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, 2 Vols, Firma K.L. Mikhopadhyay, Calcutta, 1965, P, 16-17.

২৪. P.B. Calkins, J.S.A.S. 1970, P, 803-806.

২৫. Baron Charles John Shore Teiynmouth, *Memoir of the life and correspondence of John Lord Teiynmouth*, Vol. 1, Hatchard, England, 1843, P, 25-26.

২৬. W.W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, Smith Elder and Co, London, 1868, P, 56-57, "Before the commencement of 1771, one-third of generation of peasants had been swept from the face of the earth and a whole generation of once rich families had been reduced to indigence."

"From the year 1770 the ruin of two-thirds of the old aristocracy of lower Bengal dates", P, 56-57.

২৭. মাহবুবুর রহমান, *বাংলার ইতিহাস (১৭৫৭ খ্রী. থেকে ১৯৪৭ খ্রী. পর্যন্ত)*, বুকস ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৬, পৃ, ৫০।

২৮. Ralph Fitch, *England's Pioneer to India and Burma, Companions and Contemporaries, with his remarkable narrative told in his own words*, by J. Horton Ryley, London, 1899, P, 57.

২৯. আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ও সংস্কৃতির রূপান্তর*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ, ৩৫।

৩০. R.C. Mazumder, *An Advanced History of India*, Vol, II, Macmillan & Company Ltd., London, 1978, P, 460,

৩১. J.N. Sarkar, *Studies in Mughal India*, Nabu Press, Calcutta, 2010, P, 208-209.

৩২. Duarte Barbosa , *An Account of the countries bordering on the Indian Ocean and their Inhabitants*, Royal Academy of Sciences, Lisbon, 1812 , Vol, II, P, 145-156.

৩৩. Niccolao Manucei, *Storia do Mogor, or Mogul India (1653-1708)*, Vo, IV, Translated by William Irvine, E.P. Dutton and Company, New York, 1913, P, 156.

৩৪. Duarte Barbosa, Op.Cit, P,145-156.

৩৫. Peter Mundy, Edited by Sir Richard Carnac Temple, *The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia (1608-1667),* Cambridge University Press, London, 1907, P, 146 & App D.

৩৬. Jadunath Sarker, A *History of Bengal (Muslim Period, 1200-1757),* The University of Dacca, Dacca, 1948, Vol, II, P, 250.

৩৭. Ibid, P, 35.

৩৮. স্বপন বসু, হর্ষদত্ত (সম্পাদিত), *বিশ শতকে বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতি*, বিজিত কুমার দত্ত, বাঙালির ইংরেজিয়ানা-বিশ শতক, পুস্তক বিপনি, কোলকাতা, ২০০০, পৃ, ৪৩।

৩৯. *ঐ*, পৃ, ৪২।

৪০. ভারতীয় একটি মাসিক পত্রিকা, *শ্রাবণ*, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকায় লিখতেন।

৪১. ভারতী পত্রিকা, *শ্রাবণ*, ১২৮৪।

৪২. স্বপন বসু, হর্ষদত্ত (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৩০।

৪৩. ভারতী পত্রিকা, *শ্রাবণ*, ১২৮৪।

৪৪. আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ২০৬।

৪৫. আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ২০৬।

৪৬. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ, ৪৫।

৪৭. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ (১৮৮৫-১৯২১)*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ, ১৫।

৪৮. বিনয় ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৪৫।

৪৯. K.S. Shelvankar, *The Problem of India,* Harmondsworth: Penguin, England, 1943, P, 119-120.

৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আমার ছেলেবেলা*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ, ৩৫।

৫১. Lewis Mumford, *The Culture of Cities,* San Diego, New York, 1938, P, 144.

৫২. বিনয় ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৪৬।

৫৩. J. Crawford, *Sketch of the Commercial Resources, Monetary and Mercantile System of British India,* Crawford Colvin & Company Limited, London, 1837, P, 27.

৫৪. Vera Blinn Reber, *British Mercantile Houses in Buenos Anies*, 1810-1880 (Harvard Studies in Business History), Harvard University Press, London, 1979, P, 105.

৫৫. *সমাচার দর্পন*, ১২ই ডিসেম্বর, ১৮৩২।

৫৬. Alfred Van Martin, *Sociology of the Renaissance*, Taylor & Francis Co. Ltd, London, 2017, P, 81.

৫৭. The Calcutta Gazette and Commercial Advertiser, was founded by a colonial officer Franis Gladwin in 1784,

৫৮. স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৭)*, পুস্তক বিপনি, কোলকাতা, ১৯৭৫, পৃ, ১৯।

৫৯. *ঐ*, পৃ, ২০।

৬০. প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, *বাঙালি* সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ, ১০৮।

৬১. আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ২০৭।

৬২. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট, কোলকাতা, ১৯৫৭, পৃ, ৪১।

৬৩. Owing to the Muhammadan law of inheritance, there is a tendency for all Muhammadan families to gradually beeome impoverished, and many of the Ashraf (noble Born) have thus been merged into the rank of the Ajlaf (10w Born)," Census Report of India, 1901, Vol, IV, P. 442

৬৪. Khondkar Fuzli Rubbee, *The origins of the Musalmans of Bengal*, Thacker Spink and Company, Calcutta, 1895, P.,68.

৬৫. W.W. Hunter, Report of the Indian Education Commission, 1883.

৬৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৫৫-৫৬।

৬৭. আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ২০৬।

৬৮. *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, বাঙলার কৃষক সমাজের চিত্র, বৈশাখ, ১৭৭২ শক, ৮১ সংখ্যা; বদরউদ্দীন ওমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ, ১৯-২০।

৬৯. *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা। শ্রাবণ, ১৭৭২ শক, ৮৪ সংখ্যা । বিনয় ঘোষ, *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, (বিনয় ঘোষের এই তথ্য থেকে Bengal Administration Report 1872-73, পৃ, ১১২।

৭০. ক্যাপ্টেন টার্নার ম্যাকনের সাক্ষাৎ ২২ মার্চ ১৮৩২, Parliamentary Papers, The Journal of the Royal Geographical Society of London, 1870, ix, 7351, P, 158.

৭১. কার্তিক চন্দ্র রায়, *দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পূর্বাপর-পরস্পরা*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ, ৬-৭।

৭২. Alexander Duff, *India and India Missions*, Wentworth Press, London, 1840, P, 527.

৭৩. ১৮৩১-এ ডিরোজিওর 'ইস্ট ইন্ডিয়ান' হাজার তিনেক দেশীয় তরুণ ইংরেজী শিক্ষার্থীর কথা জানায় এবং এই সংখ্যা যে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ তাও। দ্র. Examination of a Native hool, "The fast Indian; reprinted in the Indian, Gazette, 2.9.1831. ১৮৩১ এই কৃষ্ণমোহনের 'এনকেয়েরার'-এ প্রকাশিত একটি লেখায় শুধুমাত্র কলকাতা অঞ্চলেই দু' হাজারের বেশি লোকের ইংরেজী শিক্ষালাভের কথা বলা হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী ১৮৩৪-এ কলকাতায় ১টি ইংরেজী স্কুলের মোট ছাত্রসংখ্যা ১৮৬৮। শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা,দ্বিতীয় খন্ড, ১৮৩০-১৮৪০, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৪৮, পৃ, ১৩৩।

৭৪. *The Calcutta Review*, 'History fo the Native Education in Bengal', 1852, Vol, 17, P, 46.

৭৫. সালাহউদ্দিন আহমদ, *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন (১৮১৮-১৮৩৫)*, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০০, পৃ, ৩৯।

৭৬. *The Friend of India* : Quarterly Series, Vol, I, The Mission Press, Harvard University, 1821, P, 129.

৭৭. *Calcutta Review*, 1867, xv, 90, 323.

৭৮. Rapid Sketch of the life of Raja Radhakanta Deva Bahadur, with some notices of his ancestors, and testimonials of his character and learning, Hard Press, Calcutta, 1859, P,19.

৭৯. Reginald, Heber, *Narrative of a journey through the Upper provinces of India from Calcutta to Bombay 1824-25*; *(with Notes Upon Ceylon): An account of journey to Madras and Southern India*, Nabu Press, Calcutta, 2010, P, 92-93.

৮০. Anglo-Indian, Social, Moral and Political: Being a collection of papers from the Asiatic Journal, Vol, I, Hallen & Co., London, 1838, P, 82.

৮১. *সমাচার দর্পন*, ৯, ২, ১৮৩৩, পৃ, ৭২।

৮২. শী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, দ্বিতীয় খণ্ড, (১৮৩০-১৮৪০), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৪৮, পৃ, ৩০১।

৮৩. *Calcutta Review*, 1867, xv, P, 323, 213.

৮৪. সালাহউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৪২।

৮৫. সমাচার দর্পন, ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৮৩০, এবং বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১৮৩০-১৮৪০), ১ম খণ্ড*, বঙ্গিয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৪৮, পৃ, ১৩৬।

৮৬. রাজা রামমোহন রায় ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট বৃহত্তর বাংলা প্রেসিডেন্সির হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল নগরীতে ইন্তেকাল করেন।

৮৭. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলাদেশ ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতি*, প্রবন্ধ, 'রাজা রামমোহন রায়ের আধুনিক শিক্ষা দর্শন', অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ, ১২০।

৮৮. নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়, *রামমোহন রায় সম্মন্ধীয়*, ইন্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ১৯২০, পৃ, ১৪।

৮৯. K. Nag and D. Burman, *English Works of Raja Rammohun Roy or An Appeal to the Christian Public,* Sadharan Brahmo Samaj, Culcatta, 1856, P, 58.

৯০. নগেন্দ্রনাথ চট্টপাধ্যায়, *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়*, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কোলকাতা, ১৮৮১, পৃ, ১৫.

৯১. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ১২১।

৯২. Lewis Mumford, *The culture of cities,* Harcourt Brace Iovanovich, San Diego, New York, London, 1938 1944, P, 72.

৯৩. H.J. Raincy, *Historical and Topographical sketch of Calcutta,* Englishman Press, Calcutta, 1876, P, 118 ; 1802: On The 20th August, A Regulation was passed prohibiting Hindu parents from casting their children off sagar Island".

৯৪. Tapon Raychowdhury, *Europe Reconsidered*, Oxford University Press, Delhi, 1988, P, 16-17.

৯৫. বিশপ হেবার লিখিত চিঠি, কোনটালা, ১৯৭৫, পৃ, ৪০এ

৯৬. India Gazette, A Upjohn, Calcutta, 1789.

৯৭. Sophia Dobson Collet, *The Life and letters of Raja Rammohan Roy (1822-1894),* Franklin Classics, USA, 2018, P, 163.

৯৮. *Ibid*

৯৯. Syed Mahmood, *A History of English Education in India (1781-1893),* M.A.O. College in Aligarh, Aligarh, 1895, P, 28.

১০০. *Ibid,* P, 29.

১০১. *Ibid*.

১০২. *Ibid,* P, 30.

১০৩. Raja Ram Mohan Roy, *A Conference between an advocate and an opponent of the practice of burning widow's alive,* Noya Prokash, Calcutta, 1987, P, 22.

১০৪. Raja RamMohan Roy, *Brief Re-marks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females,* According to the Hindoo Law of Inheritance, Nabu Press, Calcutta, 2011. P, 32.

১০৫. Raja RamMohan Roy, *Essays on the Rights of the Hindoos over Ancestral Property according to the law of Bengal,* Baptist Mission Press, Calcutta, 1830, P, 28.

১০৬. স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)*, পুস্তক বিপনি, কোলকাতা, ১৯৭৫, পৃ, ১০৭এ

১০৭. Thomas Edwards, *Henry Derozio*, Newman & Co. Ltd, Calcutta, 1884, P, 126.

১০৮. Sir Edward Rayan to Bentinck, 13 June, 1831, Bentinck Papers.

১০৯. David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian. Modernization (1773-1835)*, University of California Press, California, 1969, P, 269.

১১০. সমাচার দর্পন, ৭০৩ সংখ্যা, ৫.১১.১৮৩১

১১১. অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ছিল হেনরি ডিরোজিও'র শিষ্যদের মিলনস্থল, Bentinck Papers. Enclosure to Idward Ryan to Bentick, 13.6.1831.

১১২. আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ, ২০৮।

১১৩. স্বপন বসু, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ১৮৭।

১১৪. India under Foreigners, The Hindoo Pioneer, October, 1835, reprinted I 19th Century tudies, No.4, October, 1873, P. 417-425.

১১৫. ভূম্যধিকারী সভা, দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ৮.৫.১৮৪৩, পৃ, ১৩৫-৬।

১১৬. Prospect of Hindu Improvement, reprinted from Enquirer, The Indian Gazette, 4.2.1832.

১১৭. একটি সমসাময়িক খ্রিস্টান মিশনারী সাময়িকপত্র অনুযায়ী "ইনকেয়েরার" এবং "জ্ঞানানেষন" এই দুইটি পত্রিকা "হিন্দু সমাজের একটি ক্ষুদ্র শিক্ষিত শ্রেণির মুখপাত্র। এই শ্রেণির তরুণরা ইংরেজী সাহিত্যে সর্বোচ্চ বুৎপত্তি অর্জন করেছে এবং উদারপন্থী ভাবধারা প্রকাশের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে। এরা কোনো সমস্যার আধা সমাধানের অসারতা সম্পর্কে সচেতন এবং দু'মুখো নীতি অবলম্বনকারীদের ঘৃণা করে। তারা বিসর্জন দিয়েছে হিন্দুধর্মের সবকিছুই, তা সেটা তাত্ত্বিক হোক, লোকাচার সংক্রান্ত কিংবা সনাতন, প্রাচীন, বিকৃতরূপ বা আধুনিক অথবা বেদান্তিক এবং পৌরানিক যাই হোক না কেন, এবং তারা ধর্মের ব্যাপারে শূণ্যস্থানে অবস্থানন করে বিশ্বের সামনে ঘোষণা করেছে যে, মুক্ত চিন্তার মাধ্যমে তারা সত্যকে অনুসন্ধান করতে চায়" অনুবাদ Calcutta Christian Observer October 1832, I, 213.

১১৮. Bengal Hurkaru, 3 October 1831

১১৯. India under Foreigners, The Hindoo Pioneer, October, 1835, reprinted I 19th Century Studies, No.4, October, 1873, P, 425.

১২০. ভূমধ্যধিকারী সভা, দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ১.১১.১৮৪৩, পৃ, ১৩৫-১৩৬।

১২১. Alexander's, East India Magazine and Colonial and Journal, Vol, 7, January-June, London, 1834.

১২২. British Empire in India, Reprinted from the Enquirer, Vol, 10, February, 1789. The Indian Gazette, 10.2.1832

১২৩. Bengal Hurkaru, 3 October 1831.

১২৪. ডিরোজিও ১৮৩১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর কলেরায় আক্রান্ত হন এবং ২৬ ডিসেম্বর মাত্র তেইশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

১২৫. ভূমধ্যধিকারী সভা, দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ১.১১.১৮৪৩, পৃ, ১৩৫-১৩৬।

১২৬. Alexander's, East India Magazine, Vol, 13, January-June, London, 1837.

১২৭. Prospects of Hindu Improvement Reprinted from the Enquirer, The Indian Gazette, 4.2.1832.

১২৮. 'রাইয়ত, দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ১.১১.১৮৪৩, পৃ, ৩১১।

১২৯. The Zaminder and the Ryot, The Calcutta Review, 1844, No. XII, P. 333.

১৩০. British Empire in India, reprinted from the Enquirer, the India Gazette, 10.2.1832.

১৩১. British Empire in India, reprinted from the Enquirer, the India Gazette, 10.2.1832.

১৩২. আনিসুজ্জামান, *বিদ্যাসাগর ও অন্যেরা*, অন্যপ্রকাশ, একুশের বইমেলা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ, ১১।

১৩৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময়কাল ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০, ১২ আশ্বিন ১২২৭, তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবী।

১৩৪. আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ১৫।

১৩৫. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ, ১৬০-১৬১।

১৩৬. বিনয় ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ১৬৪।

১৩৭. বিনয় ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ১৬২।

১৩৮. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, তৃতীয় খন্ড, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ১৩৬৬, পৃ, ১৭।

১৩৯. রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রবন্ধ সংকলন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শীর্ষক প্রবন্ধ, এভারেস্ট বুক হাউস, কোলকাতা, ১৯৫৯, পৃ, ৩।

১৪০. সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২৪.১০.১৮৫০।

১৪১. বিহারী লাল সরকার, *বিদ্যাসাগর*, শাস্ত্র প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯২২, বিংশ অধ্যায়, পৃ, ৩৪৫-৩৫৯।

১৪২. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ছিলেন একাধারে কবি, লেখক, বাগ্মী ও রাজনীতিবিদ। শৈশব থেকেই পড়াশোনার ভীষণ মনোযোগী ছিলেন, ছিলেন নীতিনিষ্ঠ। সাহিত্যচর্চাও তার ছোটবেলা থেকেই । তিনি ১৮৮০ সালের ১৩ই জুলাই সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালের ১৭ই জুলাই তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৪৩. আবদুল কাদির সম্পাদিত, *সিরাজীরচনাবলী*, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৬, পৃ, ১৯৫।

১৪৪. নবনূর, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০, সৈয়দ আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন, প্রবন্ধ, সাহিত্যশক্তি ও জাতি সংগঠন, পৃ, ১৪৭।

১৪৫. Birdly Birt, *Twelve men of Bengal in the Nineteenth Century,* S.K. Lahiri & Co. Calcutta, 1910, P, 112.

১৪৬. Abdul Latif, *A minute on the Hooghly Mudrassah,* Suburban Municipal Press, Calcutta, 1877, P, 23.

১৪৭. ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি, প্রবন্ধ, মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাধারা (১৮৬৩-১৯২৫), এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০২, পৃ, ৫২।

১৪৮. Rafiq Zakaria, *Rise of Muslims in Indian Politics, An analysis of developments from 1885 to 1906,* Somaiya Publications, Bombay, 1910, P.17, সৈয়দ, পাদটিকা-৬৪।

১৪৯. K.K. Aziz, Ali, *Ameer Ali, His life and works,* Publishers United, Lahore, 1968, P, 35.

১৫০. Nazmul Karim, *The Modern Muslim Political life in Bengal,* London School of Economics and Political Science, London, 1964, P, 300.

১৫১. Delowar Hossain Ahmed, *The future of the Mohammedan of Bengal,* Thacker Spink & Co., Calcutta, 1889, P, 44.

১৫২. BLCP, Vol, XLV, 1913, P, 576-581.

১৫৩. The Mussalman, ১৯১৩ সালের এপ্রিল ও মে মাসের বিভিন্ন সংখ্যায় এ বিষয়ে সংবাদ রয়েছে।

১৫৪. CUC Report, Vol.1, Part.1, P.212-213. এ কে ফজলুল হক ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত আরও প্রাসঙ্গিক সুপারিশ রেখেছিলেন।

১৫৫. মিল্লাত পত্রিকা, ৯ই মে, ১৯৪৭, ৫ই জুলাই, ১৯৪৬ তারিখে জমিদারী প্রথার বিলুপ্তি নামে সাপ্তাহিক মিল্লাত পত্রিকায় একটি কলাম ছাপা হয়। অবশেষে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন নমে বিল পাস করা হয়। উৎস, বদরউদ্দিন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ, ৮৯-৯৮।

১৫৬. আনিসুজ্জামান, *বিদ্যাসাগর ও অন্যেরা*, অন্যপ্রকাশ, একুশের বইমেলা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ.৬৬। মীর মশাররফ হোসেন ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে নদিয়া জেলার অন্তর্গত লাহিনীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মীর মোয়াজ্জাম হোসেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ শে নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

১৫৭. বঙ্গদর্শন, পৌষ-ভাদ্র, ১২৮০, কোহিনূর পত্রিকা, ভাদ্র, ১৩০৫, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ভাদ্র, ১৩৬৫।

উপসংহার

শিক্ষা সর্বজনীন। তবে কিভাবে? এমন প্রশ্নই ছিল উনিশ এবং বিশ শতকের বাঙালি মুসলমিদের মনে। এক্ষেত্রে মধ্যবিত্তশ্রেণি একটি বিশেষ অবস্থানে থেকে নিজেদের চিন্তা ও চেতনাকে বিকশিত করতে থাকে। এই আলোচ্য সময়ে (১৮৫৭-১৯৪৭) মধ্যবিত্তশ্রেণি কেন একটি বিশেষ বিষয় ইতিহসের পাতাগুলিকে অতি সুষ্ঠুভাবে জাতির সামনে তুলে না ধরার কারণে এই বিষয়টি একবিংশ শতকে এসেও বিভ্রান্ত। বাংলায় বলা যায় সর্বদাই একজন অতি মানব-মানবীরূপ দার্শনিক এর অভাব ছিল এবং আছে। ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনার নব নব আলোচনা-সমালোচনা একটি দেশের, জাতির সত্ত্বাকে টিকিয়ে রাখে। চিন্তার বিবর্তন যে দেশে যতবেশি মাত্রায় কার্যকর সে দেশ সার্বিকভাবে ততো শিক্ষিত হতে বাধ্য। কিন্তু এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষের একান্ত নিজস্ব স্ব-উদ্যোগের ফল। নিজস্ব চিন্তা-চেতনা না হলে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যেমন সম্ভব নয় তেমন শ্রেণি বিন্যাস মোতাবেক সমাজস্থ গুরুত্বপূর্ণশ্রেণিকে বের করাও দুরূহ বটে। তাই বলা যায় যে মধ্যবিত্তশ্রেণি সঠিক, আধুনিক সাবলীল শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, তার পক্ষে সমাজের সাথে সাথে রাষ্ট্রের সর্বজনীন শিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করাও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবুও দ্বিধাগ্রস্থ মস্তিষ্কের আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি বাংলার প্রতিটি বিষয় নিয়ে ভেবেছে। কোন কোন ভাবনা যেমন তাদের ইতিবাচকতায়পূর্ণ আবার কোন কোন ভাবনা নেতিবাচকতায় ভরপুর। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে গঠিত হওয়া শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষা চিন্তা ততটা দৃঢ় ছিল না; ছিল দ্বিধাগ্রস্থ। তবে নানা সংকট কাটিয়ে ইংরেজী জানা শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি বাঙালি জন-মানসের উপর অর্পিত সময়ে বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে বাঙালির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, প্রশাসনিক ও বিবর্তনক্রিয়াকে ত্বরানিত করে। ত্বরণ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত প্রকাশই হল বাংলার মানুষদের স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস। স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস ইতিবাচক এবং গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে মধ্যবিত্তশ্রেণির চিন্তা চেতনা যে দিকটি বাঙালি জনমানসকে নেতিবাচকতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল তা হল ব্যক্তিসাতন্ত্রবাদ। এই তত্ত্বটি এমন যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি চাকুরী করবে এবং সেই অর্থ দিয়ে পরিবার লালন-পালন ও নিজের সুখ-সাচ্ছন্দ নিশ্চিত করবে। মধ্যবিত্তশ্রেণিভুক্ত যে মানুষগণ এইরকম জীবনধারণ নিশ্চিত করতে পারবে না সে ক্রমান্বয়ে হতাশা হবে, এই হতাশা অবশেষে তাদেরকে দুর্নীতির দিকে ধাবিত করবে।

কালপর্ব ১৮৫৭ - ১৯৪৭, বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষা-চিন্তা ঠিক কেমন ছিল; বিষয়টি এক প্রকার কালক্ষেপনের মতো বলা যায়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের শুরুর পর্যায় থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত বাঙালিদের মধ্যে এক মুক্ত চিন্তার উদ্ভব দেখা দেয়। তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ শুরু হয়। তৎসময়ের বাংলা ও ইংরেজী সাময়িকপত্র যেমন: সংবাদ প্রভাকর, সম্বাদ ভাস্কর, সোমপ্রকাশ, হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রভৃতি পত্রিকা এককভাবে মুসলমানদেরকে সম্প্রদায়গতভাবে আঘাত করে। হিন্দু-মুসলিম জাতীয়তাবাদকে ধূলিসাৎ করার জন্য নানান লিখা প্রচার করা হত যা মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ প্রীতি নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। তবে হিন্দু সিপাহী মঙ্গলপান্ডের উপস্থিতি সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দুদের সমর্থনের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান এই সুযোগটিকে মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজী শিখার ক্ষেত্রে কাজে লাগান এবং

নানান চড়াই-উত্তরাই পেরিয়ে অবশেষে সফল হন। ইংরেজী জানা শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে যে চেতনা শক্তির উদ্ভব ও বিকাশ হয় তার প্রমাণ বহন করে ১৮৬০ সালের নীল বিদ্রোহ। যে বিদ্রোহে দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি অংশগ্রহণ করে। বৃটিশ সরকার খুব তাড়াতাড়ি করেই যেন নীল কমিশন গঠন করে (Indigo-commission) নীল চাষীদেরকে তাদের মহাজনদের হাত হতে রক্ষা করে। এই সময়ে মধ্যযুগীয় বর্বরতার এক দারুন পরিসমাপ্তি হয়। মধ্যযুগীয় বর্বরতার অবসান হলেও মুসলমানগণ বিশেষ করে বাঙালিরা যে নিজেদেরকে মধ্যযুগ-এর আবহ থেকে বের করতে স্বার্থক হয়েছে তা কিন্তু বলা যায় না। কেননা তারা তখন নিজেদের সঠিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বের স্থান নির্দেশ করতে পারেনি।

তাছাড়াও প্রভাবিত বাঙালি মুসলমান ছিল দোটানায় পতিত। একদিকে সুফীবাদের কোমলতা অথচ তাৎপর্যপূর্ণভাবে রবের প্রতি বিশ্বাস রাখলে বাংলা কথা, বাঙালি মানুষজন, সে হোক হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান, আর্য তাদের সাথে মিলেমিশে থাকা যায়। আবার অপরদিকে উত্তরের মুসলমান যারা উর্দুতে কথা বলে, আরবী ও ফারসিকে বিশেষজ্ঞান করে ওহাবী অথবা আসারীয় মতবাদে দীক্ষিত হয়ে রবের প্রতি বিশ্বাস শুধু তারা ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় পতিত মুসলিম ছাড়াও হিন্দু ও কেলাৎ উপজাতি, তাদের সাথে থাকা যায় সে বিশ্বাস মগ্ন রাখে। মুসলমানগণ তখন সোচ্চার। ১৮৭০-এর দিকে তারা সাড়ে পাঁচশত বছরের আগেকার পরিচয়কে যেন আবারও ঢেলে সাজাতে উদগ্রীব হয়। আত্মকেন্দ্রিক মননশীলতা গ্রাস করতে থাকে মুসলিম ও হিন্দুগনদের। বহু বছরের সামাজিক বন্ধন ভাঙ্গতে শুরু করে। শিক্ষা সকলকে রাজনৈতিকভাবে অধিকার আদায়ের জন্য সচেতন করতে গিয়ে এক একটি আলাদা জগৎ নির্মাণ করে। ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠিত হতে থাকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মুসলিম ও হিন্দু জাতীয়তাবাদ তারই ফসল। সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তাই ১৮৮৫ সালে নব উত্থানে বিকাশ আগ্রহী মুসলিমদের আশা-আকাঙ্খাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। ফলে ১৮৮৫ সালে হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণি যখন তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাল তখন মুসলিমগণ সূত্রধরে এগিয়ে চলল এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে অবশেষে একটি সুবিন্যস্ত অথচ বিতর্কিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিনির্মাণে তারা সফল হল। মধ্যবিত্তশ্রেণি যারা গঠন করতে পারলেন না তারা হলেন নীচু শ্রেণির ও নিম্নবিত্তের সাধারণ হিন্দু এবং কৃষক শ্রমিক শ্রেণির সাধারণ মুসলমান। বর্ণ-বিত্ত, আভিজাত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নীচু ও দরিদ্রশ্রেণিকে জ্ঞানের আলোয় ভাসানোর চেষ্টা কোন অগ্রপথিকই তেমন একটা করেনি। তবে ইংরেজ সরকার ও তাদের লর্ডরা আবার বাংলার সর্বস্তরে শিক্ষার আলো জ্বালানোর চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এদিকে খ্রিষ্টান মিশনারীগণ তখন আবার বিতর্কিত ছিলেন তাদের ধর্মপ্রচারের কারণে। ধর্ম হারানোর ভয়ে একদিকে যেমন হিন্দুরা তাদেরকে বাধা দিতে থাকল অপরদিকে মুসলিমরা আতঙ্কে দিন গুনতে থাকল। এই ভয়-আতঙ্কের পরও ইংরেজদের সাহায্য-সহযোগিতা ভিন্ন হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় কিছুটা হলেও দূর্বল সম্প্রদায়। তখন প্রশ্ন উঠত কে তাদেরকে গন্তব্য স্থির করাবে বা নিয়ে যাবে, যার উত্তর আসত বাঙালি সংস্কারকগণ। তবে দুঃখের বিষয় হল এখানেও দেখা গেল সম্প্রদায়প্রীতি। হিন্দু সংস্কারকগণ তাদের ধর্মীয় লোকজন নিয়ে ব্যস্ত, অপরদিকে মুসলমানগণ তাদের ধর্মীয় লোকজন নিয়ে ব্যস্ত। ঠিক এমনই যখন অবস্থা ব্রিটিশ সরকার তখন পড়ে গেল বিপাকে। তবে হিন্দু-মুসলমানের এই

অন্তর্কলহকে ব্রিটিশ সরকার নিজের স্বার্থে কাজে লাগাননি। তারা বরং হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাসমূহ অবলোকন করে অবাক হয়ে ভাবতেন এই দুই সম্প্রদায়কে কখনওই এক করা যাবে না। এটা সত্য তাদের প্রবর্তিত নিয়ম-নীতির ফলেই ভারতীয় উপমহাদেশের আজ এই সংঘাতময় পরিস্থিতি, তবে তা যে এতটা ভয়ংকর হবে তা তাদের চিন্তা ছিল না। বাঙালী চিন্তাবিদদের দ্বিধাগ্রস্থ চিন্তার ফলে সার্বিক উন্নতি মাঝে-মধ্যে ব্যাহত হয়।

উনিশ শতকের প্রথামার্ধের গঠন পর্ব বাংলায় ছিল শ্রেণিস্বার্থের গঠনপর্ব, দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে হিন্দু-মধ্যবিত্তশ্রেণির ব্যক্তিবর্গের চিন্তার ফলে শ্রেণিস্বার্থ কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। শ্রেণিস্বার্থ যত কেন্দ্রীভূত হয় ততোবেশি পরিমানে গ্রাম সমাজ এবং শহুরে সমাজ উভয় স্থানে মানুষে মানুষে সংঘাত বাড়তে থাকে। শ্রেণি চরিত্রের ধর্মানুযায়ী স্বদেশী উঠতি মধ্যবিত্ত ও নব্য অভিজাতবর্গ দারুনভাবে আত্মসেবা-চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে, যার ফলে শিক্ষা বঞ্চিত অগণিত ক্ষুধার্ত গরীব কৃষক ও নীচু জাতের বাঙালিদের কথা বৃটিশ পার্লামেন্ট, বাংলার কাউন্সিল প্লট কিংবা স্বদেশ আলোচনার টেবিলে শোভা পেত না। এই সময়ে বাংলায় আরেকটি ঘটনা ঘটে তা হলো শাসকের শ্রেণিস্বার্থের সাথে শাসকেরই আশ্রয়ে গঠিত মধ্যবিত্তের ক্ষমতা ও সুবিধাভোগের ভাগাভাগি নিয়ে তৈরি কৃত সংঘাত। আর তখনই উঠতি বাবুশ্রেণির গন্ডি পেরিয়ে চাকুরীজীবী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যে বিদ্রোহের জাগরণ ফুটে উঠে। মধ্যবিত্তশ্রেণির এই অংশের মধ্যেকার আর একটি অংশই আবার দেখতে পায় যে সাধারণ জনগণের সম্পৃক্ততার অভাবে তারা তেমন সফল হতে পারছে না। উপরন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষিত অংশের আন্দোলন গণআন্দোলনেও রূপ নিচ্ছে না, ঠিক এমনই অবস্থা যখন চলমান তখন তারা তাদের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনগুলিকে স্বার্থক করার জন্য নীচু শ্রেণির জনগণের উপস্থিতিতি নিশ্চিত করা শুরু করল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এরূপ রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের পর সমাজের গতি-প্রকৃতি নতুন মোড় নিতে শুরু করে। এই নতুন মোড়গুলিই হল মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষা চিন্তার ফসল। নতুন মোড়, কখনও নতুন আন্দোলন আবার কখনও নতুন সম্ভাবনা, নতুন অধ্যায়। বাঙালি সমাজকে ঘিরে, বাঙালিরা এমনভাবে বিবর্তিত হতে থাকে তার ফল আসে পরবর্তী বিশ শতকের পুরোভাগে। সমাজ সংস্কারক ও বিবর্তনের রূপকার শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির চিন্তাগুলি শুধু বাংলায় নয় বরং গোঁটা ভারতবর্ষে এমনভাবে স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে থাকে যা কিনা পরবর্তীতে তথা ১৯৪৭-এ দেশভাগের মধ্যে দিয়ে এক অনিশ্চিত কালপর্বে প্রবেশ করে। কালপর্বে যে সীমানা রচিত হয় তাতে অন্তত হিন্দু-মুসলিম-শিখ, বৌদ্ধ কারওরই জয় হয় নি। বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই আবার ভাবলো তাহলে কী ইংরেজদের জয় হল। উত্তর আসবে বানিয়ানদের জয় পরাজয় বলতে তেমন কিছুই তাদের দর্শনতত্ত্বে উদ্ভাসিত হয় না। কেননা কোন একদিকে তারা যখন পরাজিত হয় তখন তারা অন্যদিকে হতে তার থেকে দশগুণ জয় রচনা তাদের মজ্জাগত, বাঙালি মুসলমান এদিকে জয়কে লালন করে, অপরদিকে পরাজয়কে অস্বীকার করে। আর পরাজিত হলে যাদের কাছে পরাজিত হয় তাদেরকে দোষারোপ করার সাথে সাথে নিজেদের ভাগ্যকে চিহ্নিত করে চুপ করে ভাবে কেউ না কেউ এসে একদিন নিশ্চয়ই তাদেরকে উদ্ধার করবে। হিন্দুদের যে কোন চিন্তকের প্রয়োজন হয় নি তা কিন্তু ঠিক নয়। তবে এক্ষেত্রে হিন্দুজন সাধারণ তাদের ধর্মীয় গোড়ামী, রক্ষণশীলতার মধ্যে দিনাতিপাত করেও নিজেদের ভিতরের শিখাকে জলন্ত

রাখে তার ফলে যেটা হয়, যে যখন কোন অগ্রপথিক তাদেরকে পথের সন্ধান দিতে যায় তখন তাদের পক্ষে পথ খুঁজে পেতে বেশ একটা দেরী হয় না। একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিভক্ত বাংলাদেশ, পাকিস্তান, পশ্চিম বাংলা ও বাকী ভারত, তাকালে দেখা যায় প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন: অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, তথ্য-প্রযুক্তি, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাক্রম, প্রশাসন নীতিমালা সর্ববিষয়ে হিন্দুরাই এগিয়ে রয়েছে। ভারতের রামেশ্বর রাজ্যের এ.পি.জে আব্দুল কালাম যাকে ফায়ার ম্যান হিসাবে বিশ্ব চেনে, তিনি ছিলেন মুসলমান কিন্তু দেশভক্তির কাছে তার ধর্মীয় পরিচয় হার মানে। অপরদিকে বাংলাদেশে বসবারত হিন্দুগণ কখনওই আমাদের দেশের জন্য একজন সেরা মানব-মানবীরূপে চায় না। বাংলাদেশে বসবাস করে বাংলাদেশে বাড়িঘর থাকলেও তারা তাদেরকে গয়াকাশির লোকজনই মনে করে। তাই হিন্দুদের এটা একটি অভ্যাস স্বভাবজাত প্রক্রিয়া। যে তারা নিজেদের সর্বত্রই স্বতন্ত্র রাখে এবং পারে। হিন্দুদের তত্ত্বীয় ফিলোসফীর কাছে বাঙালি মুসলমান-এর তত্ত্বীয় ফিলোসফী তাই ভিন্ন। ভারতে মুসলমানগণ কখনও এক তত্ত্বে এগিয়ে যেতে পারে নি। ভাষার পার্থক্য, ধর্মের তত্ত্বীয় দর্শন, শিক্ষা পদ্ধতির পার্থক্য, দৈহিক, খাদ্য, দেহ অবয়বের পার্থক্য তাদেরকে সর্বদাই ভিন্ন রাস্তায় পরিচালিত হতে বাধ্য করত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলমানগণের মধ্যে যখন মধ্যবিত্তের স্বাদ আসে তখন অবশ্য দু'টি ধারা এক হওয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করে কিন্তু ঐক্যতা ছিল দ্বিধাগ্রস্থ। তাইতো ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান নাম ধ্বংস হয়ে বাংলাদেশ হলো। পশ্চিম পাকিস্তানের অসাম্য নীতিই দুই অঞ্চলের মুসলিম ভাই-বোনদেরকে আলাদা করল। বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির শিক্ষার স্বার্থকতা ও চিন্তার এক্ষেত্রে বিরাট স্বার্থকতাটুকু ছিল এইরকম যে অন্যায় আচরণ ও অসাম্যতাকে উপলব্ধি করা এবং এর প্রেক্ষিত মুসলিম সাম্যনীতি গড়ে তোলা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে উঠার ইতিহাস কিন্তু অতটা সহজ ছিলনা। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থনৈতিক কাঠামোগত চিন্তার বাস্তব প্রয়োগের ফলে প্রথমে হিন্দু সমাজে অর্থের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস রচিত হয়। পরের দিকে মুসলমানগণও শ্রেণিকরণের এইরকম কাঠামোর আবর্তে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে। শ্রেণিস্বার্থ যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠত তখন তারা শান্তি আনয়নের জন্য হয় হিন্দু আইন বিশারদ, শিক্ষক, পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ না হয়ত খ্রিস্টান মিশানারী এবং ইংরেজ সরকারের চিন্তা-চেতনার উপর নির্ভরশীল হতে হত। ইউরোপের খ্রিস্টান জনগণ তখনকার সময়ে ক্যাথলিক চার্চদের বলয় হতে নিজেদেরকে সাধারণ রূপে বিচ্ছিন্ন করেছিল। দুর্দান্ত প্রতাপশালী ইউরোপীয় ক্যাথলিক চার্চদের বলয় হতে মুক্ত ছিল বলে বৃটিশরা তখন পুঁজিবাদী মনোভাবে সাম্রাজ্যবাদ নীতির অনুসরণে চলছিল। এমনটি যদি না হত তাহলে ভারত, বাংলার মানুষদের অবস্থা হত আরও ভয়াবহ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানী ও দ্বৈতশাসন (১৭৬৫), কায়েমের ফলে ১৭৭৭-এ বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ হয় তাতো ইংরেজদের আত্মকেন্দ্রিক শাসনেরই এক ভয়াবহ ফলাফল। এই দুর্ভিক্ষে এত মানুষ মারা গেল, পচল, ক্ষুধার জ্বালায় অসহায় মানুষজন আকাশের দিকে তাকিয়ে একমুঠো খাবারের জন্য এক একটি বিমানের অপেক্ষায় থেকে থেকে করত আর্তনাদ, কিন্তু কেউ শুনত না। খাবারত আসত না, আসত মৃত্যু। খাবারের অভাবে ছোট ছোট শিশুরা রাস্তায় মরে পড়ে থাকল। কখনও কখনও মহাজনের ঘরের বিবিরা জানালাটি একটু ফাঁক করে রুটির একটি ছোট টুকরো ঢিল মেরে উঠানে অসংখ্য ক্ষুধার্ত শিশুদের মাঝখানে কাককে দেওয়া, মুরগিকে দেওয়া খাবারের মত ছুঁড়ে ফেলে খুব তাড়াতাড়ি জানালাটি বন্ধ

করে দিত। ক্ষুধার্ত শিশুদের, মানুষদের রুটির টুকরো নিয়ে কাড়াকাড়ি দেখে, ভিক্ষের জন্য আর্তনাদে পায়ে পড়তে দেখে মহাজন, জমিদার ও তাদের বিবিরা ও অহংকারী সন্তানরা খুব মজা পেত। এ যেন মৃত্যুর সাথে ক্ষুধার্ত বাঙালি দরিদ্রদের এক ধরনের মৃত্যুর খেলা যা রোমের গ্লাডিয়েটর খেলাকেও হার মানায়। সুফীগণ তাহলে পলাশী (১৭৫৭) পূর্বে বাংলার জন্য কী শিক্ষা রচনা করেছিল যা কিনা একজন মুসলিম চিন্তক, বিপ্লবী কণ্ঠস্বর, কলম ধরে সভ্যতার গান রচনা করতে পারেনি, এমন কোন দর্শনতত্ত্ব তৈরি করতে পারেনি যা কিনা বিপদের সময় বাঙালির হাতিয়ার হবে। সুফীবাদী শিক্ষায় অস্ত্রের সংযোগ ছিল না, ছিল মনের আধ্যাত্ববাদের সংযোগ। সুফীতত্ত্বেও মূখ্য একটি সূত্র ছিল এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে সবকয়টি ঘটনার পিছনে তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহপাক ইশারা দিয়ে থাকেন এবং সেই কারণ অনুযায়ী তার ফলাফলও তিনিই প্রস্তুত করে দেন। অর্থাৎ ভাগ্য আল্লাহপাক নির্মাণ করে দেন, এর বাহিরে যাওয়া ও চিন্তা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। মানুষের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস বাংলার সুফীতত্ত্বের মূল। এই তত্ত্বে বাংলার সুফী মতানুসারী মুসলিমগণ এত বেশি অনুরক্ত ছিল যে তারা দৃষ্টির রহস্য উদঘাটন ভুলে গিয়ে অদৃষ্টবাদী মঙ্গলকামনা ও পাওয়া বিভোর হয়। কেননা যদি পারত তাহলে বাংলার মাটি নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী পরিপূর্ণ জ্ঞান সৃষ্টির অভাবে ভূমির সঠিক ব্যবহার করার শিক্ষা তথা কৃষিজ পরিপক্ক জ্ঞান বাংলার কৃষককূলকে, বাংলার চিন্তকরা দিতে পারেনি বলে ভূমি থেকে এই দেশ কখনও যথোপোযুক্ত লাভ পায় নি। এরপর রয়েছে যারা ছিলেন ভূমির মালিক শ্রেণি (অভিজাত বর্গ) তারা কৃষকদের উপর রাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে আরামে দিন কাটাতেন। জমির কখন কি চাহিদা কিংবা ফসলের জন্য কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা, তার গোয়ালের চাষী গরুগুলি কতটা কর্ষন করতে পারবে, সেই শক্তি আছে কিনা, কৃষকের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য ভাল আছে কিনা, বন্যা-খরার প্রতাপে ফসল নষ্ট হলে কি করে তা রক্ষা করা যাবে, খাদ্য মজুদ সুরক্ষায় কৃষক-এর গৃহকে বলিষ্ট করা, সেঁচের ব্যবস্থা করে ফসল রক্ষা, ধান-পাট উৎপাদন নিশ্চিত করে রাখা। শাক-সবজি, গৃহপালিত পশু-পাখির উৎপাদন বাড়িয়ে বাংলার প্রতিটি আঙিনা ভরিয়ে, সাজিয়ে দেওয়ার শিক্ষা উপেক্ষিত ছিল। তৎকালীন মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় কেন কৃষিবিদ, পদার্থবিদ, জ্যোর্তিবিজ্ঞানী তৈরী করতে পারেনি। উপরন্তু নিজ উদ্যোগী দেশ হতে বাহিরে গিয়ে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা নিয়ে দেশ গড়ায় যেন স্বাধীন, উচ্ছাসী মনোভাব বাঙালিদের কখনও কেন জানি তৈরি হত না। ভূমি নিয়ে দ্বন্দ্বের খাতিরে বাংলায় সর্বপ্রথম আইন বিশারদ হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে হিন্দুরা। এক্ষেত্রে মুসলিমরা তখনও পিছিয়ে। মুসলমানরা যখনই জমিসংক্রান্ত বিষয়ে ন্যায্য অধিকার পেতে মামলা লড়তে যায় তখন তারা হিন্দু আইনজ্ঞদের শারনাপন্ন হয়। অপরদিকে হিন্দুরাও সুযোগ বুঝে বহু বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা অথচ এখন নিঃসহায় মুসলিমদের করুন দশার সুযোগ নেয় এবং অনেক অর্থ দাবী করে। মুসলিমদের হাত ছিল তখন অর্থশূণ্য, সহায় হচ্ছে না কোথাও। ১৮৩৫-এ ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি যখন হল অফিস-আদালত, দপ্তর ও শিক্ষার মাধ্যমের ভাষা তখন মুসলমান একেবারে যেন অস্তিত্বহীন হয়ে পড়তে লাগল। এখন উপায় ? দ্রুতগতিতে চিন্তাজগতের পরিবর্তনের হাতিয়ার অর্থ কারবার কেন্দ্রগুলি আগে থেকেই মুসলিমগণ হারিয়ে ফেলেছে তাহলে ঘোর অন্ধকার কাটবে কী করে? নিশ্চয়ই হিন্দুদেরকে অনুসরণ করে, যে হিন্দুগণ একসময় মুসলিম কর্তৃক শাসিত হত, গরু কোরবানী নিয়ে যাদের সাথে বড় বড় দাঙ্গা বেঁধে যেত; নাকি সেই আধুনিক ধ্যান-ধারনার ইংরেজ যারা ভারতবর্ষকে করেছে

বেদ্বীনের সাম্রাজ্য। সমাধান মুশকিল বটে; তবে সমাধানটি সহজ করার জন্য আপামর মুসলমানদের ধ্যান-জ্ঞান পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এর জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে জীবন শিক্ষকের অর্থাৎ বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানী মানুষদের। তৎকালীন এই সময়ে আধুনিক বাংলার জনক রাজা রামমোহন এর প্রভাব ছিল বাংলায় অসীম। ১৮৩০-এ যদিও তিনি ইন্তেকাল করেছেন তথাপি তাঁর ফর্মুলাগুলি সমাজের দর্পনস্বরূপ ছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সবা, ব্রাহ্মসমাজ পুরোপুরিভাবে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ-এর সুশীল অংশ নিয়ে গঠিত ছিল বলে তা মুসলিম ভাইদেরকে '৩৫-এর দশকের পূর্বে এবং পরে কখনওই প্রভাবিত করতে পারেনি। রামমোহন রায়ের মানবিক আদর্শের নেতিবাচক এই দিকটি হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে যায়। তবে ১৮১৪ এর পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে হতে যদি এইরকম জ্ঞানী দার্শনিক, চিন্তাবিদ, সর্বধর্মবিষয়ক পণ্ডিত রামমোহন রূপী কেউ তৈরি হত তাহলে বাংলায় মুসলমানদের শিক্ষার ইতিহাস একটি ভিন্ন পথে মোড় নিতে পারতো। হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তের এই বিষম উপাদান অসম বিকাশের জন্য উভয় শ্রেণির মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তফাৎ আরও প্রকটতর করে দিতে থাকে। এটি কিন্তু ঐতিহাসিক পক্রিয়ার সামাজিক বিবর্তন ধারার এক অনিবার্য ফল। পূর্বেকার ফরায়জী, ওহাবী, তিতুমীর, ফকির মজনুশাহ কর্তৃক যেসব আন্দোলন তা ছিল মূলত ইংরেজ বিরোধীতার পাশাপাশি হিন্দু-সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমান বিদ্রোহকারীদের দ্বারা ঘৃণা প্রকাশের আন্দোলন। হিন্দুরা কিন্তু সামাজিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় নেতিবাক দিকগুলিকে তাদের শিক্ষাগঠনতন্ত্রে খুব কাজে লাগায় এবং ইংরেজদের সহযোগীতা পায়। এর সঙ্গে যখন শ্রেণিস্বার্থ উজ্জীবিত হয় তখন উভয়ের চিন্তা ধারা ও কর্মপদ্ধতি স্ব-স্ব পথ তৈরি করে চলে বছরের পর বছর। আর্থিক সুবিধা ও প্রশাসনিক তথা রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্নে শ্রেণি স্বার্থ যত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ততই ধর্ম, বর্ণ, রক্ত, ভাষা, ভাব-সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতির অমিল সূত্র প্রেথিত হয়ে গভীর থেকে গভীরতার হয়েছে। অমিলের এই গভীরতা যখন জন্ম দিল দু'টি প্রতিযোগী শিবিরের ঠিক তখনই বুদ্ধিজীবীদের আদর্শ নির্মিত হতে থাকল সম্প্রদায়গত স্বার্থে। বলা বাহুল্য বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থ যখন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নীচু-উচু সবার নিমিত্তে সবার মঙ্গলার্থে মিলিত হয় তখনই জাতি, সমাজ হয় স্বার্থকতায়পূর্ণ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁরা আবার বাংলার সম্প্রদায়গত স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থকে সর্বদাই প্রাধান্য দিতেন। তাদের মত করে আর কেউ এত বড় পরিসরে বাঙালি মানস নিয়ে ভাবতেন কিনা তা বেশ সন্দেহাতীত। এদিক দিয়ে এই মুসলিম স্বার্থকে আরও বেশী চমকপ্রদ করতে তার সাথে যুক্ত হয়েছিল তখন বাবাসাহাব ড. আম্বেদকরের (১৮৫১-১৯৫৬) অস্পৃশ্যনীতি। সংখ্যালঘু বৌদ্ধদেরকে নিয়ে তিনি হিন্দু-মুসলিম দুটি বড় সম্প্রদায়ের মতামতের বিপক্ষীয় অবস্থানে দাঁড়িয়েছিলেন। রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে বিশ শতকে তিনি দারুনভাবে হিন্দু-মুসলিম চিন্তকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রভৃতি শ্রেণিগত, সম্প্রদায়গত, তথা জাতিগত দ্বন্ধের সাথে যোগ ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থ। শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বৃটিশ সরকার এমন কিছু করবেন না, যাতে তার শাসন ও শোষণের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। সুতরাং ঘটনাপুঞ্জগুলি এমনভাবে দাড়াল যে একই সাথে চতুর্মুখী সংঘর্ষের ধারা তৈরি হল। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিরাজ না করায় বাঙালি মধ্যবিত্তের চাকুরীর উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছিল। পুঁজিহীন নিঃস্ব মুসলমান সমাজে সেটা ছিল আরও বেশি প্রকটতর। তাই মুসলমান নেতাদের ক্রমাগত দাবী উঠছিল যে, বাংলার মোট লোক সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মুসলমান, অতএব

লোকসংখ্যার অনুপাতে তাদের চাকুরীতে স্থান দিতে হবে। ১৮৭০-এর পর উদীয়মান মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির এই আকুতি যেন দ্বিধাগ্রস্থ পরিবেশ তৈরি করতে থাকল। একদিকে শিক্ষাগত যোগ্যতায় মুসলমান পিছিয়ে অপরদিকে ইংরেজ সরকারের কঠিন নিয়ম এমতাবস্থায় 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনকে একটি স্মারকলিপি পেশ করে চাকুরীতে কিছু কঠোর নিয়ম শিথীল করে মুসলমানদের আর্থিক উন্নতিতে সহায়তা করতে আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু ফলপ্রসূ হয়নি। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাবার পর দীর্ঘদিন মুসলমানদের সার্বিক বিষয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার কেউ ছিলনা। বৃটিশ শাসননীতির ফলে বড় বড় বনেদি পরিবার ও ভূ-স্বামী ধ্বংস হওয়ার পর নতুন ভূ-স্বামী বা ব্যবসায়ী বিত্তবান আর্বিভূত হয় নি; এদিক দিয়ে সর্বভারতীয় মুসলিম জাতীয়তা বোধও তৈরি হচ্ছে না। কোলকাতার গোটা তিনেক নবাব পরিবার তখন সরকার প্রদত্ত বৃত্তির টাকায় নিষ্ক্রিয় অবস্থার ভোগ-বিলাসে মত্ত। এদিক দিয়ে ঢাকার নবাব পরিবার ছিল উঠতি নব্য জমিদারভূক্ত। যারা অর্থের জোরে সমাজে প্রভাব বিস্তার করলেও গোটা বাঙালি মুসলিম সামজের (উচু+নীচু) হিতকারী অবস্থানে ছিলেন না। অন্যান্য মুসলমান জমিদার ছিলেন ক্ষুদ্র ভূ-সম্পত্তির মালিক; তাদের সম্পত্তি বাড়ানোর দিকে কোন নজর ছিল তাদের মূল টার্গেট ছিল অর্থ উড়িয়ে কে কার কাছ থেকে সমাজে বড় হিতংকারী জমিদার হতে পারবে। অতিরিক্ত অকর্মন্যতা ও বিলাসীতার জন্য অনেকেরই জমিদারী একের পর এক ধ্বংস হয়েছে। এই সব অর্থশালী মানুষগুলি সমাজকে জাগিয়ে দেওয়ার মত শিক্ষিত ছিলেন না ফলে সাধারণ মানুষগণও শিক্ষার অবাধ সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। আধুনিক শিক্ষা এই ক্ষেত্রে সুস্থ শিক্ষিত, বোধসম্পন্ন সঠিক মানুষ্য মাধ্যমের অভাবে বাংলার মুসলিম ঘরে ঘরে পৌঁছাতে পারেনি। তবে এরই মধ্যে উত্তরভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৯০৮) এর স্বকীয় প্রচেষ্টায় ভারতের মুসলমান ইংরেজী শিক্ষার পক্ষ অবলম্বন করে জেগে উঠলেও তা বাঙালি মুসলিমদের বেশী প্রভাবিত করতে পারে নি। যতটা পেরেছিলেন নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) ও সৈয়দ আমীর আলী (১৯৪৯-১৯২৮) যারা শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির আওতাধীন। আব্দুল লতিফের মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি (১৮৬৩) এবং আমীর আলীর সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডন অ্যাসোসিয়েশনের (১৮৭৭) কার্যক্রম প্রধানত শিক্ষানির্ভর। মুসলমান সামজে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে এই দুই ব্যক্তির চিন্তা ধারা আবার দুই ধারায় প্রভাবিত হয়। যেমন নওয়াব আবদুল লতিফ যিনি আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রচলিত ইসলামিক ধ্যান-ধারণার মেল-বন্ধন স্থাপন করে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন। অপরদিকে আমীর আলী প্রচলিত ইসলামী ধ্যান-ধারণা যেন ইংরেজী শিক্ষার পথে বাধা হয়ে না দাড়ায় তার উপর সজাগ থেকে কাজ করেছেন। একজন আদর্শিক ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও তার মতো কাউকে খুজে পাওয়া অসম্ভব।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ মোটামুটি একটি সার্বিক কাঠামোয় গিয়ে দাড়ায়। বুদ্ধিজীবীদের চলমান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মুসলমানগণ সরকারী পেশা কিংবা অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত হয়েও রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখত। কেননা বৃটিশ সরকার ১৮৫৭-এর হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে দেয় যদিও ১৮৮৫-তে হিন্দুজাতীয়তাবাদ উদগ্রীব রূপে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের

সময়ে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর পূর্ব বাংলার মুসলিমদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এক সমীকরণে গিয়ে ধরা পড়ে। এক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে নেতৃত্বস্থানীয় পর্যায়ে ছিলেন নওয়াব সলিমুল্লাহ এবং নওয়াব আলী চৌধুরী। অপরপক্ষে কংগ্রেস রাজনীতির সাথে যারা জড়িত ছিলেন। যেমনঃ আবদুর রসুল, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ বাংলার ভাগ মেনে নিতে পারেনি। দুই চিন্তা, দুই মত অবশেষে ভেঙ্গে গেল ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব। ১৯০৬ সালে 'মুসলীম লীগ' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে বাংলার মুসলমানগণ তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় যদিও পরবর্তীতে এর পুরোভার উত্তর ভারতের মুসলমানরা নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়ে ফেলে। এরপর মুসলিমরা নিজেদেরকে হিন্দুদের মতোই সতন্ত্র ভাবতে শুরু করে। সে সতন্ত্রতার মুসলিম লীগ পরবর্তীতে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির কেন্দ্র হয়ে কাজ করে। তবে এই সময়ে আর্থিক সম্পদের অপ্রতুলতার ফলে পূর্ব বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার তেমন বিশেষ পরিবর্তন হয় নি তাই ১৯১২ সাল মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থার ক্রটি জানার পরও অর্থের অভাবে সফলতা আসেনি। তাই মুসলিম শিক্ষা অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে তখনও ছিল বেশ পিছনে। যে ক্রটিটি প্রকট আকার ধারণ করে চলছিল তা ছিল মুসলিম শিক্ষকের অভাব। পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রতি মুসলিম সন্তান ও অভিভাবকদের অনাগ্রহ। অনাগ্রহতার পিছনে দু'টি কারণ কে চিন্তায় আনা যেতে পারে। বাঙালি জাতি হিসাবে সন্তানরা একদিকে স্বীকার করে বাঙালি সংস্কৃতি অথচ অপরদিকে এই সংস্কৃতিকেই ভেঙ্গে দিতে বলে ইসলামী মতাদর্শ, নিয়ম-কানুন, খাদ্যভাস, রীতি-নীতির মধ্যদিয়ে। তাহলে এই দ্বৈতায়িক এই অবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে মুসলমান সন্তানগণ শান্তি পেত না। তারা অন্য রাস্তা খুজতে চাইত কিন্তু সঠিক দার্শনিক তত্ত্বের প্রামানিক বিশ্লেষণের অভাবে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সন্তোষজনক শিক্ষা পাওয়া মোটেও সম্ভব নয়। তখনই বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় নতুন মুসলিম শিক্ষাগুরুর চাহিদা অনুভব করতে থাকে। কিন্তু আফসোস এইরকম বৈজ্ঞানিক তাত্ত্বিক শিক্ষক তখন জন্ম নেয় নি যারা কিনা জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীদের সামনে ইংরেজী ভাষার মধ্যে দিয়ে যুক্তি প্রয়োগের ভিত্তিতে বিশ্বকোষকে বিচার করতে পারে। এই সময়ে আবার জাতীয়তাবাদী আদর্শের বা চেতনায় উজ্জীবীত জাতীয়তাবাদী কয়েকজন নেতার আবির্ভাব হয় যারা পরবর্তীতে ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে মুসলিম রাজনীতিতে তরুণ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জোড়ালো অবস্থান নিশ্চিত করে। যারা কিনা পরবর্তীতে কংগ্রেসের সাথে প্রকাত্মতা প্রকাশ করে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী স্বরাজ আন্দোলনের পট রচনা করে। এক্ষেত্রে মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী বৃটিশ বিরোধী চেতনায় দারুনভাবে উজ্জীবিত ছিলেন। ১৯১৩ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদেও সদস্য হিসেবে এ. কে. ফজলুল হকের আবির্ভাব বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির রাজনৈতিক চেতনা শিক্ষার বিষয়টিকে দারুনভাবে আলোড়িত করে। এদিক দিয়ে আবার ১৯২১ সালে গিয়ে দেখা যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদের আধিপত্যতা রোধে মুসলিম চিন্তকগণ মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি প্লট তৈরি করতে সক্ষম হয়। তবে বৃটিশ সরকারের আর্থিক সাহায্য ব্যতিত তা সম্ভব ছিল না আর তা হল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা'। পাটচাষ, পাটকল, পাটশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের দ্বারা পূর্ববাংলার জনগণ আর্থিকভাবে হয় সাবলম্বী। ফলে শিক্ষা তখন শুধু কলেজ পর্যন্ত নয় বরং সন্তানদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হলেও আর হিন্দু আধিপত্যবাদের স্বীকার হতে হবে না। তা স্পষ্ট সহকারে বিবেচ্য। এক্ষেত্রে কাঁচা অর্থের কিংবা শিল্পের যোগান কিন্তু ঐ কৃষি শিল্পই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

হওয়ার পর আস্তে আস্তে করে পূর্ববাংলার ছুটে চলা মুসলমান সমাজ স্থির হতে শুরু করে। স্ব অঞ্চলেই তারা নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরির ব্যবস্থা করতে থাকে এবং ব্রিটিশ সরকার মধ্যবিত্ত এই শ্রেণিকে বিশেষ সহায়তা দান করে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অব্যহতভাবে চলতে থাকে। আধুনিক মাদ্রাসা স্থাপন (নিউস্কীম), প্রেস ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, পরিচালনা, সভা-সমিতি গঠনের পাশাপাশি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির যারা শিক্ষিত রুচিশীল, আধুনিক তারা নিজেদের শিক্ষা চিন্তা ব্যক্ত করার এক অপরিসীম সুযোগ পেতে থাকে। নতুন যুগের নতুন চেতনা ও উপলব্ধির সংঘাতে পুরাতন চিন্তা ধারা ও মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যা কিনা কখনও তৈরি করে সামাজিক সংকট কখনও আবার সমাজকে সাজিয়ে তোলে তার ভিতরকার বৈষম্য দূর করে বিভিন্ন প্রথা, কুৎসাকে অপসারণ করে সমাজোন্নয়নের প্রসায়কে জাগিয়ে তোলে।

১৯২৪ সালের ৫ই জানুয়ারি বাংলা সরকার ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে সমানুপাত ও পারস্পারিক সহযোগীতার সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার নানা সমস্যা চিহ্নিত করা সম্ভব হলেও এই কমিটি দীর্ঘকাল বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে খাজা নাজিমুদ্দীন যখন পূর্ববাংলার শিক্ষামন্ত্রী হয়ে আসেন তখন দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছিল। কেননা বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে তার শিক্ষানীতির কোন যোগ ছিল না। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বাংলার উচ্চশিক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয় এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বোর্ড বা সিন্ডিকেটে মুসলিম প্রতিনিধিত্বকারীর সংখ্যা কম তা বিশেষভাবে প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও ১৯৩১ সালে গঠিত 'মোমেন কমিটি' যে কমিটি উচ্চ শিক্ষায় দারিদ্রতা প্রধান সমস্যা বলে ঘোষণা করে। এই ধরণের সমস্যা সমাধনে নিজেদের চিন্তা-ধারাকে কাজে লাগাতে শুরু করে। ১৯৩৭ সালে এ. কে. ফজলুল হক যখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন তখন সাথে সাথে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখণ ব্যক্তিগতভাবে ফজলুল হকের গৃহিত পদক্ষেপে অনগ্রসর মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির অগ্রযাত্রাকে আরোও বাড়িয়ে দেয়। ১৯৩৮ সালে চট্টগ্রাম ও ১৯৪১ সালে হুগলি মহসিন কলেজ তখনও আরবী-উর্দু চর্চা চলছিল অবিরত। যে আরবী উর্দু চর্চা অবশেষে বাঙালি ভাষা ও ইংরেজী চর্চাকে ম্লান করে এগিয়ে চলে কিন্তু বেশী দূরে যাওয়াত অসম্ভব। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজের অনগ্রসরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সমাজে আলোকবর্তীকা নিয়ে হাজির হন সাহসী সমাজচিন্তক, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির পান্ডিত্য অর্জনকারী ব্যক্তিগণ। বাংলায় বৃটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করে এ কথা স্বীকৃত। প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন করার ফলে বাঙালিরা পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। ইউরোপীয়দেরকে সামনে রেখে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালিরা নতুন বিষয়ে নতুন ধরনের গদ্য রচনা শুরু করে এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য স্বরচিত গদ্যকে দারুনভাবে নিজেদের সমস্ত চিন্তা শক্তিকে প্রয়োগ করে মতামত প্রকাশ করতে থাকে। নিজেদের অবচেতন মনে হিন্দু লেখকদের সৃষ্ট সমকালীন বাংলা সাহিত্যকে দারুনভাবে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করে। মুসলমানদের ধ্রুপদী ভাষা আঁকড়ে রাখার ইচ্ছা তাদের শিক্ষাগত অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ

উপাদান হিসেবে বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনাকে যিনি উজ্জ্বল করেছে তিনি হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্ব দিতে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব হয় ধূমকেতুর মতন। তাঁর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক যুগের সূচনা করে। নজরুল ইসলাম আত্মপ্রত্যয়ের কবি। নজরুল ইসলামের আগে বাংলা সাহিত্যের আসরে বহু কৃতবিদ্য মুসলমান সাহিত্যিক ও কবির আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু তাদের সেই সংকোচ-ভীরু পদক্ষেপ ছিল পরগৃহে অনাহূতভাবে অনধিকার প্রবেশের মতো। তার দরুন তাঁরা নিজেদের ভাষায়, উপমায়, অলঙ্কারে ও রচনারীতিতে কখন একেবারে ধর্মকে আলাদা করতেন মানুষের সাথে আবার কখন মানুষ ধর্মের থেকে বড়, আদর্শ হতে ছোট। আবার অনেকে নিজের ধর্মকেও দোষেছেন, পরের ধর্মকে বাদ দেন নি। আবার কেউ শুধু নিজের ধর্মকে জাহির করতেই লিখেছে এক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি অসংকোচে যেমন তাঁর কবিতার মধ্যে আরবী শব্দের ব্যবহার করেছেন ঠিক তেমনি নানা কবিতার মধ্যেও পূঁজা, ভগবান শব্দ ব্যবহার করেছেন।

হিন্দুদের সাথে মেলবন্ধন রচনায় তিনি কখনও কার্পণ্য করেননি। নজরুল ইসলাম আরবী-ফারসি শব্দ আমদানি করে কেবলমাত্র বাংলা ভাষার সম্পদ ও সৌন্দর্যই বাড়িয়ে তোলেন নি, মুসলমানদের যে বাংলা সাহিত্যে একটা নিজস্ব অধিকার আছে, আপন বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের গৌরবোজ্জল ক্ষেত্রে আছে, সেই দাবিই তিনি তার লেখনির মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠি করে গিয়েছেন। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে কাজী নজরুল বাংলা সাহিত্য সেবী ও কবিদের মুক্তিদাতা ও পথ প্রদর্শক। অথচ এই সেই নজরুল যার ভাগ্য তাকে উপযোগীতা দেয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ হয়নি পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে আধুনিক চিন্তা-ভাবনা, শিল্পকলা এবং মানবীয় জীবনযাত্রার ধারা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করার। নজরুলের সাহিত্যে নেই পাণ্ডিত্যের গুরুতার বা কঠিনতা ও সূক্ষ দার্শনিক তত্ত্ব কথার সমাবেশ। যা আছে নজরুল ইসলামের কাব্য, সাহিত্য ও গদ্যে তা হলো ভাষার কারুকাজও সত্যতা। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলার জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত। কেননা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করে মুক্তির পথ রচনার সময় হতে ১৯৭১-এ পূর্বপাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার সময় তার রচিত গান সাধনা ছিল সামগ্রিক জয়ের গান। সামগ্রিক জাতীয় চেতনা এবং এর সৃষ্টির মূলে ছিল প্রধানত নজরুল সাহিত্য। রুশ বিল্পবের ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে যেমন টলস্টয়, ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্রে রুশো ও ভলটেয়ার, বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামও ঠিক তাই। কাজী নজরুল ইসলাম-এর প্রতিভার আলো, তাঁর প্রাণের আগুন, তরুন বাংলায় এমনভাবে ছেয়ে গিয়েছিল তাঁর প্রভাব হতে মুক্তি পাওয়া আনেকের পক্ষেই সুকঠিন ছিল। শহর ও মফস্বলের প্রধান-অপ্রধান লেখকের বিবিদ রচনার দ্বারা আত্মচেতনা, দেশচেতনা, জাতীয় চেতনা ও যুগ চেতনা সম্প্রসারিত হয়। মীর মশারফ হোসেন, আবদুল করিম সাহিত্যে বিশারদ, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, কাজী ইমদালুল হক, রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন প্রমূখের রচনায় উদারতা ও প্রগতিশীলতার লক্ষণ ছিল। মৌলভী মুহাম্মদ নইমুদ্দীন, মুনশী মেহেরুল্লাহ, মুনশী জমিরউদ্দিন, মোহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রধানত রক্ষণশীল ছিলেন। অপরদিকে কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, শখ আবদুর রহিম, শেখ ফজলুল করিম, নওশের আলী খান, ইউনুস জায়ী তাঁরা ছিলেন মধ্যমপন্থী পর্যায়ের লেখক। মুসলমানদের মধ্যে অধিকার স্বাথ অক্ষুন্ন

রেখে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য কামনা করতেন তাঁরা। লেখকদের লেখায় ধর্মীয় চেতনা ও সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ রচনা বাংলার মুসলিম লেখকবৃন্দ তেমন ধর্মনিরপেক্ষ রচনা তৈরি করতে পারেন নি। মীর মশারফ হোসেন ও কায়কোবাদের প্রতিভা সীমাবদ্ধ নীতিতে আতংকিত। সীমাবদ্ধ লেখকগণ বেশির ভাগ মফস্বলবাসী ছিলেন বলে নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনধারা ও মুল্যবোধ সম্পর্কে তাদের সম্যক ধারনা ছিল না। অথচ তারা যে গ্রামের প্রান্তিক কৃষক বা সাধারণ কৃষক দিয়ে আলোড়িত তাও নয়। আধুনিক সাহিত্যও যে খুব ভালভাবে রচিত হয়েছিল তাদের হাতে তারা তারও খুব একটা প্রমাণ দিতে পারে নি। অথচ আধুনিক সাহিত্য গড়ে উঠে নাগরিক মধ্যবিত্তের নাগরিক চেতনা, আদর্শ ও মূল্যবোধ নিয়ে। তাই আধুনিকীকরণ ও নগরায়ন এদু'টি গুণ তৎসময়ের বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকদের জন্য ছিল বড় চ্যালেঞ্জ।

এজন্য তাঁরা সফল সাহিত্য পাঠককে কখনও উপহার দিতে পারেনি। সামাজিক ও শ্রেণি হিসাবে পিছিয়ে থাকার কারণে মধু-হেম-নবীন-বঙ্কিম-দীনবন্ধু দ্বিজেন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ এর মত একজন মুসলমান লেখকদের আবির্ভাব ঘটে নি। বিশ শতকের মুসলিম লেখক, গবেষক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, ধর্মনৈতা, বক্তা কখনও এককভাবে, কখনও যৌথভাবে সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য ও রাজনীতি প্রধানত এই পাঁচটি ধারায় তাদের চিন্তা ও চেতনাকে নিয়োজিত করেছিলেন। এভাবে অতঃপর চলছিল বাঙালি মুসলমান সত্ত্বা। বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির চিন্তা জগৎকে আরও বেশি শক্তিশালী করে শিক্ষার মাধ্যম কিংবা মনের ভাব প্রকাশের স্বাধীনভাবে মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহার। ভাষা দ্বন্দ্বের ইতিহাস বহু পুরোনো অথচ তার স্বাদ অমৃত। উনিশ শতকের নবম দশকের গোড়া হতেই মুসলমান সম্পাদিত সাময়িক পত্রের সংখ্যা বেড়ে যায়। পত্রিকাগুলি অনুষ্ঠানপত্রে, সম্পাদকীয় নিবন্ধে এবং প্রবন্ধাবলীতে বাংলা-উর্দু দ্বন্দ্বের কথা তুলে ধরে মাতৃভাষা বাংলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। 'নবনূর' পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী বাংলাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়চিত্ত ছিলেন। মূলত মাতৃভাষা বাংলাকে স্বীকৃতি দান এবং সে ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবোধের প্রথম উন্মেষ হয়। মুসলিম নারী তথা ইসলাম ও নারী নিয়ে চিন্তা-চেতনাসমূহ যেন একরকম ঘাসফুলের মত। মুসলিম নারী যতদিন নিজের ভিতরে আলো জ্বেলে রাখতে পারে ততই আবার দর্পনরূপ কখনও দাসী স্বরূপ, নারী প্রতিভূ হয়ে পরিস্থিতি সে মোকাবিলা করতে পারে।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যদি তার স্বাধীন চিন্তা নিয়ে না আসতেন বাঙালি মুসলিম সমাজ তাহলে হয়ত পুরুষ দ্বারাই পরিচালিত হত সর্বসময় সর্বত্র, সর্ব প্রতিষ্ঠানে, সর্বগৃহে। প্রথা নারীমুক্তির ও উন্নতির অন্তরায়। কেননা পর্দার আড়ালে থাকে বলে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নারী কখনও বাহিরে বের হতে পারে না। এক্ষেত্রে এদেশের প্রচলিত কুসংস্কারই অনেকাংশে দায়ী। ধরে নেওয়া যাক একটি মেয়ে শিশু কোন একটি গৃহের কোনে বসে আছে অথচ তার ভাই পড়তে যায় দূরের স্কুলে বই হাতে করে। ছেলে-মেয়ের মা ও বাবা উভয়েরই ধারণা মেয়ে শিশুটি যেহেতু ঘরেই থাকবে তাহলে তার যত্ন পরেই হোক। এই বলে ছেলেটির খাওয়া ও বই-পুস্তক গুছিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে বলে ভাই-এর জন্য এক গ্লাস পানি এনে দাও

কিংবা ভাই-এর জুতাখানি এনে দাও। তখন মেয়েটি কিন্তু সাচ্ছন্দে দৌড়ায় ঠিক এমনই সময় বাড়ির প্রধান ফটক খুলে ছেলেটি স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাহিরে বের হয় আর পিছনে মেয়ে শিশুটি তার মায়ের সাথে আটকা পড়ে চার দেয়ালে। দেখতে দেখতে মেয়েটি এভাবে একটু বড় হয় তখন আবার তাকে বিয়ে দেওয়া হয় তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যবধানের বয়সী ছেলের সংঙ্গে। সেই বাড়িতে তখন তার জীবন হয় তার মায়ের মত কিংবা মায়ের চেয়েও বেশী বন্দীদশায়। কেননা চলমান প্রক্রিয়ার চলতে চলতে তার শাশুড়ীও থাকে মানসিক বিকার গ্রস্থ, তখন সেই পরাধীন জীবনে যুক্ত হয় মানসিক টর্চার। ঠিক এভাবেই কাঁটত মধ্যযুগে বাঙালি মুসলিম নারীর জীবন। কোটি বাঙালি নারী অথচ জাগেনি কেউ। অথচ একদিন হঠাৎ রংপুরের পায়রা বন্দ গ্রামের বেগম রোকেয়া মুক্তির স্বাধ নিতে, শিক্ষায় বলিয়ান হতে জেগে উঠলেন; কিন্তু আফসোস বাহিরে গিয়ে খুব শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ এই পন্ডিত নারী পাননি। তবে তিনি এগিয়েছেন আলোকবর্তিকা হয়ে।

মধ্যবিত্তশ্রেণির নারীদের এমতাবস্থায় উনিশ ও বিশ শতকের নব্বইয়ের প্রান্ত কেঁটে যায়। আধুনিক শিক্ষার কথা যেখানে ভাবার অবকাশ নেই। তারপরও শিক্ষা রিপোর্টসমূহ বিশেষ করে বিশ শতকের প্রথম দশক এবং পূর্ববাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর অবলোকন করলে নারী শিক্ষিতের একটি আশাব্যঞ্জক লক্ষ্য করা যায়। সমাজে প্রচলিত নিয়ম-নীতি নারী-পুরুষ, শিশু, ধনী-গরীব, মধ্যবিত্ত সকলকেই কোন না কোনভাবে উৎপীড়নে রাখে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তা-চেতনার সফল বিকাশই পারে সমাজ-কে সাবলীল এবং গতিশীল রাখতে। এই সুন্দর পরিচ্ছন্ন সাবলীল চেতনার মূলে রয়েছে শিক্ষা। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাংলার মুসলমানদের যে অবস্থান ছিল পরবর্তীতে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণির আওতাভুক্ত হওয়ার পর সে অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়নি। দেখা যায় ১৯০৫ থেকে শুরু করে ১৯২২ পর্যন্ত খিলাফত আন্দোলনকালে তাদের সমাজ সংহতিকরণে বিশেষ করে রাজনীতির ভাষা বুঝে এবং অর্থনৈতিকভাবে সফলতা অর্জন করে ১৯৪৭ পর্যন্ত পরিবর্তনশীল বাংলার সাথে সাম্প্রদায়িকতার মননে নিজেদেরকে দৃঢ় একটি প্লাটফরমে পর্দাপিতকরণ প্রক্রিয়ায়।

পরিশিষ্ট-১

‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব’

‘খোশ আমদেদ’

(গান)

কাজী নজরুল ইসলাম

আসিলে	কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি।
ও চরন	ছুঁই কেমনে দুই হাতে মোর মাখা যে কালি ॥
দখিনের	হাল্‌কা হাওয়ায় আসলে বেসে সুদূর বরাতী।
শবে’রাত	আজ উজালা গো আঙ্গিনায় জ্বলর দীপালি ॥
তালিবন	ঝুম্‌কি বাজায়; গায় “মোবারক বা’দ” কোয়েলা।
উলসি’	উপ্‌চে প’ল পলাশ অশোক ডালের ঐ ডালি ॥
প্রাচীন ঐ	বটের ঝুরির দোল্‌নাতে হায় দুলিছে শিশু।
ভাঙ্গা ঐ	দেউল-চূড়ে উঠল বুঝি নৌ-চাঁদের ফালি ॥
এল কি	অলখ্‌-আকাশ বেয়ে তরুণ হারুণ-আল্‌-রশীদ।
এল কি	আল্‌-বেরুনী হাফিজ খৈয়াম কায়েস গাজ্জালী ॥
সানাইয়াঁ	ভয়রোঁ বাজায়, নিদ-মহলায় জাগ্‌ল শাহ্‌জাদী।
কারুণের	রূপার পুরে নূপুর-পায়ে আস্‌ল রূপ-ওয়ালী ॥
খুশির এ	বুলবুলিস্তানে মিলেছে ফরহাদ ও শিরীঁ।
লাল এ	লায়লি লোকে মজনুঁ হর্দম চালায় পেয়ালী ॥
বাসি ফুল	কুড়িয়ে মালা না-ই গাঁথিলি, রে ফুল-মালি।
নবীনের	আসার পথে উজাড় ক’ও ফুল ডালি ॥

উৎস: মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *শিখা সমগ্র* (১৯২৭-১৯৩১), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.৭

পরিশিষ্ট-২

বাংলার মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষার প্রসার ১৯১২-১৯৪১

বছর	শিক্ষারস্তর	মোট ছাত্রী	মুসলিম ছাত্রী	হিন্দু ছাত্রী	মুসলিম হার	হিন্দু হার
১৯১২	উচ্চশিক্ষা (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়)	৪০	১	৩১	২.৫%	৭৭.৫%
১৯২১	ঐ	২১৬	৩	১৪৬	১.৩৮%	৬৭.৫৯%
১৯৩০-৩১	ঐ	৩৭৫	৩	৩৬৬	০.৮%	৯৭.৬%
১৯১১	ঐ	২৬৭৫	১৬০	৩৬২	৫.৭৮%	৮৫.৩৬%
১৯১২	মাধ্যমিক শিক্ষা (মধ্যম ও উচ্চ বিদ্যালয়)	৫৯৬৬	১৩৩	৪১৮২	২.২২%	৭০.০৯%
১৯২১	ঐ	১৩২৩১	৫২১	৬৭৫৪	৩.৯৩%	৫১.০৪%
১৯৩০-৩১	ঐ	৮৭৭১	২৩৩	৫১১৬	২.৬৫%	৫৮.৩২%
১৯৪১	ঐ	২৩৮২২	১৮৯৯	১৯৮০১	৭.৯৭%	৮৩.১২%
১৯১২	প্রাথমিক	২০৭২৬১	৭৬৩৫৩	১২৪৯১৭	৩৬.৮৩%	৬০.২৭%
১৯২১	ঐ	৩২৯৭৫৪	১৭৮৩৭১	১৪৫১৮৮	৫৪.০৯%	৪৪.০২%
১৯৩০-৩১	ঐ	৫১১০৭৫	২৮০৯০৩	২১৯২১৯	৫৪.৯৬%	৪২.৮৯%
১৯৪০-৪১	ঐ	৭৭৯১৯২	৪২৫১০৩	৩৩৯৬০৫	৫৪.৫৫%	৪৩.৫৮%

উৎস: Supplement to the Progress of Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17(Fifth Quinquennal Review, Calcutta, 1918. PP. 70-71, Report on Public Instruction in Bengal, 1920-21, Calcutta, 1922, Appendix, PP. ix-x, Report on Public Instruction in Bengal, 1930-31, Calcutta, 1932, PP.32-33, Supplement to the Report on Public Instruction in Bengal, 1930-31, Calcutta, 1932, PP. 32-33, Supplement to the Report on Public Instruction in Bengal, 1930-31, Calcutta, 1932, P. 34, Report on Public Instruction in Bengal 1940-41, Alipore, 1943, P.54

পরিশিষ্ট-৩

১৮০০-১৯৪১ সাল পর্যন্ত ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে বাংলার মোট জনসংখ্যার সংখ্যাভিত্তিক অবস্থান ও তার শতকরা হার

সাল	মোট জনসংখ্যা ভারত (মিলিয়ন হিসাবে)	মোট জনসংখ্যা বাংলা (মিলিয়ন হিসাবে)	বাংলার জনসংখ্যার শতকরা হার
১৮০০	১২০	১৪.৫	১২.০৮
১৮৩৪	১৩০	১৮.১	১৩.৯২
১৮৪৫	১৩০	১৯.৪	১৪.৯২
১৮৫৫	১৭৫	২০.৯	১১.৯৪
১৮৬৭	১৯৪	২২.৬	১১.৬৫
১৮৭১	২২৫	২৩.২	৯.১০
১৮৮১	২৫৭	২৪.৮	৯.৬৫
১৮৯১	২৮২	২৬.৯	৯.৫৪
১৯০১	২৮৫	২৮.৯	১০.১৪
১৯১১	৩০৩	৩১.৬	১০.৪৩
১৯২১	৩০৫	৩৩.৩	১০.৯২
১৯৩১	৩৩৮	৩৫.৬	১০.৫৩
১৯৪১	৩৮৯	৪২.০	১০.৭৯

উৎস: S.G. Roy and A. Das Gupta, Population Estimates for Bangladesh Population Studies, XXX (1976), 17.

পরিশিষ্ট-৪

বিগত দুশ' বছরে বাংলায় সংঘটিত বিপর্যয় ও দুর্যোগ

সাল	ঘটনা	মৃতের সংখ্যা
১৭৬৯-১৭৭৬	বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ	পূর্ব বাংলায় এর পরিমান অপেক্ষাকৃত কম ভয়াবহ হলেও এটি বাংলার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশকে ছিনিয়ে নেয়।
১৭৮৪-১৭৮৮	বন্যা ও দুর্ভিক্ষ, ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথে আমূল পরিবর্তন	অজ্ঞাত
১৮২২	বাকেরগঞ্জে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস	২৭০০
১৮৭৩-১৮৭৪	দুর্ভিক্ষ	অজ্ঞাত
১৮৭৬	বাকেরগঞ্জে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস	৪,০০,০০০ জন
১৮৮৪-৮৫	দুর্ভিক্ষ	অজ্ঞাত
১৮৯৭	চট্টগ্রামে ঘূর্ণিঝড়	১,৭৫,০০০ জন
১৯১৮-১৯১৯	মহামারিরূপী ইনফ্লুয়েঞ্জা	৪,০০,০০০ জন
১৯৪৩	বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ	২ থেকে ২.৫ মিলিয়ন

উৎস: W.B. Arthur and G. Mcnicoll, An Analytical Survey of Population and Development in Bangladesh, 1976, 29.

পরিশিষ্ট-৫

'কৃষকসভার গতি ও বিকাশ' নামে ১৯৪৩ সালের একটি লেখায় কৃষকসভার অন্যতম নেতা মনসুর হবিবুল্লাহ বলেন-

বাংলায় শ্রেণিবিরোধের প্রধান ক্ষেত্র জমিদার ও কৃষক, মহাজন ও খাতক। অনেক ক্ষেত্রে জমিদার-মহাজন এবং কৃষক-খাতক মিলে গিয়ে দুটি মাত্র বিরোধী শ্রেণি হয়ে পড়ে। জমিদার ও মহাজনদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশি, কৃষক ও খাতকের মধ্যে মুসলমান খুব বেশি। তার ফলে শ্রেণিবিরোধের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রূপ ফুটে বেরোয়। তাই শ্রেণিবিধে ও শ্রেণি দাবীকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক দাবি বলে প্রচার করা হয়।

ইংরাজী শিক্ষা ও চাকরীর বিষয় নিয়ে হিন্দু ও মুসলমান মধ্য শ্রেণির ভিতরও সাম্প্রদায়িকতা খুব ছড়িয়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার প্রধান ক্ষেত্র মধ্যশ্রেণী। প্রধান কারণ:

১. কালচার বা কৃষ্টির দিক দিয়ে মুসলমান মধ্যশ্রেণি এখনো অনেকটা ফিউড্যাল অবস্থার মধ্যে রয়ে গেছে, হিন্দু মধ্যশ্রেণি (বর্ণ হিন্দু) অনেকটা বুর্জোয়া অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছে। তাই তাদের মধ্যে কৃষ্টিগত বিরোধ।

২. শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার (চাকরি, পেশা ও বৃত্তি) দিক থেকে এবং ক্রমে রাজনীতিক ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে হিন্দু ও মুসলমান মধ্যশ্রেণির ভিতর তফাত ও বিরোধ আছে।

এই বিরোধ অশিক্ষিত মুসলমান কৃষক ও অশিক্ষিত নিচু বর্ণের হিন্দু কৃষকদের মধ্যে নাই। জমিদার-কৃষক বা মহাজনখাতক বিরোধ নিতান্তই শ্রেণিবিরোধ। এই বিরোধকে ধর্মের নামে কাজে লাগানো সহজ। মধ্যশ্রেণি তাকে কাজে লাগায়।

উৎস: কৃষ্ণবিনোদ রায়: চাষীর লড়াই। পৃষ্ঠা: ১৩

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার পক্ষে বগলা গুহ কর্তৃক ২৪৯, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট-৬

পূর্ববঙ্গ সরকারের শ্রম পরিদপ্তরে রেজিস্ট্রিকৃত বিভিন্ন খাতের কারখানার তালিকা এবং শ্রমিকসংখ্যা (১৯৪৭)*

খাতসমূহ	ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ কারখানার সংখ্যা	ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ নিযুক্ত শ্রমিকের মোট সংখ্যা
১. সরকার এবং স্থানীয় অর্থে পরিচালিত কারখানা	১৬	৯,২২০
২. অন্যান্য কারখানা (মৌসুমি) সর্বমোট	১৭০	১৮,৯০২
(ক) খাদ্য, পানীয় এবং তামাক	১১৬	৯,৭০২
(খ) জিন এ্যান্ড প্রেস (পাট, সুতা)	৫৪	৯,১৭২
৩. অন্যান্য কারখানা (স্থায়ী) সর্বমোট		
(ক) বস্ত্রকল	১৭	৯,৮৫০
(খ) প্রকৌশল শিল্প	২৫	২,৯৩৯
(গ) খাদ্য, পানীয় ও তামাক	৬৩	৩,৭৯৮
(ঘ) রাসায়নিক এবং চোলাই কারখানা	৯	৩২৩
(ঙ) কাগজ এবং ছাপাখানা	৩	৭৮
(চ) কাঠ, পাথর এবং কাচ	৬	৯৬১
(ছ) ছামড়া	১	২৮২
(জি) বিধি	১	৯৮
মোট	৩১১	৪৬,৪৫১

*কেবল শক্তিচালিত এবং কমপক্ষে ২০ জন শ্রমিক নিয়োগকারী কারখানার সংখ্যা উল্লেখ করা হলো।

উৎস: এ.এফ.এ. হোসেন, হিউম্যান অ্যান্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট অব টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ ইন বাংলাদেশ, খণ্ড-১, (লন্ডন ১৯৫৬), ১০৯।

গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রাথমিক উৎস:

Report on the Census of Bengal, 1872, Vol, II.

Report on the Census of Bengal, 1881, Vol, I.

Report on the Census of Bengal, 1891, Vol, II.

Report on the Census of Indian, 1901, Vol, V, I, Part-1.

Report on the Census of Indian, 1911, Vol, IV.

Report on the Census of Indian, 1921, Vol, V, Bengal, Part-II.

Indian Council Act, 1892.

General Report on Public instruction in Bengal, 1873-1893.

General Report on Public instruction in Bengal, 1884-1885.

General Characteristics of Native Newspapers, the Calcutta Christian Observer, 1892.

General Report on Public instruction in Bengal, 1893.

Progress of Education in India, 1912.

Progress of Education in Bengal, 1932-37.

Proceedings of Legislative Council of Eastern Bengal and Assam, 1901 1902 to 1904-1906.

Proceedings of Legislative Council of Eastern Bengal and Assam, 1908.

Report on the Bengal Administration, 1925-1926.

Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee, 1929-1930, Vol, I.

Calcutta University Commission Report, 1917, Vol.I, Part-1.

Quinquennial Report of the progress of Education in Bengal, 1932-1937.

বাংলার জি.আর.পি, আই ১৮৯০-৯১।

পূর্ব বাংলা ও আসাম শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট ১৯০৭-১৯০৮, ১৯১১-১৯১২।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডার, ১৯২১-১৯২২।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৩৫-১৯৩৬।

পূর্ব বাংলা শিক্ষা রিপোর্ট, ১৯৪৭-১৯৪৮।

পূর্ব বাংলা জন শিক্ষা রিপোর্ট, ১৯৪৭-১৯৪৮।

বাংলার পাট অনুসন্ধ্যান কমিটির প্রতিবেদন, ১৯৩৯।

ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশনের প্রতিবেদন, ১৮৮০।

বাংলার জেলা প্রশাসন কমিটির প্রতিবেদন, ১৮৮৮।

২. স্মারক গ্রন্থ/ স্মৃতিকথা/ আত্মজীবনী:

দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, *আত্মজীবনী*, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, বাংলা, ১৩৬৩।

মীর মশাররফ হোসেন, *আমার জীবনী বিবি কুলসুম*, খোশরোজ কিতাব লিমিটেড, ঢাকা, ১৯১০।

সুভাষ বসু, *আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, ভারত পথিক,* সিগনেট প্রেস, কোলকাতা, ১৯২৪।

লর্ড রিপনের নিকট মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের স্মারকলিপি, দিল্লী, ১৮৮২।

আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, গতিধারা, ঢাকা, ১৯৬৪।

শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত্র*, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কোলকাতা, ১৯১৮।

মালেকা বেগম, *রোকেয়া জীবনী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮।

আব্দুল মনসুর আহমেদ, *আত্মকথা*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৭৮।

৩. দ্বৈতীয়িক উৎস (ইংরেজী)

A.k. Nazmul Karim, *Dynamics of Bangladesh Society,* Vicas, New Delhi, 1980.

A.R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1857),* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1961.

A.F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social Changes in Bengal (1818-1835),* Technical General Press, Calcutta, 1976.

A.R.Desai, *Social Background of Indian Nationalism (2nd ed),* Popular Book Depot. Bombay, 1959

A.R. Tripathi, *Trade and Finance in the Bengal Presidency*, Orient Longmans, Calcutta, 1956

A. Howel, *Education in British India Prior to 1854 and in 1870-71,* Office of the Superintendent of Government Printing, Calcutta, 1872.

Alexander Duff, *India and Indian Mission,* R. Groom Bridge, London, 1843.

Amalenu De, *Islam in India,* Maya Prakashan, Calcutta, 1882.

Amaledu De, *Roots of Separatism in Nineteenth Century Bengal*, Ratna Prakashan, Calcutta, 1974.

Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom,* Sangim Books Ltd., Hyderabad, 1959.

Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism,* Cambridge, at the University Press, London, 1971.

Anstey, Vera, *The Economic Development of India,* Longmans Green and Co., London, 1952.

Abdul Latif, A short Account of my Public life, Newman and company, Calcutta, 1885.

Alfred Von, Martin, *Sociology of the Renaissance,* Kegan Paul, Trench Trubner & Co., Ltd., Germany, 1932.

Ahmad, Muin-Ud-Din Khan, *History of the Faraidi Movement, Pakistan Historical Society* Karachi, 1965.

B.H. Baden Powell, *The origin and growth of village communities in India,* Swan Sonnenschein, London, 1899.

B.B. Misra, *The Indian Middle Classes: Their growth in modern times,* Oxford University Press, London, 1961.

B. N. Ganguli, *Dada Bhai Naoroji nad the Drain Theory* Asia Publishing House Bombay, 1965

B. Datta. Ray, *The Emergence and Role of Middle class in North-East India,* Uppal Pub. House, New Delhi, 1947.

C.H. Philips, *The Evolution of India and Pakistan 1858-1947,* Oxford University Press, London, 1964.

Douglas Hall, *Ideas and Illustrations in Economic History*, Rinchart and Winston, New York, U.S.A, 1964

D.P. Sinha, *The Educational Policy of The East India Company in Bengal to 1854*, Punthi Pustak, Calcutta, 1964

Duarte Barbosa, *An Account of the countries Bordering on the Indian Ocean and their Inhabitants,* The Royal Academy of Sciences Lisbon, 1812.

Edwin R.A. Seligman, *Encyclopedia of Social Sciences*, Mac Millan Co., New York, 1930.

Edward G. Browne, *A Literary History of Persia, 6th ed*, Cambridge, 1965.

Francois Bernier, *Travels in the Maghul Impire,* Schanel and Co. New Delhi, 1972

F.B. Bradley Birt, *Twelve Men of Bengal in Nineteenth Century*, S.K. Lahiri & Co, Calcutta, 1910

Gautam Chatto Padhyay, *Bengal; Early Nineteenth Century*, Research Indian Publication, Calcutta, 1978.

Ghulam Husain Salim, Riyaz-us-Salatin, *Text (ed) Maulavi Abdul Hale Abid, Ziggasha Prakashani*, Calcutta, 1904.

George Campbell, *Memoirs of Indian Career*, MacMillan & Co. Ltd., London, 1893.

H.E.A, Cotton, *Calcutta Old and New,* w.Newman, Calcutta, 1907.

Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics 1906-1947, Asiatic Society of Bangladesh*, Dhaka, 1987.

H. Sharp, *Educational Records (1781-1839),* National Archives of India, Delhi, 1965.

Hem Chandra Kar, *Report on the Cultivation of Trade and Jute*, Cambridge University Press, Cambridge, 1970.

Hajra S, *Jute Industry, Problems and Prospects,* Vidy a Vahini, New Delhi, 1978.
Haque, Azizul, *The Man Behind the Plough*, Book Company, Calcutta, 1939.
Islam, M. N, *Bengali Muslim Public Opinion as Reflected in the Bengali Press (1901-1939),* Bangla Academy, Dacca, 1973.
J.H.E. Garrett, *Bengal District Gazetteers*, Bengal Secretariat Book Depot, Nadia, Calcutta, 1910.
J. Johnston, *Abstract and Analysis of the Report of the Indian Education Commission*, The MacMillan & Co., London, 1884.
J.N. Sarkar, *India through the Ages Bengal*, Stosius Inc, Calcutta, 1993.
J.C. Sinha, *Economic Annals of Bengal*, The Mac Millan & Co., London, 1927.
Jack. J.C, *The Economic life of a Bengal District*, Oxford at the Clarendon Press, London, 1916.
J.P. Naik, *Elementary Education in India*, Asia Publishing House, 1966.
J.Johnston, *Abstract and Analysis of the Report of the Education Commission*, Oxford at the Clarendon Press, London, 1916.
J.P, Naik and S. Nurullah, *A History of Education in India, Bombay*, Macmillan and Co. Ltd. London, 1951.
J. Long. *Adams Report on Vernacular Education in Bengal and Behar*, Submitted to the Government in 1835, 1836 and 1838 with a Brief view of its present conditions, Calcutta time secretariat press, Calcutta, 1868.
Om, Prakash, *Duch East India Company and the Economy of Bengal*, Ananda Publishers Private Limited, Calcutta, 2012.
Ossowski, S, *Class Structure in the Social Consciousness,* Routledge, London, 1963.
Karl Marks, Notes on Indian History, the first Indian War of Independence (1857-1859), People Publishing House, Bombay, 1978.
Kopf and Joarder, *Reflections on Bengal Renaissance*, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, Rajshahi, 1977.
K.S. Shelvanker, *The Problem of India*, Penguin Books Limited, England, 1940
Khondkar Fuzli Rubbee, *The Origin of the Musalmans of Bengal*, Thacker Spink and Co., Calcutta, 1895.
K.M. Panikkar, *Survey of Indian History*, Asia Pub. House, USA, 1954.
Latifa Akhanda, *Social History of Muslim Bengal (1854-1884),* Islamic Foundation of Bangladesh, Dacca, 1981.
Laird, M.A, *Missonaries and Education in Bengal 1793-1837,* Oxford: Clarendon Press, London, 1972.

Lahiri, Pradip Kumar, *Bengali Muslim Thought, 1818-1947,* K.P. Bagchi & Co., Calcutta, 1991.

M.A. Larid, *Missionaries and Education in Bengal*, Clarendon Press, Oxford, 1972.

Macauly, *English Education and the origins of Indian Nationalism*, Loxtord Press, Delhi, 1905.

M.Azizul Haque, *Muslem Education in Bengal*, Calcutta University Press, Calcutta, 1917.

M.K.U, Molla, *The New Province of Eastern Bengal and Assam*, Rajshahi University, Rajshahi, 1981

M.A. Rahim, *History of the University of Dacca*, University Press, Dacca, 1981.

M.T. Titus, *India Islam*, Oxford University Press, London, 1930.

M.F. Rahman, *The Bengali Muslims and English Educatin (1765-1855),* Bangla Academy, Dhaka, 1973.

N.N. Law, *Promotion of Learning in India, During Mohammedan Rule by Mohammedans*, Jackson Hights, London, 1916.

N.K. Sinha, *Parliamantary Papers House of Commons, History of Bengal*, Calcutta University, Calcutta, 1965.

Norman, M, *Muslim India*, Kitabistan, Allahabad, 1942.

P. Hardy, T*he Muslims of British India*, Cambridge University Press, London, 1972.

P. Hartog, *Some Aspects of Indian Education Past and Present*, Cambridge at the University Press, London, 1939.

P. Spear, India, *Pakistan and the West, the Cambridge History of India*, Oxford University Press, London, 1949.

Qeyamuddin, Ahmed, *The Wahabi Movement in India*, Manohar Publishers, New Delhi, 1966.

Risly, H.H., *Tribes and Castes of Bengal*, Vol,I. part, 1, Nabu Press, Calcutta, 2011.

Roy. N. C, *The Civil Service of India*, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1958.

Raqibuddin Ahmed, *Progress of the Jute Industry and Trade*, Pakistan Central Jute Committee, Dacca, 1966

Romesh C. Dutt, *The Economc History of India*, 2 Vols, Routledge and Kegan Paul, London, 1906/1956.

Ram Gopla, *Indian Muslims (1858-1947),* Asia Publishing House, Calcutta, 1964.

Radha Kamal Mukherjee, *Land Problems of India, Langmans*, Delhi, 1933.

Rammohan, Roy, *Brief Re-marks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females,according to the Hindoo Law of inheritance,* Unitarian Press, Calccutta, 1822.

S.B. Saul, *Studies in British overseas Trade 1870-1814*, Liver pool University Press, London, 1960.

S. Bean Susan, *Calcutta Banians for the American Trade*, Popular Prakashan, Bombay, 1990.

S.M. Ikram, *History of the Freedom Movement*, Renaissance Publishing House, Delhi, 1984.

S.N Mukherjee and Leach Edmund, *Elites in South Asia*, Cambridge University Press, England, 1940.

Suffia Ahmed, *Muslim Community in Bengal (1884-1912)*, The University Press Limited (UPL), Dhaka, 1996.

Syed Mahmood, *A History of English Education in India*, MAO College, Aligarh, 1895.

Serajul Islam, *Permanent settlement in Bengal. A Study of its operation 1790-1819*, Bangla Academy, Dacca, 1979.

Sukumar Bhattacharya, *The East India Company and the Economy of Bengal 1704-1740*, Book World's, Calcutta, 1969.

Thomas, F.W, *The History and Prospects of British Education in India*, Deighton, Bell & Co., Cambridge, 1891.

Taybor, James, *A sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, Calcutta: G.H. Huttman Military Orphan Press, Calcutta, 1840.

T.B. Bottomore, A *Dictionary of Marxist Thought*, Harvard University Press, U.S.A, 1983.

Tarachand, *Influence of Islam on Indian Calture*, the Indian Press Ltd. Calcutta, 1956.

Wasey, Akhtarul, *Education of Indian Muslims: A Study of the All India Muslim Educational Conference, 1886-1947*, Press Asia International, New Delhi, 1977.

Wallacc, D. R., *The Romance of Jute, A short sistory of the Calcutta Jute Mill Industry 1855-1909*, Empire Press, Calcutta, 1909.

Wasti, Syed, Razi, *Memoris and other Writtings of Syed Ameer Ali*, People's Publishing House, Lahore, 1968.

Weber, Max, *the Religion of India*, Free Press, New York, 1967.

W.W. Hunter, *Annals of Rural Bengal*, Vol, I, Leypoldt and Holt, New York, 1968.

W.W. Hunter, *the Indian Mussalmans*, W.H. Allen & Co., London, 1894.

Z. H. Zaidi, *The Partition of Bengal and its Annulment (1902-11)*, Adarsha Press, Calcutta, 1935.

৪. দ্বৈতীয়িক উৎস (বাংলা)

অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, রত্না প্রকাশন, কোলকাতা, ১৯৭৪।

অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও মঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগ*, ইন্ডিয়ানা লিমিটেড, কোলকাতা, ১৯৫৫।

অরবিন্দ পোদ্দার, *বঙ্কিমমানস*, বসুমতি সংস্করন, কোলকাতা, ১৯৬০।

আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২।

আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ও সংস্কৃতির রুপান্তর*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৯।

আহমদ ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩।

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৩।

আনিসুজ্জামান, *বিদ্যাসাগর ও অন্যেরা*, অন্যপ্রকাশ, একুশের বইমেলা, ঢাকা, ২০১৯।

আবদুল কাদির সম্পাদিত, *আবুল হোসেন রচনাবলী*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৩৮৩।

আবদুল কাদির সম্পাদিত, *সিরাজী রচনাবলী*, স্বদেশ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬।

আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬।

আবু মুহামেদ হাবিব উল্লাহ, *সমাজ-সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪।

আলম মুহাম্মদ শামসুল, *বেগম রোকেয়া: জীবন ও কর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯০।

কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার জাগরন*, চন্দ্রবিন্দু প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬।

কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, স্টুডেন্টস পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৩৭৬।

কুদ্দুস মু আবদুল, কুমিল্লা জেলার কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তি, নকীব, কুমিল্লা, ১৯৭৫।

কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা*, ১ম খন্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯।

খোন্দকার সিরাজুল হক, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ঐতিহ্য সাধনা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭।

খোন্দকার সিরাজুল হক, *কাজী আব্দুল ওদুদ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭।

গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ (১৮৮৫-১৯২১)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫।

গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলাদেশ ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতি*, অনিন্দ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০।

তীর্থংকর রায়, ইষ্ট *ইন্ডিয়া কোম্পানিও ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ২০১২।

নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, *সম্বন্ধীয়*, ইন্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ১৯২০।

নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, ১৩৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

নূরুল ইসলাম মনজুর, *বিশ শতকে বাঙালি মুসলিম মানসের বিবর্তনধারা*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১৭।

বদরুদ্দীন উমর, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৬।

বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ*, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ১৩৬৬।

বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৮০০-১৯০০*, বুক ক্লাব, ঢাকা, ১৯৬৮।

বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৩য় খন্ড)*, প্রকাশভবন, কোলকাতা, ১৯৭৮।

বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র (১ম খন্ড)*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কোলকাতা, ১৩৫৯।

মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতা*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৫।

মোহাম্মদ আলমগীর, *নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর জীবন ও কর্ম এবং ঢাকা নওয়াব এস্টেট*, ঝিঙেফুল, ঢাকা, ২০১৮।

মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১ম খন্ড, ১৯৮৫।

মুস্তফা নূর-উল ইসলাম (অনু:), *বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৯।

মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী, *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্তশ্রেণি (১৯৪৭-১৯৭০)*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৮৫।

মুহাম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী প্রভাব*, র‍্যামন পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৯৩৫।

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৮।

মুস্তফা নুরউল ইসলাম, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, অন্য প্রকাশ, একুশের বইমেলা, ঢাকা, ২০০৪।

মুস্তফা নুরউল ইসলাম, *শিখা সমগ্র (১৯২৭-১৯৩১)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩।

মীর মশারফ হোসেন, *গাজী মিয়াঁর বস্তানী*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮২।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, বিশ্বভারতী, কোলকাতা, ১৩৫৭।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আমার ছেলেবেলা*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, *রোকেয়া রচনাবলী (১ম খন্ড)*, অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫।

শাহজাহান মনির, *বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-ধারা (১৯১৯-১৯৪০)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩।

শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট, কোলকাতা, ১৯৫৭।

সালাউদ্দিন আহমদ, *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-চিন্তা ও বিবর্তন (১৮১৮-১৮৩৫)*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউ.পি.এল.) ঢাকা, ২০০০।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ২য় খন্ড, (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১৭।

সৈয়দ মর্তুজা আলী, *শ্রীহট্টের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ১৩৬৮।

সুখময়, সেনগুপ্ত, *বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা: বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা (১৮৩৫-১৯০৬)*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা, ১৯৮৫।

সুফিয়া আহমেদ, *বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় ১৮৮৪-১৯১২*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২।

সুশোভন সরকার, *বাংলার রেনেসাস*, দীপায়ন প্রকাশক, কোলকাতা, ২০১১।

স্বপন বসু, *বিশ শতকে বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, ২০০০।

৫. **Newspaper/পত্রিকা**

The Moslem Chronicle, Calcutta, 1895-1905 .

The Dacca Review, Dacca *1911, 1922,* .

The Pioneer, 1903, 1907. Delhi.

The Englishman, Calcutta, 1899, 1900, 1907.

The Hindoo Patriot, Calcutta, 1884, 1886.

ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ১৮৬১।

মিহির ও সুধাকর, কোলকাতা, ১৮৯৫।

আখবারে এসলামীয়া, করটিয়া, ১৮৮৪।

সওগাত, কোলকাতা, ১৯১৮।

নবনূর, কোলকাতা, ১৯০৩।

ইসলাম প্রচারক, কোলকাতা, ১৮৯১।

আল এসলাম, কোলকাতা, ১৯১৫।

নবযুগ, কোলকাতা, ১৯২০।

আঙ্গুর, কোলকাতা, ১৯২০।

মোহাম্মদী, কোলকাতা, ১৯০৩।

৬. সাময়িকী (বাংলা)

বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ঢাকা, ১৯৫৭।

ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ঢাকা, ১৯৬৬।

ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ঢাকা, ১৯৭৩।

সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭৩।

পান্ডুলিপি, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ১৯৬৬।

সমাজ নিরীক্ষণ, ঢাকা, ১৯৯৩।

এক্ষন পত্রিকা, কোলকাতা, ১৯৬১, ১৯৯৫।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কোলকাতা, ১৮৯৪।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কোলকাতা, ১৮৪৩।

সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০০৫, ৭ম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০০৯।

অনুশীলন সমিতি, ঢাকা, ১৯০৫।

শিখা পত্রিকা, ঢাকা, ১৯২৭।

7. **Journal(জার্নাল) /Gazetteers/Magazine**

The Oxford Magazine, Oxford, 1918.

Calcutta Christian Observer, Calcutta, 1850, 1884-1912, 1936.

The Indian Review, Madras, 1906.

Journal of the Moslem Institute, Calcutta, 1905, 1910.

Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol, V, Calcutta, 1931.

O'malley L.S.S. *Bengal District Gazetter,* Khulna, Calcutta, 1908.

" " " " , Jessore, Calcutta, 1912.

" " " " , Rajshihi, Calcutta, 1916.

" " " " , Pabna, Calcutta, 1923.

" " " " , Faridpur, Calcutta, 1925.

Dacca University Journal, 1933

Dhaka University Institutional Repository

Journal of Pakistan Historical Society, Karachi, 1964, 1965.

Chittagong University Studies, Chittagong, 1980, 1981.

Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1984.

Dacca University Studies, Dacca, 1971, 1974, 1977.